শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। {আত্মা-অনাত্মা} সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহান

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৭, ১৯৭১ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র চতুর্বিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ	
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০	ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০	বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
কর্মবাণী	১·২৫	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	বাংলার ঋষি	৩·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০	বাংলার বিদুষী	৩·০০
Soul of India Speaks	৬·০০	বাংলার মনীষী	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	জীবন গড়া	·৭৫
পকেট গীতা	৩·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি		আচার্য জগদীশ	২·৫০
		আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫	রবীন্দ্রনাথ	২·৫০

প্রয়োগসহ নূতন ধরণের বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

সব মানুষের জন্য-সব কলমের জন্য

সুলেখা

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট ।
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেবল । রয়েল ব্লু
রেড ★ গ্রীণ

সুলেখা
একজিকিউটিভ
পার্মানেন্ট ।
ব্লু-ব্ল্যাক ★ মেডি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল । রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীণ
ভায়োলেট রেড

সুলেখা
জেনারেল
পার্মানেন্ট । ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল ।
রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

UNIVE

উজ্জ্বলভারত

মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭০ চতুর্বিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার চতুর্বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল এই মাঘ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (জানুয়ারী ১৯৭১) হইতে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে বর্তমান যুগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাহিয়া এই 'উজ্জ্বল ভারত' প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এমনই একটী সামগ্রিক জীবন লইয়া এমনই মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ রাখিয়া গিয়াছেন যে আজও মানুষকে তিনি আকর্ষণ করেন। তাঁহার আলোকে যুগকে বোঝা এবং যুগের আলোকে তাঁহাকে দেখার প্রচেষ্টাই 'উজ্জ্বল ভারত' পত্রিকার প্রয়োজন। সূর্যালোকিত রূপরসগন্ধে ভরা এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে ভালবাসিয়া হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে থাকাই কৃষ্ণ-কথা। যাহা বিষয়ীর সংসার—আসক্তি যাহার প্রাচীর আর বিদ্বেষ যাহার হাতিয়ার—সে সংসার কৃষ্ণের নয়, সে কথা কৃষ্ণের নয়। মানুষকে ভালবাসিব—আসক্তি বিদ্বেষের জীবত্ব হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভালবাসিব—ইহাই কৃষ্ণ-কথা। যে জীবত্ব মানুষে মানুষে ভেদ-বুদ্ধি গজাইয়া তোলে, সমাজসংসার বিষাইয়া দেয়, সে ভেদ-বুদ্ধির জীবত্ব হইতে মানুষ যাহাতে রেহাই পায় অথচ মানুষের সঙ্গে সমষ্টি-জীবন যাপন করিতে পারে, মানুষকে ভালবাসিতে পারে—সেই কথাই কৃষ্ণ-কথা। মানুষকে ভালবাসিব—সমাজ বাদ দিয়া, সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া যেমন বিষয় ভোগ করিব না, তেমনি ধর্মের নামে মুক্তিকেও 'ভোগ' করিব না—মানুষকে ভালবাসিয়া পথ চলিব—ইহাই কৃষ্ণ-কথা। সকল দেশের সকল মানুষকে ভালবাসিব, সকল মানুষ লইয়া একটী এক-বিশ্বের আমি নাগরিক হইব—ক্লীব হইয়া এবের অপরের উপরের শোষণ-অত্যাচার সহ্য করিয়া ভালমানুষ হইয়া গা বাঁচাইয়া থাকিব না—ইহাই কৃষ্ণ-কথা। তাই দুর্যোধনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল—তাই বহুবার দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দৌত্যগিরি করিয়াও তিনি শেষ পর্যন্ত অস্ত্রাঘাত করিতে অর্জুনকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মানুষকে ভালবাসার পথে মানুষের নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিব—যেখানে একে অপরকে শোষণ করিবে না—যেখানে মানুষ নিজের অবস্থার জন্য অদৃষ্টের উপরই নির্ভর করিয়া কর্ম ত্যাগ করিয়া আকাশের ভগবানের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিবে না—মানুষের ভগবান অথবা তাহার বন্ধু ও পথ-প্রদর্শক পুরুষোত্তমের পথ-চলাকে অনুসরণ করিয়া সে নূতন সৃষ্টি, সামগ্রিক সৃষ্টির পথে আগাইয়া চলিবে—ইহাই কৃষ্ণ-কথা। এই সবই উজ্জ্বল ভারতের কথা। মানুষ স্রষ্টা—সে শুধু পুতুল নয়—কিন্তু মানুষ একলা স্রষ্টা নয়। প্রথম সৃষ্টি ভগবান করেন, দ্বিতীয় সৃষ্টি মানুষ করে—এই দুই সৃষ্টির দ্বারাই সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে। তিল ভগবান করিলেন—তাহা হইতে তেল তৈরী করিল মানুষ—এই পথেই তিলও সার্থক, তেলেরও জন্ম সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—মাটির ধরণী তিনি সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ গড়িবার ভার রাখিলেন মানুষের হাতে। ইহাতেই তো মানুষের সার্থকতা—নহিলে সে মুখস্ত-করা পথে শুধু দিন যাপন করিবে? আমাদের দেশের মানুষ সৃষ্টি করিতে ভুলিয়া গিয়াছে—যে কৃষ্ণ নাচিয়া হাসিয়া, কাঁধে চড়িয়া, কাঁধে চড়াইয়া বৃন্দাবনে নূতন সমাজের জীবন-বোধ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন—আমরা সে সৃষ্টি করিতে ভুলিয়া গিয়াছি

কিংবা কোনদিন শিখি নাই। যে কৃষ্ণ দ্বারকায় রাজনীতি ক্ষেত্রেও দুর্যোধনের অত্যাচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে অর্জুনকে জীবন সম্বন্ধে নূতন পথের কথা শুনাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যকে তাকেঁাস্তি পরন্তপ, সেই বীর্যবান শ্রীমান কৃষ্ণই আগামী যুগের পথ-প্রদর্শক। হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ করিতে কৃষ্ণ আহ্বান জানাইয়াছিলেন অথচ বুদ্ধিপ্রধান আমরা হৃদয়দৌর্বল্যে ধরাশায়ী—তাই সংসার আমাদের কাছে ভার হইয়া পড়ে, রাজনীতি আমাদের কেবল শক্তির কাড়াকাড়ির ক্ষেত্র হইয়া পড়ে—আমরা সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া মুক্ত মানুষের আনন্দপূর্ণ আবাস ভূমিতে গড়িয়া তুলিতে পারি না। কৃষ্ণ-কথায় কৃষ্ণ-জীবনে আরম্ভে আনন্দ, মধ্যে আনন্দ, শেষে আনন্দ—কৃষ্ণ-কথায় শোষণ নাই, প্রাণহীন শাসনও নাই—কৃষ্ণ মূর্তিমান পোষণ। অপরের মান মর্যাদা স্বাতন্ত্র্য-স্বীকৃতি অথচ সংশ্লিষ্ট জীবন শ্রীকৃষ্ণ-কথার পরম বৈশিষ্ট্য। সর্বক্ষেত্রে একটা শোষণহীন হৃদয়বান মুক্ত মানুষের সমাজ তৈরীর যে প্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন—বর্তমান যুগে যোগাচার্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সেই বিশ্বরূপ প্রেরণাকেই সর্বসমন্বয়ের পথে রূপ দিবার জীবন ও দর্শন রাখিয়া গিয়াছেন—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মুক্ত মানুষের এই নূতন সমাজ গড়িবার কথা লইয়াই তেইশ বৎসর পূর্বে 'উজ্জ্বল ভারত' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন—আর উহা চব্বিশ বৎসর সুরু করিল। আজিকার দিনে 'উজ্জ্বল ভারত' পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও বিশ্বের সকল হৃদয়বান মানবত্ব রক্ষাকারী মহৎ ব্যক্তিকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার জানাইয়া আবার যাত্রা সুরু করিল, তাহার গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলের শুভেচ্ছাও সে অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিয়া রাখিল।

উজ্জ্বলভারতের কথা

॥ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ॥

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার চতুর্বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল এই মাঘ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী জানুয়ারী ১৯৭১ হইতে। তেইশ বৎসর-আগে এই দ্বিতীয় পর্যায় ও বহু পূর্বে ১৩৩০-৩২ বঙ্গাব্দে বরিশাল হইতে প্রথম পর্যায় "উজ্জ্বল ভারত" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে "উজ্জ্বল ভারতের" কথাটা কি? শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবন-দর্শন অনুসরণ করিয়া পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-কথাই উজ্জ্বলভারতের কথা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহার তত্ত্বকথা তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত স্ব-উপনিষৎ গীতা। সর্ব উপনিষৎ ও সর্বোপনিষদের সার গীতাশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া জীব ও জগৎকে আস্বাদন করিবার সাধনায় "উজ্জ্বল ভারত" সচেষ্ট। দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ এই জগৎকে বুঝিতে হইলে, জীবনে গ্রহণ করিতে হইলে, জগতে বিচরণ করিতে হইলে সকল দ্বন্দ্ব ও বিভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও মিলন ঘটাইয়াই করিতে হইবে এবং তাহার জন্য এমন একজন দৃষ্টান্ত-পুরুষের প্রয়োজন যাঁহার জীবনে পূর্ব-পদার্থপ্রধান অব্যয়ীভাব, পর-পদার্থপ্রধান বহুব্রীহি এবং উত্তর-পদার্থপ্রধান তৎপুরুষ সবই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে ও মূল্যে স্বীকৃত হইয়াছে। তত্ত্ব-মূরতি শ্রীকৃষ্ণ-জীবন—কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বম্—কৃষ্ণ ছাড়া আর তো কোন দৃষ্টান্ত-জীবন আমাদের জানা নাই। তিনি নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ",

সকল দ্বন্দ্ব ও বিভেদ তাঁহার জীবনেই মিলিত হইয়া জীবনকে বৃদ্ধি ও সার্থক করিয়াছে। এমন একটি জীবনকে আশ্রয় ও সর্ব্বাদিক সংগঠনক্ষেত্রে তাঁহার কর্মগত ছন্দ ও প্রয়োগ কৌশলকে অবলম্বন ছাড়া কি আজিকার দিনের প্রার্থিত 'এক জগৎ' (one world) রচনা সম্ভব ?

বর্ত্তমান বিশ্ব আজ বহুধা বিভক্ত। দ্বন্দ্বের সঙ্কীর্ণ অর্থ অর্থাৎ একান্ত বৈপরীত্য (antagonistic) অর্থ গ্রহণ করিয়া বিশ্ব আজ সংঘর্ষে সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত রুধিরাপ্লুত। অথচ তাহার সামনে one world রচনার স্বপ্ন। জগতের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই তাহাকে 'এক জগতে' গড়িয়া উঠিতে হইবে। এই সম্পর্ক নির্ণয়ই সমস্যা। ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক নির্ণয় যথাযথভাবে করিতে না পারিলে এই সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সবই এই সম্পর্ক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্ক স্থাপন লইয়াই জগতে যত কিছু দ্বন্দ্ব। এক যুগের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে চলিতে বাহিরের ঘটনার চাপ আসিয়া যখন সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয় তখনই প্রয়োজন হইয়া পড়ে সেই সকল নতুন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নতুন চিন্তাধারায় এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার। এই নতুন চিন্তাধারাকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাই উজ্জয়ন্ত ভারতের কাজ।

এতকাল জগতে প্রধান প্রধান দার্শনিক চিন্তানায়কগণ দ্বন্দ্বের একান্ত বৈপরীত্য অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির ও সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক নির্ণয় করিতে যাইয়া একে অপরকে অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছেন। অদ্বয়বাদী ভারতবর্ষ এতদিন ব্যক্তির লয়-নির্ব্বাণের সাধনার মধ্য দিয়া মুক্তির পথ করিয়া দিয়াছিল। এই যুগে জড়বাদী কম্যুনিষ্টগণও সমষ্টিমূলক রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তির লয় করিয়া দিতে চাহিতেছে। কিন্তু সমগ্র জীবনে ব্যক্তি তো কিছুতেই লয় হইবার নয়। তাই একান্ত সমষ্টিবোধও বাস্তবরূপ হিসাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। আবার সমষ্টিকে ছাড়িয়াও ব্যক্তি চলিতে পারে না। ব্যক্তি-সমষ্টি দ্বন্দ্বে যে কোন একটিকে লইয়া সমগ্র জীবন চলিতেই পারে না। মানব মন সদা সর্ব্বদাই যুগপৎ প্রতিস্পর্দ্ধী (antagonistic) ও পরিপূরক (complementary) দুইটি প্রবণতাই প্রকট করিতেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখান হইতে বিশ্বের ছোট বড় সকল ঘটনাকে বিচার করিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয়ই প্রমাণিত হইবে, জড় ও অজড়ের সমন্বয়ই প্রমাণিত হইবে, চেতন ও অচেতনের সমন্বয়ই প্রমাণিত হইবে। সমগ্র জীবনের সঙ্গে প্রতিটি দৃষ্টিকোণের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। কোন একটি দৃষ্টিকোণকে একমাত্র করিয়া অপরগুলিকে বাদ দিয়া জীবন চলিতেই পারে না। বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধক নীতিজ্ঞানকে বাদ দিয়া economic determinism-এর সূত্র ধরিয়া জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সকল সমস্যার সমাধানের জন্য দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পথ ধরিলে জীবনে কিরূপ বিড়ম্বনা নামিয়া আসিতে পারে তাহার প্রমাণ আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী বর্ত্তমানে হাড়ে হাড়েই বুঝিতে পারিতেছি। তেমনি অতীতে ভারতবর্ষ একান্ত ধর্ম্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অর্থকেই অনর্থের কারণ বলিয়া অর্থকে বাদ দিয়াছে। একমাত্র জীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিলেই প্রতিটি দৃষ্টি কোণের সঙ্গে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে। সমগ্র জীবনে সকল দৃষ্টিকোণই সত্য বাস্তব। এই সমগ্রের ধারণা লওয়া সাধনা-সাপেক্ষ। মানুষের মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত সমগ্রের দুই প্রান্তে অহরহঃ দুলিতেছে—উহার এক প্রান্ত নিজ-আমি ও অপর প্রান্ত বহির্বিশ্ব, সর্ব্বভূত। জৈব মন বুদ্ধির স্তরে এই দুই বিপরীতের মধ্যে সে কিছুতেই সমন্বয় বিধান করিতে পারে না যতক্ষণ না তাহার ঐ জৈব-মন বুদ্ধিকে একটি সমগ্র সহজ সত্তার মধ্যে লয় করিয়া দিয়া, অবগাহন করিয়া উজ্জয়ন্তরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে তাই শ্রীভগবানের জীবের এই মন-বুদ্ধি লইয়া এত টানাটানি—'মণোব মন আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' Negationই হইতেছে determination-এর ভিত্তি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই সহজ জীবন, concrete example (দৃষ্টান্ত জীবন) যাঁহার মধ্যে সকল স্বাভাবিক বৃত্তি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ব্রহ্মমূল্যে সার্থক

হইয়াছে, কোনও বৃত্তিই নিগৃহীত, নিপীড়িত দমিত হইয়া অবচেতন মনে দিয়া জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। এই সহজ মানুষ কৃষ্ণ-কথাই উজ্জীবনভারতের কথা। অপুরুষ পুরুষ পুরুষোত্তম জীবনে নিজকে গলাইয়া দিয়া মন যখন অতিমানস হয়, তখনই তাহার নাম হয় 'প্রাণ'। এই প্রাণ ছাড়া মানুষ মানুষই হয় না। মানুষ প্রাণহীন হইলে সে মানবতার শত্রু। মানুষ দেহ আমরা লাভ করিয়াছি, কিন্তু কে কতটুকু মানুষ হইতে পারিয়াছি? মনুষ্যত্বের, মানবতার প্রতিষ্ঠা যদি আমাদের কাম্য হয় তবে সকল দ্বন্দ্ব বিভেদ জীবনে হজম করিয়া নির্দ্বন্দ্ব পুরুষোত্তমরূপে অগ্রহায়ণ কৃতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সেই লীলাময় হরির চরণে নিজেকে সমর্পণ করিতেই হইবে। ইহা ভিন্ন একান্ত জৈব মন বুদ্ধি দিয়া মনুষ্যত্ব লাভের খুবই সীমিত সম্ভাবনা।

এই মনুষ্যত্ব লাভের পথে রাজনীতি, অর্থনীতি, সা ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের নানা সমস্যার বিষয়ে সহজভ ও বিস্তৃতভাবে বলার প্রেরণা যাঁহাদের নিকট হইতে ল করিয়াছে চতুর্বিংশ বর্ষে যাত্রা আরম্ভ কালে আমরা ৫ সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা অবধূত মহারাজের শ্রীচরণ স্মরণ ও বন্দনা করি। ত স্মরণ করি মানুষ ভগবান সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে যি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে জড় ও অজড়ের, matter consciousness-এর অভেদ দর্শন, সমন্বয় দর্শনে মনস্তত্ত্ব জগতের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। এই সম দর্শন বা প্রাণ-দর্শন বা পুরুষোত্তম-দর্শনকে সূত্রাকা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল পুনরায় প্রকাশ করিয়াছেন যা উজ্জীবন ভারত পত্রিকার প্রচ্ছদপটে লিপিবদ্ধ আছে।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জীবনভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে অর্থ নিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অভ্যুদয়—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—এই সমন্বয়ঘন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে।]
—সঃ—উঃ—ভাঃ।

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী 'পুরুষে'র সমন্বয় করিয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চকল বাহিরে মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত নয়। শ্রীকৃ সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও মানে স্থাপিত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বসঙ্ঘাত হইতে বিশ্বকে ত্রা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্ত হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বয়ং সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামে যুগল মিলনে রাখালরাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজে ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এ সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণে মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তা এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞা জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষ রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হই গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থ আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-পরিবৃত। কৃ ক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধা হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূ হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমে পতাকা **'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'**।

উজ্জীবনভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কি রহিয়াছে।

মাইকেলের রাধা

॥ শ্রীমধুসূদন দাশ ॥

এক সময়ে আমাদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের মধ্যে যারা বীর তাঁরা আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্বদা গলা ফুলিয়ে বেড়ান, আবার যিনি ধার্মিক তিনি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ধর্মের ধ্বজাটিকে এমন করে তুলে রাখেন যে প্রতিকূল বাতাসে তার আর এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নাই। জীবন সম্বন্ধে সেই ছিল আমাদের একটা সহজ বিশ্বাস। আধুনিক যুগের আমাদের জীবনও জটিল, দৃষ্টি ততোধিক কুটিল, বিংশ শতাব্দীর কোনও দশরথ তাঁর যুবক পুত্র রামচন্দ্রকে তাঁর একটা অসাবধান এবং অসঙ্গত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বনে যেতে বললে এই রামচন্দ্র যে শুধু গোঁয়ার্তুমি করে পিতার আদেশ লঙ্ঘন করত তা নয়, পিতৃসত্য পালনের ন্যায় তুল্যমূল্যের আরও বহু কর্তব্যের নজির দিয়া পিতাকে হয়ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই নিরস্ত করতে পারত। কলিযুগের রাম আর ত্রেতাযুগের রাম তো এক নয়; কারণ যুবক রাম যখন পিতৃভক্ত তখন সে পিতৃভক্তিই জীবন্ত বিগ্রহ, আর কিছুই নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সরল দৃষ্টিটি আমাদের এখনও যায় নি, অবশ্য না যাবার কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণও আছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যারা মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন তাঁরা বৈষ্ণব কবিতা রচনায় হাত দেন নি, যাঁরা রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবত অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন, তাঁরা মঙ্গলকাব্য বা গীতি কবিতা রচনা করেন নি, সংস্কৃত কবি কালিদাস অবশ্য মহাকাব্য রচনা করেছেন আবার খণ্ড কাব্যও রচনা করেছেন। কিন্তু আসলে মনে হয়, কালিদাসের মহাকাব্যও কাব্য নয়, নাটকও নাটক নয়, মূলতঃ সবই কাব্য। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ লেখক একটি বিশিষ্ট প্রতিভা এবং কবি-মানস নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি বড় নাট্যকার তিনি বড় কবি নন, যিনি বড় কবি তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন, তবে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভা বিরল হতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে আর সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভায় এই জটিল রূপ প্রথম দেখতে পেলাম মধুসূদনের ভিতরে। মধুসূদন সম্পর্কে এইটাই বড় কথা যে তিনি ধূমকেতুর ন্যায় বাংলা সাহিত্যে সহসা আবির্ভূত হয়ে আবার ধূমকেতুর মতনই হঠাৎ নিভে গেলেন, তাঁর প্রতিভার জাগ্রত রূপ আমরা দেখতে পেলাম না। তার ফলেই প্রতিভা যে কোন্ পথে সবচেয়ে ভালরূপে বিকাশলাভ করতে পারবে এ বিষয়েই তিনি মাঝে মাঝে সংশয়ের দোলায় দোল খেয়েছেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ছিলেন তাঁর শৈশবের সঙ্গী; বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল টাসো, দান্তে, মিল্টন এরা ছিলেন তাঁর যৌবনের স্বপ্ন। এই জন্য তাঁর মেঘনাদ বধ তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি। কিন্তু 'মেঘনাদের' বধের কোলাহল-মুখরিত রণোন্মাদনার পাশে ব্রজাঙ্গনা কাব্য মধুসূদনের নিভৃত আপন মনের গান, এই নিভৃত মনের গানই মানুষের অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয়। "মেঘনাদ বধের" ভিতরে মধুসূদনের মনের পরিচয় আছে বটে, কিন্তু মধুসূদনের কবি-মনের সহজতম এবং সুন্দরতম প্রকাশ এই ব্রজাঙ্গনার কবিতা গুলির ভিতরে। ব্রজাঙ্গনা রচনার পূর্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন, **But I suppose I must bid adieu to heroic poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition But there is the wide field of romantic and lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the lyrical way"।** ব্রজাঙ্গনা কাব্য বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রেম-গীতিকার সর্বপ্রথম

া সাহিত্যের যে সকল প্রাচীন কবিকে মধুসূদন সহিত শ্রদ্ধা করেছেন, তার ভিতর দেখতে পাই ও কাশীরাম দাস ; তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ি, ইংরেজ, ফরাসি, সংস্কৃত এবং বাংলার অনেক ক্ষেত্রে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, া সাহিত্যের প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস বা অন্য কোন রির নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এক নাম আছে সেও বোধ হয় সংস্কৃত ন। তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে নে বেশ একটু অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছেন, ম বন্ধুকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছেন—

k you are cold towards the poor Broja. Poor man! when sit down poetry leave aside all religious bias.

Mrs. Radha is not such a bad after all. if she had a 'Bard' like umble servent from the beginning, ld have been a very different cha- it is the vile imagination of the at has painted her in such colours".

মতে মিসেস রাধা মোটের উপর খুব খারাপ য়। বৈষ্ণব কবিদের হাতে পড়ে মিসেস রাধা ই মহিলাটি একেবারে নাস্তা-নাবুদ হয়েছেন। মধুসূদনের কোন সংশয় ছিল না। সুধার রস তায় মধুসূদন বলেছেন—

হাত ধরাধরি করে নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণীচয় কামাগ্নি নয়নে
উজলি কানন রাজি বরাঙ্গ কৃপণে
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাগ রঙ্গ ছলে ॥

রমণীয়তা মধুসূদনকে যে দিন স্পর্শ করেছিল সেদিন জেলি মাখাই, তাই সাহেব মধুসূদনও ছাট কোট ধুতি চাদর পরে বৈষ্ণব কবিদের দলে ভিড়ে গেলেন বৈষ্ণব কবিদের দলে একবার ভিড়তে পারলেই যে কবি হওয়া যায় তা নয়। তাই ধুতি চাদরের মধুসূদনের কোট পেন্টুলনকে চিনে নিতে খুব বেগ হয় না।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য সমগ্র ভাবে বিচার মোটের উপর এই কথাই মনে হয়, রাধা যেন অনে মিসেস রাধা হয়ে গেছে। সে আর প্রাকৃত-অপ্রা মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাই। তাঁর প্রাকৃতত্ব একেবারে তাই মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা খানিকটা তাঁর বীরা সহোদরা হয়ে পড়েছে। তাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ রাধারাণী হতে প্রাকৃত নায়িকা বলেই ভ্রম হয় কে

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির রাধা হতে মধু রাধা অনেকখানি পৃথক। মধুসূদনের রাধা প্রথ বিরহীনা এবং দিব্যোন্মাদিনী, বৈষ্ণব কবিদের রা রাগ, অনুরাগ, মান অভিমানে যতই সুচতুরা হোক না বিরহে সে বনহরিণী। বুকের কথা ে ফুটে বলতে পারে না। তার একটি দীর্ঘশ্বাসই যে কবিদের ভাষা ও সঙ্গীত অবলম্বন করে এক একটি হয়ে রয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের রাধা বিরহে বড় হৃদয়ের আবেগ হতে তীক্ষ্ণ কথার বাধুনিই যেন স্থানে বড় বেশী হয়ে উঠেছে। অন্তরের গভীর অপেক্ষা বাঁজটাই যেন প্রকাশ পেয়েছে বলা দিব্যোন্মাদিনী রাধা বলছে—

"যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পা
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে
যদি অবহেলা করি রুষিবে মধব অ

"দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি নদী ত্রপবতী
মজো না রিঝমে তার তুমি হে দূত রাধার
হেরো না হেরো না কেশ সুষম যুবতী
কিনিতে তোমার মন বেচে সে সৌরভ-ধন
অবহেলি সে ছলনা যেও আত্মগতি।"

এইখানে আমাদের মেঘের প্রতি যক্ষের সাবধান-বাণী মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া পৌরাণিক কথাও রাধাকে দিয়ে মধুসূদন অনেক বলেছেন। পৃথিবী রাধাকে বলেছেন—

"যবে দশানন অরি
বিসর্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী
তুমি গো রাখিলা বরাননে,
তুমি ধনি ছিদা হয়ে বৈদেহীরে কোলে লয়ে
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণী"।

শুধু কি যুক্তি তর্ক, ঈর্ষান্বিত তীব্র খোঁচাই কি কম?

"লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী
তুমি তারে ঘৃণা কেন কর সীমন্তিনী।
অনন্ত জলধি-নিধি
এই দুই বরে তোমা দিয়েছেন বিধি
তবু তুমি মধু বিলাসিনী"

সুরটা অতি নিম্ন স্তরের। বৈষ্ণব কবিতার রাধা নিজেকে কলঙ্কিনী বলে কোনদিন যুক্তি তর্কের অবতারণা করে নি। অপবাদ যতদিন সহ্য করতে পারেনি, ততদিন

"সই লোকে বলে কালা পরিবাদ
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তাজিয়াছি কাজরের সাধ"

তারপর প্রেম যখন পাগল করে তুলল তখন বৈষ্ণব রাধা মুক্ত কণ্ঠে বলছে—

"ননদি বল গে যা তুই নগরে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ-কলঙ্কসাগরে"

এ কলঙ্কের ডালি মাথায় নিতে বৈষ্ণব রাধার লজ্জা নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই,

"বঁধু তোমার লাগিয়া　　কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।"

বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার বেশী তুলনা করে লাভ নাই। কারণ পূর্বেই বলেছি মধুসূদনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরূপ। কিন্তু মধুসূদন যে ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখেছিলেন এটাই তাঁর সর্বতোমুখি প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয়। মধুসূদনের অন্তরে ছিল একটি সত্যকার কাব্য-চিত্ত, তাই বৈষ্ণব কবিতা তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করেছিল একটা স্বকীয় প্রকাশের বেদনা, তার ফলে ব্রজাঙ্গনার সৃষ্টি, এসব দেখে শুধু নীরবে বসে ভাবতে হয় মধুসূদনের প্রতিভা ছিল কি বিরাট। যে বিরাট সম্ভাবনা তাঁর চিত্তের মধ্যে ছিল আমরা তার কতটুকু মাত্র আভাষ পেয়েছি।

দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা সত্ত্বেও মধুসূদন যে স্থানে স্থানে সত্যই বৈষ্ণব কবি হতে পেরেছিলেন এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য যে প্রেমকাব্য হিসাবে অনেক স্থানে মধুর হয়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে বিরহে ব্রজবাসী সকলে কাতর। পশুপক্ষী তরুলতা কৃষ্ণের বিরহে সকলেই বিমর্ষ, গাছে আর ফুল ফোটে না, যা ফোটে তাতে অলিগুঞ্জন নাই, তরুশাখে শারির কূজন নাই। সব আঁধার। বিষাদ-মলিন রাধা বলছে—

"দিবা অবসান হলে রবি গেল অস্তাচলে
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন
নলিনীর যত জ্বালা এত জ্বালা কার"

সখীগণ রাধাকে সাজাবার জন্য বনলতা হতে ফুল ছিঁড়ে এনেছে, কিন্তু রাধার আর ফুল-সাজের সাধ নাই; তাই সখীকে বলছে—

কেন এত ফুল　　তুলিলি সজনী
তরিয়া ডালা
মেঘাবৃত হলে　　পরে কি রজনী
তারার মালা?

রাধার ত আজ কেহই নাই, লতার ত অলি-বধূ আছে। ঐ যে পুষ্প হতে অলির মধু আহরণ সেইখানে লতার সার্থক জীবন। তাই—

কেন গো হরিলি　　ভূষণ লতার
বনশোভিনী
অলি-বঁধু তার　　কে আছে রাধার
হতভাগিনী।

বাঁশীর গান শুনে বৈষ্ণবের রাধা পাগলিনী, সেই বাঁশী নে মধুসূদনের রাধা বলছে—

"ওই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন রে
মুরারীর বাঁশী
সুবন্ধ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যামদাসী"।

খাও প্রেমোন্মাদিনী রাধার ছবিখানি সত্যই প্রাণস্পর্শী উঠেছে। সখীদের নিকট কৃষ্ণের আগমনের আশ্বাস য় রাধা বলছে—

"কি কহিনি সই শুনিলো আবার
মধুর বচন
সহসা হইনু কালা ছুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন।
ছা সে তোর পায়ে ধরি কহ না লো সত্যকরি
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ"।

র কৃষ্ণচূড়া ফুল হাতে রাধা সখীকে বলছে, এই যে য় পাপড়ির উপর মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু বারিকণা, ভাবছিস এ শিশির পড়া জল! তা নয়।

"লয়ে কৃষ্ণচূড়া মণি কাঁদিনু আমি সজনী
বসে একাকিনী
তিতিনু নয়ন জলে সেই জল এই গলে
গলে পড়ে শোভিতেছে দেখলো কামিনী।"

আবার শিঞ্জরাবদ্ধা বিরহিণী সারিকাকে রাধা বলছে—

"ওই যে পাখিটী সখি দেখিছ পিঞ্জরে
সতত চঞ্চল
কভু কাঁদে কভু গায় যেন পাগলিনী প্রায়
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে সজনী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি।"

রাধার প্রাণ কৃষ্ণ-বিরহে ঐ পিঞ্জরবদ্ধা সারিকার মত ছট করছে। আজ সারিকার ব্যথা যে রাধার বুকের ব্য তাই নিজের সম্বন্ধে রাধা বলছে—

"দেহ ছাড়ি যাই চলি যথা বনমালী
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালী।"

তারপর ভাব সম্মিলন, দিব্যজ্ঞানের আভাষ আমরা ব্রজাঙ্গ কাব্যের প্রথম হতে পাই, কিন্তু বসন্ত কবিতাটিতে দেখে পাই—

"মুছিয়া নয়ন জল চল লো সকলে চল
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব
আইল বসন্ত যদি আসিবে মাধব।"

যুক্তির বহর নাই,—শুধু "আইল বসন্ত যদি আসিবে মাধব"- শুধু প্রেমের বিশ্বাস, হৃদয়ের অনুভূতি—এইখানে শ্রীমধুসূদ চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতিরই সমশ্রেণীভুক্ত হ পেরেছেন।

কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন; তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিক। 'They complete, by excluding each other' —De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও

ইরাবতীর তীরে

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

এই ইরাবতীর তীরেই সেই কোন্ আদি-যুগে রাজা সুদাস যুদ্ধ করে অন্য দশজন রাজাকে হারিয়ে প্রথম রাজ চক্রবর্তী হয়েছিলেন—হয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। ভারতের মাটিতে ক্রমে আর্যরা নানা গোত্রে বা শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার প্রধান ছিলেন ভরতরা। এঁরা সরস্বতী ও দিষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থান ব্রহ্মাবর্তে বাস করতেন। মৎস্যবংশীয়রা বাস করতেন অধুনা আলওয়ার, জয়পুর ও ভরতপুরে। অণু ও দ্রুহ্যরা পাঞ্জাবে, তুর্বসরা দক্ষিণ পূর্বদেশে, যদুরা পশ্চিমে আর পুরুরা সরস্বতী নদীর ধারে ধারে। এঁদের মধ্যে পুরুরা ছিলেন বিশেষ ক্ষমতাশালী। এ ছাড়া আরও বহু অপ্রধান বংশের মানুষও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এঁরা এসে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে বিদ্যমান থাকতেন।

ঋগ্বেদে আমরা ভরতদের ত্রিৎসু গোত্রীয় রাজা সুদাসের সঙ্গে, পুরুদের অধীনে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের আরও দশটি শাখার সহায়তায় পঞ্জাবের আধিপত্য লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উল্লেখ পাই। ভরত ও অন্য দশটি শাখার মধ্যে পুরোহিত নির্বাচন নিয়েই বিবাদ ঘটে। প্রথমে কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্র মুনির অধীনেই ভরতেরা বিজয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করেন, কিন্তু কিছু কাল পরে বিশ্বামিত্রকে অপসারিত করে বশিষ্ঠ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের স্থান অধিকার করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহায় বিশ্বামিত্র পশ্চিম পঞ্জাবের দশটি শাখাকে উত্তেজিত করে ভরতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত হন। ভরতবংশীয় রাজা সুদাস এই ইরাবতীর তীরেই তাঁদের পরাজিত করতে সক্ষম হ'ন। বহুদিন এই ভরতরা পরাক্রমের সঙ্গে পঞ্জাবের বুকে রাজত্ব চালান। তারপর কালক্রমে পুরু ও দ্রুহ্যরা ধীরে ধীরে ক্ষমতা বিস্তার করে ভরতদের স্থান অধিকার করে সমস্ত পঞ্জাবে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

আর্যদের কাছে আর্য অনার্যের প্রধান প্রভেদ ছিল বর্ণে। আদিম অধিবাসীদের তাঁরা নিষাদ দস্যু বা দাস নামে উল্লেখ করেন। কালো মানুষদের তাঁরা ঘৃণা করতেন। এই বর্ণ বিদ্বেষ থেকেই ক্রমে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি।

রামায়ণের সময় কালেও আর্যরা ভাল করে সমস্ত প্রদেশে বসবাস করতে পারেন নি। স্থানে স্থানে আর্য ঋষিরা তাঁদের আশ্রম স্থাপনা করেছেন মাত্র। এই রামায়ণেই আমরা দেখি আর্য ও অনার্যের মধ্যে কি গভীর ভেদ যার জন্য গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে রাজা রামকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তপস্যারত শূদ্র রাজা শম্বুককে বধ করতে বাধ্য হতে হয়।

মহাভারতের যুগেও এর প্রভাব যথেষ্ট পাওয়া যায়—যেমন গুরু দ্রোণাচার্য দ্বারা ব্যাধপুত্র একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ। মন স্তব্ধ হয়ে যায় ব্রাহ্মণের এ অন্যায় ঔদ্ধত্যে ও ব্যাধপুত্র একলব্যের মহিমায়! তবুও মহাভারতের যুগে এ আর্য অনার্যের বিভেদ অনেকটাই কমে এসেছে বলা যায়। মহাভারতের সম্পাদক বেদব্যাস স্বয়ং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও এক ধীবর কন্যার সন্তান। পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্য-গন্ধাগর্ভে যমুনা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। সে যুগের তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ এ নিয়ে সন্দেহের বা বিতর্কের অবকাশ নেই। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু তাঁরই ঔরসজাত সন্তান এ কথা সর্বজনবিদিত। ধৃতরাষ্ট্র-মাতার দাসীপুত্র (ব্যাসপুত্র) মহাজ্ঞানী বিদুরের মর্যাদার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরও আমরা জানি পাণ্ডুর কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রী ছিলেন অনার্য মদ্ররাজকন্যা।

পাণ্ডবদের অনার্য পত্নীদের সন্তানেরাও আর্য পত্নীদের সন্তানদের সম মর্যাদাই পেয়েছেন দেখতে পাই। ক্রমে আদি অধিবাসীরা আর্যদের আচার আচরণ শিক্ষা নাম গোত্র গ্রহণ করেছিলেন, আর আর্যরাও তাঁদের সভ্যতা ধর্ম দেব-দেবীদ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আজকের হিন্দু ধর্ম, আজকের ভারতবর্ষ আর্য অনার্যের মিলনে মিলিত সভ্যতার পুষ্ট। এই পঞ্জাব সেই মিলনের ক্ষেত্র। আজকের এই ভারতীয় সভ্যতার উৎসভূমি এই পঞ্জাব পর্যবসিত হতে পারে।

এ সব হল বৈদিক যুগের কথা, পুরাণের কথা। আজকের যে জনতা প্রধানত হিন্দু মুসলমান ও কিছু খৃস্টান। তার মধ্যে কিছুরা আবার নানকের অনুগামী শিখ আর কিছু বা দয়ানন্দজীর অনুগামী আর্য সমাজী।

গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়ে টঙ্কারা ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন দয়ানন্দ সরস্বতী। এই মেধাবী শৈবকুলের পাঁচ বছর বয়সেই বেদ মন্ত্র আয়ত্ত করেন। পিতা একান্ত ইচ্ছা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করবেন পুত্রকে—কিন্তু সে ইচ্ছা ব্যর্থ হয়েছিলো। বিধির বিধান অন্যরূপ। বালক যখন চৌদ্দর কোঠায়, সব শাস্ত্র তখন সে অধ্যয়ন করে ফেলেছে। পিতা এক শুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। পবিত্র রাত্রির দিনে পুত্রকে মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন বিনিদ্র থেকে সে প্রহরে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করতে। শুভ রাত্রি অতীত হয়ে যায়। বিগ্রহের পানে চেয়ে সেদিন বসে আছে এক তেজস্বী বালক। মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ ফুল বিল্বপত্র সরে উঠল, নৈবেদ্যর কলমূল চাল দিকে ছড়িয়ে দেবতার আহার চুরি করে খাচ্ছে দুরন্ত ইঁদুর পাল। বালক-মনে প্রশ্ন জাগলো—এই কি সেই শক্তিমান দেবাদিদেব যাঁর ওপর দিয়ে তুচ্ছ ইঁদুরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে? বিহ্বল বিভ্রান্ত বালক মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এল, আর কখনও ঢুকলো না। পিতা ক্ষুব্ধ হলেন, গুরু হলেন—কিন্তু ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে গেছে তাঁর নাস্তিক ছেলেটি। আর্য সমাজী ও আদি ব্রাহ্মদের মধ্যে নিবিড় মিল। দুইটিই বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বলা যায়। বেদ উপনিষদই এঁদের ধর্মের ভিত্তি; শুধু কালের প্রয়োজনে যে অজ্ঞান লোকাচার ও কুসংস্কারের পলিমাটি তার ওপর জমা হয়েছিলো এঁরা বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা তা ক্ষেত্রমুক্ত করে নিয়েছেন। স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রচলন করে দেন, পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন মহান বৈদিক ধর্ম স্বকীয় গৌরবে।

কিন্তু কি দিলো ইংরাজেরা এই ভারতবর্ষকে? দেড়শো বছর ধরে এই ভারতের মাটিতে রইল কিন্তু থেকে শেষ সেই শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধই রয়ে তাদের। ভারতীয়দের সঙ্গে কিছুতেই এ মাটিতে মিশে আপন হতে পারল না এরা। অত্যাচার অন শাসন শেষেষই চালিয়ে গেল! তবুও তাদের মধ্যেও কেউ কেউ স্মরণীয় বরণীয় কি! দানবতার তাণ্ডব ছা তাঁদের দেবত্বও জেগে থাকবে চিরদিন। ডেভিড সাহেব, বেথুন সাহেব, কেরী সাহেব—সতীদাহ প্রথা উ কারী লর্ড বেন্টিঙ্ক—এঁরা তো সত্যই প্রাতঃস্মর কলকাতা স্থাপনকারী জব চার্ণকের তো কথাই আল বাঙ্গালী সহধর্মিণী গ্রহণ করে আচার আচরণে তিনি আধা বাঙ্গালীই হয়ে গিয়েছিলেন। যে হতভাগিনী বিধবা মেয়েটিকে আগুনের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছি তিনি, নিশ্চয়ই স্নেহে সেবায় কৃতজ্ঞতায় তাঁর জীবন ভ্রূষনায় ভরে তুলেছিলেন সে প্রীতি-ধন্যা নারী। যে তাকে নব জন্ম দান করেছিলেন মৃত্যুর তমিস্রা বাঁচিয়ে। আর এই irrigation ব্যবস্থা, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এ সবই তো লর্ড ডালহৌসির মুক্ত P. W. D. Department, Central Legislat Council of India তাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় রেলপথের জন্মযাত্রাও যে তাঁরই স্পর্শ-টেলিগ্রাফ, ডুলদসার ট্যাম্প ইত্যাদি বহু স্মরণীয় কীর্তি ও স্মরণীয় করে রেখেছে ভারত-ইতিহাসে। বন্ধুবর সাহেবের মেয়েদের জন্য কলেজের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। তা ছাড়া বাদশাহী সড়ক গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড যা সেই বাংলা থেকে সুদূর পঞ্জাব চলে এসেছে—এর পূর্ণ সংস্কারও তিনিই করিয়ে গেছে এই মহান scotsman-কে ভারতীয়ের পক্ষে ভোলা শ মাধোপুরের কাছে রাবিনদীর এই যে বন্ধ, সে তো তি

জলদানের জন্য তাঁর সুযোগ্য পার্শীয়ান এঞ্জিনীয়র আলি মর্দান খাঁন এখান থেকে 'হসলী' নামে একটি মৌসুমী নহর বের করেন। Annexsation-এর সময় 'হসলী'কেই লর্ড ডালহৌসী Upper Bari Doab নহরে পরিণত করান।

সারা জীবন প্রায় কাটল চৌধুরী সাহেবের জলের ধারে ধারে। পঞ্জাবের এই পঞ্চনদীর ইতিহাস ইতিবৃত্ত আজ তাঁর নখদর্পণে। পঞ্চনদীর দেশ এই পঞ্জাব—তবু কি রুক্ষ, কি বন্ধুর আর মরুময় এ দেশ। যত্র তত্র বালুকার স্তূপ বা ছোট ছোট বালুর পাহাড় আর বালুকার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত এ অহল্যা ভূমি প্রস্তর কঠিন। এ দেশ তাই গ্রীষ্মে অত্যন্ত তাপদগ্ধ ও শীতেও অতিশীতে পীড়িত। ভারত মহাসাগর আজ অনেক দূরে সরে গেছে তবু পঞ্জাবের কেবলের পূর্বতীরের ভূমি কোথাও হাজার ফিটের বেশী নয়, আর দিল্লী ও লাহোর এ দুটি প্রধান সহরই সাতশ ফিটের কিছু উর্দ্ধে মাত্র। প্রাগঐতিহাসিক Jurastic যুগে এ ভূমি সমুদ্রগর্ভের অংশ ছাড়া যে আর কিছু ছিল না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পঞ্জ অব তারি সন্ধি পঞ্জাব; কথাটি পার্সীয়ান আর এই পঞ্চনদের বারিই সারা পঞ্জাব প্রদেশকে সাধ্যমত সরস করে ফলে ফুলে ভরিয়ে মুলতান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় পঞ্চনদে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই পঞ্চনদ আবার আরও ৪৪ মাইল নীচে প্রবাহিত হয়ে সিন্ধু নদে গিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এমনি করেই দেহের শিরা-উপশিরার মতই এই নদীগুলি পঞ্জাবের, আর সেই নদীগুলি থেকে canal বা নহর বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই নদী পাঁচটি যথাক্রমে বিপাস, শতলেজ, চেনাব, রাবি ও জেলম। পঞ্জাবের রুক্ষমাটি এমনি করেই এই নদী পাঁচটির করুণা ধারায় শস্যপূর্ণা অন্নদাত্রী। সংস্কৃত কাব্যে নদীগুলিকে আমরা বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা নামে পাই। আর্যরা এই দেশটিকে সপ্তসিন্ধুর দেশ বলতেন—আর তাঁরা এই পাঁচটি নদীর সঙ্গে সিন্ধু ও সরস্বতীকেও ধরতেন। রুক্ষ বন্ধুর আর অনুর্বরা এই দেশে নতুন সভ্যতার প্রাণ-স্পন্দন জাগালেন এই আর্যেরা। এই অহল্যা প্রকৃতিকে তাঁরা শস্যপূর্ণা বসুন্ধরায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন নাবা ভূমি বা নদীর কাছাকাছি ভূমিতে বসতি স্থাপন ও কৃষিকার্য চালিয়ে। জিলম ও শতলেজ অর্থাৎ বিতস্তা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী ভূমিই প্রধানত পঞ্জাব বলে আমরা উল্লেখ করি। পশ্চিম থেকে পূবে এর মধ্যবর্তী নদীগুলি চেনাব, রাবি, বিপাস।

বৈদিক ঋষিদের এই পাকিস্তান অর্থাৎ ইরাবতী বা রাবির জন্মস্থান কাঙড়া জেলার রোটাং পাশের কাছে। সেখান থেকে উত্তর পশ্চিম বাহিনী হয়ে চম্বার নগরীর নীচে দিয়ে উপল চপল পায় প্রমত্তা ধারায় চটুল নর্তকীর বিনোহিনী মূর্তিতেই বেরিয়ে এসেছে পর্বত-তনয়া। চম্বার কাছে এ নদী কিশোরী, তার কৈশোর স্বপ্ন তখনও অনাগত যৌবনের দূর পদধ্বনির হাতছানি শোনে। এইখানে রাবির বুকে একটি সুন্দর সেতু আছে। সেখান থেকে সে ছুটেছে ডালহৌসী শৈল নগরীর দিকে বিচিত্র গতিতে। তারপর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রান্ত সীমা ছুঁয়ে আপন পথের সুধার ফলে ফুলে সাধ্যমত ভরিয়ে প্রাণ-চাঞ্চল্যে চঞ্চল করে কঠিন বনভূমিকে শ্যামল সরস করে আবার দক্ষিণ পশ্চিম মুখে গিয়ে এর স্রোতধারা বালোলিতে মিলিত হয়েছে। সেখানে কাশ্মীর ও চম্বার সঙ্গে গুরুদাসপুর জেলা মিলেছে। এখানে এ নদী সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার ফিট উচ্চে। মাধোপুরের ঠিক ওপরেই Upper Bari Doab নহরের প্রধান কার্যালয়। রাবি এখান থেকে পাহাড় ছেড়ে সমতলের দিকে গুরুদাসপুরের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। মাধোপুর নহরে জল যোগাতে এ গিরিকন্যা নীর্ণা হয়ে পড়েছে। এই দূর পথে সিধনাই পর্যন্ত আর আসতে হত না এ নদীকে যদি না জম্মু পর্বত উত্থিত Ujhএর জলরাশিপুষ্ট এ প্রবাহিনী রাজেন্দ্রাণীর মতই পরিপূর্ণা রূপ নিয়ে সিয়ালকোট সহরের প্রান্ত ঘেঁসে এই জিলাটিকে গুরুদাসপুর আর অমৃতসর থেকে বিযুক্ত করে দিয়ে লোজা লাহোরের পশ্চিমবাহিনী হয়ে মন্টগোমারী ও লায়েলপুর সহরকে বিভক্ত করে মুলতানের উত্তর দিয়ে কজা সহরের কাছে চেনাবে মিলিয়ে গেছে। মুলতানের কাছেই এই লোজা দীর্ঘ পথ নদী যাকে বলা হয় সিধনাই এই সিধনাই থেকে একটি ছোট নহর বের করা হয়েছে

এই আয়নাটিই হল বাচ্ছোতরা বা সিধনাই বহু। উপস্থিত চৌধুরীর কর্মক্ষেত্র। সিধনাই-এর নহর Head Ballakir (Triple project) লোয়ার রাবি লোয়ার নহরের তুলনায় নালামাত্র।

লাহোরের দক্ষিণে হেড বলোকিতে নদীর জল নিয়ে বিজ্ঞানের সার্থক লীলা হয়েছে বলা যায়। পঞ্জাব জলসেচ প্রণালীর গর্বের বস্তু এই Triple project আধুনিক বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা, বৈজ্ঞানিকদের ত্রিবেণী সঙ্গম। Upper Jhelam Lower Chenab নহর দুটি ও Lower Bari DoabCanal এই তিনটি মিলেTriple project। ঝেলম, চেনাব ও রাবির বিপুল জলরাশি বহন করে নিয়ে এই নহর তিনটি পঞ্জাবের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই রাবি নদী যদিও ঝেলমের মতই দীর্ঘ ৪৫০ মাইল পথ প্রবাহিনী তবুও ঝেলমের তুলনায় এ ক্ষীণা। শীতের দিনে হেডগুলি এতই জল শুষে নেয় যে মাধোপুর প্রধান-বাঁধালয়ের নীচে জল প্রধানত (Ujb) উজ্ব-এর জলধারাই জাগায়। উজ্ব-এর জলধারাও আবার লোয়ার রাবি ডাবাব নহর শুষে নিচ্ছে। মধ্যগোনাবীর পর থেকে মাসের ৯ মাস রাবির বুকে হেঁটে পারাপার হয় মানুষ, জীবজন্তু। বাচ্ছোতরার সিধনাই প্রধানকার্যালয়ের নীচের অবস্থাও সেই একই। সারা শীত কালটা প্রায় চড়া পড়েই থাকে কিন্তু গ্রীষ্মে যখন বরফ গলতে সুরু হয় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, যে নামে তখন এই সব নদীগুলিতে। বর্ষার সে গতি হয় বাপ। সে যেন দুকূল প্লাবিত করে রুদ্রের রূপ নিয়ে মত্ত ভৈরবের মতই বাঁধন হারা হয়ে ছুটে আসে। শীতে যারা শীর্ণা গ্রীষ্মে তারাই আবার প্রমত্তা প্রাণোচ্ছ্বাসে। সামনে তার পড়ে ভেসে চলে যায় স্রোতের কুটোর মত। শুকনো বীর চড়ায় চড়ায় তীরে তীরে অকস্মাৎ সামাল সামাল রব ঠে। এত ক্ষিপ্র গতিতে আর এত ভীষণা রূপ নিয়ে কিয়ে ঝাঁপিয়ে কালগর্জনে ছুটে আসে এই স্রোতধারা বহু লোকের সর্বনাশই না ঘটে যায়। ছোট ছোট ছেলেরা হয়ত বা গোধন নয়ত বা ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে শুকনো মরুনদীতে সামান্য যেখানে একটু ক্ষীণ স্রোত বইছে জল খাওয়াতে নিয়েছে তাদের গোধন বা ছাগপাল দূর থেকে কলকল্লোলিত জলগর্জন আর তার উত্তাল তরঙ্গরাশি তাদের অন্যমনস্ক শিশুমনকে সাবধান করতে যে হয়নি—নয়ত তাদের জীবজন্তুরা সহজাত সাবধানতা জানতে পেরেও সময়মত বাঁধ ভেঙ্গে পাড়ে পালাতে পারেনি, উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে ভীমগর্জনে জলস্রোত সব তাদের গ্রাস করে কোথায় নিয়ে ফেলে তার চিহ্নটুকুও রেখে যায় না। এমনই জীবন মৃত্যুর খেলোয়ার এই প্রদেশের লোকেরা। তাদের দেহমনে অশৈশব প্রকৃতির এই কাঠিন্য নানা বিরূপতার সঙ্গে লড়তে লড়তে কঠিন হয়ে গেছে। পঞ্জাবীরা তাই স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু কঠিনদেহী এক জাতি। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য তাদের জলহাওয়ার দান। কিন্তু লাক্ষের ধার তারা বড় একটা ধারে না। যুদ্ধে তারা দুর্ধর্ষ সৈনিক। তারা শক্তিমান, বীর্যবান জীবন ধারণের ভাগিদেই। ইংরেজ রাজত্বের বহু অপকীর্তির মধ্যেও মহৎ কীর্তি পঞ্জাব জলসেচ ব্যবস্থা। সারা প্রদেশ শিরা-উপশিরার মতই ছড়িয়ে আছে নহরের শাখা প্রশাখা। কৃষ্ণ শুষ্ক মরুময় এ দেশটার বেশীর ভাগই নিষ্ফলা হয়ে পড়ে থাকতো যদি না জলসেচ প্রণালী এইসব অহল্যা মাটি প্রাণবাহী নালা নহরের জলধারা ঢেলে সিক্ত করে জীবনে ডেকে দিতো। পঞ্জাবের বেশীর ভাগ চাষ আবাদ এই জলসেচ প্রণালীর সাহায্যেই হয়ে থাকে। পঞ্জাব বদলে ইংরেজকে যুগিয়েছে সবল সুস্থ সৈনিক আর তেজী সুঠাম আরবি ঘোড়া।

পঞ্জাবীরা লড়িয়ে জাতি। তাদের ঘরে ঘরে আজ পূর্ব পুরুষের স্মৃতি-চিহ্নবাহী যুদ্ধের কোনও না কোনও অস্ত্র। এক কথায় আজও তাদের 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। ভাবনাহীন'। •

পদাবলীর শেষ পর্যায়ে চারজন বৈষ্ণব কবি

॥ ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত ॥

পদাবলী সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে ষোড়শ শতকের স্বর্ণদীপ্তি ও সমৃদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু ঐ সাহিত্যের ধারাটিকে পরবর্তী কালের করপুটে তুলে ধরবার একটি আন্তরিক প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদা গীত চিন্তামণি', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র', বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদাবলী-সংকলন গ্রন্থগুলিই এই প্রয়াসের আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। প্রাকচৈতন্য যুগের দু' একটি পদ রামগোপাল দাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে ধরে রেখেছিলেন, —পরবর্তী যুগের বিপুল পদসম্ভারকে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে উপরিউক্ত কয়েকজন বৈষ্ণব কবি ও সংকলয়িতা উত্তরকালের রসিক জন-মানসের রসাস্বাদনের জন্য মহাকালের ভাণ্ডারে একত্র করে জমা রেখে গিয়েছেন। চিরস্মরণীয়কে চিরদিনকার করে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে (আনুমানিক ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত সমুদ্র' নামক একটি পদ-সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এই সংকলন গ্রন্থে তিনি স্বরচিত ২২৮টি পদ সন্নিবিষ্ট করেন। সুতরাং তাঁর নিজের পদ সংখ্যা একেবারে কম নয়। তাঁর ১২৮টি পদ বৈষ্ণব দাস 'পদকল্পতরু'তে গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে রাধামোহন ঠাকুরের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি অল্প বয়স থেকেই বৈষ্ণব সমাজের গুরু ব'লে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমারেরও গুরু ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি জয়পুরের মহারাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁকে 'পরাজিত করেছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র বলেন, এই সময়ে রাধামোহন ঠাকুরের বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল। তাই যদি হয়, তবে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ এই বিচার ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি পৈতৃক বাসস্থান ঢাকন্দী গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। শোনা যায়, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির (১৭৭৫ খ্রীঃ) তিন বৎসর পরে তিনি পরলোকে গমন করেন। তা হ'লে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে তাঁর লোকান্তর ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, উপরিউক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য বাদশাহী পরোয়ানা নিয়ে স্বকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বাঙলা দেশে এসেছিলেন। কথিত আছে, তিনি রাধামোহন ঠাকুরের কাছে পরাজিত হ'য়ে তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে, স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্বের বিচার ছয়মাস ব্যাপী চলেছিল। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বিচারের ফলাফল তৎকালীন বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর দরবারে অনুমোদিত হয়েছিল। এই বিচার-সভায় রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টৈঞা-বৈষ্ণবপুর নিবাসী গোকুলানন্দ সেন ও তাঁর বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। এই গোকুলানন্দ সেনই 'বৈষ্ণবদাস' ছদ্ম-নামে পদাবলীর বিখ্যাত সংকলনগ্রন্থ 'পদকল্পতরু' সম্পাদনা করেন। ৩১০১টি পদ এই সংকলন গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে এতবড় সংকলন গ্রন্থ আর নেই। উদ্ধবদাস নামে পরিচিত বৈষ্ণবদাসের বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার এই সংকলন-কর্মে সহায়ক ছিলেন। পদকল্পতরুর উপসংহারে বৈষ্ণবদাস লিখেছেন—

আচার্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
• • • •
গ্রন্থ কৈল পদামৃত- সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥

সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা রচিল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥

উদ্ধৃতিতে এই কথাটিই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈষ্ণবদাস পদাবলীর এই বৃহত্তম সংগ্রহকর্মে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন গুরু রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থ থেকেই এবং তাঁর সংকলন গ্রন্থে গুরুর সমস্ত পদ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের মনে হয়, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যদি রাধামোহন ঠাকুরের তিরোধান ঘটে থাকে, তবে এর পরে পদকল্পতরু'র সংগ্রহ-কর্ম হওয়া সম্ভব নয়। রাধামোহন ঠাকুরের জীবিত কালেই বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু' সংকলন করেছিলেন ব'লে অনুমান করা যায়। 'পদকল্পতরু'র আলোচনা-ভিত্তিক বেশ কয়েকটি পদে সরল কবিত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবদাসের শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাধামোহন ঠাকুরের পাণ্ডিত্য, অপূর্ব রসবিশ্লেষণের জন্য 'পদামৃত-সমুদ্রে' থাকলেও তাঁর কবিত্ব খুব উচ্চশ্রেণীর ন না। গোবিন্দদাসের অনুকরণই পদগুলির মধ্যে ত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রায় সবগুলি পদই তাঁর বুলিতে রচিত। নিম্নোদ্ধৃত পদটি রাধার খণ্ডিতা রূপ াশ্রে কবিত্বময়:

ধীর নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাগ তহিঁ লাগি।
নয়নক আরকত বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনী জাগি॥
মানিনি নিছই বাঢ়ায়সি মান।
কুসুম নখ-পদ দৈরিক অলকত
রোখে করসি সোই ভান॥

ন খণ্ডিতা রাধার মান ভাঙাবার জন্য কৃষ্ণের উক্তি ই রস-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

'সংকীর্তনামৃত' সংকলয়িতা দীনবন্ধু দাস অষ্টাদশ ীর প্রথম ভাগে পদ রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় ছিলেন। তাঁর পিতা বল্লবীকান্ত, পিতামহ নন্দকিশোর। র্তনামৃতে'র পুঁথি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ ক'রে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে দীনবন্ধু দাসেরই ২০৭টি গ্রথিত হয়েছে। শেষের দিকের একটি পদে আছে—

দোঁহার অঙ্গ হেলাহেলি দেখি কোন ছলা করি
মন্দির বাহিরে আনাইব।
মধুমতী-পদপাশে লুকাইঞা অভিলাষে
দীনবন্ধু রঙ্গ দেখিব॥

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নি শুনেছি, তিনিই বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের দৃষ্টি এই 'মধুম শব্দটির দিকে আকর্ষণ ক'রে সিদ্ধান্ত করেন যে, দীনবন্ধু দ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য-শাখার সঙ্গে সং ছিলেন; কারণ নরহরি ঠাকুর ব্রজলীলার 'মধুমতী স ব'লে পরিগণিত হয়েছিলেন। 'সংকীর্তনামৃত' সংকল দীনবন্ধু দাসের যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে তেমনি বহুপদে স্বতোচ্ছ্বসিত কবিত্বের প্রকাশও ঘটেছে ঐ সময়কার বহু বৈষ্ণব কবির মধ্যে কবিত্ব-বিচারে কি দিয়ে দীনবন্ধুকে একটি শ্রেষ্ঠ আসনে অভিষি করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রামূলক একটি পদে ত কবিত্বের সঙ্গে বর্ণনার একটি রসমধুর সম্মেলন ঘটেছে:

নিশি পরভাতে নফর নাহি নাচত
রোয়ত শুক পিক সারি।
নন্দমহল কল- রব শুনি আকুল
ধাওল ব্রজপুরনারী॥
সুন্দরি মন্দির বাহির ভেল।
গুরুজনে এক নয়ন পথ-পাতরে
অপর নয়ন ধনী দেল॥

তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচ করেছিলেন।

'পদরত্নাকর' সংকলয়িতা কমলাকান্ত দাস কাটোয়া প্রায় চার ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সিউর গ্রামের অধিবা ছিলেন। তিনি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে বসেই 'পদরত্নাক সংকলন করেছিলেন। নিজের কুড়িটি পদ এই পদ-সংকল

চাঁচর-চিকুর কবরি-ভার শোহন
কুসুমাবলি অনুপান।
কালিন্দি-নীর-তরঙ্গে বিরাজিত
জনু ঘন-ফেনক দান।
মধুর বিহারিণী বালা।
মন্থর গমনে বিলোলিত উর পর
মঞ্জুল মণিময় মালা॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জগদানন্দ বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীরভূম বিবরণে তাঁর সম্বন্ধে যে-তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাতে দেখা [বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (অপরার্ধ): ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৩৯৭] যায় যে, তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে বিখ্যাত চৈতন্য-পরিকর নরহরি সরকারের বংশধর এবং তাঁর পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড থেকে উঠে এসে বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকটবর্তী জোঁকলাই গ্রামে বাস করেন। তাঁর জন্ম-সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংকলিত একটি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে জগদানন্দ ভণিতার একটি পদ পাওয়া গিয়েছে; সেইজন্য ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন একজন জগদানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের বংশধর যে-জগদানন্দ তিনি ১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২—৮৩ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। জগদানন্দের পূর্বপুরুষ যে কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীখণ্ড গ্রামে বাস করতেন, তার উল্লেখ একটি পদেও করেছেন:

খেদ কি কহব খিনত সম গতি
খণহিঁ খল খল হাসই।
খণ্ড কপালিয়া খণ্ড বাসিয়া
জগত-আনন্দ ভাসই॥

ধ্বনিঝংকারময় শব্দচিত্র রচনায় জগদানন্দের দক্ষতা অবিসংবাদিত। কিন্তু শব্দচিত্র-সম্বলিত পদগুলিতে তাঁর কবিত্বের প্রকাশ ঘটেনি। কবিত্ব এবং আন্তরিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলিতে শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্যে এবং ধ্বনিসৃষ্টির মাধুর্যে তাঁর শ্রীরাধার অভিসার-মূলক একটি পদ বিশেষভাবে স্মরণীয়:

মধু বিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপ লুব্ধ গুঞ্জ গুঞ্জ
ঝুরুত গতি গজি গমন মঞ্জুল কুঞ্জনারী।
ঘনগরজন চিকুর পুঞ্জ মালতী ফুল শোভে রঞ্জ
অঞ্জন যুত রঞ্জ নয়ন খঞ্জন গতিহারী॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গা অনঙ্গ
কিঙ্কিণী-রব-কঙ্কণ মৃদু রণিত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু-ভুরঙ্গ কালি দমন-দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গ পহিরে রঙ্গিল নীল সাড়ী॥

জগদানন্দ 'ভাবাশ্রয়ার্থ' দীর্ঘক সমধ্বনি সম্পন্ন শব্দকোষ-জাতীয় এরূপ পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তা' অসম্পূর্ণ রেখেই পরলোক গমন করেন।

বৈষ্ণবদাস-সংকলিত সুবিখ্যাত 'পদকল্পতরু'তে জগদানন্দের মাত্র সাতটি পদ গ্রহণ করা হয়েছে। 'পদকল্পতরু' অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৭৫০ খ্রীঃ) যদি সংকলিত হ'য়ে থাকে, তবে এ-কথা আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি যে, ঐ সময় জগদানন্দের কবিখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই সময় যদি তাঁর বয়স ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর ধরা যায়, তবে ১৭২০ সালকে তাঁর জন্ম সময় ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে তিনি বাষট্টি-তেষট্টি বৎসর জীবিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে জগদানন্দের একটি পদও দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন তিনি খুব সম্ভব কিশোর বালক ছিলেন।

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ভাঁটার যুগে জগদানন্দ লেখনী ধারণ করলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পদাবলীর জগতে তিনি সমুজ্জ্বল।

সরস্বতী পূজা

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

বৎসরান্তে আমরা আবার বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতী ায় সবাই মিলিত হয়েছি। চারিদিক আনন্দে ভরে ঠেছে। আমরা জানি ভারতবর্ষের সব দেবদেবীর পূজারই াড়ায় একটা কথা আছে যাকে বলে তার তত্ত্বজানা। তায় শ্রীভগবান বলেছেন "মামেন্ বেত্তাস্মি তত্ত্বতঃ" : হে র্জুন আমি কি ও কতখানি তা তত্ত্বতঃ জান। তিনি , কেন তাঁকে পূজো করছি এ না জেনে শুধু পূজো রলে আমরা সত্যিকার ফল কিছুতেই পেতে পারি না। শুধু চৈ করলে একটা উচ্ছ্বল আনন্দ ছাড়া আমাদের ীবনকে এতটুকুও এগিয়ে নেয় না। সেই জন্য এই পূজা- সরে দেবীর তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা জানতে প্রয়াসী হব। বকেন্ ইতে মানুষ জড়সড় হয়ে যায়। তার পরেই সে বসন্ত ঋতু। সমস্ত গাছে গাছে ফুল ফোটে। পুরাণো তা খসে পড়ে, নূতন পাতা বের হয়। পাখীরা আনন্দে কে, ভ্রমর ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়। সব যেন আনন্দে তে ওঠে। প্রকৃতি যেন নব রূপে আমাদের কাছে তার াশ উন্মোচন করে। এই সময় সরস্বতীর পূজো হয়। ্বতী যে রসের দেবী। রস এলেই চারদিক আনন্দে ুলে ওঠে। সেই আনন্দে মানুষ যাতে যা খুশী তাই না য়, সেই জন্য মা সরস্বতী এলেন শুভ্র সাদা পবিত্র বেশে। ার কংকারে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হবে, কিন্তু র পা বিপথে পড়বে না, সে আনন্দ তাকে খারাপ পথে য়ে যাবে না। মা যে আমাদের ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী। । মানে বড়, বড়কে জানার বিদ্যা, মহানকে জানার বিদ্যাই । বিদ্যা। ব্রহ্মকে জানা, ভগবানকে জানার যে বিদ্যা তাই বিদ্যা। বড়কে, বৃহৎকে, ব্যাপককে, গভীরকে কি করে তে হবে, সেই পথ শিখব সরস্বতী পূজায়। আমরা রসের জগতে বিচরণ করব—একান্ত অজানের মতো ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করব, সত্যিকারের মানুষ হওয়ার আশীর্ব্বাদ চেয়ে নেবো। পূজো মানে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের বিনয়, এক কথায় আমাদের সকল মানবসত্তা কেমন করে বিকশিত করবো, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের তথা সমগ্র বিশ্বের সকলকে কেমন করে ভালবাসব, শ্রদ্ধা করব সেই ছন্দ শিখে নেওয়া। আজ বিংশ শতাব্দীর ভারত- বাসী আমরা যখন নিজেদের দিকে তাকাই তখন আমাদের ভেতরে কী দেখতে পাই? আমরা কী মায়ের কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনার কোন সুর নিজের ভিতরে শুনতে পাই? দুঃখে বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় যখনই ভাবি আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যা আস্বাদনের পথ থেকে স্খলিত হয়ে কোথায় ভেসে চলেছি। জড়সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধাক্কায় আমরা একান্ত জড়ের হাতে পুতুল বনে চলেছি। এ যে জনজীবনে কত বড় অসুস্থতা তা আজ আমরা মায়ের কাছে বসেই আত্মসমালোচনা করব, সার্থক পূজারী হবার সংকল্প গ্রহণ করব। তবেই হবে আমাদের সত্যিকারের পূজা করবার প্রয়াস সার্থক। ভারতীয় নরনারী আমরা আজ সকলেই উপলব্ধি করছি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ কি বিষম বিপর্য্যয় এসে গেছে। পরিবারে সুস্থতা নেই, সমাজে সুস্থতা নেই, প্রতি ক্ষেত্রেই কোথায়ও যেন কারো স্থিতি- ভূমি নেই। এত জটিলতার মধ্যেও কেমন করে ভাগবত জীবন, উচ্চ জীবন, দিব্যজীবন যাপন করা যায় তার কৌশল শেখাই ভারতবর্ষের পূজার তাৎপর্য্য। বাস্তব জগতকে পুনর্বিন্যাস করে সকল জটিলতাকে সর্ব্বভূত-কল্যাণময় কী করে করা যায় সেই বিদ্যাই মানুষের একমাত্র প্রার্থনীয়। আমরা ভুলে যেন না যাই আমরা আর্যবংশধর। আর্য শব্দ ঋ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। ঋ মানে গতি। সে গতি কোন্ গতি। সে গতি ব্রহ্মমুখী গতি। যারা গতিধর্ম্মী তাঁরাই আর্য।

এই এগিয়ে চলা, জীবনকে শোভন করার পথে এগিয়ে চলা যেন স্তব্ধ হয়ে না যায়। একান্ত জড়বাদের চাপে আমাদের জীবনের চলার গতি যেন রুদ্ধ হয়ে না যায়। আজ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের ভাণ্ডারে এত জ্ঞান বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষের সভ্যতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। কিন্তু এই ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের বাঁচতেই হবে যে এবং বিশ্বকেও বাঁচাতেই হবে। এই নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচাবার মন্ত্রও ভারতের ভাণ্ডারেই আছে। ভারতবর্ষের নারীই সেদিন দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "যে নাহম্ অমৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যে বস্তু যে চিন্তাধারা আমাকে অমৃত করবে না তেমন বস্তুতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আজ ভারতের নারী আমরা যদি গার্গী মৈত্রেয়ীর মত সকল মৃত্যুর বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারি, অমৃতের তত্ত্ব প্রচার ও আচরণ করতে না পারি তবে আমাদের ভারতের মাটিতে জন্ম নেওয়া ব্যর্থ। শাস্ত্রে বলেছেন "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"। অর্থাৎ দেবতা হয়ে দেবতার পূজো করবে। তার মানেই হোল যাকে আমি পূজো করছি তাঁর যা আদর্শ তা আমার জীবনে ধারণ করতেই হবে নতুবা তিনি আমার পূজো গ্রহণ করবেন কেন? আমরা কিন্তু যুগ যুগ ধরে সরস্বতী না হয়েও সরস্বতী পূজো করে আসছি, লক্ষ্মী না হয়েও লক্ষ্মী পূজো করে আসছি, দুর্গা না হয়েও দুর্গা পূজা করে আসছি। যার ফল দাঁড়াচ্ছে যুগ যুগ ধরে পূজা করা সত্ত্বেও ভারতের অন্তহীনতা ও আদর্শহীনতা যেন বীভৎস রূপে বেড়ে চলেছে। আমরা যেন স্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি হয়ে পড়ছি। এই মলিনতার হাত থেকে আমাদের যে বাঁচতেই হবে। দেশ কাল যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আমাদের যে নরসিংহীর মত রুখে দাঁড়াতেই হবে। গর্জন করে বলতে হবে, কোন মলিনতা, কোন সংকীর্ণতা দিয়ে আমরা ভারতের মাটিকে অপবিত্র হতে দেবনা। আমরা জীবন্ত সরস্বতী হব। জীবন্ত সরস্বতীর চরণতলেই বিশ্ব স্বস্থ হওয়ার ছন্দ পাবে। আজ প্রতিটি নরনারীর জীবনে কি দৈন্যই না নেমে এসেছে। আমাদের ধনকৌলীন্যে, জ্ঞানকৌলীন্যে, কর্মকৌলীন্যে অন্যকে ছোট ভাবতে, অন্যকে নিপীড়িত করতে প্রাণ একটুও শিউরে ওঠে না। আমরা সভা সমিতিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বক্তৃতা করে এসে পরিবারের ভাইয়ের সংগে মিলতে পারিনা। আমরা অফিসে আদালতে একরকম, খেলার মাঠে একরকম, সভাসমিতিতে একরকম, পরিবারে একরকম, সমাজে একরকম। এই যে সামঞ্জস্যহীন জীবন এ কিন্তু ভারতীয় জীবন নয়, সারস্বত জীবন নয়। মানবজীবনে এত বড়ো ফাঁক আমরা কিছুতেই সৃষ্ট হতে দেব না। আজ প্রতিটি মায়ের কাছে আমার এই বিনীত আহ্বান—আসুন আমরা সকলে মিলে মায়ের চরণে মিলিত হই। এবং মিলিত হয়ে অমৃত হবার দীক্ষা গ্রহণ করি। দীক্ষা গ্রহণ করি সমগ্র বাংলা সমগ্র ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে অমৃতের বারতা শোনাবার। আজকের পূজায় বিশেষ করে বিদ্যার্থীরাই উদ্যোক্তা—যারা আমাদেরই ঘরের ছেলে মেয়ে। তারা যেন সরস্বতী দেবীর পূজার তত্ত্ব জীবনে উপলব্ধি করে বর্তমান বিশ্বের ভাঙাগড়োলের স্রোতে নিজেদের বাস্তব সত্তাকে হারিয়ে না ফেলে। তাই আজ আমরা প্রতিটি মা আমাদের বিদ্যার্থী সন্তানদের আহ্বান জানাই। ওগো আমাদের সন্তানদল, তোমরা দেবী সরস্বতীকে হৃদয়ে ধারণ করো। তোমাদের সকল বাণী মন ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সত্যার্থে হোক, তোমাদের বাণী যেন মিথ্যাকে আশ্রয় না করে, মনের গতি কখনও মিথ্যা না হোক, ইন্দ্রিয় সকল অন্যপথে চালিত না হোক আজ বাংলার মানুষ আমরা বাংলা দেশের কী ছবি দেখছি। মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু সে জ্ঞান মানুষকে মানুষ করেনি—করেছে ধ্বংসের উপাসক। এর কারণই হচ্ছে প্রাণের রসধারায় যে জ্ঞান সিঞ্চিত নয় তা মানুষকে মানুষ না করে বিকৃত করবেই। সারস্বত জ্ঞানই সেই জ্ঞান যে জ্ঞান প্রাণের মহিমায় উজ্জ্বল। বাংলা দেশ এই জ্ঞানেরই উপাসক হোক শান্ত হোক, সুন্দর হোক এবং সারা বিশ্বের পথ-প্রদর্শক হোক এই আশাকে রূপ দিতে প্রচেষ্টা করে যাব। *

* ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের পূজায় পঠিত।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮৬)

র সুখদুঃখ আমি কিছুতেই আপনার মত বুঝব না—চোখ দিয়ে দেখতে হবে।…কেউ নিজের বিচ্ছির দিয়ে অন্যকে বুঝতে…রাজা যতই ভাল হোক দুঃখ বুঝবে না—নর যতই ভাল হোক নারীর বে না…যদি না তারা এক স্তর উপরে না উঠতে golden thread (ব্রহ্ম সূত্র) সেই ব্রহ্ম-সবে না ধরতে।…মণি প্রোতং ইদং সূত্রে মণিগনা প্রত্যেক মানুষ নিজের দৃষ্টিকোণ ছাড়া কে বাপের তে চায়…লোহহ্…He is the I am of the es…। পরিচ্ছিন্ন মনই মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে কামকে —সেই জন্য গোবিন্দ বললেন, মন্মনা ভব…। Be politan—বিশ্ব নাগরিক হও…ব্যক্তিগত জীবন মানুষের ধর্ম-জীবনও কাম হয়ে দাঁড়ায়…। অন্যের নিজের ধর্ম চাপানোও কাম।…প্রকৃতির ভাবের প্রতি ওয়ায় কৃষ্ণ গৌর হলেন।…যা কিছু ছোট তার জন্য ওয়াই পুরুষোত্তম-ধর্ম।…দরিদ্রের মানুষের প্রতি লোভ তা-ই গণতন্ত্র আনে।…৪৫০ বৎসরাধিক গে মহাপ্রভু প্রথম এই গণতন্ত্র আনেন।…বড়র যখন র ছোটকে পাওয়ার জন্য, রাজার যখন লোভ হয় জন্য তখনই তাহার রাজা হওয়া সার্থক, প্রজাও ী।…দরিদ্রের কি কম সৌন্দর্য?…বৃন্দাবনে গোবিন্দ পা ধরলেন—জয়দেব লিখলেন, 'দেহি মে দারম্…স্মরগরল খণ্ডনম্'—পুরুষত্বের গৌরবের । করতেই, প্রকৃতিকে তার নিজস্ব মূল্যে স্বীকার না র্ঘদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই কৃষ্ণ প্রকৃতির ত হয়ে বললেন, দেহি মে পদপল্লবমুদারম্…। এই চাইছে।…বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, শীতে কেঁপে যার আমার ঐশ্বর্য বাড়াচ্ছে, তাদের মর্য্যাদা দিতে না পারা দীনতা আমাদের ছাড়তেই হবে।…তাদের এ খাটুনী জন্য কি আমাদের লোভ হয়?…সেবা করতে কার লোভ হয়? কয়জনের লোভ হয়?…কামকে জবরদস্তি করে দমন করা যায় না—বিশ্বরূপ না হলে, বিশ্বকে ভাল না বাসলে মদনমোহন হওয়া যায় না…। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের দেশ এটা—কামের ইন্ধনও দিতে পারব না, repressionও চলবে না…বিশ্বনাগরিক হও—নিজের ক্ষুদ্র আমিকে ছড়াইয়া দাও বিশ্ব-সেবার জন্য—কাম দমিত হবে…। কি আজ তোমার ঘরের আঙ্গিনায়…পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আর কোন ব্যক্তিগত জীবন চালানো সম্ভব নয়…।…শান্ত জগতে ব্যক্তিগত সাধনা চলত, আজিকার উন্মত্ত বিশ্বে বিশ্বরূপের সাধনার প্রবর্তক পুরুষোত্তমকে হাল ধরতে হবে…। প্রত্যেক মানুষকে আজ বিশ্বনাগরিক হতে হবে… …শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিতাগোপাল দুইজন কাম দমনের কথা শুনিয়ে গেছেন—আজ ব্রহ্ম অবতীর্ণ মাটিতে—আমরা নব বৃন্দাবন গড়ব—ধর্মে অর্থে কামে মোক্ষে প্রেমে সে বৃন্দাবন হবে নূতন সমাজের ভিত্তি স্বরূপ।…।

২০।৩।৫৭।…। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন, উদ্ধব সে আত্মঘাতী যে এই মনুষ্য-দেহ পেয়ে ভব-সমুদ্রের পারে গেল না অর্থাৎ সদ্ব্যবহার করল না।…নরদেহের বিশেষত্ব দিচ্ছেন নৃদেহম্ আদ্যম্—নরদেহ সর্বশ্রেষ্ঠ—কেননা সকল দেহের সমন্বয় এতে আছে—নরদেহ সুলভ অথচ সুদুর্লভ—মানুষের এই দেহতরী সুদৃঢ়—এত বড় তুফানেও এ নৌকা সহজে ভাঙে না—প্লবং সুকল্পম্। গুরু কর্ণধার—

বাহুদ্বারা প্রেরিত হচ্ছে—এমন দেহ পেয়েও যে জীবনের সমাধান পেল না সে আত্মঘাতী···। উপনিষৎ বলেছেন, আত্মহা যারা তারা অসুর-লোকে যায়। এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা আসেন।···সংসারে আত্মা বড় মলিন হয়···এ সংসারে আত্মবিক্রয় না করে কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।···যা অবজ্ঞায় দিচ্ছ তেমন দান নিতে পারি না।···সংসার আমায় পদাঘাত করে যাচ্ছে···সংসারে পরস্পর পরস্পরকে অবাচ্য বলছে তবু সেই সংসারের আসক্তি বিদ্বেষের মধ্যেই থাকবার জন্য আকুতি—সংসার ছাড়া থাকতে পারে না।···পরমহংস-দেবের দৃষ্টান্ত—মেছুনীকে ফুলের গন্ধে ভরপুর চাদরে শুতে দিয়েছে, তার ঘুম হয় না···শেষে মাছের ছাকড়া নাকের কাছে নিয়ে ভস্‌ভস্ করে ঘুমাল।···সংসারী লোকেরাও এমনি—সংসার যতই কষ্ট দিক তবু সেই সংসার না হলে থাকতেই পারে না...। সংসারে কে নিজের কল্যাণ চায়?···ঘটনা দিয়ে দেখাতে পারি কেমন করে মানুষ নিজের স্বার্থ নষ্ট করে।··· স্বামী গাল দিচ্ছে স্ত্রীকে, স্ত্রী গাল দিচ্ছে স্বামীকে—এই অপমান করা না করা নিয়ে সংসারী বিষয়ী লোক ২৪ ঘণ্টা চলছে।···মাথা নোয়াব না—এ কথা বলতে বীর্য লাগে। বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ সংসারে আত্মসম্মান রক্ষা করতে গেলে জীবনে খুব কম প্রয়োজন রাখতে হবে।...জড়ের ক্ষেত্রে মানুষ খুব পরাধীন। পুত্রের মৃত্যুর দিনেও খিদে পায়—তাই আত্মাকে, আদর্শকে বাঁচাতে দেহের প্রয়োজন কমাও—দেহসম্পর্ক যাদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কমাও।...অতিমাত্রায় ভোগ করলে চুরী করতে হবে।··· এই আত্মহত্যা নিবারণের জন্য প্রয়োজন কমাও। প্রয়োজন বাড়িয়ে চুরী দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না।...আমি সারা জন্য minimum প্রয়োজনে চালিয়েছি···দুর্জয় শীতে বৃন্দাবনে লেপ গায়ে দেই নি ··কয়জন পারবে?···বিষয়ী লোক কেউ পানে আটকা, কেউ সিনেমায় আটকা—না হলেই চলে না—এমন লোক দিয়ে কি বিপ্লব হয়? নূতন সমাজ গড়া হয়? প্রয়োজন কমাও।···আমার আদর্শনিষ্ঠা দেখে ভায়ে বলেছিল—মাথার মাথা খারাপ হয়েছে···তার বাড়ী আর যাই নি।··তারপর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভায়ে বাড়ী যাই।···সৃষ্টি কর...আজ সৃষ্টি করতে হবে—নূতন যুগের culture, নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে হবে। আমি যদি কিছুই করতে না পারতাম, তাহলে ছেলেদের ওখানে আমাকে অপমানের অন্ন খেতে হতো··· একটু মাথা নোয়ালে নেহরু আমায় প্রচুর টাকা দিতে পারত···কিন্তু আমার আদর্শকে খাটো করা সম্ভব নয়...। আমি তাদের নিন্দে করার জন্যে বলছি না—নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে সত্য স্থাপনের জন্য বলছি ··। নিজেকে আমি কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রেখেছি...কোথাও যেতে হলে পাঁচ মিনিটে যেতে পারি—always in attention—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক যেমন সদা জাগ্রত···ঘুমের সময় নাই।···হ্যাঁ, তিনি কৃপা করেন—কিন্তু কতদিন তিনি কৃপা করবেন?··· সব পাপ মোর, আর না করিব পাপ—মহাপ্রভু বললেন।। তুমি কেবল পাপ করেই চলবে, আর তিনি কৃপা করতেই থাকবেন তা হয় না—তোমাকে পাপ না করার জন্য, শুদ্ধ পথে চলবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হতেই হবে।···মহাপ্রভুই আবার ছোট হরিদাসকে বর্জন করলেন—বর্জন করার প্রয়োজনও হয়—তাতেই তার কল্যাণ। রাখতে চাইলেই কি রাখা যায়?।···দেহের প্রয়োজন মেটাতে এত সময় গেলে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিরাটের কাজ করবে কখন?··· বাঙ্গালীর খাওয়ার ঘটা···আর গুজরাটীদের খাওয়া—ভেবে দেখ···। মেয়েরাও সেখানে ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেত দেখতে যায়···। খাওয়ার জন্যই যদি এত সময় যায় কি কাজ করবে? এই জন্যই ভারতীয় সভ্যতা বলছে—দেহের ক্ষেত্রের প্রয়োজন বাড়িও না।···এটা আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে···। বুকের পাঁজর জালিয়ে create করতে হবে···। আমার এ দর্শনের প্রয়োজন সকলের মধ্যে—ধনী দরিদ্র, স্বামী স্ত্রী···। টাকার বাসের সাধ্য নাই মানুষের মত মানুষের কাছে না আসে···। পরম সংযম না হলে এই দারুণ দুর্দিনে কেউ বাঁচবে না...। আমার এই সোনার মানুষ নিতাগোপাল দেখিয়ে গেছেন কত অল্প প্রয়োজনে সংসার চালানো যায়··উহ অর্থাৎ বতসব তরকারীর খোসা—তাই দিয়ে চচ্চড়ী নিতাগোপালের খুব প্রিয় খাদ্য ···মাথা নোয়াব একমাত্র তাঁর কাছে, কেননা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ঘটনায় কিভাবে চলতে হবে তাও তিনি শেখাবেন, আবার সব ঘটনার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতাও শেখাবেন। পুরুষোত্তমে যে শরণাগত, তার অন্নক্ষেত্রে তো দূরের কথা সর্বক্ষেত্রেই সে প্রতিষ্ঠিত হবেই। ··

২১।৩।৫৭—কলিযুগের সাধনা ভাগবতের প্রথম তিনটী শ্লোকের ভিতরে অতি উদাত্তভাবে নিহিত হয়েছে—শ্রীনিত্যগোপাল সেই শ্লোককে বর্তমানের সমস্যাপীড়িত মানুষের দুয়ারে উপস্থিত করেছেন।···সকল সমস্যাকে এড়িয়ে নয়, তার মধ্যে বসেই কি করে সমস্যাগুলিকে যাচকবৃত্তে আহ্বিত করে হরণ করা যায়, হরণ করে তাকে জীবনীশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাই-ই চেষ্টা করতে বে। কৃষ্ণ বাদ দিলে ভাগবত হয় না।···নরনারায়ণ আশ্রম সমস্যা-পীড়িত মানুষের মধ্যে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।···কলিযুগের মানুষের জন্য ভগবানের দুটী বিশেষণ—একটী ধরাট্, একটী ধাতা যেন সদা নিরত হকম্—নিজের অন্তরের ভগবৎ-আশীর্বাদকে পরিস্ফুট করে সমস্যা সমাধান করতে হবে। কলিযুগ সেইজন্য সৃষ্ট হয়েছে—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লোকেরা অনেক সমস্যা ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন—তারই শোধ দিতে হচ্ছে আমাদের। ·· আজকের সমস্যা এত বেশী যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করতে পারবে না, তাই গীতা ভাগবত শরণাগতির কথা বলে ফেলেছেন। দ্রৌপদীর হাতে, উত্তরার হাতে দুই হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া ছাড়া কি গতি ছিল?··· তারা বলেছেন, পাহি পাহি মহাযোগিন্···। অভিমন্যু-ভার্যার সন্তান পরীক্ষিৎ বলছেন, আমি তো একদিন মরে গেছিলাম, শরণাগত আমার নারের সূক্ষ্মিতে প্রবেশ করে সুদর্শনচক্রদ্বারা যিনি আমায় রক্ষা করেছিলেন, দ্রোণাচার্যপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রে যখন আমার এ শরীর পুড়ে গিয়েছিল সেই আমাকে যিনি বাঁচিয়ে ছিলেন, সেই তাঁর কথাই তুমি কও। কলিযুগের কাছে দৃষ্টান্ত এই দ্রৌপদী উত্তরা; তাঁদেরই মত আমরা প্রত্যেকে সমস্যা-পীড়িত, বিপদগ্রস্ত—তাই হাত তুলে শরণাগত হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় না পরীক্ষিতের নাম বিষ্ণুরাত।···আজকের এই সমস্যার সমাধান করতে হলে যারা বিচ্ছিন্ন আমির বিচার দিয়ে সমাধান যাবে না, বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম-দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হইবে ·· ভগবান যখন আসেন সকল সমস্যা গায়ে মেখে আসেন কেবল মানুষের জীবনেই সমস্যা থাকে না—ভগবানও সকল রকম সমস্যা নিয়েই আসেন। তবে যুগের ভগবানের গায় সকল সমস্যা যেমন থাকে, সমাধানও থাকে···। নরনারায়ণ আশ্রম এইটে experiment করছে—···। আমি সংসারী নই—সেইটে একটা সমস্যা, আমি সন্ন্যাসী নই সেটাও এক সমস্যা।···কেবল বাইরের কোন ব্যবস্থাদ্বারা এর সমাধান নাই···। অন্তরের উজ্জীবনদ্বারা, উন্নয়নদ্বারা এর মীমাংসা এখানে প্রত্যেককে নিয়ে সমস্যা—গরুকে নিয়ে পর্যন্ত. এখানে প্রত্যেকের খাওয়া আলাদা—এত সমস্যার মধ্য উপায় অন্তরের জ্যোতিকে জাগ্রত করা। কেবল বাইরে থেকে সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যা বাড়ে মানুষের মন যদি দুর্বল হয়, ভীত হয়—মানসিক স্থৈর্য দৃঢ়তা যদি না থাকে, তাহলে সমস্যার সমাধান হবেকি করে দেহ একদিনে সুস্থ করা যাবে না, কিন্তু মন সুস্থ করা তার তো অনেকখানি মানুষের উপরে? এখানে এক খড়ের গাদা নিতে লাগল তিনবার?—কেন এমন হল? কৃষ্ণ পরিবারের সমাজের, রাষ্ট্রের সমস্যার মূর্তি এবং তার সমাধানেরও মূর্তি। শ্রীনিত্যগোপালও তাই।···আমি তো সমস্যাই ডাকছি। মানুষকে ডাকি মানেই তো সমস্যা ডাকি ··মানুষ যখন আসে আমি নিষেধ করে দিতে পারতাম। নিষেধ না করে ভুলই করেছি···। নিত্য গোপালের দাসানুদাস হয়ে আমি কয়েকটী মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারব আশা ছিল ··।

ক্রম

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৩৯)

শ্রীনিত্যগোপাল, আমার জীবনের ধ্রুবতারা, বিশ্বসঙ্গ রচনার পথে তুমি আমি পথিক। আমি তোমার পথ ধরিয়া চলিব, তোমার শ্রীপদ অনুসরণ করিয়া চলিব, তোমার শ্রীপদ-স্পর্শ আমার মাথায়, সকল শরীরে অনুভব করিয়া চলিব, তোমাময় হইয়া চলিব। তুমি ডাক দিয়া গিয়াছ—'চরৈবেতি'। আমি চলিব সকল আসক্তি বর্জন করিয়া তোমার পথে। বিশ্ব আমার সামনে, আমার পথ আজ আর কোন রকমে রুদ্ধ নয়। আমি মুক্ত বিশ্বে মুক্ত দেহ প্রাণ মনে বিচরণ করিব, মুক্ত সত্তা চৈতন্য আনন্দ উপভোগ করিব, মুক্ত বিশ্ব রচনা করিব। তোমার জয় হউক।...৪৯০ টার পর মঠে যাই। রেণু...হরিদাস ভট্টাচার্যের বাসায় যায়। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। ফেরে ৭টায়।...৮।০ টার পর বি, কে পাল আসেন। তাঁহার নিকট শ্রীদুর্গাতত্ত্ব (আজ যাহা মঠে আলোচনা করিয়াছি তাহা) আলোচনা করি। যো মাং জয়তি সংগ্রামে ব্যাখ্যা করি। শব্দের root meaning এর মধ্যে যে কত রকমের অর্থ—শুধু negative নয়, positiveও—আছে তাহা বলি। বায়োলজি আজ সাইকোলজি ও ফিলোসফির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।" আজ দৃষ্টান্ত নিতে হইবে জীবন হইতে। জীবনে একটি কণাও সর্বব্যাপী। দেহের কোনও এক ক্ষুদ্রতম স্থানে কাঁটা বিঁধিলে সমস্ত শরীর তৎক্ষণাৎ বেদনাতুর হয়। 'সর্বব্যাপী' space ও timeগত নয়। প্রতিটী অণুও সর্ব, প্রতিটী অণু ব্যাপিয়া থাকাই সর্বব্যাপিত্ব, অনন্ত। জীবাত্মা হইতে অনন্ত পরমাত্মা প্রকাশিত হইতেছেন, যেমন অনন্ত ফল হইতে অনন্ত বৃক্ষ আত্মপ্রকাশ করে। ইহা শ্রীনিত্যগোপালের দৃষ্টান্ত। ইহা organic। সকালে মায়া, তরু ও তাহাদের পুত্র আসে। ৫৲ টাকা দিয়া যায়। জয়া আসে সকাল ৮টার মধ্যে, রাত্রি ৮টায় যায়।

৮ই অক্টোবর

'যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা' তিনিই শ্রীদুর্গা। মানবীয় পরিপ্রেক্ষিতে তিনিই শ্রীরাধা। তিনি দেবী, তাই চিন্ময়ী, তিনি 'সর্বভূতেষু'—তাই রসময়ী। 'রস' তো সর্বভূতের পরিণামরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধা অক্ষরের বুকে চিন্ময়ী, ক্ষরের বুকে রসময়ী, তিনি চিদ্রসময়ী, চিদ্রসঘন। তিনিই আজ শ্রীনিত্যগোপালরূপে আমার হৃদয়ে জন্ম নিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল চিন্ময়, মৃন্ময়, রসময়। তিনি সর্বভূতেষু—সখা আমার, সাথী আমার, বন্ধু আমার, সুহৃৎ-স্বামী-আমার। তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্বে বিচরণ করিবার মত শক্তি দেও, সুযোগ দেও, ধন-জন দেও। আসন করি (১২৫)।...সন্ধ্যায় তারক রায় ও যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দুইই রিটায়ার্ড ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট) মঠে আসেন, ঠাকুরের তিরোভাব বৎসর জানিতে চান।... আলোচনায় অনেক দূর যাওয়া যায়। Psychologically প্রমাণ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কতদূর বলিয়া গিয়াছেন, আর শ্রীনিত্যগোপাল তাহার পর কতখানি বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 'অবিদ্যা' পর্যন্ত নামিতে পারেন নাই, শ্রীনিত্য-গোপাল নামিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনা করিবেন, 'intellectual treat' অন্ততঃ পাইবেন। তিনি আমার লেখা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের কথা বলেন। Law of Excluded Middle যে অচল, তাহা বলি। ৮৷৷টার পর ফিরি।...

৯ই অক্টোবর

শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি অবিদ্যার অধিষ্ঠায় বিশ্বের বুকে

াসিয়া দাঁড়াইলে অযাচিত অহৈতুকী কৃপায়। তুমি াসিলে, আমিও তোমাকে তিল তুলসী দিয়া দেহপ্রাণমন দিব। তোমার এই আসার সামনে আমি আমার সব ছু বিসর্জন দিব। তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে মূর্ত ক। আমার বাসনা কামনা সব তোমার মাঝে শুদ্ধ ক। আমার ইচ্ছা বলিয়া যেন কিছু না থাকে। এমন রিয়া আমাকে গড়িয়া তোল। তোমার প্রেমের বাঁধনে মাকে চিরদিনের জন্য বাঁধ।···আমি যে বড় একা। মাকে নিয়া তুমি কি করিবে? বড় জ্বালায় যে দিন যায়। মার অবতরণকে আমরা সার্থক করিলাম কৈ? কে য়া আছে তোমার এই নামিয়া আসাকে সার্থক করিবার ? ঠাকুর, আলো দেও, পথ দেও। আসন করি ২৫)। হরিদাসী বেলার মারফত ভাণ্ডারহাটি হইতে ীত মাছ ও মিষ্টি বৈকালে পাঠাইয়া দেয়। বৈকালে তাভ ও সুধাতা আসে। এতকাল পরে (টালিগঞ্জের) নে আসে সকালে। ৫টার পর মঠে যাই। খগেনবাবুর ' টিনের চালার ভিৎ সম্বন্ধে কথা হয়। সাহস করিয়া া না দিলে কি কাজ হয়? এত ছোট কাজ পড়িয়া য়াছে, ইহাতে কি একটা মঠের সম্মানই রক্ষিত হয়? য় চিকিৎসালয় ডাক্তারের অভাবে অচল। ওদিকে রও কোন উদ্যোগ নাই। আমি গিয়া তবু নাড়াচাড়া নচেৎ sleeping hollow (যাহা হরিদাস ভট্টাচার্য য়াছেন)। ঠাকুর, কেমন করিয়া তোমার কাজ করিব? দের অপেক্ষায় কি কোনও কাজ করিতে পারিব? াকে তো এ বিষয়ে স্বাধীন করিয়া দিলে না? তোমার সাধ মিটাইয়া করিতে পারিলাম না। ধনজন সব য়াই তো আমি অসহায়। বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা- প্রথম হইতে প্রতিভা কিছুটা পাঠ করে। যুগের প্রয়োজন সম্বন্ধেই আমাদের আপত্তি। আমরা বলি- যুগের প্রয়োজন বড় অজড় সংবয়। ভারতের উপর বিদেশ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চান যে, ভারত সবই ছিল, শুধু বিদেশী আসার ফলে সে আত্মসম্ হারাইয়াছে। কিন্তু কেন বিদেশী আসিতে পারিল এমন অন্তর্দ্বন্দ্ব এদেশে চলিতেছিল যাহার ফাঁক দিয়া মুষ্টি বিদেশী প্রবেশ লাভ করিতে পারিল। সে দুর্বলতা ইহা দেখেন না। এ দেশের জড়-বিমুখতা যে দুর্ভোগের জ দায়ী—এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন? রাত্রি ৮॥টার ম মঠ হইতে ফিরি। গোপা আজ ভাত খাইয়াছে। সকা রামগোপাল আসিয়াছিল।

১০ই অক্টো

নিত্যগোপাল, তোমার আমি আমার সকল দেহমনপ্র মন্থন করিয়া সৃষ্টি করিব, যেমন একটী ক্ষুদ্র বীজ নিজে ভিতরে লুকায়িত মহীরুহকে সৃষ্টি করে, যেমন দুধের বু ছড়ানো মাখন মথিত হইয়া সৃষ্ট হয়, যেমন তিলের ব চিড়িয়া তৈল সৃষ্ট হয়। আমার সত্তার ভিতরে মাখা তোমাকে গড়িয়া তুলিব। আমি তোমাকেই দেখিব পাই আদর করিব। তুমি আমার জীবনমন্থন ধন, সারা অঙ্গে নিংড়ানো ধন। তোমাকে না পাইলে চলিবে না, বিশে সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকা তোমা মন্থন করিয়া বাহির করিবই। তুমি তো বাহিরে নও তুমি আমার মূল—আমি সমূল, চিৎ-মূল, আনন্দ-মূল তোমাকে না পাইলে আমার আমিই সিদ্ধ হয় না। তু আমার সিদ্ধি। আমি ৫টার পর মঠে যাই।...৮॥টার প আমি ফিরি। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ কিছুটা পাঠ হয়।...

১১ই অক্টোব

ক্রম

সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র কি ?

॥ মানবধর্মী স্বদেশরঞ্জন ॥

মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে সমাজের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, শিক্ষা সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ ব্যবস্থার ইতির রূপান্তর ঘটে এসেছে। সভ্যতার গতি পরিণতি বিবর্তনের ধারা কেবল একটানা উন্নতির ইতিহাসই নয়— মাঝে মাঝে অবনতিও ঘটেছে।

এই উন্নতি-অবনতির বিচারের মাপকাঠি হল :

ব্যক্তির পছন্দ মতো খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা, মাজে ইচ্ছামতো চলা-ফেরা বলা-কওয়ার ক্ষেত্রে কত বেশী মানুষ কতটুকু সুখ-সুবিধা পেল কিংবা পেল না তারই চোরে।

প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে মানুষ যতবেশী সুখ-বিধা বাড়িয়েছে, সমগ্রভাবে সে সভ্যতার পথে ততখানি গিয়েছে।

বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কারের ফলে অর্থনীতির রূপান্তর টে এসেছে।

কিন্তু মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লেই তো সমস্যা মেটে ।। উৎপাদকগণের মধ্যে সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থাও চাই। ৎপাদন ব্যবস্থায় যার যতটুকু অবদান, উৎপাদনের াগও তার ততটুকু। কিন্তু এই ন্যায্য বণ্টন বস্থা সব সময় হয়ে ওঠে না। উৎপাদকগণ তাদের ন্যায্য াংশ সব সময় পায় না। রাষ্ট্র-যন্ত্রের ওপর যে-সব মানুষের ভাব থাকে বেশী, সেই সব মানুষের মধ্যেই উৎপাদনের হভাগ বণ্টিত হতে থাকে। এই বর্ধিত উৎপাদনকে ধিকতর মানুষের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ম-কানুনের রূপান্তর ঘটে এসেছে। রাষ্ট্রের ওপর ধিক সংখ্যক মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েছে।

এই ভাবেই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে এসেছে।

আবার মাঝে মাঝে এও দেখা গেছে যে, নানা কারণে [illegible] মানুষের আর্থিক দুর্গতি সুরু হয়েছে, রাষ্ট্রের ওপর অপেক্ষাকৃত অধিক মানুষের প্রভাব-প্রতি সংকুচিত হয়ে কতিপয় মানুষের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রী হয়েছে। সভ্যতার নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও মানসিক স সমূহের অপচয় ঘটে' সভ্যতার পশ্চাদ্গতি সুরু হয়ে সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরে গেছে।

সারা বিশ্ব জুড়ে আজ সভ্যতা এমনই এক সংকটা পড়ে ডুবতে বসেছে। সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা উল্টো f ঘুরে যাচ্ছে। এই সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করলে যাবে যে বর্তমানের আধিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-রূপই এর দায়ী।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর ইউরোপে অভিজাত ও য সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অবসানের পর ভূ-দাসত্ব প্রথা, কিউ প্রথা ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়ে ব্যক্তিমানুষ যে পেল, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির প্রাণের মর্যাদা নিরাপত্তা, ধন সম্পত্তির অধিকার যে স্বীকৃত তারই ফলে সুরু হয়েছিল মুক্ত মানুষের মধ্যে পারস্প চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি।

সেই সঙ্গে সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাস (objective moral standard) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খর্ব প্রভু-দাস শাসিত সমাজের শোষণ-শাসনের অস্ত্র আখ্যা পরিত্যাগ করা হল ; পরিবর্তে গ্রহণ করা হল সুবিধা নৈতিক আচরণ। সুবিধা অসুবিধার উপযোগবাদী ((Pragmatism) ও সর্বজন হিতের পরিবর্তে অধি লোকের অধিকতম হিতের হিতবাদী নীতির (Uti rianism) দ্বারা পরিচালিত হয়ে যদি পারস্পরিক যোগিতা চলতে থাকে তবে যা ফল হয় সে রূপ ফলই ফ লাগল। সুবিধাবাদী নীতিকে মর‍্যালিটি বলাই চলে যে আচার-ব্যবহার সর্বজনগ্রাহ্য হয় তাকেই মর‍্যা বলা চলে। অপরের প্রতি সদ্ব্যবহারের নামই মরালি

জনগ্রাহ্য বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে যদি প্রতিযোগিতা
তে থাকে তবে তা যে শীঘ্রই অনিবার্য ভাবে জঙ্গল জগতের,
ার যার মুল্লুক তার'—'might is right', গায়ের
রের নীতিতেই পর্যবসিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি?
ও তাই। তারই ফলস্বরূপ সর্বজনগ্রাহ্য নীতি-বিগর্হিত
স্তিক প্রতিযোগিতার ফলে শক্তিমান আরো শক্তিশালী
উঠতে লাগল, দুর্বল হতে থাকল আরো দুর্বল, ধনী
ী আরো ধনী, গরীব আরো গরীব।

ধনীরা প্রতিযোগিতায় জনগত জেতার উদ্দেশ্যে
র পণ্যের পড়তা কমাতে ও ক্রমবর্ধমান বাজার দখল
আরো ধনী হবার জন্যে কলকারখানা বাড়িয়ে চলল।
বাণিজ্য অনিবার্য গতিতে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠতে
। পাহাড় প্রমাণ পণ্য সম্ভার উৎপাদন হয়ে চলল
সে পণ্য বিক্রয়ের বাজার ও সম্ভার কাঁচামাল আমদানীর
রাজ্যের প্রয়োজন দেখা দিল।

প্রতিযোগিতা কেবল অর্থনীতিতেই এল না, জীবনের
ক্ষেত্রেই দেখা দিল। মনুষ্য প্রজাতির বাঁচার, তার
বৃদ্ধি, উন্নতি ও প্রগতির শাশ্বত যোগ্যতা (fituess)
যোগিতা তা ভুলে, মৃত্যু-ফাঁদ যে প্রতিযোগিতা সেই
মানুষ পা দিল।

তিযোগিতায় টিকে থেকে নিজ নিজ রুজি রোজগার
রাখার জন্য ব্যবসায়ী, শিল্পী, শ্রমিক, পেশাধারী
সকলকেই সতত সতর্ক ব্যস্ত হয়ে থাকার ফলে
স্ত হয়ে পড়তে হল। ক্রমে দেখা গেল এমন এক
। গড়ে উঠছে যেখানে অধিকাংশ মানুষ কেবল ভীত
সতর্ক থেকে টাকা রোজগার করে, হারাবার ভয়ে
ত্বে সঞ্চয় করে, নিরাপত্তার জন্যে বীমা করে, অবসর
সেই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সংগ্রাম-সঙ্কুলিত জীবন
escape করার জন্য লঘু আমোদ-প্রমোদ করে,
ত্রেজক সিনেমা নাটক দেখে, গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে,
নাচগান করে, তাস পাশা খেলে, মদ খায়,
কাপড় ধোয়না-গাঁটি গাড়ি ঘোড়ার ফ্যাসানের

মস্তের বিচারবিবেচনা করার প্রবৃত্তি থাকে না—পারেও

এই অবকাশে গড়ে ওঠে এক সংসদীয় গণতান্ত্রিক
সাধারণ মানুষের এই মানসিক ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে কা
ধূর্ত ব্যক্তি দল বেঁধে জন সাধারণের নামে তাদের ধাপ্
ভাঁওতা দিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে রাষ্ট্র দখল করে সারা দে
সকল মানুষের গার্জেন সেজে রাজত্ব করতে থাকে।
পরিচালনায়, আইন-কানুন রচনায় কোন প্রকার দায়-দ
সাধারণ মানুষের না থাকাতে তারা আর কোন গুরু
বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না; নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে
মামুলি কাজটিই করে চলে, চর্চার অভাবে নিত্য
সমস্যা সমাধান করার মতো মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী
হারিয়ে ফেলে, মানুষের সহজাত বৃত্তি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
সন্দেহবাদ, অনুসন্ধিৎসা তা স্তব্ধ হয়ে যায়; মস্তিষ্ক
চালনার অভাবে সকলের মানসিক বিকাশ বন্ধ হয়,
তোতা পাখির মত যে কথা বার বার শোনে, বার
পড়ে সেটাকেই সত্য বলে ধরে নেয়। সাধারণ মা
এইরূপ মানসিক অবস্থার সুযোগে ক্ষমতালোভীরা ত
কথা প্রচুর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বহু আড়ম্বরে একই
বার বার শোনাতে থাকে; তখন জনসাধারণ গভীর বি
পরম বন্ধু জ্ঞানে কতিপয় মানুষের হাতেই সকল ক্ষ
তুলে দিয়ে তাদেরই শাসন-ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় মেনে ন
অপছন্দ হলে হয় ভাগ্যে মনের ক্ষোভ, নয়তো অদৃষ্টকে দি
দেয়—বিকল্প পথের সন্ধান খুঁজে বের করতে পারে
জনসাধারণ তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অদৃষ্ট
হয়ে ওঠে, হাত দেখায়, কোষ্ঠি গণায়, লটারির টিকিট কে
নিজ জ্ঞান বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস হারাবার ফলে স্বাধীন ম
মুক্ত জীবনের দায়-দায়িত্ব-ঝঞ্ঝাট নিতে ভয় পায়, এবং
fear of freedom-এর ফলে ডিকটেটর-ভক্ত
ওঠে।

কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, তার সহজাত স্বভা
যা মানুষের প্রজাতি পরিবর্তন ভিন্ন লুপ্ত হবে না.—
অস্বাভাবিক ব্যবস্থা সহ্য করে না; সে প্রতিবাদ জান

প্রয়োজন-বোধও হারিয়ে ফেলে' ammoral হয়ে যায়; এবং ভাবাবেগে মত্ত হলে অসামাজিক কাজ করতে তখন আর তাদের বাধে না। শুধু রাজত্ব করার লোভে, শাসন করার ক্ষমতার মোহে ক্ষমতাবানেরা জনসাধারণকে ক্ষমতা-শূন্য, দায়-দায়িত্বহীন, অন্নগ্রহপুষ্ট জীবকূলে রেখে দেয়; তখন সেই জনসাধারণেরই আত্মঘাতী, অসামাজিক কাজকর্মের ফলে গোটা সমাজটাই ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়; তখন এইসব ক্ষমতা-লোভীদের সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করাও আর হয়ে ওঠে না। তখন এইসব শিল্পপতি ও রাষ্ট্র-নায়কেরা জনদরদীয় গণতন্ত্রের মুখোস খুলে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার জেরার জন্যে শিল্প-বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে নিজ নিজ গোষ্ঠীর মনোপলি, পার্টির এক-নায়কত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের জন্য দল বাঁধতে বাধ্য হয়। ফলে যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ—মহাযুদ্ধ—অনিবার্য হয়ে উঠতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সভ্যতার বর্তমান সংকটের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি ও প্রতিনিধিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রই দায়ী। এই দুই ব্যবস্থাই মনুষ্য-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

মানুষ মুক্তি-পিয়াসী জীব। সে নিজ নিজ স্ত্রীপুত্র নিয়ে পরিবার গড়ে সার্বভৌম জীবন যাপন করতে চায়। সেটা সম্ভব হতে পারে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগের ও শাসন কার্য পরিচালন বিভাগের ওপর যদি প্রত্যক্ষ হাত থাকে। সমাজের রাজনৈতিক বিভাগের ওপর যেমন সে তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা চায়, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সে নিজের উৎপাদনকে সম্পূর্ণভাবে নিজেই ভোগ করতে চায়। দিন মজুরীর বিনিময়ে সে তার উৎপাদনটি ধনীকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে চায় না—বাধ্য হয়েই দেয়। উৎপাদকের পক্ষে তার সমগ্র উৎপাদনটা ভোগ করা তখনই সম্ভব হয় যখন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির পরিবর্তে সহযোগিতামূলক অর্থনীতির প্রবর্তন হবে। শিল্প বাণিজ্যের শ্রমিকীকরণ ও কৃষিজমির কৃষকীকরণের দ্বারাই সেটা সম্ভব হতে পারে; অর্থাৎ সেটা হতে পারে উৎপাদনের উপায়—জমি কলকারখানার মালিকানা—যদি উৎপাদকের হয়। খাওয়া-পরার ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ না করলে, প্রতিযোগিতায় হেরে পুনরায় মালিকানা হারিয়ে দিন-মজুর হবার সম্ভাবনা থাকবে।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করেই অতীতে সমাজে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হত। কারণ জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকলে যে হারে সে না খেতে মরে। বর্ণাশ্রমী ও ফিউডালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ব্যবস্থাই ছিল—যদিও তা ছিল দাসত্বের ভিত্তিতে।

রেনেসাঁসের দার্শনিকদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের অঙ্গীকার ছিল—

তাঁরা ব্যক্তি-মানুষকে এই দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করে এক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলবেন। তাঁরা মানুষের মুক্তির দর্শন রচনা করলেন। ফরাসী বিপ্লবে দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ব্যক্তি-মানুষ মুক্তও হল, কিন্তু মুক্ত-সমাজ গড়ে উঠল না। ব্যক্তি-মানুষ মুক্ত হলেই মুক্ত-সমাজ গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব-বিরোধ দূর করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সমাজ টেকে না। সে-দিনও সেই ভারসাম্যের অভাবে মুক্ত সমাজ গড়ে উঠল না। মুক্ত স্বাধীন মানুষের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও সংঘাতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিক্ষোভে সমাজের ভারসাম্য ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হ'য়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। যুদ্ধে গৃহযুদ্ধে মহাযুদ্ধে সমগ্র মানব প্রজাতিই ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল।

আজ এই সংকট থেকে মনুষ্য সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে। সেই সঙ্গে ভারসাম্যে অচঞ্চল মুক্ত মানুষের দ্বারা গঠিত এক মুক্ত-সমাজ গড়ে রেনেসাঁসের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে।

পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমবায়ী অর্থনীতি সেই রূপ সমাজ গড়ে তুলবে। তখন সারা বিশ্বে সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদ ও শ্রেণী-সংগ্রাম দূরীভূত হয়ে এক বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপিত হবে, সমগ্র মানব প্রজাতি একই বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক হবে। তখন রেনেসাঁসের সেই অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে।

পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

বর্তমানের প্রতিনিধি মারফৎ গণতন্ত্রের পরিবর্তে পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র স্থাপন করতে হলে সকল মানুষ যেন তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারে সেইজন্য গ্রামে গ্রামে গ্রাম-সভায় সকল মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সেই গ্রাম-সভার হাতে সকল ক্ষমতা দিতে হবে। তখনই সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি নিবারিত হয়ে বর্তমান সংকট কেটে যাবে।

যে রাষ্ট্রে সমগ্র সমাজের সকল মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তাকেই সমাজতন্ত্র বলা চলে। পার্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা চলে না। জনগণের গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণ যখন নিজেদের গ্রামে গ্রামে গ্রাম-সভায় সংগঠিত হয়ে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে, ব্যবহার করে' তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসন পরিচালন বিভাগকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে—তখনই তাকে জনগণের গণতন্ত্র বা আমূল গণতন্ত্র বা পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র বলা হবে। প্রতিনিধিরা যখন পার্টি গড়ে' জনগণের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা না করে পার্টির নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে তখন তাকে গণতন্ত্র না বলে পার্টিতন্ত্র বা গার্জেনতন্ত্র বললেই সেই রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় মেলে।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির পরিবর্তে সহযোগিতামূলক অর্থনীতি

সহযোগিতামূলক অর্থনীতিই সমবায়ী অর্থনীতি। এই সমবায়ী অর্থনীতির গোড়ার কথা হল :

উৎপাদক তার উৎপাদনের উপায়কে—জমি কল-কারখানাকে—নিজস্ব করে পাবে এবং উৎপাদনের সম্পূর্ণ মালিক হবে, এবং নিজ উৎপাদনকে বাড়াবার জন্যে, কাঁচা-মাল পাওয়া ও বিপণনের সুবিধার জন্যে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। যে-সব ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্যে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয় সে সব ক্ষেত্রে সকল উৎপাদক সেই কলকারখানার যৌথভাবে মালিক হবে এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ পাবে। বৃহৎ শিল্পে যেখানে শতশত বা সহস্র,সহস্র লোকে কাজ করে, সেখানে তারা সকলেই সেই সেই শিল্পের যৌথভাবে মালিক হবে, এবং যোগ্যতা অনুসারে যেমন পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন সেই নিয়মেই লভ্যাংশ পেতে থাকবেন। বর্তমানের শিল্প বাণিজ্যের মূলধন এই সব শ্রমিকরা লভ্যাংশ থেকে বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে শোধ করে দেবে। শ্রমশীল মালিক, ডাইরেকটার, ম্যানেজার প্রভৃতিকেও শ্রমিক রূপে গণ্য করা হবে এবং যোগ্যতা অনুসারে তারা পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ পাবে।

ধনীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে বন্ড ও টাকা দেওয়া হবে তা তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রেখে সুদ গ্রহণের অধিকারী হবেন মাত্র। সেই সুদের ওপর ক্রমবর্ধিত হারে আয়কর ধার্য করে অতিরিক্ত অপরিশ্রম-লব্ধ আয়ের পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে।

ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের পুনরাগমনের পথ রুদ্ধ করার জন্যে দেশের বিদ্যুৎ, ডীম বা অয়েল ইঞ্জিন চালিত শিল্পে প্রয়োজনের বেশী দিন-মজুর নিয়োগ নিষিদ্ধ হবে ও কৃষিক্ষেত্র বা হস্ত-চালিত শিল্পে পাঁচজনের বেশী দিন-মজুর নিয়োগ নিষিদ্ধ হবে। মজুরির হার প্রয়োজন-ভিত্তিক।

সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র গড়ে তোলা যাবে কোন্ উপায়ে ?

গত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শ লাভ যে সমবায়ী অর্থনীতি ও পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে, মুক্তির দিক থেকে তাতে আপত্তি জানাতে যেমন বিশেষ কেউ এগিয়ে আসেন নি, তেমনি তা বাস্তবে গড়ে তুলতেও বিশেষ কেউ এগিয়ে আসেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান করে বোঝা গেছে যে, কেবল মননশীলতার সাহায্যে, abstraction-এর দ্বারা নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ নয়। সে জন্য সকলের পক্ষে এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুনে ভালর প্রতি আগ্রহ, অধিক লাভের প্রতি আকর্ষণ, স্বার্থের প্রতি টান তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তথাপি যে এগিয়ে আসে না তার কারণ না বোঝা, না জানা। আর

অজানার প্রতি, নূতনের প্রতি, চোখের আড়ালকে, অন্ধকারকে সন্দেহ-ভয়-দুর্ভাবনা তো জীবমাত্রেরই স্বভাব-ধর্ম। সেইজন্য কেবল বই পড়িয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে সমবায়ী অর্থনীতি ও পঞ্চায়েতী গড়ার শিক্ষা দেওয়া যাবে না, লোকে ঠিক বুঝে তা গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হবে না। অতএব এবার থেকে জনগণকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তালিম দিতে হবে, এবং সে অভিজ্ঞতা গ্রাম-সভার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দিতে হবে।

লক্ষ লক্ষ গ্রামে গঠিত এই সব প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কিভাবে জাতীয় রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কিভাবে গ্রামের মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা কলকাতার বিধানসভা ও দিল্লীর লোকসভায় প্রতিধ্বনিত হবে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে না বোঝালে লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য একটি ছায়া পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের কাঠামো রচনা করতেই হবে। তবেই সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা সেটা বোঝা সম্ভব হবে।

গ্রামসভা যখন তার গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে তা রূপায়িত করতে চাইবে, তখন তাকে কতক-গুলি সামাজিক ও আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সামাজিক বাধাগুলি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যমে স্থানীয় চেষ্টায় দূর করা সম্ভব হতে পারবে। কিন্তু আইনগত বাধা-গুলির জন্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে। কোন কোন আইনকে কীভাবে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে তা গ্রামসভা ছায়া অঞ্চলসভাকে জানাবে, ছায়া অঞ্চলসভা ছায়া ব্লকসভাকে জানাবে, ছায়া ব্লকসভা ছায়া জেলাসভাকে জানাবে, ছায়া জেলাসভা ছায়া বিধান-সভাকে জানাবে, ছায়া বিধানসভা ছায়া লোকসভাকে জানাবে। ছায়া বিধানসভার ও ছায়া লোকসভার কর্ম-কর্তাগণ প্রকৃত বিধানসভার ও লোকসভার প্রতিনিধিদের জানাবে ও তাদের প্রতিক্রিয়া জনসাধারণকে জানাবে এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি-গণকে গ্রামসভার গৃহীত আইনের খসড়াসমূহ গ্রহণ করবার জন্য আন্দোলন করবে, চাপ সৃষ্টি করবে।

এ ছাড়া প্রকৃত বিধানসভা ও লোকসভায় যে-সব বিল আসবে (বাজেট প্রভৃতি যাবতীয় বিল) আমাদের ছায়া বিধানসভার ও ছায়া লোকসভার কর্মকর্তারা প্রতি গ্রাম-সভায় সে-সব বিলের আলোচনার ব্যবস্থা করে গ্রামসভার মতামত প্রকৃত বিধানসভা ও লোকসভায় প্রেরণ করবে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া গ্রামসভাসমূহকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে থাকবে।

বর্তমানের প্রকৃত লোকসভা ও বিধানসভার সঙ্গে ছায়া লোকসভা ও বিধানসভার পার্থক্যটা সহজেই লোকের চোখে পড়বে। তারা দেখবে যে, প্রতিনিধিরা পার্টির নির্দেশে এই সব আইন কানুন রচনা করছে বা বিরোধিতা করছে, শাসনকার্য পরিচালনা করছে ; আর ছায়া লোকসভা ও ছায়া বিধানসভা গ্রামসভার নির্দেশ অনুসারে তা করছে। বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যক্তির স্থান ও ক্ষমতাটা যে কতটুকু আর পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রে তা যে কত বেশী তা অভিজ্ঞতার দ্বারা সাধারণ মানুষ বুঝতে থাকবে।

লোকে এই সঙ্গে দেখবে যে, লক্ষ লক্ষ গ্রাম-সভা থেকে একই বিষয়ে লক্ষ লক্ষ প্রকার নির্দেশ আসছে না, দু এক রকমই আসছে। এখানে একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিধানসভা ও লোকসভা প্রতি বছর কয়েকশ আইন কানুন রচনা ও সংশোধন করে বটে কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সে সব আইন কানুনকে মাত্র সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, অন্ন বস্ত্র গৃহ স্বাস্থ্য শিক্ষা, আভ্যন্তরীণ নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ ও আরক্ষ ব্যবস্থা। এই সব কটি মিলে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের একতিয়ারভুক্ত বিষয়। এক কথায় নাগরিকদের জীবধর্ম পালনে সাহায্য করাই রাষ্ট্রের কাজ। মনুষ্যধর্ম পালনে প্রেম-প্রীতি স্নেহ-মমতা দয়া-মায়া প্রভৃতি ভাবাবেগ সঞ্জাত বৃত্তির ও নৃত্যগীত সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন ও বিকাশের সাধনা ও সম্ভোগের বিষয়-সমূহ রাষ্ট্রের একতিয়ারের বাইরে। যে যার ঘরে বসেই পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে এই সব মনুষ্যধর্ম পালন করা চলে, এইখানে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ

অগ্রহণ মেজাজ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা দিতে পারে—দেয়ও।

মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য আহার নিদ্রাদির নিমিত্ত যে সব কাঁচা মালের প্রয়োজন হয় তার সরবরাহ নেতে সকলে হবে একমত। সকলে চাইবে অন্নবস্ত্রাদি সস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ এবং সে সরবরাহের উপায়-পদ্ধতি বলার যোগ্যতা থাকে বিশেষজ্ঞদের, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রকুশলী, শিক্ষা স্বাস্থ্যবিদ্‌দের। এই সব বিশেষজ্ঞরা তাদের পরিকল্পনা গ্রাম-সভা সমূহে পেশ করবেন, জনগণ তার মধ্যে পছন্দমতো যে কোনো একটি বেছে নেবে। এইসব বিশেষজ্ঞদের মতে মতবিরোধ থাকলেও তার মধ্যে শতকরা পাঁচদশ ভাগের মাত্র তফাৎ থাকতে পারে। তার মধ্য থেকে অধিকাংশ গ্রাম-সভা যদি সবচেয়ে খারাপ পরিকল্পনাটিও বেছে নেয় তথাপি বিশেষ ক্ষতি হবে না।

এই সব ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে জনগণের অভিজ্ঞতা বাড়বে, তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন ঘটবে, ক্রমে ক্রমে ভুলভ্রান্তির সংখ্যা কমে আসবে। দায়-দায়িত্ব চাপার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাশীলতা বাড়তে থাকবে, তখন মানুষ বুঝবে যে ব্যক্তির কোন্ কাজের ফলে সমষ্টির কোন্ ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতি ব্যক্তিকে কীভাবে এসে আঘাত করে। এই চিন্তা করার ফলেই মানুষ নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে থাকবে। চিন্তাশীল মানুষই যে নীতিপরায়ণ মানুষ তা বাস্তবে দেখা যাবে।

এই ছায়া রাষ্ট্রকাঠামো মানুষকে কেবল আমাদের ঈপ্সিত রাষ্ট্রক্রমের ইঙ্গিতই দেবে না, পুরাতন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষকে তালিম দিয়েও চলবে, যা ক্রমে পুরাতন রাষ্ট্রকে গ্রাস করে তার স্থান গ্রহণ করবে।

সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠনী সমিতি

এখন প্রশ্ন হল ছায়া রাষ্ট্র গড়েই বা তুলবে কে, পরিচালনাই বা করবে কে?

এই জন্যে চাই একদল স্বার্থত্যাগী, রাজনৈতিক ক্ষমতা-বিমুখ নিষ্কাম কর্মযোগী লোক-সেবক—যাঁরা ক্ষমতার আসনে বসে মানুষের প্রভু বা শাসক হবে না, যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বন্ধু উপদেষ্টা পথপ্রদর্শকের মতো কেবল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে তাঁদের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে শেখাবে, যার ফলে তারা নিজ নিজ সমস্যা সমাধান করে নিজেদের পছন্দ মতো সমাজ-সংসার গড়ে তুলে জীবনকে সম্ভোগ করতে পারবে।

এই সব লোক-সেবকদের নিয়ে একটি **'সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠন সমিতি'** গঠনের প্রয়োজন আছে। তারাই গ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত এই ছায়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাঠামো গড়ে তুলবে এবং তা গ্রামে গ্রামে জনসাধারণকে ও অঞ্চল থেকে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে বন্ধু উপদেষ্টা পথপ্রদর্শকের মতো হাতে কলমে তালিম দানের মাধ্যমে এই সকল রাষ্ট্র-কাঠামোকে পরিচালন করতে সাহায্য দান করবে।

এই সংগঠন সমিতি গ্রামাঞ্চলের গ্রামসভায় ও সহরাঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় ভোটারসভায় নিম্নলিখিত সাধারণ প্রস্তাবটি বুঝিয়ে বলবে যে, এটি রূপায়িত হলে দেশের বেকারী তথা দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হয়ে দেশে মুক্ত মানুষের দ্বারা গঠিত এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সহযোগিতামূলক সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক শোষণমুক্ত অর্থনীতি গড়ে উঠবে। এবং এই প্রস্তাবটি পুরোপুরি রূপায়িত করবার জন্য তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেবার জন্য এবং ছায়া বিধানসভা ও ছায়া লোকসভায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করবে:

"যে হেতু দেশের চার ভাগের তিন ভাগ উৎপাদনের উপায় হ'ল জমি, সেই হেতু জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লেই বাকি এক চতুর্থাংশ উৎপাদনের উপায় যে শিল্প বাণিজ্য সেবামূলক কাজ-কর্ম সে সবেরও উন্নতি লাভ ঘটবে।

"জমির উৎপাদনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রধান উপায় হল: কৃষকের জমিতে বারোমাস জল সেচের ব্যবস্থা। কিন্তু বারোমাস সেচ-ব্যবস্থা দেশের শতকরা পাঁচ-সাত ভাগের বেশী নেই। বৃষ্টির জল ধরে রেখে, মাটির তলার জল ও নদী-খাল-বিল-পুকুরের জল তুলে উচ্চ ফলনশীল বীজের দ্বারা উৎপাদন অবিলম্বে চার-ছ গুণ বাড়ানো যায়।

"কিন্তু কৃষকের জমি খণ্ড-বিখণ্ড আকারে মাঠময় ছড়ানো থাকায় খুব কম কৃষকই নিজ চেষ্টায় সেচের ব্যবস্থা করতে পারে। কৃষকের ছড়ানো ছেতা চকবন্দি করার কাজ (Consolidation of holding) অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। সকল কৃষিযোগ্য জমি জাতীয়করণ করে, আড়াই একরের প্লটে (এক হেকটর) গ্রামের সকল জমি ভাগ করে, ক্ষতিপূরণ বাবদ কৃষকের মালিকানীনের সমপরিমাণ জমি চকবন্দি আকারে এক জায়গায় দেওয়া হবে, তাতে প্রত্যেক কৃষকই কিছু বেশী বা কম পেতে পারে। কারণ আড়াই একরের চক ভাঙ্গা চলবে না। উত্তরাধিকার সূত্রেও তা ভাঙ্গা চলবে না, একাধিক অংশীদার থাকলে হয় তাদের যৌথভাবে মালিক হতে হবে, নয়তো অংশীদারদের মধ্যে যে চাষ করবে তাকে বা তাদের বিক্রী করে দিতে হবে। যে বেশী পাবে তাকে তার মূল্য দিতে হবে, যে কম পাবে সে সেই কম জমির জন্য মূল্য পাবে।

স্থানীয় গ্রামসভার হাতে (সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারী যার সদস্য) জমি চকবন্দি করার পর বণ্টনের ভার দিলে কাজটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হতে পারবে। দুই তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার ওপর আপত্তি বা নালিশ মোকদ্দমা চলবে না।

নিম্নলিখিত সূত্রটি অনুসরণ করলে এই চকবন্দি ও পুনর্বণ্টন সম্বন্ধে মতান্তরের সম্ভাবনা কম হবে। প্রথমেই গ্রামসভার সদস্যগণ পুরাতন দাগ নম্বর অনুসারে প্রত্যেক জমির একটি মূল্য নির্ধারণ করবেন। তারপর আড়াই একরি প্লটে সকল জমি ভাগের পর যে ব্যক্তির পুরাতন দাগের অধিক পরিমাণ জমি এই নতুন আড়াই একরি প্লট বা পাশাপাশি একাধিক প্লটের মধ্যে পড়বে—তার ভাগে সেই এক বা একাধিক প্লট পড়বে। তারপর তার পুরাতন দাগ নম্বর অনুসারে বর্তমান চকবন্দি জমির গুণগত মূল্য যদি বেশী হয়, তবে তাঁকে তা দিতে হবে, বা যদি কম হয় তবে তাঁকে তা পেতে হবে।

(খ) এই চকবন্দির কাজ শেষ করতে কিছু দেরী হতে পারে। সেই জন্য অবিলম্বে সেচ-ব্যবস্থার জন্য সরকারকে সেচ-ব্যবস্থার মালিকানা নিজের হাতে রেখে স্থানীয় সমবায় সমিতির সাহায্যে কৃষকদের জল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) কৃষকদের বছরে তিনটি ফসল তুলতে হলে কৃষকের হাতে সব সময় মূলধনের জোগান থাকা চাই। একটি ফসল তুলে সেটি বেচে দেনা শোধ করে পরবর্তী ফসলের চাষ করতে হলে তিনটি ফসল তোলার সময় পাওয়া যাবে না। সেই জন্য সমবায় সমিতিকে কৃষকের ফসল বন্ধক রেখে সম্বৎসর কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। জমি বন্ধক ঋণের অধিকন্তু নিরাপত্তা স্বরূপ থাকবে। সেই জন্য বর্তমানের সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ঋণদান সমিতির পরিবর্তে আধুনিক ব্যাঙ্কে পরিবর্তিত করতে হবে এবং গ্রাম-সমবায় সমিতিগুলিকে এই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাখারূপে কাজ করতে হবে। কৃষি-বিপ্লব ঘটাবার জন্যে যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হবে ফসল বন্ধক প্রথার দ্বারাই মূলধনের দ্রুত আবর্তন ঘটিয়ে সেই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে।

এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতের সাড়ে পনর কোটি হেকটর কৃষি-জমির পাঁচ কোটি হেকটর জমিতেও যদি উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ বছরে তিনবার করা যায়, তবে যে বাড়তি উৎপাদন হবে তাতে বৎসরে হেকটর প্রতি একজনের শ্রমবহুল (Labour intensive) কাজের সৃষ্টি হবে। কিন্তু বর্তমানে ভারতে এত বেশী বেকার নেই। তখন কৃষিতে ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে যন্ত্রাদির সাহায্য নিতে হবে এবং মূলধনবহুল (capital intensive) কৃষি শিল্পের দ্বারা মাথাপিছু আয় বেড়ে চ'লে জীবন-মানের উন্নতি ঘটাবে। অর্থাৎ ভারতের সাড়ে পনর কোটি হেকটর কৃষি-জমির মধ্যে পাঁচ কোটি হেকটরে বা পশ্চিম বাংলার প্রায় ষাট লক্ষ হেকটর কৃষি-জমির মধ্যে কুড়ি লক্ষ হেকটর জমিতে জল দিতে পারলেই ভারতের তথা পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং এ কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে।

(ঘ) পল্লীর বেকার, আংশিক বেকার ও সহরাঞ্চলের পল্লীবাসী শ্রমিকদের পল্লীতেই কাজ দেওয়ার জন্য সহর অঞ্চল থেকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে গ্রামে গ্রামে বিকেন্দ্রিত করতে হবে। এই সব ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ

শিল্পের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা, নিয়ন্ত্রিত কাঁচামাল সরবরাহ ও সরকার কর্তৃক বিক্রয় ব্যবস্থা করতে পারলেই যে কোন শিল্প যে-কোন পল্লীতে চলতে পারে, তাতে সহরের ভিড় কমে সহর বাঁচবে, পল্লী-অঞ্চলও তার শ্মশানবেশ ছেড়ে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে। কলকাতা নগরী বাঁচবে না যদি ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ এবং প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি বিকেন্দ্রিত হয়ে ক্রমবর্ধমান ভিড় না কমে।

(৩) কেবল উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, তার ন্যায়-সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থাও চাই। সেইজন্য প্রথমতঃ কৃষকের অলাভজনক দু'চার বিঘার জোতকে লাভজনক জোতে পরিণত করে তাতে সচ্ছল ভাবে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যে সব কৃষকের জোত এক হেকটরের (আড়াই একর) কম, তার জোতকে চকবন্দি আকারে অন্ততঃ এক হেকটর করে দিতে হবে।

(৪) ঋণগ্রস্ত কৃষককে ও সহরের শ্রমিক ও স্বল্পবিত্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য এবং ভবিষ্যতে ঋণগ্রস্ততার হাত থেকে এদের মুক্ত করার জন্য কৃষকের জোতকে চকবন্দি করে সেচের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং সহরের শ্রমিক ও স্বল্পবিত্তের আয় বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) খাস জমি থেকে ভূমিহীন কৃষকদের এক আধ বিঘা মাথা পিছু বিলি না করে, নিরপেক্ষ এক হেকটর (২৮ একর) জমি দিতে হবে, এই পরিমাণ জমি গ্রামের সকল ভূমিহীনকে দেবার মতো না থাকলে যে পরিমাণ জমি পাওয়া যাবে তা দিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য এক যৌথ কৃষিখামার গড়তে হবে এবং তাদের বাড়তি শ্রমকেও উৎপাদনশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে।

যে-সব গ্রামে বেশী খাস জমি পাওয়া যাবে না সেখানে বিঘা প্রতি এক কাঠা জমি ক্ষতি পূরণ দিয়ে খাস করে গরীব কৃষকের অলাভজনক জোতকে লাভজনক করতে ও ভূমিহীন কৃষকদের যৌথ খামারের জন্য জমির প্রয়োজন মেটান হবে।

(৬) শিল্পে শান্তি স্থাপিত না হলে উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকবে। দেখা যাচ্ছে এ যুগে ধনতন্ত্র আর চলে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক্সো-এশিয়ায় আজ আর শিল্পে শান্তি থাকছে না, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মানুষের কষ্ট বাড়ছে। মানুষ যখন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেছে, তাদের ইচ্ছায় যখন সরকারের পতন-উত্থান ঘটছে, আইন ভাঙ্গা-গড়া চলেছে, তখন সে আর দিন-মজুরীর দাসত্ব, মালিক মজুরের দ্বন্দ্বমান বরদাস্ত করতে চাইছে না—তা ব্যক্তিগত মালিকের অধীনেই হোক আর রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীনেই হোক। এর প্রতিবিধান হতে পারে, শিল্প বাণিজ্যের শ্রমিকী-করণের দ্বারা। তখন উৎপাদকগণই উৎপাদনের মালিক হবে এবং যোগ্যতা অনুসারে তা রক্ষিত হবে; অর্থাৎ শিল্পে বাণিজ্যে সমবায়নীতি প্রযুক্ত হবে।

কলকারখানার মূলধন শ্রমিকরা কুড়ি বছরের মেয়াদে কিস্তিবন্দি হারে লাভের থেকে শোধ করে দেবে। উৎপাদনে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা সকলেই শ্রমিকরূপে গণ্য হবেন; অর্থাৎ বর্তমানের সক্রিয় মালিক, ডাইরেক্টার, ম্যানেজার প্রভৃতিকেও শ্রমিক বোঝাবে। সকল শ্রমিকই যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক পাবেন এবং সেই হারে নিট লভ্যাংশও পাবেন। সকল শ্রমিকই সংস্থাটি পরিচালনার অধিকার ও দায়-দায়িত্ব লাভ করবেন এবং সকলে মিলেই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করবেন। এই পরিচালকগণ সকল শ্রমিকের নিকটই দায়ী থাকবেন। তখনই কেবল শিল্পের শান্তি স্থাপিত হবে, উৎপাদন বেড়ে চলবে।

(৭) গ্রাম-সভা ও সহরের বৃথ সভার হাতে সকল ক্ষমতা দিতে হবে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও তা রূপায়নের ক্ষমতা, স্থায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা, প্রতিনিধি নির্বাচনের ও তাদের পদত্যাগে বাধ্য করার ক্ষমতা, যে কোন বিল (আইনের খসড়া) আনার ক্ষমতা দিতে হবে; তবেই সার্বজনীন সার্বভৌম অধিকারের অর্থ থাকবে—গণতন্ত্র সার্থক হবে, মানুষ মুক্ত হবে।

(৮) দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য বেকার যুবক ও কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এক পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন বাহিনী গড়তে হবে। এই বাহিনী উক্ত কর্মসূচী রূপায়ন করে কৃষি-বিপ্লব ঘটাবার কাজ ত্বরান্বিত করবে। এই বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে কৃষকের জমিতে জল দেবার জন্য সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, পাকা রাস্তা তৈরি করতে,

গ্রামাঞ্চলকে বিদ্যুতিকরণ করতে, ক্ষুদ্রশিল্প সমূহকে বিকেন্দ্রিত করে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে, শ্মশান পল্লীবাংলার শ্রী ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। কলেজসমূহের ছাত্ররা এই কাজের মধ্যেই তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে; অধ্যাপকরা সঙ্গেই থাকবেন, গাছতলায়, তাঁবু খাটিয়ে ক্লাশ করবে; পল্লীর জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য সদ্য পাশ করা ছাত্রদের প্রবীন চিকিৎসকরা গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান হাসপাতাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। প্রত্যেক অঞ্চলে পশুপক্ষী পালন শিক্ষাদান কৃত্রিম প্রজনন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে; আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র ও মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(৯) প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে এবং হাতে-কলমে শিক্ষার দ্বারা কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি পেশা গ্রহণের জন্যে যেন সত্যিকারের কাজের লোক হয়।

ছাত্রেরা যেন কেবল মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে পাশ করতে না শিখে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শেখে—যার ফলে তারা তাদের জীবনের নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য গুরু নেতা বা অপর কারোর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরাই তা সমাধান করতে সক্ষম হয়। সেই রূপ শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন যে মনুষ্য সমাজ-বন্ধনের সিমেন্ট স্বরূপ, তা মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাস থেকে যেন সকলে জানতে পারে। সেই জন্য এ বিষয়টি সকল ছাত্রের অবশ্য পাঠ্যরূপে গণ্য হবে।

(১০) বয়স্কদের নৈতিক শিক্ষালাভ ঘটবে গ্রামসভা ও ভোটার সভার অধিবেশন কালে। দায়-দায়িত্ব চাপলেই মানুষ চিন্তাশীল হয় আর চিন্তাশীল মানুষই নীতিপরায়ণ মানুষ। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করার জন্যও কিছু তালিম পেতে হয়। সে কাজটির জন্য গ্রাম-সভার অধিবেশন-কালে বা অন্য সময় কাজের আলোচনা কালে তাদের কাজ কর্মের বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবার জন্য এই সংগঠন সমিতির সভ্যগণকে ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

সমাজকে বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত করতে আমরা যুক্তির আলোতে যে পথের সন্ধান পেলাম ঠিক সে পথেরই সন্ধান দিয়ে গেছেন এই বিংশ শতাব্দীর তিন মহাপুরুষ। এই তিন জন হলেন লেনিন, গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়। এঁরাও তাঁদের যুক্তি বুদ্ধি আলোতে এই পথেরই সন্ধান পেয়েছিলেন। গ্রাম-স্বরাজের কথা—all power to the soviets; বিকেন্দ্রিত সমবায়ী অর্থনীতির কথা—factorys to the workers, lands to the peasants। এই সব যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষেরা এই কর্মসূচী দিয়ে গেছেন বলেই যে আমরা এটি গ্রহণ করছি তা নয়, যুক্তিসঙ্গত বলেই তা গ্রহণ করছি।

মনুষ্য-সমাজ যখন যুক্তি বুদ্ধি ভুলে অতীতের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে চলতে থাকে তখনই আসে দুর্দিন। সেই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে যুক্তিবুদ্ধি জ্ঞান-খড়্গে খণ্ডন করতেই মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। সেই সেই সময়কার সমস্যা সমাধান করতে এই সব মহাপুরুষগণ যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানের সাহায্যে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, পরবর্তীকালে তাঁদের ভক্তরা পূর্বপুরীদের হাত থেকে যুক্তিবাদের আলোক বর্তিকাটি গ্রহণ না করে স্থান কাল পাত্র ভুলে সেই সব সিদ্ধান্তকে সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের কাজেও অন্ধভাবে প্রয়োগ করতে চান। তাতে তাদের গুরু-ভক্তির নিদর্শন মেলে সত্যি, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। তখন যুক্তিবাদের পুনঃপ্রবর্তন করে দেশশুদ্ধ ভক্তদের মনের অন্ধকার দূর করতে পুনরায় মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের কর্ম-সূচীটিকে চিরন্তন কর্মসূচীরূপে গ্রহণ না করে, তাঁদের হাত থেকে কেবলমাত্র যুক্তিবুদ্ধি জ্ঞানের বর্তিকাটি গ্রহণ করব।

সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠন সমিতির বর্তমান কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ

সভাপতি মণ্ডলী

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত — শ্রীমতী রেণু মিত্র

শ্রীনলিনরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রধান সম্পাদক

মানবধাদী স্বদেশরঞ্জন

সম্পাদকগণ

শ্রীশিশির বন্দ্যোপাধ্যায় — শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য

সদস্যগণ

শ্রীনিভৃত গুপ্ত — শ্রীনির্মলকুমার গুপ্ত

শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ — শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র

ঠিকানা

ন্যাশনাল হিউম্যানিষ্ট হল, দ্বিতল

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

সূচীপত্র, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৭ ; ১৯৭১

১। আমাদের কথা ৩

২। উজ্জ্বলভারতের কথা ৪
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

৩। লাঞ্ছন লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা ৬

৪। মাইকেলের রাধা ৭
শ্রীমধুসূদন দাশ

৫। ইরাবতীর তীরে ১১
শ্রীবিভা সরকার

৬। পদাবলীর শেষ পর্যায়ে চারজন বৈষ্ণব কবি ১৫
ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

৭। সরস্বতী পূজা ১৮
শ্রীসুনীতি সান্যাল

৮। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ২০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

৯। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪৪) (৩য়) ২৩

১০। সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র কি ? ২৫
মানবধাদী স্বদেশরঞ্জন

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

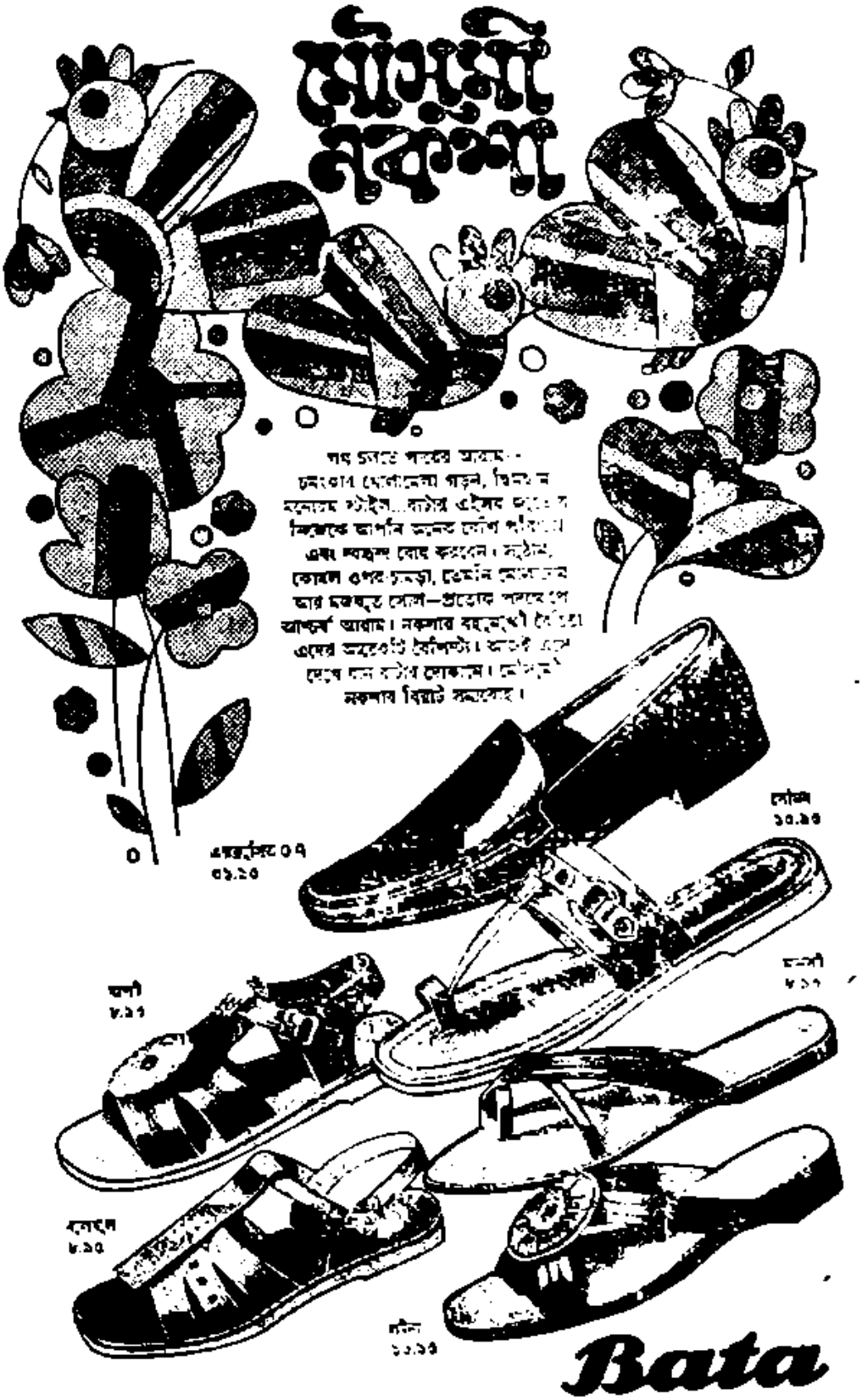
মৌসুমী নকশা
পথ চলতে পায়ের আরাম...
চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ঝিলমিল
মনোরম স্টাইল...হাটার এইসব আনন্দ
নিজেকে আপনি অনেক বেশি পাবেন।
এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। মসৃণ,
কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি নরম-তুলতুলে
আর মজবুত সোল—প্রত্যেক পদক্ষেপে
আশ্চর্য আরাম। নকশার বহুমুখী বৈচিত্র্য।
এদের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য। আজই এসে
দেখে যান কতটা মানানসই। মৌসুমী
নকশায় বিরাট সম্ভারে।
সোল
১০.৯৯
এক্সক্লুসিভ ০৭
৩১.২০
বলী
৮.১১
ফ্লোরেন্স
৮.১৯
Bata

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

16 APR 1971

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its publication	...	Bi-monthly.
3.	Printer's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	RENU MITRA M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 16th February, 1971.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

আমি বিশ্বনাগরিক" "এই বিশ্বই আমার মহামঠ

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৭-৭৮, ১৯৭১ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র চতুর্বিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
বাটার জুবিলি
জুবিলি ১১
১৯-২৪
জুবিলি ২১
১৩-২৭
জুবিলি ৫১
২৭-৩৫
জুবিলি ৩০
২৯-৩৪
Bata

CALCUTTA UNIVERSITY

ঊদ্বোধন

চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৭৭-৭৮, বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭১ চতুর্বিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাবণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮৭)

যাই হোক, আমি বলি অন্তরের জ্যোতি বাড়াও··· মেয়েরা কগড়ার মূর্তি এরকম কথা চলিত আছে···সত্যিই তো—মেয়েদের গণ্ডী ছোট—তারা সেইটুকুর মধ্যে বিচার তো করেই সাধারণতঃ। কিন্তু বিচার না করেও যে পারে সেইটেই তো প্রমাণ করতে হবে···। শ্রীকৃষ্ণ সহস্র নারীর সমাবেশ ঘটিয়ে রাস করেছিলেন—এই সেই নাচা কাঁদার মধ্যে তো কগড়ার কথা শোনা যায়নি?... এক মৌলভী শ্রীকৃষ্ণের এই রাসের কথা শুনে বলেছিল—আমার তিন কবিলা—এই তিনের চুলাচুলিতে টেকা ভার, কিন্তু যে মানুষ শত শত নারীকে নিয়ে মিলে মিশে আনন্দের হাট বসাতে পারে তবে তো সে একটা বৌএর মত বেটা...। কেমন করে একটা সঙ্ঘ চুলাচুলি না করে চলতে পারে সেটা প্রমাণিত হবে কলিকালে। আজকের দিনে সঙ্ঘ গড়া একমাত্র সমাধান...। কেমন করে সঙ্ঘ ভেঙে যায়, কেমন করে হিংসা বিদ্বেষ জ্বালে, অযোগ্য ক্ষমতা পেলে কেমন করে যোগ্যকে তোড়ায়—সবই তো আমি জানি। এখানে যাতে সেই ত্রুটি না ঘটে অথচ সঙ্ঘ চলে সেই চেষ্টা করতে হবে এই নরনারায়ণ আশ্রমে।··· কুরুক্ষেত্রে ভারত ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু পুরুষোত্তম-রাজ্য স্থাপন করার কৌশল সেখানে প্রচারিত হয়েছিল।····· প্রত্যেকের অন্তরের সমস্যা কমাও, বাইরের সমস্যা কমবে। ···শৃঙ্খলা আমি বড় ভালবাসি...বাঙ্গালী একটা জাত যে কালের কাছে অপরাধ করে বসে আছে।...জীবনের রাগের কমাও···। শিব আমার উলঙ্গ হয়েছিলেন রাগের কমাতে...। উলঙ্গ হও...নিরুপাধি হয়ে দাঁড়াও···আসক্তি কমাও—আসক্তিতে সমস্যা বেড়ে যায়।···অতীতের সংসার যদি ভেঙ্গে না যেত তাহলে এখানে আসা হতো না। ভেঙ্গে যে গেছে এটা তো সৌভাগ্য—এসেছ যখন, এখান থেকে কেন রিক্ত হয়ে যেয়ো না...নিতাগোপালের কাছে এলেও যদি রিক্ত হয়ে ফিরে যাও তার চেয়ে দুঃখ আর কি আছে?···কথা বন্ধ কর·····যে যুগ আসছে সে যুগের কোন কথা তোমরা জান না—সে কথা শিখতে হবে...। আমরা যে ভাষায় বলি অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ভাত খাই—আমার সঙ্গে ভাতের সম্বন্ধ আগে এইটে ঠিক কিন্তু····· ইংরাজীতে I take rice·····। You are to unlearn many things—জীবনের আগের বিশ্বাস ভুলতে হবে·····। দুধ গলি গলি ফিরে, ঘুরা বৈঠল বিকায়—মদ বসে থাকলেই বিক্রী হয়, চাই দুধ, চাই দুধ বলে গলি গলি ঘুরলেও কেউ দুধ কেনে না—এই হল কলি কাল। মানুষ হওয়ার ডাক দিয়ে গেছেন নিতাগোপাল...। বাহিরের ভিক্ষাঝুলা খালি নিয়ে ফিরে এস শ্রীনিতাগোপালের কাছে—তাঁর কাছে সব পাবে···। সকলের অন্তরের ব্রহ্মকে জাগিয়ে দিতে নিতাগোপাল এসেছেন···। আমি যে এই তোমাদের নিয়ে experiment করছি, এতে তোমরা সহযোগিতা কর··। এমনও মনে হয়েছে তোমাদের পা ধরে বলব কি যে, ওগো তোমরা সহযোগিতা কর...। একলা আমি তোমাদের বদলাতে পারব না—তোমরা যদি সচেষ্ট না হও, সহ-

যোগিতা করে নিজেদের নূতন করে গড়ে নেবার জন্য উদ্যোগী না হও কিছু হবে না।...মহানির্বাণ মঠে নিত্য-গোপাল তাঁর সাধনা রেখে গেছেন, একদিন প্রস্ফুটিত হবে।...

মাদ্রাজ ১লা চৈত্র ১৮৯৯। নূতন বৎসর

কাল ভাগবতের প্রথম শ্লোকের কথা বলছিলাম—কি করে জগৎ সৃষ্টি করলেন ভগবান তাই কাল বলেছি—ধীমহি ধ্যান করি সদা নিরন্তকুহকম্...সত্যং পরং ধীমহি—আমরা পরমসত্যকে ধ্যান করি। পরমসত্য কাকে বলে? যেখানে ব্যবহারিক সত্তা আর পারমার্থিক সত্তা মেলে সেটা পরম সত্য।... আচার্য শংকর দুটোকে পৃথক করে রেখেছেন—তাঁর মতে ব্যবহারিক এই রোজকার জীবনের সত্তা শেষ হলে পারমার্থিক সত্তা প্রকাশিত হবে। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের তা নয়। ব্যবহারিক সত্যের দোষ এই যে, যে যার ইন্দ্রিয় প্রীতিতে কাজ করে।...দুধে প্রীতির কথা যতই হোক, একটু গভীরে স্বার্থ ছাড়া কিছু নেই—শংকর বলেন থাকতে পারে না। পারে না যে তাতো সত্যিই—মনে আমি যদি আমার মত করে তোমাকে চাই তোমাকে সত্যিকারের পাওয়া তো হবেই না।...যেমন রক্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিল...তেমনি পুরুষের বল সইতে পারার ক্ষমতা নেই বলে নারী মোহিনী ...। মোহিনী সেজে যেখানে সম্বন্ধ রাখতে হয় সে তো মিথ্যা।...Unless above himself he can ect himself, how poor a thing man is—muel Danial। নিজের উপরে উঠতে হবে—না সো না হাম রমণী...। Unless above herself ow can erect herself,...unless above himself শ্রীকৃষ্ণ can erect himself—তাহলে তত্ত্বের মধ্যে তাঁরা মিলবেন কি করে? দুইজনে এ নেই ব্যবহারিক সত্তা পারমার্থিক সত্তায় গড়ে ওঠে।... ভক্ত যতঃ ইতরতঃ—এই বিশ্বের জন্মস্থিতিলয় যাহা ত হইয়াছে সেই পরসত্যকে আমি ধ্যান করি।...তাঁর ব্যতিরেকে।...কৃষ্ণ রাধা ব্যতিরেকে থাকতে পারেন, র কৃষ্ণ ব্যতিরেকে থাকতে পারেন—তাই কৃষ্ণরাধা এক। যুক্ততা ও দূরে থাকা দুই-ই একসঙ্গে চালাতে হবে-ভগবৎ স্বভাব নিয়েই মানুষ এ সংসারে এসেছে...। প্রত্যে স্বামীকে কৃষ্ণ হতে হবে, প্রত্যেক স্ত্রীকে রাধা হতে হবে। স্বামী to the power কৃষ্ণ, স্ত্রী to the power রাধা-তাহলে সার্থকতা; power মানে শক্তি।...হরিরাম কৃষ্ণ এই তিন তারকব্রহ্ম নামের ভিতর দিয়ে সংসারকে। the power কৃষ্ণ করার প্রচেষ্টা।...ব্যবহারিক সত্তা rearrauge করতে হবে পারমার্থিক সত্য হতে গেলে-কেবল (only) থাকতে পার কি না—কেবলোঽহম্-onlyness-এর সাধনা করতে হবে...। পরকীয় স অর্থই above himself can ereect himself জগদতীত সত্তায় যে নিজেকে উঠাতে না পারে সে সার্থকতা লাভ করতে পারবে না—আগেই বলেছি অ ব্যতিরেক একত্র চালাতে হবে।...কেউ কারো নয়-অথচ এক।...স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই পরকীয় সম্বন্ধ অর্থ independent অথচ interdependent—দু দুজনের অধীন, আবার দুজনই স্বাধীন স্বতন্ত্র—দুজনে মি এক...। এতখানি হলে তবে জীবনে আনন্দ ও মু উভয়ই পাওয়া যায়।...ভাগবতের প্রথম শ্লোকের দৃষ্টা দর্শন করছে...। সৃষ্টির বাইরে থাকতে পার কি না বিবেকানন্দ নাকি বলেছিলেন খুতুর মত বেলুড় মঠ ফে দিয়ে চলে যেতে পারি,...গান্ধীজী সবরমতি আশ্রম তে দিলেন...কৃষ্ণ নিজের বংশ লোপ করলেন।...Maximu distance is the shortest distance...। বাদ দি short করতে চাইলে short হবে না...ইউক্লিডে straight line সব distance বাদ দিয়ে।...আইনষ্টি বলতে পারেন maximum distance নিয়েই straig লাইন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বকে রাখলেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুস্থ ও সত্য হবে...। সংসারের সঙ্গে চটাচটি ক ভগবানের দরবারে রোজ আমরা নালিশ জানাই—তোম

করে নি কেন?...বিশ্বের মাঝে যে বিশ্বয় চায়, সে বিশ্ব সত্য—বিশ্বের মাঝে যে স্বামীপুত্রকে চায় সে স্বামীপুত্র সত্য। বিশ্বকে বাদ দিয়ে চাইতে গেলে বিশ্ব স্বামীপুত্র সবই মিথ্যা—তখন শংকরের মতবাদই সত্য।...White head...Prosses of Realilyতে বলছেন—It is as true to say that God transcends the world as that the world transcends God. It is as true to say that God creates the world as that the world creates God...। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—দুই জন দুই জনকে পাওয়ার জন্য ছড়াছড়ি করছেন—কেউ কাউকে পাচ্ছেন না...। দুইয়ের পেছনে ছোটার নাম অদ্বয়—দুইকে অতিক্রম করে পাওয়া ব্যতিরেক...। ভারতীয় সভ্যতায় এর দৃষ্টান্ত আছে—রামকে সীতা হারাতে হল ব্যতিরেক সম্বন্ধকে আস্বাদন করতে। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার, নল দময়ন্তীর বিচ্ছেদ ঘটল কেন?—সৃষ্টির সত্য এই ব্যতিরেক সম্বন্ধ আস্বাদন করাতে। এই টেনিং দিবার ভার নর নারায়ণ আশ্রমের উপর।... ঈশ্বরের কাছে যদি কর্মী ধরা পড়ে যায়, কর্মীর কাছে যদি কর্ম ধরা পড়ে যায় তাহলেই উভয়ে মিথ্যা...। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যদি কর্মীদের কাছে ধরা পড়ে যান, তাহলে আশ্রম চালানো যাবে না—ব্যতিরেকে তাঁকে থাকতেই হবে—আবার অন্বিতও হবে...। দুটি ব্রজগোপীর মাঝে কৃষ্ণ—দুটী বিন্দু, মাঝখানে গুরু—দুইটী মানুষ মাঝখানে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর—তাহলে দুই জনের মিলন হতে পারে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং...বিশ্বরূপের ক্ষেত্র ছাড়া মিলন হয় না...। এ বিশ্বে মিলন যেমন সত্য, বিরহও সত্য তেমনই...। অতিমাত্রায় পাওয়ায় আসে তামসিকতা, পাওয়ার মাধুর্য না পাওয়ায়...অতিমাত্রায় না পাওয়ায়ও আর এক রকমের তামসিকতা আসে...এ বিশ্বে প্রত্যেক দুটি বস্তু লুকোচুরী খেলছে—একে অপরকে পাচ্ছে, পাচ্ছে না...।

১৩।৩।৭১...কলির সাধ্য ও সাধনার ইঙ্গিত করে এসেছে ভাগবত...। সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনটি জিনিষ ভগবানের সঙ্গে যুক্ততায় এবং বিযুক্ততায় চলছে...। কেবল ও কেবলা সেখানে পরস্পর পরস্পরের নিরপেক্ষ ও অপেক্ষমান, সেখানেই ব্রাহ্মী স্থিতি।...যা কিছু হলেও চলে, না হলেও চলে যায়—সে-ই সৃষ্টি করতে পারে।...যাঁর থেকে সৃষ্টিস্থিতিলয় হয়েছে তিনি অর্থের অতিরিক্ত...কোন্ বস্তুর কার প্রয়োজন এ যিনি না জানেন তিনি সৃষ্টি করবেন কি করে?...প্রয়োজন-বোধ জানেনা বলেই রক্ষা করার ইচ্ছা নাই...। লেখাপড়া করা আমাদের প্রয়োজন এ বোধ সত্যি থাকলে, করতো...। এ বস্তুর, এ ঘটনার, এ কথার, এ ব্যবহারের এই অর্থ..., বর্তমানে এ ভাবে চলছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার...এ সব জানলে শুদ্ধ পথে চলত। শব্দের তিনরকম অর্থ আছে। বাচ্যার্থ, বাক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। প্রত্যেক জিনিষের অনেক অর্থ—সে সব জানা না থাকলে সৃষ্টি করতে পারে না...। টাকা উপার্জন করা প্রয়োজন জীবন রক্ষা করতে...কৃপণ তার অর্থ বোঝে না—সে কেবল জমায়।...আবার টাকা না থাকলে উপবাস করে মরা ছেলেও আর একজন টাকা যা তা করে খরচ করে...সে-অর্থের প্রয়োজন-বোধ শেখে নি...যে জন বিবেক মনে হৃদয়ে জ্বালায় মোহের বাতি আর গৃহে তার জ্বলিবে না আর নিশীথ-প্রদীপ বাতি।...কখন কোন্ বাতি জ্বালাতে হলে সে জ্ঞান-বোধ ভগবানের ছিল।...ভগবানের শরণাগত হতে হয় ভগবানকে কৃতার্থ করবার জন্য নয়, নিজেকে ছুটিয়ে তোলবার জন্য...। জ্ঞান বা বিদ্যা ভিতরেই আছে—শরণাগত হলেই জ্ঞান ফুটে বেরোয়।...অর্থের অতিরিক্ত যে অর্থের অপব্যবহার করে না...। কৌমারে আচরে প্রাজ্ঞঃ ধর্মান্ ভাগবতান্ হই।...যথা সময়ে বস্তুর প্রয়োজন বোধ না শিখলে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে শেষে। অপরা হোত না যদি প্রয়োজন-বোধ জানত।...কাঁঠাল পাতা আর কাঠের গুঁড়ো কাজে লাগান যেতো।...এ বিশ্বে সব ছন্দে ছন্দে গাঁথা...। বিষয়ের সঙ্গে চোখের ছন্দ গাঁথা...স্ত্রীকে যখন তখন যেখান সেখান দিয়ে ঢোকালেই কি ঢোকান যায়? অর্থাভিজ্ঞ না হওয়ার জন্য শেষে নাম সংসার ছেড়ে যায়...। ঠাকুর বলবেন, ছেড়ে যে গো

যায়—আমি তো ও অর্থে সংসার সৃষ্টি করি নি।··· মার জীবনদর্শন শুনে রাজশাহীর শৈলেন মজুমদার ছিলেন reorientation of every concep- n···। প্রয়োজন-বোধ, অর্থ-বোধ আছে বলে নিত্য- পালের কাছে সব বিধি-নিষেধ কিঙ্কর।···বিধির গোলাম ভারতীয়দের জীবন হাঁচি টিকটিকিতে আবদ্ধ···। বি গোলাম হয়ে একাদশীতে জল খেতে নেই বিধি য় মরলেও জল দেয় না।···আবার যখন যারা ভাঙে া সাধারণ সৌজন্য বা স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলে না।··· র কতটুকু বাদর আর মানব না এ হিসাব খুব সূক্ষ্ম— এ হিসাব করতে হবে।···সৃষ্টিস্থিতিলয়ের ছন্দ-বোধ ন্ত করা খুব কষ্ট—কিন্তু আজ সেইটেই দরকার।··· ছন্দ ভাঙনও চলবে না, আবার হাঁচি টিকটিকির ারও চলবে না।···ঋষিদের কাছে বস্তুর অর্থবোধ কম, পুরুষোত্তমের কাছে অর্থবোধ আর একরকম···। ও বটে, তা artও হবে বটে···। খাওয়ার ছন্দ আছে, র ছন্দ আছে—ছন্দ একান্ত অন্নেও নেই, একান্ত রেকও নেই।···কৃষ্ণ ভাঙবার ছন্দ জানতেন, তাই, ন্তে তিনি ভাঙলেন।...আমিও সেইদলের লোক ছিলাম দশজন লোকের সামনে যেতে পারে না, কোনদিকে) ানই না···অথচ কোন্‌রে কাপড় খসে না যে মানুষের নিত্যগোপালের স্পর্শে আজ ছন্দ বদলে নিতে হয়েছে, ান আনতে হয়েছে।...তিনটার সময় দিনের পর খেলে অম্বল হবেই জেনেও যারা খায় তাদের সেই দিয়ে বোঝাবে যে খাওয়ার অর্থ-বোধ হয় নি।··· ত্তম অর্থেই অভিজ্ঞ···। তোমাদের এ আশ্রম এমন যে লোকে যেন দেখবার মত জিনিষ বলে দেখতে , দেখে শিখে যায়...। সংসারের প্রত্যেক কর্মও করে করলে সার্থক হয়, সংসারের সম্বন্ধগুলি কেমন রাখলে সম্বন্ধগুলি সার্থক হয়, তাদের গৌরব রক্ষা তোমাদের তাও শিখতে হবে, দেখাতে হবে।··· —এই বাণী—আমার ছন্দ—আমার তৈরী করবার কল্যাণকারী হয় এবং তা যেন মনোহারী হয়—অর্থা লিখি করে বলবে—কৃষ্ণকে মোহন বলে ডাকত জটিল বুদ্ধিলাও—এমনই একটী মনোমুগ্ধকর চলা বলা তাঁর ছিল।· গান্ধীজী বিরুদ্ধ কথা বললেও আত্মীয়ের মত শোনাত।· আবার এমন লোক আছে যারা পরম আত্মীয় হলেও এম করে কথা কয় যে মনে হয় সে পরম শত্রু।···বাক্ বৈ বশিষ্ঠ—সার্থক কথা বল।···নিত্যগোপালের জীব অনুধ্যান করবার চেষ্টা কর···নিত্যগোপাল লীলা-চক্র লীলা-কেবল·····

২৫. ৩. ৫৭। ভাগবতের প্রথম শ্লোকে কলির সাধনা কথা রয়েছে·। পর সত্য হল সেই সত্য যেখা ব্যবহারিকের সঙ্গে পারমার্থিকের সমন্বয় রয়েছে···। পরম নিজের জ্যোতি দিয়ে সমস্ত কুহক বিনষ্ট করে···। এ জ্যো পারকরা আলো নয়। বাইরের টাকা দিয়ে বড় হওয়া না দালান দিয়ে বড় হওয়া নয়—এ জীবন ভিতর থেকে গ বড় হওয়া, নিজের অন্তরের ব্রহ্মশক্তিকে জাগ্রত করে তু বড় হওয়া··। কলিযুগে এত আবিলতা এসে পড়েছে বাইরের দিকের ব্যাপারগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে—খাও দাওয়া গল্পগুজব···। সেই পর সত্য থেকে এই বিশ্বের জ স্থিতিলয় হয়েছে—তাঁর সঙ্গে এই জগতের সম্বন্ধ অন্বয় ব্যতিরেকের—immanent ও transcendent। এম করে তিনি সংসারের সঙ্গে যুক্ত নন যে সংসার তাঁকে পে বসতে পারে কিংবা সংসারকেও তিনি গোলাম করে রাখে নি।···You must do without your wife, yo must do without your son···। কারোকে ছাড় আমি থাকতে পারি না এ যদি বল তবে তাতে মানবাত্মার অপমান হয়। ··তুমি আর তোমার ম পৃথক, তুমি আর তোমার প্রকৃতি পৃথক এই বোধ—পাতঞ্জল এটাকেই বিবেক বলেছেন। মনের পেছ ধাওয়া করো না। তোমার মন যা চায় তা বলেতাই পে হবে, তাই সত্য—এরকম করে ভাবলে বা চললে সত্য থে অনেক দূরে থাকবে।·· স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির ব্যতিরেক সম্ব

and at the same time interdependent। মন যা চায়, মনের গভীর প্রীতির মধ্যে তাকে ত্যাগ করতে হবে।...শরৎচন্দ্র লিখেছেন, বড় প্রেম কেবল কাছেই টানে না, তা দূরেও সরিয়ে দেয়।...কোন্ বস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কি অর্থ, কি প্রয়োজন—তা কি আমরা জানি? অর্থ জানি না বলেই শেষ পর্যন্ত বস্তু আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে যায়, সম্পর্ক তিতো হয়ে ওঠে।...আমার করে ফেলতে যাওয়াই কামুকতা—যা কিছুকে হোক্—বস্তু বা মানুষ...। আমার করতে গেলেই আর বস্তু বা মানুষ সত্য থাকে না, সুন্দরও থাকে না, বিকৃত হয়ে যায়, কেননা তখন তার মর্যাদা নষ্ট হয়। নিজের সত্তা স্বীকৃতিটুকু না পেয়ে তখন সে মোহিনী সাজে—অর্থাৎ অন্তরের সত্যকে গোপন করে ব্যবহার চালিয়ে যায়। এতে কি মানুষকে সত্যি করে পাওয়া হয়? একেবারেই না।...ভগবান মানুষকে যেভাবে ভালবাসেন, মানুষকেও সেইভাবেই ভালবাসতে হবে। এ কথাটা মনে রেখেই চলতে হবে—এ সংসারে আর যাহারা আমায় ভালবাসে, তারা সবাই ঘরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে। তোমার প্রেম যে সবার বাড়া। তাই তোমারি নতুন ধারা। বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাকো, ছেড়েই রাখ দাসে। ছেড়ে রেখে ভালবাসতে শেখাই শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা।...তিনি স্বরাট্—তিনিই শুধু স্বরাট নন্, আমরাও। আমাদেরও স্বরাট হতে হবে। তবে ব্রহ্ম হবা—তিনি অর্থ বিস্তার করলেন হবা অর্থ হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।...হৃদয়ের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করতে হবে।...হৃদয়ই শুধু ভাবতে পারে আর তাই বলতে পারে যে, যে দুটোতে বিবাদ সেই দুটোতেই মৈথুন হয় এবং তা হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।...যদিও আজ দেখা যাচ্ছে হৃদয় বলে বস্তুটি যেন নাই—সর্বত্র ব্যবসা বুদ্ধি ছাড়া কথা নাই—তবু হৃদয়ের শাস্ত্রই চালাবার দিন আজ এসেছে, বুদ্ধির শাস্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।...দু রকমে রাখা যায়, বেঁধে রাখা, ছেড়ে রাখা। মুক্ত রেখেও রাখা যে যায় বৃন্দাবনে তারই দৃষ্টান্ত।...ভাগবত আগে স্বাধীনতা দিতে বলেছে তারপর যোগ্য হবে...। রাজা যদি স্বাধীনতা না দেয়, ইস্কুল করে উপকার করলে কি হবে? যোগ্য করবার সত্যিকারের ইচ্ছা থাকলে আগে স্বাধীনতা দিতে হবে।...স্বাধীনতা দিলেই স্বীলোকে উচ্ছৃঙ্খল হবে?... হয় না—সংযমও মানুষের অন্তরের ভগবদ্দত্ত সম্পদ।... যেন রাখতে—স্বরাট্। নিজেকে দিয়ে যে দীপ্তি পেতে চায়—কত বড় স্বাধীন সে।...বরমপি ধারা তরুতলে বাস...। বৈকল হইয়া যেন করে পরাপেক্ষা কার্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা...। প্রয়োজন কমাও।...যারা মুক্তি-পথের পথিক তারা বাহুল্য কমিয়ে দেয়...। অনেক দূরের যাত্রী তুমি—lugguage কমাও, বেশী lugguage থাকলে তার ভাড়া দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাবে।...যারা জীব তাদের বাহুল্যের অন্ত নাই...। একেবারে অপুরুষোত্তম নেশা—তাই দুর্ভাগ্য যে হিমানী স্নো র বিজ্ঞাপন পেতে হয়।...আমি জীবনে কত টাকার জামাকাপড় পড়েছি?...তেল ছেড়েছি, তা-ও স্বাধীনতার জন্য...। নেসে থাকি—রোজ বাজার থেকে তেল আসবে তার জন্য আমাকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত—তেল আসতে দেরী হত...তাই তেল মাখাই ছেড়ে দিলাম—রোজ এ অপেক্ষায় অধীনতা ভাল লাগল না।... যাত্রাগান দেখিনি সে-ও স্বাধীনতার বোধের জন্য—একদিন এক যাত্রাগানে গিয়ে দেখলাম খুব ভীড়, মাঝখানে একদল চেয়ারে বসেছে—চলে এলাম —ভাবলাম যেদিন ঐ মাঝখানে গিয়ে বসতে পারব সেদিন যাত্রাগান শুনব...। স্বাধীন ভারতের এরোপ্লেন দেখব বলে পরাধীনতার সময়ের এরোপ্লেনের দিকে তাকিয়ে দেখিনি।...তাই বলি যদি স্বাধীন জীবন যাপন করতে চাও, প্রয়োজন কমাও—দেহ মনের প্রয়োজন-বাহুল্য রেখে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না।...কবিদের দোহাতে আছে চাতক তার বাচ্চাকে শেখাচ্ছে, আকাশের জল ছাড়া গঙ্গাজলও মুখে ছুঁবি না।...ভুলে গেল জাতি আজ ভারতীয় ঐতিহ্য?—Plain living high thinking?—অন্নসমস্যার সমাধান হিমানী স্নো মেখে, চা খেয়ে, এত বাহুল্য রেখে?...বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে...তাই তিনি আজ বিদ্যাসাগর। অতীতের ত্যাগ বৈরাগ্য ছেড়ে কি দাঁড়াতে পারবে?...পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে

আনা নিয়ে কিছুতেই ভারতীয় সভ্যতা তে পারবে না। ভারতীয় সভ্যতা বলতে তিবিধকার ঘুণংধারোল্লেখ কোন কিছুকে আমি ছি না—ভারতীয় সভ্যতা বলতে বোঝায় simple epitomised—ভারতীয় সভ্যতা বলতে বোঝায় n lving high thinking—ভারতীয় া বলতে বোঝায় live and let live—বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও, অপরকে বাঁচাও। ীয় সভ্যতা বলতে বোঝায় ঋষি রাজা জনক—ে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া আর এদিকে চাষী হওয়া—ও চাষী হতে হবে। এই ভারতীয় সভ্যতা চালাতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে as it is নিয়ে তুমি পারবে । কলকাতার রাস্তায় কাঁধা গায় দিয়ে চলেছি to challange মানুষের বেশ ভূষা থেকে সব প্রয়োজন বাড়িয়ে জীবনের standard of g বাড়াবে ··।···প্রয়োজন কমাও ·· কমাল লাগে ? হৃদয়ের ভিতর দিয়ে ভগবান দেখা দিতার করে-।...নিত্যগোপালের বুকের মধ্য দিয়ে তত্ত্ব পেয়েছি, ড়ে পাইনি · কোন বড় জিনিষ বুকের মধ্য দিয়ে দেওয়া যায় না।·· মানুষকে আমি কোন্ প্রাণ দিয়ে রি তা কে বিশ্বাস করছে ?...সাক্ষী শুধু নিত্য-।...। কিছুই আমার নেই—শুধু হৃদয় দিয়ে মানুষকে রার কথা বলা ছাড়া...। তবু হৃদয়ের জোরে বুকে তুলে নিয়েছি।.....প্রত্যেককে আর কে দু রকম করে পেতে হবে—একবার ঘরে, আর বাইরে।—সবাইকে, স্ত্রী পুত্র বন্ধুকে পর্যন্ত এই আমি পেয়েছি...। রাস্তায় একবার না পেলে ারের পাওয়া হয় না। এই দুই রকম করে পাওয়াই ও ব্যতিরেকের পাওয়া।···এই হৃদয় নিয়েই নিত্য-এসেছিলেন—সেই হৃদয় তোমাদের হোক।··· কাছে যারা থাকে, তাদের প্রাণ দিয়ে আমি বুঝতে চেষ্টা করি। তারা কোনো ব্যথায় না থাকে টাই করি। নিত্যগোপাল—তুমি গতি ভর্তা প্রভু-নিবাস শরণ সুহৃৎ।···

২৩।৩।৫৭—ভাগবতের প্রথম শ্লোকের আলোচনা করছি—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্ সত্যং পরং ধীমহি ॥

১ ভাগবত

—আমরা গুরু ও শিষ্য সেই পরমসত্যকে ধ্যান করি; শ্লোকের বাকি অংশগুলি পরমতত্ত্বের বিশ্লেষণ।···তিনি যদি শুধু সৃষ্টি করতেন, তাহলে শুধু অন্বয়ের সম্বন্ধ হত—ব্যতিরেক সম্বন্ধ আছে বলেই জীবও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেন। ভগবান যে ছন্দে সৃষ্টি করেছেন, সেই ছন্দেই জীবকে সৃষ্টি করতে হবে।···তাঁর অনুগমন করে সৃষ্টির ছন্দ জানতে হবে।··· ব্যতিরেক সম্বন্ধ না রাখলে প্রত্যেকে। প্রত্যেক পদার্থ—ঘটনা মানুষ বস্তু সব কিছুই) প্রত্যেককে পেয়ে বসবে।... পদার্থের অর্থে অভিজ্ঞ হতে হবে...দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায়, সামান্য, বিশেষ, অভাব এই সাতটা পদার্থের অর্থ জানতে হবে—বৈশেষিক।···আদি কবি ব্রহ্মার কাছে হৃদয়ের মধ্য দিয়া বেদ দিয়াছিলেন।···হৃদয় সর্বকালিক—হৃদয়ের ভাষা সকলে বোঝে···। বুদ্ধির ভাষায় কথা বললে দেবতার ভাষা মানুষ বোঝে না, বিড়ালের ভাষা মানুষ বোঝে না—কিন্তু হৃদয়ের ভাষা বোঝে।···পাখী কি কথা কয় তা নিয়ে subjective explanation চলবে না—হৃদয়ের ভাষায় বুঝতে হবে।...কলিযুগে এই হৃদয়ের ধর্ম, আকাশের ধর্ম প্রচারিত হবে...। আকাশের ধর্ম ছিদ্রদাতৃত্বম্—হৃদয়ের ধর্ম আচরণ করলে সে আকাশের ধর্ম পায়—তখন কারো সাথে তার গা ঠোকাঠুকি হয় না... হৃদয়ের ধর্মেই শুধু এক ও বহুর সমন্বয় সম্ভব···। হৃদয়ের কথা হচ্ছে বিশিষ্ট প্রত্যেকটী মানুষ যার যার মত রোজগার করবে—প্রয়োজন মত পাবে···। আমি সকলকে খাইয়ে রাখছি এটা capitalistic mentality—এটা হৃদয়ের কথা নয়।···প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে সার্থক করতে হবে···রাসের চিত্র দেখুন—শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক ব্রজগোপীকে individually fulfil

করছেন—আমাদের সকলকে বিধৃত করে রেখেছেন—অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে সার্থক করেও সমষ্টিবদ্ধতা রক্ষা করছেন।··· আমি স্বামী হিসাবে সার্থক হব, পুত্র হিসাবে সার্থক হব, ভাই হিসাবে সার্থক হব—অথচ সবশুদ্ধ আমি সমষ্টিরই একজন।···সম্পট মানে বিশ্বদীপ্ত।—কৃষ্ণকে তাই লম্পট বলা হয়।···রাস দেখে এইটাই বোঝার ছিল যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তাকে স্বীকার করে তাকে সমগ্রের মধ্যে দেখতে হবে। পরিবার গড়তেও হবে এইভাবে—প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তা স্বীকার করেই একটী সমগ্র পরিবার···। যে কোন ভাবে একজন বড় আর একজন ছোটকে exploit করে, তার প্রতিবাদ বৃন্দাবনে···প্রত্যেকে স্বরাট হবে।··· একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে গেল বটে—কেননা একজনের সব দায় দায়িত্ব থাকবে, সকলে মিলে আর দায়িত্ব ভাগ করে নেবে না—তা আর চলবে না। কিন্তু ভিন্ন থেকেও তো মানুষ বাঁচতে পারে না...। যোগাযোগসম্পন্ন অনেকগুলি 'কেবল' মানুষের সমবায়ের নাম পরিবার।···প্রত্যেককে খাটতে হবে।··· মনুকেও মানব না, কিংবা তাঁর পিতা পুরুষোত্তমকেও মানব না—তাতে ধ্বংস অনিবার্য···আজ সমাজে এই ধ্বংস চলছে।···প্রত্যেকে যদি গোটা আশ্রমটাকে নিজের মধ্যে feel না করে তবে আশ্রম চলবে না। কাজ প্রত্যেকেরই আলাদা—কিন্তু দায়িত্ব undivided।··· এটা খাই না, ওটা খাই না—এ মনোবৃত্তি capitalistic··· Cleanliness is a বুর্জোয়া mentality—টলস্টয়।··· খাওয়া পড়ায় সব ব্যাপারে commoner হও।···তবে তুমি বিশিষ্ট কোথায়?—যে part play করতে, যে mission নিয়ে তুমি এসেছ—তাতে তুমি বিশেষ; আদর্শের ক্ষেত্রে, মনের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবেই। কিন্তু দেহের ক্ষেত্রে, খাওয়ার পড়ায় সাম্যবাদ।··· নিত্যগোপাল বলে গেছেন, একলা খাইব সুখ না পাইব।··· রসসমূহকে মন্থন করে কেমন করে পারিবারিক ভাবে তাকে লাগান যায় তারই খোঁজ দিয়েছেন কৃষ্ণ।···যে যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হও যতদূর পর্যন্ত সম্ভব—এটা আকাশের ধর্ম···কিন্তু খাওয়াপড়ার ক্ষেত্রে এক হও।··· এই ছিদ্র আছে বলে যেমন অগ্রসর হওয়ার সুযোগ, তেমনি এই ফাঁকের মধ্যেই বিপদ।···বুদ্ধির রাজত্ব চলে গেছে··· Kingdom of God is love and that God is love···। ব্যক্তিসত্তা অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রেখে মানসিক সত্তার সংবাদে রাস রেখে গেছে···। এই রাসের অভিপ্রায় নিয়ে সংসার গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিত্যগোপাল তোমাদের দিয়েছেন।··· অরবিন্দের self-life and cosmic life এর সমন্বয় এই রাসেরই কথা।···Every man is an all-men,···এও রাসেরই কথা।···হৃদয় দিয়ে জগৎটাকে দেখতে হবে···।

২৭. ৩. ৭১। ওঁ···। (ভাগবতের প্রথম শ্লোক (পুনরাবৃত্তি করিলেন।) সেই সব সত্তা পুরুষোত্তমকে ধ্যান করি—যিনি নিজের জ্যোতিতে সুহৃদ নিরস্ত করেন··· তাঁ থেকেই সৃষ্টি, তাঁর সঙ্গে সৃষ্টির অন্বয় ব্যতিরেক সম্বন্ধ, তিনি সকল অর্থে অভিজ্ঞ, তিনি স্বরাট্।···বিশ্বের সমস্ত জীব স্বরাট্ ···,প্রত্যেকের মধ্যে তিনি এক আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন যা ফুটিয়ে তুলতে পারলে সুহৃদ নিরস্ত করা যায়। ···অন্তরে সে একক—কিন্তু বাইরে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলে তাকে বাঁচতে হবে।···হৃদয়ের মধ্যের বেদ দিয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিশ্ব হৃদয়াকাশের মধ্যে বসে আছে···, বুদ্ধি অন্যের রক্তে নিজের তর্পণ করে...; হৃদয় live and let live-এর বার্তা প্রচার করে, হৃদয় প্রত্যেককে স্বরাট্ হতে বলে। হৃদয়ের রাজ্যে দুই জনই স্বতন্ত্র কর্তা, অথচ কেউ কাউকে শোষণ করে না, অপমান করে না, ছোট মনে করে না,—এ সব কথা বললে মুক্তস্তে সুরয়া···। পুরুষোত্তম-স্তরে এ বিশ্বের তেজ বারি বৃক্তিকার মধ্যে বিনিময় ধর্ম চলছে, এখানে মালা-বদলের প্রশ্ন ওঠে, হৃদয় বদলের কথা আছে এখানে।···মাটি জল আগুন যেমন পরস্পর পরস্পরের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে, ঠিক তেমনি সংসারে প্রত্যেক স্বরাট্ অপর স্বরাটের সঙ্গে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে···। রাজা-প্রজা, স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে স্বরাট্ অথচ প্রত্যেককে অপরের সঙ্গে বিনিময় করে বাঁচতে হবে—এ ভুললেই সব গোলমাল হয়ে যাবে। সংসারটা মিথ্যে হয়ে গেছে কেন না আমাদের মনোবৃত্তি হচ্ছে আমারটা তো আমারই, তোমারটাও আমার। পঞ্চীকরণ বলছে মাটিতে

মাটি আট আনা, বাকি জল বায়ু আকাশ প্রতিটি দু আনা করে আট আনা। এমনি প্রত্যেকটির বেলায়। বিনিময় না করলে মাটি জল এরা কেউ বাঁচত না—খ্রীষ্টসৃষ্টির বেলাতেও তাই। ষোল আনাই মাটি মাটিতে নেই। মানুষের মধ্যে ষোলআনাই আমি—এই বুদ্ধি এসে গেছে বলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।···তোমার বৈশিষ্ট্য থাকবে— কিন্তু তা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ফুটাতে হবে। তোমার যা আছে তা দিয়ে অপরের কাছ থেকে জিনে বলে তোমাকে অপর বস্তু নিতে হবে···কৃতার্থ করবার বুদ্ধিতে নয় —আত্মগত্যের ভিতর দিয়ে ··। মাটির মধ্যের জল দিয়ে রান্না হয় না, সে জন্য জলের জলই লাগবে ··। বৈকুণ্ঠবের জিনিষে ভুল হয়ে গেছে···। স্বয়ংভাবের ভিতরেই সব ভাব রয়েছে বলে সেটাই শ্রেষ্ঠ—তা নয় ··। স্ত্রীর ভিতরের মাতৃভাব দিয়ে মাতৃত্বের সাধ মেটে না—স্ত্রীর ভিতরে দু' আনা মাতৃত্ব, মায়ের ভিতরে মাতৃত্ব আট আনা। আমার মায়ের চালতা মাখার কথা মনে পড়ে—বড়ো যখন গ্রামের বাড়ীতে ফিরতাম—মা ঠিক মনে করে চালতামাখা খাওয়াতেন...। জলের জল দিয়েই জলাভাব মেটাতে হবে...। সকল রসের মশলা মিশিয়েই বাস্তবটা চলছে। গুরুর রান্নার কাজ, অপরের লেখাপড়ার কাজ এ দুয়ের বিনিময় করে নিতে হবে...। মহাভাগবত পুরাণে আছে শিব রাধা হলেন...। বিনিময় না থাকলে, হৃদয় না থাকলে মানুষ পরস্পর খুনাখুনি করে মরবে।—তোমার দুঃখ আমার হউক, আমার দুঃখ তোমার হউক—গুরুর দায়িত্ব শিষ্যের হউক, শিষ্যের দায়িত্ব গুরুর হউক।। ব্যবসা বাণিজ্যেও বিনিময় আছে—কিন্তু তার পেছনে অভিসন্ধি থাকে আর সেখানে থাকবে হৃদয়—অভিসন্ধি নয়।

২৮. ৩. ৪৭। ঐ—ঐ শ্রীনিত্যগোপাল বহু জায়গায় বর্তমান ভজনের কথা বলেছেন···সাধক সুহৃৎ গ্রন্থে প্রায় ৷৷০ পৃষ্ঠায় নিত্য ধর্ম পত্রিকার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, সেখানেও বর্তমান ভজনের কথা আছে...। অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি তিনটাই বর্তমান ভজন। বর্তমান ভজনের প্রশস্ত মূল কলিযুগ···। বর্তমানটাই আমার প্রত্যক্ষ, অতীত চলে গেছে, ভবিষ্যৎ আমার হাতে নেই···ঐ ১৪ বৎসরের আমিই এখন আমার অবলম্বন।···বাল্যকালকে তো আর আমি পাকড়াও করতে পারছি না—। Work while it is to day এও বর্তমান ভজন।—বর্তমান দিয়ে আরম্ভ না করলে তুমি আরম্ভ করবে কি করে? অবশ্য একান্ত বর্তমান বলে কিছু নেই—বীজ অতীতের ফল, ভবিষ্যতের স্রষ্টা।—বর্তমানকে নিয়েই আরম্ভ করতে হবে—। মেঘ ডাকলে গর্জনটাই শুনি সেটা প্রত্যক্ষ, কিন্তু মেঘ ডেকেছে সেটা অনুমান।···প্রত্যক্ষের সঙ্গে যোগ আছে, অনুমান হাতের বাইরে।···শ্রীকৃষ্ণ অনুমান—বেদব্যাস বলে গেছেন···নিত্যগোপাল আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান নয়। তোমাদের পক্ষে তিনি অনুমান, আমি বেশি প্রত্যক্ষ।... শ্রীদুর্গা কোথায় জানি না—মাটির মূর্তিতে দুর্গার গুণ কল্পনা করি—তা আরোপ বটে—তবু একরকম প্রত্যক্ষ...। কিন্তু প্রত্যক্ষ একজনকে পূজা করা অনেক তফাৎ...। মাটির মূর্তিতে যা কিছু তা আমারই কল্পনা ··। প্রত্যক্ষের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়।····· প্রত্যক্ষ যাকে ধরলাম তিনি যদি ভগবান্তা হন তবে তো হয়েই গেল। কৃষ্ণকে নিয়ে বর্তমান ভজন···রামচন্দ্রকে নিয়ে বর্তমান ভজন ···। প্রত্যক্ষের কাছে প্রাণ দেওয়া একদিক দিয়ে খুব সহজ, আবার তা কঠিনও বটে··। ঐ যে নবদ্বীপের ছোট ঘরটাতে বসে নিত্যগোপাল বলেছিলেন, 'জয় কি, টেনে তুলব ··'সেই বাণীই তো রক্ষাকবচের কাজ করে আসছে। কত যে নিশ্চিন্ততা আসে ঐ আশ্বাসের কথায়। ···আবার প্রত্যক্ষের কাছে প্রাণ দেওয়া কঠিনও বটে, তাতে নিজের শক্ত অহংকার, বিকৃত অহংকারে বাধা লাগে; fixed—অনমনীয়—মানসিকতা দিয়ে অন্য কিছু বোঝা বা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।...আকাশের ভগবান যা করতে না পারেন, রক্তমাংসের মানুষ তার থেকে বেশী করতে পারেন···। ছেলে যদি ব্রহ্ম হন—তাকে তো সহজেই চাই—তাহলে ছেলের সাথে সাথে ব্রহ্মকেও পেলাম।.. ছেলে ব্রহ্ম হলে তার সঙ্গে সঙ্গে চলে' ব্রহ্ম হওয়া যায়।...ছেলে যদি বলে সত্যকথা কইতে হবে, তাহলে তাকে যে চাই-ই সেজন্য আমাকেও সত্যকথা কইতে হবে। অনুমান করাও চলে—কিন্তু সে বড় জটিল।

...আমি তো আমার জ্ঞানবুদ্ধির পরিধি দিয়ে অনুমান করব—সে আর কতটুকু? সে অনুমান তো আমার আসক্তি বিদ্বেষ দিয়ে আচ্ছন্ন, আমার শক্তি দিয়ে সীমিত। ...সেই অনুমানের পথে ব্রহ্মকে পাওয়া সহজ নয়, সকলের নয়।...আমার স্ত্রী দেখেছে আমার একটা social life আছে—তাই সে যদি আমাকে ধ্যান করতে চায় তাহলে আমার social lifeটা বাদ দিয়ে আমাকে ধ্যান করলে চলবে না। আমার সারা বাঙ্গালামর ঘুরে বেড়ানর সঙ্গে আমাকে ধ্যান করতে হবে।...ভালবাসলে পরমাত্মার দিকটা আর অনুমান থাকে না...। যিনি বলেছেন আমি বিশ্বনাগরিক, তাঁকে পেতে হলে আমাকেও তো বিশ্বনাগরিক হতে হবে...। গুরুকে ভালবাসলে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললে তাঁর জীবনের ব্যাপকতা ও গভীরতা আমার জীবনে আসে।...নিত্যগোপাল, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলব।...তোমরা যদি আমাকে ভালবাস তাহলে আমার সমস্ত জীবনকে ধ্যান করতে হবে—আমি যে সকল ক্ষেত্রে ছুটাছুটি করছি, রাজনীতি বলতে বলতে রাধানীতি বলছি, মাটির কথা বলতে বলতে গোলোকের কথা বলছি, আমি যে সকল ক্ষেত্রে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি...এই সব কিছুর সঙ্গে এই চঞ্চল জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে...। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ত্রিকালে এক সুসমঞ্জস জীবন যাপন করতে গেলে তেমনই এক প্রত্যক্ষ গুরুর সাথে সাথে চলতে হবে...ব্রহ্ম যে পথে বিচরণ করে গেছেন, আমিও সেই আচরণ করব—এরই নাম ব্রহ্মচর্য...। কালীকে দেখতে ছুঁতে পারি না, কিন্তু মাকে দেখতে ছুঁতে পাই...সেই মা যদি সব ছেলেকে ভালবাসেন, আমাকেও সব ছেলেকে ভালবাসতে হবে...। তিনি যদি শবরীর বাড়ী যান আমাকেও তাই যেতে হবে...। পরমাত্ম স্তরে সকলেই এক...। আমি নিত্যগোপালকে ধরে রাম বুঝব, কৃষ্ণ বুঝব...। বর্তমানকে না ধরলে অনুমানের অন্ধকারে চলা সহজ নয়।... Pringle Pattison God in-flesh-এর কথা বলেছেন। ...God in flesh-ই গুরু, অবতার...। সদ্ গুরু চাই...। যদিও শাস্ত্রেও ব্রহ্ম-দর্শন হয়, তবুও...Algebra Made-Easy-র ন্যায় অবতার হচ্ছেন God Made-Easy। আমি জল পান করি নিত্যগোপালের।...যদিও জল স্বরূপতঃ সর্বত্র আছে...কিন্তু বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান নিত্যগোপাল-জীবনে আছে বলেই নিত্যগোপাল-জল আমি পান করি।...নিত্যগোপালই আমার বিষ্ণুপাদপদ্ম—তিনি আমার প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ...সর্বপ্রমাণ—এই তত্ত্ব আস্বাদিত হলে ঘুরে যায়, ঘরে বসে তের।...যে কোন গুরুর উপাসনা করলেই হবে সন্দেহ নেই কিন্তু সে গুরুর জীবনে ব্যাপকতা গভীরতা আছে কি না—তিনি আমাকে সর্বগুরুর সমন্বয় আস্বাদন করিয়ে দিতে পারবেন কিনা...। সর্বগুরুর পীঠস্থান নিত্যগোপাল... তাই তাঁকে ভালবাসি—তাই বর্তমান যুগের সামনে তাঁকে উপস্থিত করতে চাই।...

১।৭।৫৭—ওঁ...ওঁ। ভাগবতের প্রথম শ্লোক—সৃষ্টি-স্থিতি লয় সবই জীবনের প্রকাশ—লয়ও...। সৃষ্টিস্থিতিলয়কে অন্বয় ব্যতিরেক সম্বন্ধে দেখতে হবে।...স্বরাট্ মানে হচ্ছে যার নিজের আলো আছে।...হৃদয় হচ্ছে আকাশ। আকাশ-অবকাশ আছে বলেই জগাই-মাধাইরও হরিনাম করবার অবকাশ ছিল...। অনধিকারী বলে কেউ নাই...। মহাশক্তিমানও হৃদয়ের ব্যাপারে মোহগ্রস্ত হয়—হৃদয় বিরুদ্ধ মতাশ্রয়ীকেও আশ্রয় দেয়—ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সবকেই হৃদয় আশ্রয় দেয়।...হৃদয় বিনিময়ধর্মী...; হৃদয়ই সামগ্রিক জীবন-বোধ আনতে পারে।...কর্ম হবে জীবনের ভিত্তি,...সেবা দিয়ে গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়...সেই জ্ঞান দিয়ে সংসারে কর্ম করতে হবে...।

পঁচিশে বৈশাখ

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে পঁচিশে বৈশাখ নটি আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। এই দিনটিতে নি বাংলার মাটীতে এসেছিলেন তিনি যে আমাদের ীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন মানুষকে আনন্দের াজ দিতে, এসেছিলেন মানুষকে আনন্দের পূজারী রূপে হতে। তাই তো তাঁর বিরাট জীবনকে না বুঝতে রলেও তাঁর আনন্দকে তো বুঝি। আনন্দ যে মানুষের রের চাহিদা!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আনন্দ কিন্তু স্বার্থপরের আনন্দ নয়, ুক বিষয়ীর আনন্দ নয়, অন্যের গলা টিপে নিজে বড় য়ার আনন্দ নয়। তাঁর আনন্দ "আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বেতি কদাচন", তাঁর আনন্দে মানুষ ব্রহ্মময় হবে এবং ানের কোন অবস্থাতেই তার ভয় নেই। তাই তাঁর ইতা-সেবায় যখন দেখি তিনি মানুষকে নির্মল আনন্দের, আনন্দের খোঁজ দিয়েছেন—তখনই তাঁর আগমনের দিনটীতে শিশু, বুড়ো, যুবা সকলেই কেমন উৎফুল্ল উঠি।

কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভাণ্ডারে এত বড় সম্পদ ে গেলেন—রেখে গেলেন আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের ও ন্দ স্বরূপা প্রকৃতির তথ্য, তা আমরা কতটুকু জীবনে ন্ধি করতে পেরেছি? জীবনকে আনন্দময় করতে রছি? আজ রবীন্দ্রনাথের ভারতের, রবীন্দ্রনাথের বাংলা ের মানুষের অন্তরকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। াকের দিনে জন-জীবনের অবস্থা আর বিস্তারিত করে অপ্রয়োজন। সুস্থতা বলতে, আনন্দ বলতে যা বোঝায় আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অথচ প্রতি বছরই আমরা ন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, তাঁকে স্মরণ করে সভা করি, ক স্মরণ করে বক্তৃতা করি, তাঁর সাহিত্য-সম্পদ সম্বন্ধে ম্বারী বোঝাই করি। বাহ্যিক অনুষ্ঠানের চাকচিক্য আমাদের বেড়েই চলেছে কিন্তু অন্তরের মণিকোঠা যেন ক্রমশঃ অন্ধকারেই ভরে যাচ্ছে।

তাই এই দুর্যোগময় দিনে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবনা দিয়ে আমাদের মনে করতে হবে কেমন করে পথ-চলার ছন্দ শিখে নেব যে ছন্দে চললে জীবনের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দ বজায় থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা বুঝতে হলে রবীন্দ্রগত প্রাণ হতে হবে, নিজের আমিকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। নতুবা শুধুই ভাবুকতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কী কথা আমাদের বলে গেলেন—তা অবশ্যই বুঝবার দিন আজ এসে গেছে। দ্বিতিধর্মী ভারতবাসী 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'-মন্ত্রে জীবনের বাস্তব মূল্যকে অস্বীকার করে, পরমার্থ মূল্য দিয়ে জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করছিল যার ফলে জীবনে ধীরে ধীরে নেমে এল শুধুই ক্লীবত্ব। এই ক্লীবত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করবার অমোঘ মন্ত্র নিয়ে এলেন বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, নিত্যগোপাল, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি। কিন্তু তাঁদেরও আমরা ব্যর্থ নমস্কারেই দ্বারের বাইরেই রেখে দিলাম—জীবনে তাঁদের বরণ করলাম না। যার ফলে নেমে এল ব্রিটিশের রুদ্র শাসন। ব্রিটিশের রাজদণ্ড ভারতবাসীর সুখ-শয্যা কেড়ে নিয়ে জীবনে চরম বিপর্য্যয় এনে দিয়েছে। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ এলেন ভারতবাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সকল সৌন্দর্য্যের ডালি হাতে নিয়ে। তিনি জগৎ আর জগন্নাথকে এক করে জগতের নতুন রূপ, নতুন ব্যাখ্যা সাহিত্যের ভাষায় মানুষের জীবনের সামনে তুলে ধরলেন। অতীত যুগে মানুষ আমরা শুধু পারমার্থিকতাকেই বড় করে দেখতে শিখেছিলাম—মানুষের জীবনের কোন মূল্যই স্বীকৃত ছিল না, যার জন্য অনায়াসে সন্তানকে সাগরের জলে বিসর্জন

দিতে পেরেছি, পেরেছি স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরে স্বর্গে পাঠাতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের চেয়ে কম পারমার্থিক ছিলেন? তিনি ভগবানকেও যেমন করে সুন্দরতম প্রিয়তম ভাবেই ভালবেসেছিলেন, তাঁরই সৃষ্ট জগতকেও তেমনিই সুন্দরতম প্রিয়তম জানতেন। তাই ত বলতে পেরেছিলেন "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"। যে জড় জগৎ অতীত ভারতবাসীর কাছে ছিল মিথ্যা, মরীচিকা, রবীন্দ্রনাথ তাকেই দেখলেন সুন্দর! কালের বিবর্তনে আজ জড়বাদ, আপাতিক ভোগবাদ মানুষের অন্তরকে মাতিয়ে তুলেছে, একান্ত জড়বাদ তাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে। চিন্তাবিদ্‌গণ স্পষ্টই উপলব্ধি করছেন একান্ত জড়বাদের ধাক্কায় কোন্ অন্ধকারে ছুটে চলেছি। এই সাঙ্কটে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের যে বড় প্রয়োজন। জড় জগৎ কেমন করে সুন্দর, কোন্ ছন্দে চললে তা মাধুর্যময়, তাই যে তিনি আমাদের কাছে বলে গেলেন। আমরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করি, সভা করি, আবৃত্তি করি—সবই করি, করি না শুধু তাঁর জীবন-সাধনা জীবনে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা। নতুবা আজ মানুষের জীবনে চরম দুর্দিন নেমে এসেছে—মানুষ তার স্বরূপকে হারিয়ে আসুরিক আনন্দে মেতে উঠেছে। সংশয় জাগে—বুঝি বা রবীন্দ্রনাথের সুন্দর জগতের রূপ বীভৎসরূপে পরিণত হয়! তাই বলি, যদি আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই তবে রবীন্দ্র-চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের সামনে পথ নেই। তিনি যেমন করে মানুষকে ভালবেসেছিলেন, যেমন করে জগৎকে ভালবেসেছিলেন, যেমন করে জগন্নাথকে ভালবেসেছিলেন সেই শিক্ষাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

আজ তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা বিশ্বকণ্ঠে ধ্বনিত হোক্,

"যদি থাকে প্রাণ তবে তাই লহো সাথে
তবে তাই অভি করো দান।
বড় দুঃখ বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কঠিন সংসার
বড়ই দরিদ্র শূন্য
বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই
চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

"প্রজ্ঞাবাদী সম্প্রদায়সমূহ বলিতেছে—'ন মদন্যৎ অস্তি'—'আর কেহ নাই'। এক মতবাদ অপরকে নিঃশেষ না করিয়া যেন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণই করিতে পারে না! নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন অন্যের নিঃশেষ নির্ব্বাণ। এমন করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া পরস্পরের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা পুরুষোত্তম-বেদে নাই। গীতা 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্'-এর মধুর শাস্ত্র। গীতাশাস্ত্রে পরস্পরের 'বোধ' এমনভাবে জাগ্রত করিতেই অবতীর্ণ, যাহার ফলে 'শাস্ত্র-সঙ্ঘ' সম্ভব হইবে। জীবন-বেদই তেমন শাস্ত্র-সঙ্ঘ।"—ব্রহ্মসূত্র অবধূত ভাষ্য।

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

জন অ্যামস্ কমেন্স্কি
বা কমেনিয়াস

(১৫৯২—১৬৭০)

॥ অধ্যক্ষা শ্রীগায়ত্রী যতি ॥

শিক্ষা জগতের মহাকাশপ্রবাহে বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত পরিক্রমা ঘটেছে। এখন থেকে ৩০০ বছর আগে এমনি একটি জ্যোতিষ্কের বিস্ময়ে ঘটেছিল, শিক্ষাজগতে যার উল্লাস আজও অনুভব করা যায়। তিনি হলেন জন অ্যামস কমেন্স্কি তিনি শিক্ষাজগতে কমেনিয়াস নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

কমেনিয়াস ১৫৯২ সালে ২৮শে মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়ায় মোরাভিয়া নামক স্থানের নিভনিজ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হ'য়ে নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন যুদ্ধে এগিয়ে চলেন। কমেনিয়াসের পিতামাতা মার্টিন লুথারের মতবাদপুষ্ট প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ধর্মীয় উপাদান এত প্রবল হয়ে উঠে যে রোমান ক্যাথলিকদের ঘৃণায় তিনি তাঁর পৈতৃক নামটি পর্যন্ত ছাড়তে বাধ্য হন এবং এরপর থেকেই কমেনিয়াস নামে পরিচিত হন। নানান বিপর্যয়ের পর একটু বেশী বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে যাবেন কিন্তু সেখানে তিনি বেশ মেধাবী ছাত্র বলে বিবেচিত হন। মাত্র যখন ষোল বৎসর তাঁর বয়স তখন ত্রুটিপূর্ণ ল্যাটিন শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর মানবদরদী মনকে নাড়া দেয়। তাই তিনি উন্নততর সমাজ ও সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টিতে মেতে উঠেন। তাঁর মতে শিক্ষাই হবে তাঁর পরিকল্পিত কাজের উপযুক্ত হাতিয়ার। তিনি বলেছেন—**If man is to be man, he must be educated"..."The better one is educated the more he excells others"।**

তিনি প্রধানতঃ ল্যাটিন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ল্যাটিন শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মাতৃভাষা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। মাতৃভাষার (মোরাভিয়ার ভাষা) প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। জারমানিতে হারবর্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই তিনি মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মোরাভিয়ান ভাষায় একটি অভিধান রচনা করেন। এরপর তিনি তাঁর সমকালীন বহু শিক্ষাবিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং শিশুদের উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেন।

এর অল্পকাল পরেই কমেনিয়াস **church** এর **Pastor** নিযুক্ত হন ; ফলে এখান থেকেই তিনি শিক্ষা সংস্কারের প্রভূত সুযোগ লাভ করে শিক্ষার কাজেই গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেন।

তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময়ে মানুষের মধ্যযুগীয় ধর্মের মোহাবরণ ছিন্ন হয়েছে, মানুষ অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে পুরোহিত শ্রেণীর কঠোর শাসনে। সমাজ ও প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ের নিগড়ে তাঁরা আর বাঁধা পড়তে চান না। তাই তিনি যখন প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে জ্ঞানের উৎস (**sense realism**) হিসাবে তুলে ধরতে চাইলেন এবং ভারতীয় দার্শনিকদের মত ঘোষণা করলেন যে 'জ্ঞান আসবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে'—**"There is nothing in the intellect which was not previously in the senses"**—তখন জনগণ তাঁর এই মতবাদকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। তিনি আরও বল্লেন যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয়গুলি আসবে এবং কল্পনার সাহায্যে ঐগুলি স্মৃতিতে রক্ষিত হবে, তারপর বিষয়সঞ্চারকে শিশু বুঝতে শিখবে এবং সর্বশেষে আসবে বিচারবুদ্ধি যার সাহায্যে শিশু

প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হবে।

কমেনিয়াস কেবলমাত্র নীরস শিক্ষাতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেন নি; একান্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকৃত শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রকে, প্রতিটি বিষয়কে স্পর্শ করেছে। শিক্ষায় থাকবে সাবলীল গতি; শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতঃপ্রণোদিত। তাই তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন—**Education should come to the child as flying to birds, swimming to fishes and running to animals.**

বিংশ শতাব্দীতে আমরা শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতার কথা বলে থাকি। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এখন থেকে ৩০০ বছর আগেও কি গভীর সহানুভূতিতে কমেনিয়াস সমস্ত মানুষের শিক্ষার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি তাঁর **The Great Didactic** গ্রন্থে সমস্ত মানুষের সম্যক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একান্ত গোষ্ঠীভুক্ত, তাই ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থা সে যুগে ছিল একান্তই অভিনব। সমস্ত মানুষের শিক্ষার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রটি ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন, তাই তিনটি শ্রেণী সমন্বিত বহু **Pausophic** বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোলো। শিক্ষাকে তিনি বহু সম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। "ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সি"—এই তত্ত্বটি বার বার উপলব্ধি করেছিলেন, তাইতো তাঁর **Great Didactic**-এর পাতায় দেখি "**A good and wise man is the most precious treasure of a state and is of far more value than palaces, than heaps of gold and of silver, than gates of brouze and bars of iron**"···

কমেনিয়াস তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে মনোবিজ্ঞানের আলোতে সমৃদ্ধ করেন। তিনি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তিনি আবার মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বও (Faculty theory) অস্বীকার করেন নি। তিনি কল্পনা, স্মৃতি, বিচারবুদ্ধি, ভাবাবেগ, ইচ্ছা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এগুলির যথাযথ বিকাশের কথা চিন্তা করেছেন।

কমেনিয়াসের মতে মানুষের চরম লক্ষ্য হোলো ভগবানের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরমানন্দলাভ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে শিক্ষা। মানুষের নৈতিক সংযমই মানুষকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ ইচ্ছা আবেগের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে। জ্ঞান থেকে আসবে ধর্ম, ধর্ম থেকে উৎপত্তি হবে আধ্যাত্মিকতার।

শিক্ষাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শিক্ষার কাঠামোটির আমূল পরিবর্তন একান্তই আবশ্যক। সমগ্র শিক্ষা-স্তরটিকে তিনি চারটি ভাগে বিভক্ত করেন :—

(১) শৈশবকাল—শিক্ষা আরম্ভ হবে মাতৃক্রোড়ে, প্রত্যেক গৃহকোণই হবে শিক্ষালয়। ১—৬ বছর এখানে শিশু শিক্ষালাভ করবে। প্রথমে শিশু বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিখবে; নানা প্রকার সুখভ্যাস গঠন করবে, পরীর গল্প, ছন্দোবদ্ধ কবিতা, গান এবং খেলার মাধ্যমে নানান জিনিষ শিখবে।

(২) বাল্যকাল—৬—১২ বছর পর্যন্ত শিশুরা **Venacular School** এ পড়বে। এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সুরু হবে। প্রত্যেক গ্রামে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, এই বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব শিশুই শিক্ষালাভ করবে, ল্যাটিন শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ৬ বছর শিশুরা মাতৃভাষা অত্যন্ত ভালোভাবে শিখবে।

(৩) কৈশোর—১২—১৮ বছর পর্যন্ত শিশুরা **Gymnasium** অথবা **Latin School** এ পড়বে, এরূপ স্কুল প্রত্যেক শহরে স্থাপিত হবে। এই স্তরে মাতৃভাষা, গ্রীক, ল্যাটিন, হীব্রু ইত্যাদি পড়বে। তাঁর নিজের লেখা **Latin Text book** এই স্তরে পড়ান চলতে পারে।

(৪) যৌবনকাল—১৮—২৪ বছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। এই স্তরে ধর্ম, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা পড়ান চলবে।

কমেনিয়াস শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা শেষ হলে যখন প্রত্যেকের নীতিবোধ গড়ে উঠবে তখনই কেবল পরিভ্রমণের দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

তিনি পাঠ্যক্রমের পরিধির বিস্তার চেয়েছিলেন। তাঁর মতে দুনিয়ায় এমন কিছু থাকবে না যা মানুষের জানার বাইরে থাকবে, তাই তাঁর মতে পাঠ্যক্রমটি হবে encyclopedic; এর মধ্যে থাকবে ল্যাটিন, গ্রীক, হীব্রু, মাতৃভাষা, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা ইত্যাদি।

কমেনিয়াসের পূর্বে শ্রেণীপাঠনার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হোতো না। কমেনিয়াস বলেন যে প্রত্যেক শিশুর স্বাতন্ত্র্য আছে ঠিকই কিন্তু শ্রেণীপাঠনার সুফলও উপেক্ষণীয় নয়। একসঙ্গে সমস্ত শিশুর পাঠ গ্রহণের ফলে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্ররা মেধাবী ছাত্রের দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

তখনকার দিনে Inductive method-এর খুব প্রাধান্য ছিল। শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে এই পদ্ধতি ছিল অগ্রগণ্য। কমেনিয়াস এই পদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে শিশুর উৎসাহ উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব জিনিষের সাহায্যে শিক্ষার কথা বলেছেন। একটি বিষয় খুব ভালো-ভাবে আয়ত্ত হলে তারপর নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়কে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হবে। হাতে কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

একজন শিক্ষক একটি শ্রেণীকে ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারেন যদি তিনি শিক্ষা পদ্ধতিটি ঠিকভাবে নির্বাচিত করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষা দিবেন কম কিন্তু শিক্ষার্থী যাতে শিখবে বেশী। তাই তিনি পদ্ধতি হিসাবে খেলা-চলে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু খেলাটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক না হয়ে জীবনকেন্দ্রিক হবে। যেমন শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিখবে কেমন করে চাষ করতে হয়, কেমন করে যুদ্ধ করতে হয় ইত্যাদি।

তিনি যে সময়ে শিক্ষা-সংস্কারে মন দিয়েছিলেন তখন শিশুদের মনের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার মত বিষয়বস্তু সমন্বিত পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কমেনিয়াসের মতে শিক্ষার অর্থই হোলো "Completest possible preparation for life, here and thereafter, not through languages but through all facts about the universe to which languages opened the door"। সেইজন্যে তিনি ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নিজে শিশুদের বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোলো Janua Linguarum Resareta (The door of the languages unlocked)। এই বইটিতে ৮০০০ হাজার প্রয়োজনীয় Latin শব্দ চিত্রসহযোগে বোঝান হয়েছে ও বাক্যে প্রয়োগ দেখান হয়েছে। এছাড়া Vestibulum, Atrium, Orbis Sensualism Pictus ইত্যাদি পুস্তকের নামও উল্লেখযোগ্য।

শিশুকে কমেনিয়াস প্রস্ফুটোন্মুখ ফুলের সঙ্গে এবং শিক্ষককে মালির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাজেই বিদ্যালয়টি হবে মানবতা শিক্ষার একটি পবিত্র পীঠস্থান। এখানে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয় বোঝা শিশুদের ঘাড়ে চাপান হবে না, তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেড়ে উঠবে সৌন্দর্যময় ও আনন্দময় পরিবেশে। শিশুদের সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রাচীর গাত্রে নানা প্রকার চিত্রশিল্প নানচিত্র ইত্যাদি থাকবে আর খেলাধূলার জন্য প্রশস্ত প্রান্তর, নানাবিধ সরঞ্জাম ও মনোরম উদ্যান। শিশুরা মেলায় যেতে যে আনন্দ ও উৎসাহ দেখায়, বিদ্যালয়ের আসতে তারা তদনুরূপ আনন্দ অনুভব করবে।

এই প্রসঙ্গে কমেনিয়াস বলেছেন শিক্ষকরা মনে করবেন শিক্ষকতা একটি সম্মানজনক পবিত্র জনহিতকর ব্রত! অবশ্য শিক্ষকদের উচ্চ বেতন দেওয়ায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েতে কোন পার্থক্য করেন নি। তিনি উভয়ের সামর্থ্য সমান বিবেচনা করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাহত হয়নি।

কমেনিয়াস ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের আওতায় মানুষ

হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল ধর্ম ও নীতিশিক্ষা। এই নীতিশিক্ষা দেওয়ার সব চেয়ে বেশী দায়িত্ব শিশুর পিতামাতার। প্রথম ছয়বছরেই এই শিক্ষার বীজবপন করতে হবে। এই বয়সে শিশুরা কি করে সুন্দরভাবে খাবার খেতে হয়, পোষাক পরতে হয়, নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হয় শিখবে। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে, সত্য কথা বলতে শিখবে, ঠাট্টাছলেও মিথ্যাচরণ করবে না। আলস্য পরিহার করবে, তাদের ইচ্ছা সংযত করতে শিখবে, শিশুরা পরমত সহিষ্ণু হবে, শৈশবের এই শিক্ষাই শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করবে। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার জন্য প্রতি পিতামাতার সচেতন হওয়া উচিত। তাঁদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণভাবে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়।

এই নীতি শিক্ষার কথাটি আমাদের আবার চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমানে প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তরেও পিতামাতা শিক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান। তাই জন্ম নিচ্ছে রাতারাতি বহু Nursary School এর। যতই সমস্যাভাব হোক অভিভাবকদের একটু সতর্ক হতেই হবে। নইলে নীতিশিক্ষার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোটিও ভেঙ্গে পড়বে, এখন আবার নতুন করে হাল ধরতে হবে অভিভাবকদেরই।

শৃঙ্খলা ও শাস্তির কথা বলতে গিয়ে রুসোনিয়াস বলেছেন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলে হয়তো কখনও কখনও শাস্তির প্রয়োজন হতে পারে। কোনো অন্যায় করলে তবেই শাস্তির কথা আসে, যাতে না ভবিষ্যতে আবার সেই একই অন্যায় হয়। শৃঙ্খলা আসবে প্রকৃত-পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রুসোনিয়াসের অবদানের অন্ত ছিল না। শিক্ষার সার্বজনীনতা, বাস্তবতা, ধারাবাহিক পদ্ধতি, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদির জন্য তাঁকে যথার্থই Prince and Creator of education বলা হোতো।

তোমার শরণ লইলাম

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

তোমার শরণ লইলাম—একথা বলি তো বারে বারে,
পূর্ণা রজনীতে তুমি আস যবে ধরার দুয়ারে।
তোমার অর্চনা করি ধূপ দীপ জ্বালি',
দিকে দিকে আনন্দ-দীপালি
জ্বলে ওঠে—নিমেষে নিঃশেষ হয়ে সকল আঁধার
সরে যায়। মনের গহনে রাজে কী প্রসন্ন মূরতি তোমার
ভয় নাই, আর নাই ভয় :
পেয়েছি অশোক মন্ত্র, মৃত্যুরে করেছি আমি জয়।

সে রাত্রি জ্যোৎস্না-সিক্ত থাকে নাকো', হয় অবসান ;
আবার আঁধার নেমে আসে।
কোথা সে অভয় মন্ত্র। মৃত্যুর মদিরা করি পান
বেদনার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে
ভরে ওঠে এ পৃথিবী। হিংসায় উন্মত্ত ধরাতল ;
চারিধারে কামনার বিকৃত বীভৎস কোলাহল।
'মার'-কবলিত পৃথ্বী—অশান্ত, বিভ্রান্ত অসহায়
মরণের দিন গোণে সৃষ্টির চরম ব্যর্থতায়।

আবার তোমার মন্ত্র বেজে ওঠে : বৈশাখী পূর্ণিমা
নেমে আসে ধরণীতে মুছে দিতে সকল কালিমা।
চারিদিক ভরে ওঠে প্রসন্ন সে আলোর কিরণে,
আবার আশ্বাস জাগে মনে।

অমিতাভ, এ আঁধার চিরতরে দূর করে দাও ;
তোমার অমৃত মন্ত্রে আতঙ্কিতা পৃথিবী বাঁচাও।

ব্যর্থ স্বাধীনতাকে সার্থক করার উপায়

॥ মানবেন্দ্রবাদী স্বদেশরঞ্জন ॥

ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয়েছিল তখন সে স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, মনের সকল বৃত্তি ও শক্তিকে বিকশিত করে তোলার পথে যে সব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বাধা আছে সে সবের অপসারণ, জীবন-ভোগের অবাধ স্বাধীনতা—এককথায়, ব্রিটিশ আমলে যেটুকু ভাল ছিল সেটুকু তো থাকবেই, অধিকন্তু যা ছিল তা পেতে হবে।

কিন্তু ব্রিটিশ আমলে ভাল কিছু ছিল কি? ছিল বই কি। ইতিহাসেই আছে, ব্রিটিশ আসার আগে নবাবী আমলে আইনের শাসন ছিল না, স্বৈরাচার চলত। সে যুগের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন, "কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা থাকিয়া শোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া শান্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে শোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বের করে"। ব্রিটিশ এক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানুষকে শোয়াস্তি দিয়েছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য যে আইনের শাসন তা ব্রিটিশ প্রবর্তন করেছিল।

সকল রাষ্ট্রই তিনটি পদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসন পরিচালন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। ব্রিটিশ তার বিচার বিভাগ ও শাসন পরিচালন বিভাগকে পরম নিপুণতা ও সেই সঙ্গে কঠোরতার সঙ্গে পরিচালিত করে ভারত থেকে সেই স্বৈরাচার দূর করে আইনের শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্যই এই দুই বিভাগে বিশেষতঃ শাসন কার্য পরিচালন বিভাগে শেষেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। অপর যে তৃতীয় বিভাগ, আইন প্রণয়ন বিভাগ, তাতে তো তাদের পুরোপুরি কর্তৃত্বই ছিল। বিচার ও শাসনকার্য পরিচালন বিভাগের ভারতীয়করণ ও আইন প্রণয়ন বিভাগের ওপর জন-প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবী নিয়েই সুরু হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিচারের, শাসন কার্য পরিচালনার ও আইন কানুন রচনার নিয়ম কানুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেদিন ছিল না; ছিল ভারতীয়করণের দাবী। সেইজন্য ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ব্রিটিশের সংবিধানের ছাঁচেই ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে, ব্রিটিশ রাষ্ট্র অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার মতোই পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক laissez faire অর্থনীতি ও সমাজনীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেলেও ঈপ্সিত ফললাভ হচ্ছে না। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগই সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় করণ হওয়া সত্ত্বেও জন-গণের বন্ধন কাটছে না, শোয়াস্তি হচ্ছে না, সন্তোষ বিধান করা সম্ভব হচ্ছে না, সর্বশ্রেণীর মধ্যে সীমাহীন অসন্তোষ স্তরে উঠছে। যেটুকু আইনের শাসন ছিল, যে পরিমাণ নিরাপত্তা ছিল, অর্থনীতিতে যেটুকু নিশ্চয়তা ছিল আজ তাও যেতে বসেছে।

সমাজ বন্ধনের সিমেন্ট হল সর্বজন গ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন। যেটুকু নীতিপরায়ণতা সমাজে ছিল আজ তা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত না হলেও দ্রুত যেতে বসেছে। ফলে রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় সব বাঁধনই শিথিল হয়ে যাচ্ছে, সবই ভেঙে ভেঙে পড়ছে; এবং এই সর্বজন-গ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন না মানার ফলে ধর্ম হয়েছে কুসংস্কারের ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়েছে উৎপীড়নের উৎস, রাষ্ট্র হয়েছে অনিষ্টের উদ্ভাবক, শিক্ষা-ব্যবস্থা

হয়েছে অজ্ঞানতার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু কেন এমন হল? আজ আমাদের এর উত্তর দিতে হবে, এই সমস্যা সমাধান সূত্রের সন্ধান করতে হবে, নতুন করে স্বাধীনতার যুদ্ধ সুরু করতে হবে।

পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র যে বর্তমান যুগে অচল, স্বাধীন ভারতের নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থা ঐ ছাঁচে গড়ে তুললে তা যে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবে না মানবেন্দ্রনাথ রায় সে কথা স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ১৯৪৪ সালেই ঘোষণা করেছিলেন এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া ও জনগণের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে দেশবাসীর নিকট তা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ তা গ্রহণ না করে ব্রিটিশের পার্লামেন্টারীয় গণতন্ত্রের ও ধনতান্ত্রিক আদর্শকেই গ্রহণ করেন। আর যখন তার শূন্য-গর্ভতা জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন মানবেন্দ্রনাথের বিকল্প পরিকল্পনাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত বিবেচিত হলে তা গ্রহণের সময় এসেছে।

পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র যে এদেশে চলছে না তার জন্যে আমাদের দেশবাসীর অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নয়, ঐ রাষ্ট্র ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিই তার জন্য দায়ী। এই দোষ ত্রুটির জন্য পৃথিবীর কোন দেশেই আর পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সার্থকভাবে চলছে না।

প্রথম মহাযুদ্ধে কাইজারের পতনের পর জার্মানীতে যে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল তা আর্মান জাতির মতো সর্ববিষয়ের প্রযুক্তি বিদ্যায় সুদক্ষ অভিনয় সুশৃঙ্খল জাতির পক্ষেও রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কেবল জার্মানীতেই যে সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয়নি তা নয়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপের যে সব দেশে সে চেষ্টা করা হয়েছিল সে সব দেশের কোনটিতেই তা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে যে শতাধিক ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে সেখানেও এ চেষ্টা সফল হয়নি বা হচ্ছে না; পরিবর্তে কোন না কোন প্রকার ডিকটেটরি শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তা ছাড়া ব্রিটিশ ফ্রান্স প্রভৃতি পুরণো পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক দেশের সমাজেও ভারসাম্য থাকছে না, জনগণের মধ্যে অশান্তি অসন্তোষ তয় সত্ত্বেও দুর্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

এই সব দৃষ্টান্ত নিঃশেষে প্রমাণ করছে যে এ যুগে সংসদীয় গণতন্ত্র অচল। অতএব ভারতেও যে তা অচল হবে আমাদের সংবিধান রচনার সময় সে কথা স্মরণ করা উচিৎ ছিল।

পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও তা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারে না, ব্যালট বাক্সে তা প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে হয়। তখন আর জনগণের কোন অধিকার ও দায়-দায়িত্ব থাকে না। সেইজন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের কোন সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না, প্রতিনিধিরাই দল বেঁধে পার্টি খাড়া করে রাজত্ব করতে থাকে। তখন অপ্রয়োজনীয় ক্ষমতা-হীন জনগণ থাকে অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন, atomised। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের কোন অধিকার ও দায়-দায়িত্ব না থাকার ফলে এই প্রতিনিধিদের পার্টিশাসিত শাসন-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রয়োজনও তারা অনুভব করে না, রক্ষা করতে এগিয়েও আসে না, তা ছাড়া অসংগঠিত থাকায় সে ক্ষমতাও থাকে না। সেইজন্য জার্মানী ও অন্যান্য দেশে যখন একদিকে কমিউনিষ্ট স্বৈরাচার, অন্য দিকে ফ্যাসিষ্ট স্বৈরাচারের দ্বারা রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়েছিল তখন জনগণ এগিয়ে এসে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে নি সুতরাং এ দেশেও কমিউনিজিম, মার্কসিজিম, লেনিনিজিমের নামে যে স্বৈরাচারের অনুপ্রবেশ ঘটে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে পার্টি একাধিপত্য স্থাপন করতে চাইছে তা যে ভারতীয়দের অযোগ্যতার ফলে ঘটছে না, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ত্রুটির ফলেই ঘটছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় এসেছে।

এই পার্লামেন্টীয় রাষ্ট্র কাঠামো ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকল্প পরিকল্পনা যা সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে তা যে মানবেন্দ্রনাথ পঁচিশ বছর পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন তা আমরা বলেছি।

এই রাষ্ট্রতন্ত্রের নাম আমরা দিয়েছি সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পার্টি শাসনের কোন অবকাশ থাকে না। জনগণই নিজ নিজ পল্লীতে সংগঠিত হয়ে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসন পরিচালন বিভাগকে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। পার্লামেন্ট ও বিধান সভা এই সব স্থানীয় গণতন্ত্রের নির্দেশসমূহের সমন্বয় সাধনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হবে মাত্র। সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের পরিবর্তে কয়েক লক্ষ স্থানীয় গণতন্ত্রের আয়ত্তাধীনে থাকবে। সার্বভৌম ক্ষমতা যখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে তখন কেউ আর নিজের পরিশ্রমের ফল থেকে আংশিক ভাবেও বঞ্চিত হতে চাইবে না, বা মনিব-চাকরের ছোট-বড় সম্বন্ধ বরদাস্ত করতে চাইবে না। সকলে তখন নিজ নিজ উৎপাদনের উপায়ের—জমি কলকারখানার একক ভাবে যৌথভাবে মালিক হতে চাইবে এবং নিজ নিজ উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষ বিধান করতে ও বিপণনের সুবিধার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে। তখনই সমবায়মূলক অর্থনীতি গড়ে উঠে শিল্প বাণিজ্যে বর্তমানের অশান্তি অনিশ্চয়তা কেটে গিয়ে ক্রমবর্ধিত হারে উৎপাদন বাড়িয়ে চলবে।

এই বিংশ শতাব্দীতে যে কজন যুগ প্রবর্তক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে লেনিন গান্ধী এবং এম এন রায়কে মহান বলে মনে করি। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ও আধুনিক বিশ্বে সজ্জিত মানুষের মধ্যে সর্বধ্বংসী প্রতিযোগিতা ও বিরোধের মীমাংসা করে সভ্যতাকে প্রগতির পথে চালিত করতে যে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর সংসদীয় তন্ত্র সক্ষম হবে না সে কথা এই তিন মহামানব পরস্পর হতে দেশকালের ব্যবধানে থেকেও নিজ নিজ যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন এবং পরিবর্তে যে বিকল্প রাষ্ট্রতন্ত্রের ও নীতির মূলনীতি দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর রূপে অভিন্ন। শুধু কথা ষ্টালিন যেমন লেনিনের আদর্শকে ত্যাগ করে রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থাকে পার্টির কর্তৃত্বাধীনে এনে রুশ জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের স্বৈরাচার কায়েম করেছিলেন, তেমনি গান্ধীবাদী কংগ্রেসীরাও গান্ধীর আদর্শকে গ্রহণ না করে যুগের অনুপযোগী সংসদীয় গণতন্ত্র ও প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করে গান্ধীজীর বিশ্বাসের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে লেনিনের এই আদর্শবাদে মার্কসের তাত্ত্বিক সমর্থন ছিল না, তিনিও কোন তাত্ত্বিক সমর্থন দেননি। গান্ধীও তাঁর আদর্শবাদকে তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাত্ত্বিক সমর্থন দিয়েছেন মানবেন্দ্র নাথ।

আমরাও আমাদের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি। পূর্বসূরী ও অতীতের মহাপুরুষদের আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক সমস্যার সমাধান করতে যুক্তিবুদ্ধির আলোকে যে পথ ও কর্মসূচীর সন্ধান দিয়েছিলেন তা যে দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে সকল সমস্যাই সমাধান করতে সক্ষম হবে তা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁদের নিকট থেকে যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে সমাধানের পদ্ধতিটি পরম কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব, কিন্তু তাঁদের কর্মসূচীটিকে বিনা বিচারে গ্রহণ করব না। তাতে হয়তো অন্ধ গুরু-ভক্তির নিদর্শন মিলবে না, কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে।

রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন তাঁর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন তিনটি শ্লোগানের দ্বারা—Land to the peasents, Factories to the workers, All powers to the Soviets—জমির মালিক হবে কৃষক, কলকারখানার মালিক হবে শ্রমিক, সকল সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে পল্লী পঞ্চায়েতের হাতে। গান্ধীর কথা স্মরণ করুন। তিনিও পঞ্চায়েত রাজ ও বিকেন্দ্রিত শোষণমুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির কথা বলে গেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় যে হেতু এদের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, সেই হেতু উভয়ের জ্ঞান অভিজ্ঞতা যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসের তত্ত্ব তথ্য ও অভিজ্ঞতার সুযোগ-সুবিধাও পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ব পুরীদের মতো অনেকাংশে intuition-এর ওপর নির্ভর না করে যুক্তির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক

ভিত্তির ওপর যে নবমানববাদ নামে দর্শন রচনা করেছেন, তাতেও এই তিন আদর্শের তাত্ত্বিক সমর্থন ও প্রয়োগ পদ্ধতির সন্ধান মিলেছে।

গত পঁচিশ বছর ধরে—এই বিকল্প রাষ্ট্ররূপ ও অর্থনীতির কথা জন-সমক্ষে প্রচার করে আসছি। কিন্তু মানুষের মনে কিছু মাত্র দাগ কাটতে পারিনি। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, দৃষ্টান্তের সাহায্য ছাড়া সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বের বিমূর্ত রূপগুলি সম্বন্ধে ধারণা করা জনসাধারণের পক্ষে সহজ নয়। যারাও বোঝেন তাঁরাও ভেবে পান না কিভাবে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় গণতন্ত্রগুলির ইচ্ছা ও নির্দেশকে লোকসভার সদস্যরা সমন্বয় সাধন করে আইন-কানুন রচনা করবে বা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রী-বর্গকে নির্দেশ দেবে। এ দুটি সমস্যার সমাধান দেখিয়ে দিতে হবে দৃষ্টান্তের সাহায্যে। তবেই সকলে বুঝবে। নতুবা ব্যাপক অসন্তোষের আগুনে বর্তমান সমাজকে জ্বালিয়ে দিয়ে নতুন প্রগতিমূলক পথের সন্ধান না পেয়ে সমাজ পিছিয়ে যাবে, অরাজকতার মাৎস্যন্যায়, ধূর্তদের অসাধুদের অত্যাচারীদের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের ঈপ্সিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য ছায়া পার্লামেন্ট ও ছায়া বিধান সভার পরিকল্পনা করেছি। এই ছায়া আইন সভাদের সাহায্যেই দেখান যাবে যে কি ভাবে গ্রামসমূহ কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কি ভাবে কেন্দ্র এই সব স্থানীয় গণতন্ত্রের ইচ্ছার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে; দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যে লক্ষ লক্ষ গ্রামসভা থেকে লক্ষ লক্ষ মত ও পথের নির্দেশ আসছে না, যা আসছে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন অতি সহজেই সম্ভব হচ্ছে। এটাও সেই সঙ্গে দেখান সম্ভব হবে যে, এই সব স্থানীয় গণতন্ত্রগুলি সংখ্যালঘুকে পীড়নের যন্ত্র হবে না, নিয়মশাসিত, নীতিপরায়ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানই হবে। আর দেখান যাবে কীভাবে দেশের সমগ্র অর্থনীতি সমবায় নীতিভিত্তিক হবে।

প্রকৃত লোক সভা ও বিধান সভার পাশাপাশি যখন ছায়া লোকসভা ও ছায়া বিধানসভা চলতে থাকবে তখন মানুষ সহজেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা চোখের ওপর দেখতে পাবে। তারা দেখবে যে প্রকৃত লোকসভা ও বিধান সভা চলেছে পার্টিদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, আর ছায়া লোকসভা ও ছায়া বিধানসভা চলেছে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় ভোটার পঞ্চায়েতের নির্দেশ অনুযায়ী। অবশ্য ছায়া আইন সভার প্রস্তাবিত বিলসমূহ প্রকৃত আইন সভা গ্রহণ না করতে পারে, কিন্তু তাদের প্রত্যাখ্যান জনগণের ইচ্ছাকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। ফলে অচিরেই পার্টি শাসনের স্বরূপ জনগণের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দেখা যাবে যে এই দৃষ্টান্ত দেখে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং জনগণের সক্রিয় সমর্থনে যা ছিল ছায়া সেটাই প্রকৃত বিধানসভা ও লোকসভার রূপ পরিগ্রহ করছে, ছায়া আইন সভার সদস্যরাই জনগণের আস্থা অর্জন করছে; এবং সেই সঙ্গে পুরাতন সমাজের অভ্যন্তরেই নতুন সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে পুরাতন ব্যবস্থার স্থান গ্রহণ করছে পুরাতন যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাব ও ভাবনার স্থানে নতুন মূল্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাব ভাবনা গড়ে উঠছে এবং সেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার বর্তমান যুগের সকল মানুষ তাদের জীবনকে বিকশিত করার সকল বাধা মুক্ত হয়ে এক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলে নিজ নিজ জীবনকে সকল দিক দিয়ে সম্ভোগের পথ করে নিচ্ছে।

তখনই স্বাধীনতা যুদ্ধের ঈপ্সিত ফল লাভ করে সুদীর্ঘ পরাধীনতার ইতিহাসের অবসান ঘটবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৩৯)

শ্রীরাধা, সকল বিশ্ব-পরিণামের ব্রহ্ম-রূপ প্রদায়িনী—সকল পরিণতির তুমিই ব্রহ্মময়ী রূপ। সকল পরিণতি পরিণতি থাকিয়া, 'হে' থাকিয়া কোন্ ছন্দে ব্রহ্মময়ীরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে তুমি তাহারই বিগ্রহ। তোমার নৃত্যগতির দিকে চাহিয়া বুঝিয়াছি কোন্ কৌশলে সকল নৃত্য-পরিণতি ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইতে পারে, সকল প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি থাকিয়া কি করিয়া নিবৃত্তির চং-এ গড়িয়া উঠিতে পারে। আমি রাধা—রাধা-ভাব আমি চাই। আত্মনিবেদনের মাঝে আমি আমার সকল দেহপ্রাণমন তোমাকে দিয়া তুমি হইয়া যাইব। তোমার বিশ্ব-ঘরের আমি ঘরণী হইব, তোমার বিশ্ব আমার হউক, বিশ্ব-পার্থ আমার হউক। তোমার বিশ্ব-ঘর সাজাইব—ইহাই আমার জীবনব্রত। আমাকে তুমি বিশ্বের মাঝে দাঁড় করাইয়াছ। সব আমার আপনার। বুদ্ধের যাহা বিদ্যা—ক্ষণিক বিজ্ঞান—তাহা শঙ্করের অবিদ্যা। শঙ্করের যাহা বিদ্যা—স্থিরত্বাদি দর্শন—তাহা বুদ্ধের অবিদ্যা। 'ক্ষণিকেষু অপি স্থিরত্বাদি ভ্রান্তিঃ বিদ্যা।' অথচ উপনিষৎ বলেন, 'বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ'। এই বিদ্যা অবিদ্যার সমন্বয় নিত্যগোপালেরও সিদ্ধান্ত। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই নাদি অনন্ত। বিদ্যা দেয় সরল জীবনের খোঁজ, অবিদ্যা য় জটিল জীবনের খোঁজ। তাই সরল, রসই জটিল। ঙ্করের বিদ্যা ও বুদ্ধের বিদ্যা সমন্বিত হইলেই অর্থাৎ একত্ব বহুত্বের সমন্বয় হইলেই হয় তাহা ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা। শঙ্করের অবিদ্যা ও বুদ্ধের অবিদ্যা অর্থাৎ বহুত্ব ও ক্ষণিক দর্শনের সমন্বয়ই ব্রহ্ম-অবিদ্যা। ব্রহ্ম-বিদ্যাও যাহা, ব্রহ্ম অবিদ্যাও তাহা। পুরুষোত্তম এক ও বহুর অতীত তাই বুদ্ধ-শঙ্করের সমন্বয় বিধান করিতেছেন। ৫টার পর মঠে যাই। ধীরানন্দ আগামী শনিবারের পরের শনিবারে গড়িয়া শিবগুরু মঠে অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র দেয়। রবিবার বক্তৃতা দিবার জন্য আজও বিশেষ অনুরোধ করে। ১১৩নং রাসবিহারী এভিনিউস্থ মহানির্বাণ মঠকে কেন্দ্র করিয়া সভা ছাড়া আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই। অনেক বক্তৃতা দিয়াছি। কেউ কি ছুটিয়া আসিল? লোকেরা যে যাহার ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইলে আরাম পায়। ৮টার মধ্যে ফিরি।...

১২ই অক্টোবর

ঠাকুর, দেখা দেও, আমার জীবনে তুমি প্রকাশিত হও। আমার দেহমন প্রাণবুদ্ধি অহংকার নিংড়াইয়া স্পন্দিত করিয়া মথিত করিয়া দেখা দেও। বীজ যেমন আবেষ্টনের রস আহরণ করিয়া, তোমাকে সৃষ্টি করিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষ সৃষ্টি করে, আমিও তেমনি বিশ্ব হইতে রস ও উপাদান আহরণ করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিব, গড়িয়া তুলিব। আমার জীবনের কোণায় কোণায় তুমি পূর্ণ হও, ভরিয়া ওঠ, আমার অন্তর বাহির ব্যাপিয়া ছাপাইয়া তুমি প্রকাশিত হও। আমি বীজ তুমি বৃক্ষ। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ। কে কাহার কারণ, কে কাহার কার্য? জীবনেই তোমাকে চাই স্রষ্টা রূপে, সৃষ্ট রূপে। ওগো নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক, সর্বোপাধি-বিবর্জিত, তুমি বাহিরের 'আচার' নও, আমার জীবনঘন তুমি, জীবনরঞ্জন তুমি। আমার বুক চিরিয়া তোমাকে পাইব, আমি আমাকেই পাইব। তুমিই আমার আমি, তুমি আতপ, আমি ছায়া। তোমার সুরে আমার জীবন-বীণা বাজুক। আমার পরিচ্ছিন্ন সুর শুদ্ধ হউক।...নারী-জীবনের সকল অপমানের মূর্ত্তিমতী প্রতিবাদ শ্রীরাধাকেই

যে মেয়েদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য মেয়েদের ডাকিয়া ছিলাম, তাহা কোনও মেয়ে বুঝিল না। মেয়েরা কি নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে এতটুকুও সচেতন? বেশ আছে ঘরকন্না লইয়া। যাহারা পথে বাহির হইল, তাহারাও কি নিজেদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন? মেয়েরা কি এতই cheap? কেন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না অবিবাহিত থাকিবার জন্য, যতদিন না পুরুষেরা পুরুষোত্তম হইবার সাধনা না নেয়? কেন মেয়েরা 'ঘর' করিবার জন্য এত পাগল? রাধারাণীর জন্য লওয়া কি ব্যর্থ হইবে? কি বুকভরা বেদনাই না মেয়েদের জন্য আমার বুকে রাধারাণী দিয়াছেন! রবীন আসে বিকালে।...বৈকালে কেওড়ার (যাদব সেনের বাড়ীর) সঙ্গীবরঞ্জন পাল (পুটুরিয়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক) আসে।...নারকেল থেকে যে খাওয়ার জন্য তেল করে সেটা আমার খুব প্রিয়—ইহা আজ বলি। ইহারা তৈয়ারী করিবে।...

১৩ই অক্টোবর

ঠাকুর, জীবজগৎ সৃষ্টির লালসায় কি উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রতিটি কণা চায় সৃষ্টি করিতে, সৃষ্টি-কলা আস্বাদন করিতে। কিন্তু তোমাকে সৃষ্টি করা হইতেছে সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। বীজ সৃষ্টি করে বৃক্ষকে, বৃক্ষ সৃষ্টি করে বীজকে। তোমাকে আমি আমার সকল বেদনা দিয়া সৃষ্টি করিব, নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিব, বিশ্বকে exhibit রূপে প্রদর্শন করিব। ওগো বেদনার ঘন বেদমূর্তি আমার, তুমিই ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টি-কলাবিদ্যা। তুমি আপনার হতেও হও আপনার, আমার সকল দেহপ্রাণমন নিংড়ানো ধন তুমি। তুমি আমার জীবনে প্রকাশিত হও, আমার হও, আমি ধন্য হই, তুমি ধন্য হও। তোমার সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে সার্থক হউক। পারস্পরিক সৃষ্টিই সৃষ্টির শেষ কথা। 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'—সৃষ্টি করাতেই জীব জগতের সার্থকতা। আমি উপরে থাকিতেই সূর্য সেন নীচে আসে। সে আজ বৃন্দাবন রওয়ানা হইয়া গেল। আমার খরচের জন্য ২ টাকা দিয়া গিয়াছে। তাহাকে মিষ্টি দেওয়া হয়। বৃন্দাবনের কথা শুনিয়া প্রাণটা কেমন হইল। কতদিন দেখি নাই। রাধারাণী, আমার হৃদয়ে থাকিও। উষাদিদিকে একবার বৃন্দাবন লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। কি জানি হইবে কিনা।...নীলু ৫ টাকা ও সুধীর ৪ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠায়।...জল-প্লাবনের সময় নীলু ১০খানা কাপড় সংগ্রহ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়াছিল, সেই খবর ২রা অক্টোবরের আনন্দ-বাজারে বাহির হইয়াছিল। ৫টার পর মঠে যাই। দাশরথি পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র-শিষ্য দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে অনেক কথা হয় ঠাকুরের দর্শন ও সিদ্ধান্ত-দর্শন সম্বন্ধে। 'অভাব' 'বিশেষ' 'পদার্থ' এবং উহাদের বেদান্তের ভাব ও নির্বিশেষের সঙ্গে সমন্বয় করিতে পারিলেই নিত্যগোপালের দর্শন হয়। 'অভাব' সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য-সত্ত্ব নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান হওয়ার তত্ত্ব আলোচনা হয়। শ্রীনিত্যগোপালের চরণতলে বসিয়া নূতন সূত্রি রচনা করিবার ভার নিতে বলি। রঘুনন্দন আজ চলিবে না।.....বিশ্বের দেবতা নিত্যগোপাল। ছেলেটি ভাল, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আমার ঠিকানা নিয়া গেল। অবধূত ভাস্করের কথা বলি। বরিশালের 'Little Brothers of the poor'-এর আলোচনা আশুবাবুর সঙ্গে হয়। কেমন করিয়া নিত্যগোপাল 'কামিনী-কাঞ্চন' পরিত্যাগ করিলেন, নিতাইবাবু প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হন, তাহা কৃষ্ণপণ্ডিত, রমাপতিবাবু, ক্ষিতীশবাবুদের সামনে বলি। ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার দুঃসাহস রাখি। তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ৯॥ টায় আসি ...।

১৪ই অক্টোবর

নিত্যগোপাল, সর্বক্ষেত্রে সুন্দর আমার, ঘরে থেকে কর ঘর উজলা, বাইরে গেলে দিক উজলা, আমার অন্তর বাইর কর উজলা! তোমার পরশে ব্যষ্টি জীবন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সব উজ্জ্বল হইবে। নিত্যসুন্দর আমার, আমার প্রাণের প্রাণ তুমি, মনের মন তুমি, আমার অন্তরতম তুমি, এমন সকল দর্শন, সকল বেদকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার মত দিব্য রূপ তোমার ছাড়া আর কাহার আছে? তোমার যে কী রূপ আমি দেখিয়াছি, কাহাকে বলিব? বর্ত্তমান যুগের সব মহাপুরুষদের পরের কথা

মি বলিয়া গেলে। তাই বলিতে সাহস হয় তোমাতেই কলের চরম পরিণতি, তোমাতে আসিয়া সকলে গিয়াছে। তুমি নিজেও ইহা লিখিয়া গিয়াছ। তুমি , আমি ভক্ত। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। মি ছাড়া আমার কিছু নাই। আসন করি (১:৫)। ণ ১১টার পূর্বে বাহির হইয়া বামাপদ, বন্ধুগোপাল , সুরেশ দাস, প্রেস ও চিত্রাঙ্কীর ওখানে যায়, ফেরে টায়। সকালে তবনাথ ভট্টাচার্য আসেন, ৩ টাকা া উদ্বোধনের গ্রাহক হন; তাঁহার অসংলগ্ন কথা ধার বলিতে থাকেন। ৪টায় মঠে যাই। সন্ধ্যায় রক রায় আসেন। সহায় ভ্রূ-ভঙ্গিতে এই বিশ্ব চলে, মি কেমন করিয়া মানুষের মতে জন্ম নেন, অবতার হন? মি বলি—বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণের কথা। Idealism Realism-র সমন্বয় দেখানতে অবতারের প্রয়োজন। হার পর তিনি যখন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার া বিধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সেই বিধি তাঁহাকে নতেই হয়। যখনই কিছু সৃষ্টি হয়, তখনই তাহার পেক্ষ একটী সত্তার আবির্ভাব হয়—ইহাই সৃষ্টির ত্কার কথা। সৃষ্ট স্রষ্টার হাতের একান্ত যন্ত্র নহে। । জগতের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি চলেন। । স্রষ্টার মত অখণ্ড।...

১৫ই অক্টোবর

ঠাকুর, শরণ আমার, আমার নিঃসঙ্গ এই সংসার-াপথে তুমিই আমার সঙ্গী। আমার বাধা গুঁজিবার াপদ স্থান তুমি। তোমার আমির তুষ্টিতে বিশ্বের 'আমি' তুষ্ট হইবে। যেমন গর্ভস্থ শিশুর খাওয়া-বাঁচা মায়ের খাওয়া বাঁচা, তেমনি তোমার মধ্যে আমি ব, শুইব, ছুটিব, বাঁচিব। তোমার 'আমি'-র রস ণ করিয়া আমার আমি পুষ্ট হইবে। ওগো আমার ই, সকল ক্ষেত্রের আমি, তোমার 'আমি'র সঙ্গে যুক্ত া ছাড়া আমার 'আমি' যেন কখনও পৃথকভাবে না । তুমি আমি এক অপৃথক সত্তায় থাকিব—ইহাই ার বাসনা। তোমার ইচ্ছা আমার জীবন-যন্ত্রে পূর্ণ ক। আমার দেহপ্রাণমন লইয়া তোমার ইচ্ছা তুমি সাধন কর। তোমার জয় হউক। আসন করি (১২৫)। ...আজ জওহরলাল চীন যাত্রার পথে কলিকাতা আসেন। ৪।৷ টার পর মঠে যাই। প্রায় ৪টায় শতবার্ষিকীর কার্যকরী সমিতির সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভা-সমিতির মত টাকা নাই। যাহা আছে যেন শেষ করিতে খরচ হইবে। টাকা না হইলে কাজ করা সম্ভব হইবে না। দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের কোন ব্যবস্থা হইল না। সুধাংশু ডাক্তার অসুস্থ, অন্য লোক নিযুক্ত করিলে টাকা লাগিবে। টাকা নাই। সব এখন বন্ধ বা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।...পিতৃশ্রাদ্ধ, মেয়ের বিবাহ কি 'টাকা নাই' এই কথা শোনে? মঠের কাজই বা শুনিবে কেন? কেমন করিয়া এইসব মানুষদের লইয়া কাজ করিব? ঠাকুর, শেষে তোমার মঠে গিয়াও এইসব লোকের মধ্যে পড়িতে হইল যাহাদের কাজের জন্য কোনও দরদ নাই। মাথা যখন দিয়াছি, দায়িত্ব যখন নিয়াছি, আমি তো এখন ভীরুর মত পশ্চাৎপদ হইতে পারিব না। আমাকে করিতেই হইবে। ইহা একটী challange — প্রকৃতির নিকট হইবে। তাহারা চায় সব বন্ধ হউক। তাহাদের ইহাতেই আনন্দ। কিন্তু আমি তো আজও আছি। আমার সামনে হইতে কাজ বন্ধ হইবে, ইহা হইতে দিতে পারিব না। ঠাকুর বলিয়া কাঁপাইয়া পড়িব। 'বাঁচি কিম্বা মরি দিতে হবে পারি'। ১টার পর ফিরি। চুপুরে নারিকেলের তৈল দিয়া ভাত খাই।

১৬ই অক্টোবর

রাধারাণী আমার, তুমি বিশ্ব সংগঠন মূরতি, তুমি রাস মণ্ডল রচনা করিয়া চলিয়াছ, বিশ্বের সব শকতি, তোমার কাম্যব্যূহ। প্রাণ তোমার আত্মনিবেদনময়ী। এই আত্ম-নিবেদনই সংগঠনের প্রাণ। সারা জীবন 'সংগঠন' 'সংগঠন' বলিয়া কাঁদিলাম, কত মানুষকে ডাকিলাম, কেহ তো আসিল না। খাই নাই, পরি নাই, নিজের বলিয়া কিছু রাখি নাই। কংগ্রেসকে সব লোনাটুকু দিয়া দিয়াছি, দেহের ভাবনা কোন দিন ভাবি নাই। আজ তোমার মহানির্বাণ মঠের লোকেরা বলেন কিনা টাকা নাই, হাসপাতাল চলিবে না, প্রচার হইবে না। মেয়ের বিবাহ যদি 'টাকা নাই' শোনে না, মঠের কাজই বা এই অজুহাত শুনিবে কেন? কাজ করিতে হইবে

যে ভাবে হউক—ইহাই তো জীবনে তোমার কাছে শিখিয়াছি। আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, ধন দেও, জ্ঞান দেও। তোমার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব। আসন করি। (১৩০)। বিরজা আজও খুব সকালে শেফালী ফুল দিয়া যায়। সকালে চেতলা যাওয়ার সাথে উপেন্দ্র বসু গন্ধব (বাইসাক্রী) হঠাৎ আমাকে রাস্তা হইতে দেখিয়া ঘরে উঠে। সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও দুইটী পুত্র। ৩০ টাকা পেনসন পায় গভর্ণমেণ্ট হইতে। কংগ্রেসের সময় গান গাহিত। তাহার দৈন্যের অনেক কথা শুনি। একদিন আসিতে বলি। নিত্য খাইতে দেই। অতুল আসে, সে ক্যাম্পে স্থান পাইতে পারে। কম্বল চায়। প্রতিবার কম্বলটা দেই।··· —চল্ল না মঠে কোন কাজ হউক। কিন্তু কাজ করিতেই হইবে। কাজ আগে টাকা পরে—ইহা বুঝাইতেই হইবে।···আগামী ৩ দিন গুরু নানকের উৎসব মহানির্ব্বাণ মঠে নির্গুণ বালিক সৎসঙ্গ কর্তৃক উৎযাপিত হইবে। তাহার আয়োজন মঠে হইতেছে।···সেলাইর মাষ্টার তাহার পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে নিবার জন্য আসে। ৯টায় যাই রিকসায়।···

১৭ই অক্টোবর

ঠাকুর, শরণ আমার, দেহপ্রাণমনের আশ্রয় তুমি। আমার দেহপ্রাণমন দিয়া তোমাকে আমি গড়িয়া তুলিব, আমার দেহপ্রাণমন দিয়া জীবনে গড়িয়া উঠিবে। তোমার দেহের মধ্যেই আমার দেহ দিয়া, তোমার প্রাণের মধ্যেই আমার প্রাণ দিয়া, তোমার মনের মধ্যেই আমার মন দিয়া: তুমি আর আমি, আমি আর তুমি সর্বতোভাবে এক অদ্বিতীয় —ইহাই আমাকে উপলব্ধি করাও। তুমি কি এমন করিয়াই আজও গোপন হইয়া থাকিবে? প্রকাশিত হও আমার সকল দেহে প্রাণে মনে। তোমাকে বিশ্ব দরবারে বহন করিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আমি সার্থক হই। তোমার জয় হউক।·· সাধন করিয়া পাও, আর পাইয়া সাধন কর—সাধন করিতেই হইবে। ঠাকুরের সম্প্রদায়ের পাওয়ার পর সাধন করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাহারা পাইল, অথচ সে পাওয়াকে মন দিয়া প্রাণ দিয়া দেহ দিয়া চিনিয়া লইল না, পরখ করিয়া লইল না। আজ সে পাওয়া তাই না-পাওয়ার শামিল হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায় সাধন করিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কাজেই তাহাদের মৈত্রী করুণা প্রভৃতির সংস্কার আছে। ইহারা একেবারেই কিছু করিল না. সাধারণ সামাজিক মানুষের যে শুচিতা, তাহাও যিনি তাহাও ইহাদের নাই। নবদ্বীপের কোনও স্কুলের শিক্ষক (বোধ হয় মণীন্দ্র) সন্ধ্যার পর আসিয়াছিলেন। ২১শে, ২২শে, ২৩শে নভেম্বর সভা করিবার একটী আলোচনা হয়। তারিণীবাবু পূর্বে একবার যাইয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিবেন। নির্গুণ বালিক সৎসঙ্গ আজ সন্ধ্যায় কীর্তন আরম্ভ করে। প্রতিভা একটী মেয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মঠেও গিয়াছিল। ...রেণু গোপাল মহম্মদ হইতে তাহার 'ঘরে-বাইরে' ও 'শেষ-প্রশ্ন' বইগুলি বিক্রয় করিয়া নিয়া আসে। উপেন পর আসিয়াছিলেন···। ১৮ই অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি আমার 'সঙ্গী'। না হইলে অপ্রতিবার অশস্ত আমি কি বাঁচিতাম? পথে যেদিন বাহির হইয়াছি, সেদিন হইতে আমার উপর সর্ববিধ আক্রমণ চলিবার পথই সুগম হইয়াছে। কত ঘুণাক্ষর বু আচরণ যে আমার আঘাত করিয়াছে তাহা তুমি জান। কিন্তু তোমার স্নেহ দিয়া তুমি আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছ। তাই সব তোমাতে ঠেকিয়া প্রতিহত হয়।...তুমি আমাকে ঘিরিয়া না রাখিলে কোথায় আমি থাকিতাম? ধরার ধূলিতে বিলীন হইতাম। পথে যেন কেহ বাহির না হয় তোমাকে সঙ্গে না লইয়া। পথই সকলের সকল আক্রমণের ক্ষেত্র; ঠেকাইবার কিছু নাই। আমার ঠাকুরই সেখানের একমাত্র সান্ত্বনা; আসন করি। ধীরেন আসে ১০॥ টার পর। আমি রেণু ও গোপা জয়াদের বাড়ী যাই। পরে বসুর ওখানে যাই। ...আমি আজ বিরাট জগতের বুকে দাঁড়াইয়া। কেউ আমার নাই। যে আহারটা লইয়া যাও। কে এ পাগলের খোঁজ লয়? রেণু ব্যাঙ্ক হইতে ২০০৲ টাকা তুলিয়া আনে সেলাই-এর কল কিনিবার জন্য। মঞ্জুর বাসা হইতে মঠে যাই। শ্যামসুন্দরানন্দ আজ আসিয়াছেন, ৩ দিন থাকিবেন নির্গুণ বালিক সঙ্ঘের আজও প্রার্থনা ও সঙ্গে গান হয় গোপা ও রেণু ৭॥ টার পর আসে। জয়া আসিয়াছিল আমি ৮টার পর চলিয়া আসি। নিতাগোপাল, কবে ঘরে ঘরে তোমার তত্ত্ব পৌঁছাইয়া দিতে পারিব? তোমা

তত্ত্বের সেবা করিবার জন্য কে আছে? মঠে বেশুন-মূলা-কপির সেবা হয়। কিন্তু তোমার তত্ত্বের সেবার জন্য কে প্রাণপণ করিবে? মঠে সবই হইবে, হইবে না শুধু তোমার প্রাণের, তোমার তত্ত্বের সেবা ও তাহার প্রচার প্রসার। আমাকে কি সে অধিকার দিবে? টালিগঞ্জের ইন্দুলেখা দেবী সন্ধ্যায় আসিয়াছিলেন। দেখা হয় নাই...।

১৯শে অক্টোবর

ঠাকুর, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব, তুমিই আমাকে মারা জীবন রক্ষা করিয়াছ। না হইলে আমি অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়া মরিতাম। তোমার উপর নির্ভর করিব; তুমিই আমার গোপ্তা, রক্ষক। পদে পদে রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। আমার 'আমি' ও 'আমার' তোমার কাছে দিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব। 'আমি'-র বোঝার ভার আর বহিতে পারি না। আমার 'আমি' তুমি লও, আমার 'আমার' তুমি লও। তুলসী তিল দিয়া আমার 'আমি' 'আমার' তোমার চরণে ডালি দিলাম। আমি তোমারই তোমার হইব। ওগো আমার 'আমি'। আমার 'আমি'-ই আমার সত্তা আমি। আমি নিভিয়া যাই। আসন করি (১২৫)। বিরজা ৭টার পর সেফালী দিয়া যায়। কিছুকাল থাকে। রেণু ভবানীপুর যায় আমেত করা বাক্স আনিতে। প্রস্তুত হয় নাই। কাল আসিতে বলিয়াছে। উমাদিদি মন্তুর বাসায় যায় বৈকালে। আমি ৪॥টার পর মঠে যাই। ৮॥টা পর্যন্ত থাকি। আরতি ভোগ ইত্যাদি শেষ হইয়াছে, ভজন শেষ হয় হয়। বেশ অনুষ্ঠান হইয়াছে। কোনও কিছু অসম্পূর্ণ থাকিতে দেখিলে অপরে তাহার জন্য ছুটিয়া যাইয়া করে। আজ সকালে ঢাকা জেলার হরপাড়ানিবাসী হাইকোর্টের ট্রান্সলেটার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রসাদ বিশ্বাস (যাহার গান—কি দিয়ে পূজিব আমি আছে আমার ইত্যাদি), মালখানগরের কালিদাস বসু, তাঁর কথা উঠে। কালীপ্রসন্ন দাদার 'কামিনী ব্রহ্ম ন ব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠার কথা, পুরাণ পাঠ না শুনিয়া নিত্য পাঠ শোনার কথা বলি। অবিরল ধারায় চোখের পড়িবার কথা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িয়া আমি হইয়াছিলাম কামিনীকাঞ্চনবিদ্বেষী, রাস্তায় মেয়ে দেখিলে চক্ষু মুদিতাম ইত্যাদি। সেই আমি কালীপ্রসন্নদাদার প্রভাবে বদলাইয়া যাই। সেই অবস্থায় ১৩১০ সনের ১৮ই অগ্রহায়ণ আমি বিবাহ করি। 'পন্থা' পত্রিকার 'সর্বাত্মক' ভাবেরও প্রভাব আমার উপর পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে শ্রীনিত্যগোপালে আসিবার গোড়ায় ছিল কালীপ্রসন্নবাবুদের সঙ্গ, হীরেন দত্ত, রাজেন্দ্র মুখার্জী ও পি. এন্. মুখার্জী প্রভৃতি থিয়োসফিস্টদের সঙ্গ। কোথায় জীবন কোথায় আসিয়াছে! হৃদয়ের ভিতর একটা পরিবর্তন আসিয়াছে, সে এবার অনেক শান্ত, সুস্থ। মিনুও এখন সুস্থ।

২০শে অক্টোবর

নিত্যগোপাল, তুমি দীনবন্ধু, দীননাথ; আমি দীনহীন। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শকে শোষণ করিয়া তাহাদিগকে দীন দশায় উপনীত করাইয়াছি, রূপ-রসাদিও আমাকে শোষণ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়াছে। তুমি দীননাথ। তুমি দুইকেই শোষণমুক্ত করিয়া দুইকেই স্বয়ং মর্যাদায় দাঁড় করাইয়াছ। তোমার রাধা-প্রকৃতি সাহায্যে তুমি ইহা করিয়াছ। রাধারাণী আমার নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা প্রকৃতির মুক্ত রূপ, স্বাধীনভর্তৃকা রূপ। মুক্ত জীবন-প্রবাহ মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধা। রাধারাণী, পরাণপুতলী আমার, আমার জীবন শোষণমুক্ত হউক। আমি যেন কাহাকেও শোষণ না করি, কেহ যেন আমাকে শোষণ না করে। প্রতিটী বস্তু শোষণমুক্ত ব্রহ্ম হউক—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'। বিশ্বের শোষণমুক্ত জীবন লাভ হউক। তোমার জয় হউক। আসন করি (১৫০)।...তিনটার পর রেণু মিনু ও সেলাইর মাষ্টার কল কিনিবার জন্য যায়। টাকা দিয়া আসে। কেহই কল না থাকায় কাল এখানে 'অর্পিতা সঙ্ঘে'র নামে delivery দিবে। আজ 'অর্পিতা'র কথা খুব মনে হইতেছিল। সে আমার কাজ করিবে বলিয়াছিল। আমাকে একা ফেলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। বুকভরা বেদনা বহিয়া চলিয়াছি। মনু সেফালিকে বক্তৃতা শিখাইতে চাহিয়াছিলাম। কৈ, কেহ তো আসিল না। মঠে কাহারও সঙ্গে মিলিয়া সুখ পাই না। কে আছে নিত্যগোপালের তত্ত্ব লইয়া? ইহারা সনাতন পথ ধরিয়া চলিতে চায়—অথচ

ইহাদের ঠাকুর সেবা বিলাসী—কাজেই ইহারা কোথাও নাই। আমি একা কি করিব? দুঃখিতের মত মঠে যাই আর আসি। ইহাদের সামনে কোন আলো নাই। এখানের ইহারা যদি সুস্থ মনে সুস্থ প্রাণে কাজ আরম্ভ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র হইলেও তাহা ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করিতে পারিত। ঠাকুরের দর্শন 'চালু' হইবার যোগ্য। এমন চালু জিনিষ চলিবে না? প্রাণপণ করিয়া চালাইলেই চলিত। আমি মঠে যাই ৪॥টায়। ফিরি ৮টায়। ধীরেন রেণুর ইনজেকশন দিয়া যায়। নীলের বাস্ত সারাইয়া আনে। আখিলজগৎ প্রেসের প্রাপ্য দিয়া দেয়। মিঠু তাহার জীবনের অগ্রগতির সকল সুযোগ পাইবে, এখন বুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া তাহা নিলেই হয়।

২১শে অক্টোবর

সেলাইর কল আসে।

শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বের সর্ববিধ সুরের সর্বসম্বন্ধ-মূর্তি তুমি, সম্বন্ধের যে ছন্দে দুই দুইয়ের মর্যাদা রাখিয়া এক হইতে পারে তুমি সেই ছন্দের দেবতা। তোমাকে মূর্তিমান সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে আমি পাইয়াছি। মদনমোহন, মদনমোহন-ছন্দে এই বিশ্বের অনেক জীবনের সকল সম্বন্ধ ছন্দিত হইয়া উঠুক, তোমার সচ্চিদানন্দ রূপ ও স্বরূপের মাঝে আমার দেহ প্রাণমন সহায়ে তুমি তোমার বিশ্বকর্ম সম্পাদন কর, আমার দেহপ্রাণমন তোমার ক্রীড়াক্ষেত্র লীলাক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠুক। আমার জীবনে তুমি প্রকাশিত হও। হৃষীকেশ, তোমার সেবায় আমার দেহপ্রাণমন নিয়োজিত হউক। আসন করি (১৫০)।...সেলাইর কল আসিয়াছে ৬টার পর।...কল নাবি বেশ হইয়াছে। অর্পিতা-সজ্ঞ জয়যুক্ত হউক। অর্পিতা আমার, কত দিন হইল তুমি সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছ। আজিও তোমাকে আমি বুকে করিয়া রাখিয়াছি। তুমি আমার জীবনে চিরদিন থাকিবে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। তোমার অপেক্ষায় আমি আজিও আছি। বলিয়া গিয়াছ আমার কাজ করিবে। আমার কাজ তো পড়িয়াই রহিল, কাজ যে আমায় ভাসিয়া যাইতেছে। আমারও তো দিন ফুরাইল। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে ডাকিলাম, কেউ তো আসিল না। আমি অযোগ্য, তাই কেহ আসে না। কেমন করিয়া ডাকিলে মানুষ আসে, তাহা বোধহয় শেখা নাই। মহানির্বাণ মঠ হইতে দুঃখ পাইয়া ৭টায় চলিয়া আসি। সন্ধ্যায় তারিণীবাবু কোথায় বাগানের দিকে—বোধ হয় জ্ঞানসুন্দরানন্দের ওখানে গিয়াছে। আমি একা বসিয়া আছি। অফিসটা খালি রাখিয়া আসিতেও পারি না। খৈলেন আসার পর চলিয়া আসি। পয়সা খরচ করিয়া রোজ যাই—attend করিবার সময়ও তারিণীবাবুর নাই। আমি চলিয়া আসিলেও তো ওখানে যাইতে পারেন। শতবার্ষিকীর কোন কথাই তো নাই। মূলা কফি লাগানো হয়, হয় না ঠাকুরের প্রচার। এক একবার মনে হয় শীঘ্র আর যাইব না। কে বসিয়া আছে আমার অপেক্ষায়? ৮টায় পি, কে, পাল আসেন। যাহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া দেখিব, সে যতদিন নিজেকে উহা বলিয়া না বুঝিল, ততদিন আমার দেখা বাস্তব হইবে না। ইহাই creative দর্শন। 'ন কামস্নেহহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্ ...,' 'প্রায়েন দেব মুনয়ঃ' শ্লোক ব্যাখ্যা করি। 'যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে'—মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়।...

২২শে অক্টোবর

রাধারাণী আমার, হৃদয়-সম্পুটমণি—হিরণ্ময় সম্পুটে (কৌটায়) গোপন রাখা মণি আমার, তোমাকে লইয়া অনন্ত পথ চলিয়াছি—হিরণ্ময় পরে কোবে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক। জীবনের গোপনীয়তম প্রদেশে তুমি আমার আছ। তুমিই আমার নিত্যগোপাল। দুনিয়ার সকল অনাদর, সকলের ছাড়িয়া যাওয়ার বুক চিঁড়িয়া আজও চলিয়াছি তোমাকে বুকে লইয়া অনন্তের পথ ধরিয়া। উপরে নীল আকাশ নীচে শ্যামলা ধরণী—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি দুই সখা, দুই সাথী, দুই বন্ধু—পরস্পরের গায়ে গা লাগাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া। বিশ্বকে তোমার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই এই অভিযানের গূঢ় প্রয়োজন। তোমাকে আমি সকল বুক দিয়া ধারণ করিব। আসন করি (১৫০)। নীলুর পোষ্ট কার্ড আসে। আজ আর মঠে যাই নাই। কে আছে শতবার্ষিকীর ভাবনায়? ঠাকুরের কফি মূলা খাইলেই চলিবে, তত্ত্ব-পরিবেশনের প্রয়োজন কি।

কাতার কত জায়গায় যাইবার কথা ছিল, কে যায়? ার মাথা ব্যথা? আমি এই তত্ত্ব-পরিবেশনের জন্য ছুট-করিয়া সেলাম সারা জীবন। বড় দুঃখ আমার। দের চাহিয়া ছিলাম ঠাকুরেরই সেবার জন্য। ঠাকুরের গ্রামোফোন রেকর্ড-এর মত তাঁহারা ধরিয়া রাখিবে ইরূপ একটা বিশ্বাস ছিল। তাহাদের receptivity-র ণা) শক্তি বেশী বলিয়া জানিতাম। কয় জন আসিল? াসিল পুরুষ, দুয়েকটী শক্ত মেয়ে হইলেও তো হইত। পঞ্চাশিকে বক্তৃতা শিখাইতে চাহিয়াছিলাম। তাহারা । গিয়াছে আমাকে নিরাশ করিয়া। সুধা গেল। রিবে আমার কাছ, ঠাকুরের কাছ? সন্ধ্যার পর জন বসু আসে।...আজ সেধাইর বলে প্রথমে র বালিসের জন্য একটা ওয়ার তৈয়ারী করিয়া দেয়। বাবু আসে।...

২৩শে অক্টোবর

কুর, তুমি মানুষকে আদর করিয়াছ, কিন্তু তুমি ে ছিলে, অনাদরে চলিয়া গেলে। তুমি মূর্তিমান । আমরা তোমাকে আদর করি নাই, দেহপ্রাণ মন র আদরের সামনে সমর্পণ করি নাই। তুমি ছিলে র মত, আমরা ছিলাম আমাদের মত মনবুদ্ধির খেলা অভিসন্ধি লইয়া। তোমার সঙ্গে আমাদের যোগ । নাই। বিয়োগের দুঃখ তাই আমাদের প্রচুর। ছিলে হৃদয়ের রাজা। তোমাকে কাঙ্গাল করিয়া ছিলাম, দেহপ্রাণ মন দিয়া তোমাকে তো সাজাই আমার বিশ্বরাজ, হৃদয়রাজ। তোমাকে বিশ্বময় । দিবার মত বল দেও। এত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া করিয়া তোমার কাজ করিব? ঝড়ের মত চলিবার াও। আসন করি (১৪০)।...৪ টায় মঠে যাই। বিছানো হয় নাই। তারিণীবাবু কিছুটা অসুস্থ বিধায় ৪॥০ টায় পর পূর্ণেন্দুবাবু আলোচনা করেন। পূর্বের শ্রোতারা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মহা-পুরাণ হইতে দশমহাবিদ্যার প্রকাশ পাঠ হয়।... ওখানে যাই। সে আজ নলহাটি যাইবে। তাহাকে শতবাধিকীর কথা বলি, 'ঠাকুরের কাজে কোনও divided responsibility নাই। প্রত্যেকের কাছেই ঠাকুর 'পূর্ণ'। ঠাকুর তো ভাগের ঠাকুর নন। যে পারিবে, যাহার সৌভাগ্য আছে, সেই করিবে। কে করিল বা না করিল, তাহা দেখিবার প্রয়োজন কি? মেয়ের বিবাহ 'টাকা না থাকা' শোনে না। টাকা নাই বলিয়া নবদ্বীপের প্রোগ্রাম হইতে ছিল না...। আমিই খরচ দিব। সম্ভব হইলে আসিও। লোক ও টাকা পাঠাইও। কে কাহার কাজের জন্য কাহাকে ডাকিবে? ডাকিবার লোকও নাই।' আমি কত আঘাত সহ্য করিয়া যে প্রতিভা রেণু কুসুম ও আমার সন্তানদের আগলাইয়া রাখিয়াছি তাহা আমার বুক জানে। প্রতিভা বলিল—তাহার মামীমা তখন এখানে। তখন সকলের বাসন প্রতিভাকে সাফ করিতে হইত। আমি তাহা লইয়া ঝগড়া করিতাম—কেন বাসন মাজার লোক রাখা হইবে না? এমনই সারা জীবন করিয়াছি—কাহারও গায়ে কাঁটার আচড় না লাগে তাহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। তবুও মানুষ পাই নাই।

২৪শে অক্টোবর

বাবা নীলকমলের তিরোধানের তিথি

'কালী, আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালী নাম সারারে। যাঁরা সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে পেয়েছে রাজ্য ভারারে। আমার দরিদ্রেরই ধন ও রাঙা চরণ গলায় পরেছি সারারে।' মা তোমার পাদপদ্ম গলায় হার করিয়া চলিয়াছি। তুমি চিৎশক্তি, জ্ঞানশক্তি, বৈরাগ্যশক্তি, শ্মশানবাসিনী, দিগম্বরী, শিবহৃদিবিলাসিনী। সব বিষয়কে তুমি বৈরাগ্যের আগুনে পুড়িয়া দিব্য রূপপ্রদায়িনী। মা, আমাকে বিশ্বের দিব্যরূপ দেখিবার মত তৃতীয় নয়ন দেও। সারা জীবন আমার শ্মশান হইয়া গিয়াছে। মা, তুমি শ্মশানের বুকে ব্রহ্মধাম প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু...। কালী, কালী, তুমিই কৃষ্ণের দেহ—শ্রীনিত্যগোপাল শুনাইয়া গিয়াছেন। মা মুক্তকেশী, বাবা নীলকমল! আজ নীল-

বাবা নীলকমল—আমি তোমাদের সার্থক সন্তান হব—'যেন মুখ দেখে মা তোর ছেলে বলে সকলে চেনে'। আসন করি (১৫০)। সকালে নদী আসে। বৈকালের সভায় কথা হয়। আজ সারাদিন বৃষ্টি।...বৃষ্টির জন্য অশ্বিনীকুমারের সমাধিস্থলে সভা সম্ভব হয় নাই। নীলরতনবাবু সমাধিস্থল ঘুরিয়া এখানে আসেন। তাঁহাকে পুরাণো 'উদ্ধবসংবাদ' হইতে 'বিপ্রপত্নী' অর্থাৎ রানী সম্বন্ধীয় লেখা রেণু পড়িয়া শুনায়। 'শ্রীনিত্যগোপাল চরণে' প্রথম প্রবন্ধটিও শুনায়: তাহার পর প্রতিভা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ হইতে 'সাধনা ও সাধক' অংশ পড়ে।...মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে তাহারা তাহার প্রতিদানে কেহ 'আমি' সমর্পণ করে নাই; বরং 'আমি' শক্তই হইয়াছে। আমি বলিয়াছি, 'আমি নাই তোমরা আছ', তাহারাও বলিয়াছে, 'ঠিকই, আমরাই আছি'। কেহ তো বলিল না, 'না, আমরাই নাই, তুমি আছ'—আজ এই কথা খুব আলোচনা হয়। ২৪শে অক্টোবর

শ্রীনিত্যগোপাল, 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রমবিবর্তিত রূপ তুমি। ভাবের দৃষ্টিকোণ ও রসের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা দুইটাকে এক করিয়া তুলিবার জন্য মায়ার ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ মর্যাদা ও মূল্য স্থাপন করিলে। মায়ার মূল্যে মায়ার মূল্য। মায়ার মূল্যে ব্রহ্মের মূল্য নিরূপণই 'রস'; আর ব্রহ্মের মূল্যে মায়ার মূল্য নিরূপণই 'ভাব'। তুমি দুইয়ের সমন্বয় স্বীকার করিয়াই ধন্য দার্শনিক, ধন্য বিপ্লবী। তুমি অযাচিত করুণায় আমার দুয়ারে আসিয়াছ। তোমার এই আসার ভিতর আমার 'আমি' ও 'আমার' মুছিয়া যাউক। বিশ্ব তোমার গৃহ, ঘর. আমি সেখানে গৃহিণী হইব, ঘরণী হইব, ওগো বিশ্বাত্মন্। তোমার সুরে সুর মিলাইয়া আমিও বলিব, 'I am a cosmopolitan'। আমি তোমার বিশ্ব-গৃহ গুছাইব, সাজাইব, তোমার আবাসভূমিরূপে গড়িয়া তুলিব। 'মদস্য হৃদয়ং তব তদস্য হৃদয়ং মম যদস্য হৃদয়ং মম তদস্য হৃদয়ং তব'—তোমার আমার মালা বদল হউক। সারাদিনই ঝির ঝির বৃষ্টি। 'রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করে। আলোচনা হয়—আগে পাওয়া, পরে সাধনা। 'যন্মনো ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্'—মনের পিছনেও তিনি, মাঝেও তিনি, সামনেও তিনি। অতিমানস আজ মনের মাঝে অবতীর্ণ, ঘরের প্রতি পরিধানের মাঝে অবতীর্ণ, ঊর্ধ্বগতি আজ নিম্নগতির প্রতি ধাপে ধাপে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ দৃষ্টান্ত আজ চলিবে না—একটি দেওয়ালের ওপারে আনন্দ চলিতেছে টের পাওয়ার পর নই ফেলিয়া এক জন উঠিয়া সেই আনন্দ দেখিয়া লাফাইয়া পড়িল. দ্বিতীয় জনও আনন্দ দেখিয়া লাফাইয়া সেখানে পড়িল। তৃতীয় ব্যক্তি আনন্দোৎসব দেখিয়া বাহিরের লোকদের খবর দিবার জন্য নামিয়া আসিল। একজন লোক-কল্যাণের জন্য ব্রহ্মানন্দ পাইয়াও ফিরিয়া আসেন। এ পার ওপারের মাঝখানে দেওয়াল রহিয়াছে—ইহা আজ অচল। 'এদেশে ওদেশে বহুত অন্তর জানয়ে সকল লোকে। এদেশে ওদেশে মাখামাখি আছে এ কথা কয়ো না কাকে।' ও দেশ এ দেশেরই ideal aspect। মায়াবাদীরা এদেশ ওদেশ পৃথক, ওদেশে যাইবার পরে এদেশে আবার আসিবার কথা বলেন। শ্রীঅরবিন্দও এই দলের মায়াবাদী—তবে শঙ্কর হইতে অনেকখানি জীবনবাদের দিকে অগ্রগামী। ও দেশ আজ এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবতীর্ণ। ইহা খুঁজিয়া বাহির করা, চেনা ও আস্বাদন করাই সাধনা।

২৬শে অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি আসিয়াছিলে মনানে মনানে ভালবাসিতে, আদর করিতে, একাসনে সহ আসনে বসাইতে। পুটুরিয়া যোগিনী মা'র আশ্রমে ভক্তদের নিয়া পিচকারী লইয়া হোলি খেলিয়াছ! তুমি আসিয়াছিলে, অধিকার দিয়া যোগ্য করিয়া লইতে, 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি' মন্ত্রের সার্থকতা শিখাইতে। অধিকার পাইয়া আমাদের মাথা বিগড়াইয়াছিল। পাইলেই যে পাওয়া হয় না, যোগ্য হইয়াই যে পাইতে হয় তাহা তোমার আদরের গর্বে ভুলিয়া গিয়া ছিলাম। কত দুঃখে তুমি খাটে বসিয়াছিলে তাহা আজ বুঝিতেছি। অযোগ্যের দল আমরা কত অপমানই না করিয়াছি। আমাকে যোগ্য করিয়া লও, তোমার সমান আসনে বসিবার, তোমার বুকে থাকিবার মত যোগ্যতা আমার হউক: নিরঞ্জন হইয়া নিরঞ্জনকে পাইতে হয়।

'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—তুমি কি সমানধর্মী করিবার জন্য শত্রু মিত্র সকলের সামনে আসিয়াছ 'এই আমি আসিয়াছি' বলিয়া? হরি বাগদী বলিয়াছিল, 'একবার আসপুনিয়া পাড়ার সাধুকে দেখে নেব'। তুমি আসিয়া বলিলে, 'হরি, এই আমি আসিয়াছি, আমাকে দেখ'। তুমি তো আদর করিয়াছ, আমি কুরিলাম কই? ঠাকুর, ঠাকুর, তোমাকে বুকে রাখিবার মত যোগ্য যেন হই।...কিতীশ আবির স্বষ্টির মূল বলে। দেব অসুর সংগ্রামে ব্রহ্মা অসুর বধের জন্য বজ্র (ছাগ, আবির) প্রস্তুত করেন, সেই ছাগ পুরুষোত্তম চরণে দিতে হয়—কাম-জয় হইল ইহার উদ্দেশ্য। আমি 'নিবৃত্ততর্ষৈঃ' শ্লোকটি হইতে পঞ্চম পদটীর ব্যাখ্যা করি, গোপাল তাপনী হইতে 'যো হ বৈ কামান্ কামেন কাময়তি' এটী ব্যাখ্যা করিয়া ব্রজলীলার তাৎপর্য বলি। নীলরতন-বাবু উপস্থিত ছিলেন।...

২৭শে অক্টোবর

রাধারাণী আমার, তুমি বিনীতা তুমি বিদগ্ধা। সকল বাধা বিপত্তি সকল কলঙ্ক অগ্রাহ্য করিয়া পরিপাক করিয়া কল পদবিক্ষেপে উদ্বেলিত না হইয়া তুমি চলিয়াছ ব্রজের পথ বহিয়া। কি শান্ত সমাহিত বিগ্রহের বিগ্রহ তুমি। মুখে হাসিটী লাগিয়া আছে, কোন ক্লান্তি নাই, অথচ কি ভীষণ দৃঢ় সংকল্প। ঠিক এইরূপ দেখিয়াছি নিত্যগোপাল-জীবনে শান্ত সমাহিত বিগ্রহের রূপ। তুমি সাগর, আমি ক্ষুদ্র তটিনী। আমার বুকের জল নিঃশেষে তোমার বুকে দিয়া দিব, শূন্য হইব। আমার শূন্য বুক তোমার অগাধ জলরাশির অনুপ্রবেশে পূর্ণ হইবে, গঙ্গা সাগর সঙ্গম সিদ্ধ হবে। আমি রিক্ত হইব, তোমার পরিপূর্ণতায় পূর্ণ হইব। আমি শরণাগত—অনুকূল গ্রহণ করিব, প্রতিকূল বর্জন করিব, আপ্তত্বে তোমাকে বরণ করিব, রক্ষা করিবে এই বিশ্বাস রিব, তোমার কর্মে আত্মনিক্ষেপ করিব, তোমার বিশ্বকর্মই আমার কর্ম হইবে, আমি দীন হইব, তুমি থাকিবে দীননাথ। মি আমার, আমি তোমার। সুবোধ মুখার্জী আসে, হাটনের লাইব্রেরী' প্রবন্ধের প্রথমাংশ দিয়ে যায়। উদ্বো-ন লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে সভা নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়া করিবার ন বলি। একখানি 'শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' অমরবাবুকে দিবার জন্য দেই।...নীলু হঠাৎ ৪টার পর কিছু সন্দেশ ও ২টি কমলাসহ উপস্থিত হয়। তাঁহার আসিবার কথা ছিল ৩রা ৪ঠা নভেম্বর।...মঠে প্রথমে পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে 'নিগমবল্লতরোঃ গলিতম্ ফলম্' শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পরে ৩টী যুবক আসিয়া মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তাহাদের কাছে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে', শঙ্কর বুদ্ধ সমন্বয়, Relativity, Quantum theory, Whitehead-এর It is as true to say' ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়।...

২৮শে অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি ছাড়া আমার কি আছে? তুমি আমার হৃদয়ানন্দ, নয়নানন্দ, মদানন্দ, জ্ঞানানন্দ, অয়ি দীনদয়ার্দ্র দয়িত আমার। সকল দেহপ্রাণ মন দিয়া তোমাকে আদর করিব.....। আমার সারা জীবনের সমাধান, বর্তমান বিশ্ব সমস্যার মূর্তিমান সমাধান তুমি। এখন তোমার পাইয়াও সাধ মিটিল না। তোমাকে লইয়া বড় দায়ে ঠেকিয়াছি, আমাকে দায়মুক্ত কর। তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করিবার মত সুযোগ দেও...। তারিণী-বাবু আজও পানিহাটী হইতে আসেন নাই। কি করিয়া যে কাজ হইবে জানি না। আমার প্রাণ দিলেই কি হইবে? ৭টার মধ্যে ফিরি। আজ বি কে পাল আসেন নাই। লবণ আইন অমান্যের সময়কার রহমৎপুর হইতে আমাকে দেওয়া অভিনন্দন প্রতিলা পাঠ করে। আমার সেই দুর্দ্ধর্ষ মূর্তিকে যদি ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া প্রকট করিতে পারি, তবেই বটে ঐগুলি সার্থক হইত। পুরণো প্রতিষ্ঠা রোমন্থন করিয়া লাভ কি? উহা অপদার্থতার পরিচায়ক। আবার কলিকাতাকে নাড়া চাড়া দিতে যদি পারিতাম, তবে কাজ হইত। দেখি ঠাকুর কি করেন। ৮টার পর কার্তিক মাসের (আজ ১২ই কার্তিক) উদ্বোধন' প্রেস হইতে আসে। স্যাপার লাগানো হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত ইহারা কাজ করে। নীলু যদি স্বেচ্ছায় এখানের কাজে যুক্ত হয়, তবেই হইবে। টানাটানি আমি করিব না। সব দিক বিলাইতে হইলে তাহার 'দৃঢ়সংকল্প' দুর্জয় সাহসী হইতে হইবে।

২৯শে অক্টোবর

ঠাকুর···তুমিই আমার 'স্থান,' আমি আমার স্থানে স্থিত হইব। তোমার পাদপদ্মই আমার স্থান।···আমাকে যোগ্য করিয়া তোমার সেবার উপযোগী করিয়া নও। তোমার সমানধর্মী না হইলে তো তোমার সেবা হয় না।··· মঠে প্রকাশানন্দের সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন, সম্বন্ধে কথা হয়— ভাবের দৃষ্টিকোণ ও রসের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য ও সমন্বয়। নিত্যগোপাল দার্শনিকভাবে মায়ার, নামরূপের, বিশ্বের পারমার্থিক মূল্য স্বীকার ও আস্বাদন করিলেন। তিনি 'পূর্ণ', 'নিরাকার', 'অদ্বৈত' শব্দের নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। 'অংশের' পূর্ণত্ব কেহ কি এ যাবৎ প্রকাশিত করিয়াছেন? 'বহু' ও 'সর্ব' শব্দের পার্থক্য আলোচিত হয়। বুদ্ধের অবিদ্যা ও শঙ্করের অবিদ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও নিত্যগোপাল-জীবনে এক। একই ব্রহ্ম বা অবিদ্যার শঙ্কর নিয়াছেন একত্বের দিক, বুদ্ধ নিয়াছেন বহুত্বের দিক। শঙ্করের মতে বহুদর্শন অবিদ্যা, বুদ্ধের মতে একদর্শন অবিদ্যা। নিত্যগোপাল দুই দর্শনের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাই তিনি অবিদ্যাকেও অনন্ত বলিতে পারিলেন। ঠাকুরের দর্শনে ব্রহ্মও সাধ্য নন, মায়াও সাধ্য নন, সাধ্য হইতেছে মায়া-ব্রহ্মের সমন্বয়, মায়া-ব্রহ্মের পরকীয় সম্বন্ধের আস্বাদন। তাই মায়া-মুক্তিই মায়া। মুক্তি নাই। আছে উভয়ের পরকীয় সম্বন্ধের দিব্য রস আস্বাদন। আর ইহার মধ্যে ভুক্তি ও মুক্তি সমন্বিত।

৩০শে অক্টোবর

শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি আসিলে 'রসের' ব্রহ্মমূল্য' প্রদান করিবার জন্য, নামরূপাত্মিকা নিন্দিতা মায়ার ব্রহ্ম-সমকক্ষতা রূপ, স্বাধীন কর্তৃকারূপ বিধান করিবার জন্য। মায়া আজ পরব্রহ্মমহিষী। নাম আজ নামীর জন্য—নাম নামী ও দেহ-দেহী আজ পুরুষোত্তম জীবনে অভেদ। বিশ্ব আজ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। অনির্বচনীয় অদ্বৈত তোমার দর্শন ও জীবন। কে আছে তোমার মত এমন মহান মধুর, এত সুন্দর।...নাম রূপের মান, বিশ্বের মান তুমি ছাড়া আর কে বিধান করিবে? দেহাত্মবাদকে দেহাত্মবাদ রাখিয়া কে এমন করিয়া অধ্যাত্মবাদের রূপ দান করিত তুমি ছাড়া? হেয়া প্রকৃতিকে কে উপাদেয়া রূপে ফুটাইয়া তুলিত তুমি ছাড়া নিত্যগোপাল? তুমি ধন্য, আমরাও ধন্য।···কত আশা করিয়া···কত তপস্যা করিয়া ইহাদের পাইয়াছি। কিসের জন্য? নির্যাতীতা, অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, শোষিতা প্রকৃতির অনিন্দ্য সুন্দর রূপের প্রতিষ্ঠা করিতে। ইহার জন্য কি নয়? কোনও লোভ তো নাই। ৪টার পর সকলেই মঠে যাই। ৪টায় আলোচনা হয়। নীলু উপস্থিত ছিল। 'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলৌ ইচ্ছন্তি সম্ভবম্'—কেন? পরস্পর বিরুদ্ধদের সমন্বয় এই যুগে সম্ভব বলিয়া, বিশ্বেশ্বর হইতেও বিশ্বের মহিমা অধিকতর বলিয়া। 'নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্'—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যোগ ভাবপ্রধান। কলি ভাব রস সমন্বয়প্রধান যুগ। ভাবের দৃষ্টিকোণে ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত, অক্ষর, অনাম, অরূপ প্রভৃতি সত্য; মায়া বিশ্ব, ক্ষর, নাম, রূপ মিথ্যা। রসের দৃষ্টিকোণে মায়া, বিশ্ব, ক্ষর, নাম রূপ সত্য; ব্রহ্ম প্রকৃতি এই দৃষ্টিকোণে মিথ্যা। শঙ্কর, Hegal ভাবুক, বুদ্ধ, চার্বাক দেহাত্মবাদী রসিক। জীবনের এই দুই আস্বাদনই তুল্য সত্য। চাই দুয়ের সমন্বয়। শ্রীনিত্যগোপালই সমন্বয় মূর্তি। ৫০০০ বৎসর পূর্বের শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনিত্যগোপাল। ৪৫০ বৎসর পূর্বের শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীনিত্যগোপাল। আজিকার আলোচনা ভাল হইয়াছে। খুব কাঁদিয়াছি ঠাকুরের সামনে বসিয়া। পরে অফিস ঘরের বারান্দায় আলোচনা হয়। বলি শ্রীনিত্যগোপালকে তো পাইয়াছি, পাই নাই ভাইদের, তারিণীবাবুকে। ভাইদের পাইলে আমি কলিকাতা পাগল করিতে পারিতাম। রেণু দুপুরে রান্না করে। সন্ধ্যার পর সত্যেন বসু আসেন, বীরেনও আসিয়াছিল।

৩১শে অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি উপনিষদের 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম উপৈতি' মন্ত্রকে আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে আসিয়াছিলে। তুমি চাহিয়াছিলে পরম সাম্য নিতে। কিন্তু আমরা তো নিরঞ্জন হইলাম না।···আমাকে চরম বিপ্লব দেও, আমাকে তোমার জীবন ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করিবার মত বল বীর্য দেও। আমি বজ্রের মত ছুটিব। ব্রহ্ম-নৈতিক জীবনে যেমন দুর্দম ছিলাম তেমনটী তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আন্দোলনে করিয়া দেও।···নীলু উপস্থিত

ল। উপাসনায়ও নীলু উপস্থিত ছিল। দুপুরে সে রান্না রে।···সকালে ননীগোপালবাবু (Rtd-Sub Deputy) সেন। তাহার অবস্থা সমাধি-সুরথের মত। স্ত্রী যন্ত্রণা ন, 'মর' 'মর' বাক্যও নাকি বলেন। এইরূপ ঘটনার তর দিয়া ভগবানের ইঙ্গিত কি তাহা দেখিবার সিদ্ধান্ত করতে বলি। সকালে তিনি বাজার হইতে মুড়ি মুড়া কিনিয়া খান। 'Push from without Pull om within', মর্কট বৈরাগ্য না করিস্'—ইত্যাদিও । সংসার ছাড়া বা না-ছাড়া হঠাৎ কিছু না করিতে । ছাড়িলেও তো ছাড়া হয় না। একটা আশ্রয় না য়া বাহিরে আসিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। ৪টার মঠে যাই। 'আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোঃ আরাধনং ॥ তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্'—ইহাই গোপালকে পাইয়াছি, পাই নাই ভাইদের' গত কার এই বাক্যের অর্থ। বিষ্ণুকে না পাইলে ভগবানকে য়া পূর্ণ হয় না। ননীবাবুর কাছে 'ন কাময়ে' শ্লোক া করি। গভর্নমেন্টের পুস্তক পরীক্ষার এক্সপ্রেস চিঠি কাছে আজ আসে। কাল সকালে ৮টা হইতে ১টায় ত হইবে। রেণু যাবে যায়। নীলু ২ বস্ত্রাসহ নী রবিবার আসিবে এইরূপ স্থির হয়।

১লা নভেম্বর

াধারাণী, আত্মনিবেদনময়ী আমার, উন্মাদিনী আমার ক জীবনধারা তুমি আমার—। 'রাধাভাবদ্যুতি হয় না ধনা। সে ভাবের তত্ত্ব আত্মনিবেদন'। তুমি আত্ম-নময়ী—'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মামেতি সমুপাসতে। ং পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্'—হে পার্থ, যে ণ নিজেদের অঙ্গ পর্যন্ত 'আমার' বলিয়া সমগ্রভাবে না করে, তাহাদের চেয়ে নিগূঢ় প্রেমভাজন কেহ । তোমার জীবনে দেহাত্মবাদ ও অধ্যাত্মবাদ সমন্বিত ছে। তোমার কাছে দেহও পরমার্থ সত্য, আত্মধর্ম সব াতে সমন্বিত। তুমি আমার জীবনের অন্তস্তলে তে চাইতেছে, প্রাণবল্লভা আমার। তুমিই নিত্য-রূপে আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছ।···রেণু···শ্রীশ-বাবুর ওখান হইতে টেক্সটবুক কমিটীর Approval দিবার জন্য ৩১ খানা ক্লাশ VI এর বই আনে। বিশ্বনাথ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। নীলু ও জয়ার নিকট পত্র দেওয়া হয় যে, রাসপূর্ণিমার দিন ১০ই নভেম্বর আসিতে হইবে, ৭ই নভেম্বর রবিবার নয়।···জীবনে কি দুর্যোগ ঠেলিয়াই না চলিয়াছি! আমার জীবনে এত রকমের বিভিন্ন স্তরের ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে যাহার সঙ্গে আটকাইয়া না পড়া শুধু নিত্যগোপালের কৃপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে। রাজনীতির জটিল আবর্ত্ত, বরিশালের রাজাবের মেয়েদের মধ্যে চরকা কাটা ভাগবত পাঠ, ঘরের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়া বৃহত্তর জীবন-চেতনার কথা শোনানো, সর্বশেষ ইহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া সঙ্ঘ গঠনের প্রচেষ্টার মধ্যেও তো আগাইয়া চলিয়াছি। এ শুধু তাঁহার কৃপা। নিত্যগোপাল, তুমিই আমার শরণ। আমি শরণাগত। আমার মন বুদ্ধি তোমার হউক। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব—তুমি আমি একপ্রাণ হইয়া চলিব—এই আশীর্ব্বাদ কর। দুইদিন হইল প্রস্রাবের জ্বালার জন্য Specific। ৪ বার খাই। একটু ভাল আছি।···

২রা নভেম্বর

নিত্যগোপাল, সকল দুনিয়া আজ মনের স্তরের লঙ্গর তুলিয়া প্রাণের স্তরের জন্য পাড়ি লাগাইয়াছে। এই প্রাণের স্তরে অগ্রগামী পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, পরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, তাহারও পরে বর্তমান যুগে শ্রীনিত্য-গোপাল। এই প্রাণের স্তরই পরস্পর বিরুদ্ধদের সমন্বয়ের স্তর। ভাব ও রূপের সমন্বয় স্তর, ছোট ও বড়র সমন্বয় স্তর, ক্ষর অক্ষরের, বিশ্ব-বিশ্বাতীতের, মানস অতিমানসের সমন্বয়ের স্তর। আরোহ ও অবরোহ (ascent ও descent) এই মনের পরস্পরবিরোধী দুইটী দৃষ্টিকোণ মাত্র। প্রাণে দুই-ই যুগপৎ—উঠিয়া নামা ও নামিয়া—উঠা দুই-ই যুগপৎ। নামার এক অর্থে উঠা, উঠারই অপরার্ধ নামা। এই মন বুদ্ধি যখন শরণাগতির মধ্যে লীন হয়, নিভিয়া যায়, তখন উঠানামার সমন্বয়-ঘন প্রাণতত্ত্বের আবির্ভাব হয়।··· নবদ্বীপে পূর্ণ বাগচি, গোপেন্দুভূষণ ও গোবিন্দ গোস্বামীর

নিকট আমার নামীয় পত্রগুলি রেণু লেখে। আমি দস্তখত করিয়া দেই। ১২॥ টার পর রেণু রাইটার্স বিল্ডিং, পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী প্রভৃতি বই আনে, পরে যুগান্তর ও আনন্দবাজারে গত রবিবারের সভার বিবরণী নিয়া আসে। আজ অগ্রহায়ণের উজ্জ্বলভারতের আমার প্রবন্ধ 'এক-বিশ্ব রচনা ও তাহার সাধনা ভাবরস সমন্বয়' লেখা ও নকল করা শেষ হয়।···আশুবাবুকে ত্রিকোণেশ্বরে ঠাকুর যেখানে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে স্থান সম্বন্ধে যাবতীয় খবর লইতে বলি ···। খগেনবাবু বলেন—কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রচারের টাকা নাই। আমি উহার মধ্যে নাই। এই তো ঠাকুর তোমার ভক্তদের অবস্থা! আমি একা কত ঠেলাঠেলি করিব? বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। ঝড় বহাইবার মত হৃদয়ে বল দেও।

৩রা নভেম্বর

নিত্যগোপাল, কবে আবার তুমি আসিবে?···দিন তো গেল। আজও তোমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছি। তোমার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য কাঁদিয়া বেড়াইলাম। সহস্র সহস্র নরনারীকে ডাকিলাম। কয় জন আসিল? আমার যে বুকভরা বেদনা। তোমার পাদুকা শিরে বহন করিয়া বেড়াইব। তোমার দর্শন ও জীবনের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব, তোমাময় হইব এই করিও ঠাকুর। সকালে প্রথমে আসে ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত···। কিছু পরেই আসে অনিল সমাজদার ও তাহার সঙ্গে দিলীপ নারায়ণ···।···গত কল্য নীলরতনবাবু প্রভৃতির কাছে খগেনবাবু আমার সম্বন্ধে অভিযোগ করেন—বিবেকানন্দ কত কাজ করিয়াছেন, টাকা আনিয়াছেন, আমি কেবল টাকা চাই, কি করিতেছি ইত্যাদি। আমি বিবেকানন্দ নই, তবু ছোটও ছোটর মত সেবা করে। বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করিয়া লাভ কি? এখানে বিবেকানন্দ যখন নাই, তখন শতবার্ষিকী করিবার প্রয়োজন কি? বিবেকানন্দ আসুন। তবে শতবার্ষিকী হইবে। ঠাকুর, কি করিয়া ইহাদের লইয়া কাজ করিব? আজিকার যুগান্তর আনন্দবাজারে গত রবিবারের সভার বিবরণ বাহির হয়—আনন্দবাজারে ৩৭ লাইন। ঠাকুরের তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার যুগ-চিন্তানায়কত্ব ফুটিয়াছে। আজ খুব ভাল লাগিল—প্রকাশিত হও ঠাকুর! ৮টায় ফিরি। নীলরতনবাবু খগেনবাবুর কথায় দুঃখ পাইয়াছেন। শতবার্ষিকীর টাকা নাই শুনিলে নাকি—প্রভৃতির খুব আনন্দ হয়। এই তো অবস্থা!

৪ঠা নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার চরণপ্রান্তেই আমার স্থান, নিত্যবসতি স্থান 'স্বানম্'। আমি সংসার-বিতাড়িত। আমি তোমার বিশ্ব-প্রকৃতিকে মিথ্যা জ্ঞানে ঘৃণা করি নাই, তাহার স্পর্শ এড়াইয়া দূরে পলাইতে চাহি নাই, বরং সত্যজ্ঞানে সেখানে তোমার আসন রচনা করিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছি। কিন্তু সংসার তো আমাকে স্থান দিল না। না দিবার হেতু হইল—বিশ্বের যে বিশ্বাতীত রূপ আছে, বিশ্ব যে বিশ্বই হয় না বিশ্বাতীতের সঙ্গে, অবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, তাহা তো বিশ্ব না বুঝাইয়া ছাড়িবে না। বিশ্ব সেইজন্য প্রতি জীবকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়, পরে আবার বুকে টানিয়া লয়।···তোমার পদতলে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এক। আমাকে ধন্য কর, আমি তোমার। তুমি আমার অনন্ত দূরে বলিয়া অনন্ত নিকটে। আমি ও আমার দাবী দেশ-কাল আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়। অনন্ত দূরের মাঝে বিশ্বের দাবী স্বীকৃত। আমি দূর হইয়াই তোমার স্ব-নিকট। আজ কথা হইতেছিল—আমি আমার ভাগ্য আমার বন্ধুদের সঙ্গে, সকলের সঙ্গেই মিশাইতে চাহিয়াছি ফাঁক না রাখিয়া। তাই সকলকে তাহাদের পরিধি পর্যন্ত পাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছি। প্রতিভার বাবার বাড়ী গিয়াছি, রেণু সুধাদের বাড়ী গিয়াছি, তাহাদের পরিবারের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিয়াছি। শুধু তাহাদের পাইবার জন্যই তো? সত্য-ব্রতকে পাইবার জন্য তাহার ব্যবসায়ের খাতাপত্র লিখিয়াছি রাত্রি ১২টা পর্যন্ত জাগিয়া। মঠে ৪টার পর যাই। আজ···এর কাছে আমার বৃন্দাবন যাওয়ার কথা, ব্যাণ্ডেল স্টেশনে মাথা হইতে রক্তপাতের কথা, ঠাকুরের ষড়ভুজ হওয়া ও কৃষ্ণ মূর্তিতে আকর্ষণ করার কথা,...বরিশালের বারনারীদের মধ্যে ভাগবত পাঠের কথা বলি প্রায় ১ঘণ্টা। ৮টায় ফিরি।

৫ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার থাকাতেই আমার থাকা, তোমার 'অস্তি'ই আমার 'অস্তি', তোমার 'ভাতি'ই আমার 'ভাতি' তোমার আনন্দই আমার আনন্দ। আমার জীবনের কর্মের পরিধি, জ্ঞানের পরিধি, আনন্দের যতটা পরিধি, তুমি ঠিক তাহা coincide করিয়া আছ, আমি যতদূর যাই, তুমি সঙ্গে সঙ্গে ততদূর যাও। আমার জীবনের মাঝে তো তোমার এই খেলা দেখিতেছি। আমার সঙ্গে যাহারা ছুটিয়াছিলেন—স্ত্রীপুত্রকন্যা, সুরেশ গুপ্ত, সতীশদাস···রমেন্দ্র উমেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি, এদিকে প্রতিভা কুসুম, রেণু সুধা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে যতদূর পারিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছি। আমি সকলের সঙ্গেই ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত, দ্রব্যাদ্বৈত, সাধনা করিয়া এক হইতে চাহিয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধও ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈতের—তাঁহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল। তাহে দোষ নত করি স দোষ নত হইল। তুমি আমার মত হও, আমাকে তোমার মত করিয়া লও! আসন করি। উপরে থাকিতেই ইতেন গুহ আসে আশ্বিনীকুমার স্মৃতিসভার ভার উদ্বোধন করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়া যায়। আজ জীবনে প্রথম 'স্বর্ণসিন্দুর' খাই পাথরকুচি পাতার রস সহযোগে। বিনা ওষুধেই একরূপ জীবন চলিয়াছে। আজ কত রকম ওষুধের প্রয়োজন। ৫টার পর গীতাভবনে যাই। আচার্য যদুনাথ সরকার সভাপতি। আমি উদ্বোধন করি 'ভক্তানাং ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ' ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়া। অশ্বিনী কুমার মোক্ষক্ষেত্রে ও ভোগক্ষেত্রে সমভাবে বিচরণ করিতেন। তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল 'এদেশে ওদেশে মাখামাখি আছে'—এর বাণী। ভোগ মোক্ষ যাহাদের করতলগত, তাঁহারাই হন স্রষ্টা। তাঁহার Little Brothers of the Poor, তাঁহার ত্যাগ প্রেম পবিত্রতার মধ্য সকলই সৃষ্টিময়। তাঁহার জীবনে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি এক হইয়া গিয়াছিল। দুর্গামোহনবাবু, কল্যাণকুমার, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতিও আসেন। শেষে সভাপতির বক্তৃতা হয়। তারিণীবাবু নবদ্বীপ হইতে চিঠি দিয়াছেন। পূর্ণবাবু, গোপেন্দ্র, গোবিন্দ গোঁসাই-এর সঙ্গে আমার চিঠি দিয়া দেখা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজী আছেন। পূর্ণবাবু সভাপতি হইবে না। সভা ২১শে, ২২শে, ২৩শে হইবে। গীতাভবন হইতে ৭॥০টার পর মঠে যাই। ৮॥০টার পর ফিরি।···

৬ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার 'অমনা ভব', 'মদ্যাজী-ভব', 'মর্যাপিত মনোবুদ্ধি' আমার জীবনে সার্থক হউক। আমার অত্যন্ত মনোলয়, অত্যন্ত বুদ্ধিলয় হউক।···আমি তোমার বুদ্ধি দিয়া সকল বুঝিব। আমার বুক তোমার বুকের মাঝে নির্বাণ লাভ করুক। তোমার বুক দিয়া আমাকে, তোমাকে, তোমার বিশ্বকে বুঝিতে দাও। তোমার ভাষায় আমি কথা কহিব, আমাকে নিকটে টানিয়া লও, তোমার বুকের মাঝে টানিয়া লও। আমার 'আমি'কে তোমার 'আমি'র মাঝে মুছিয়া ফেল, এক করিয়া লও। তোমার আমার বিচ্ছেদের জ্বালা ঘুচাইয়া ফেল। আমার সত্তাচৈতন্য তোমার সত্তাচৈতন্যের মাঝে টানিয়া লও, আমাকে অপৃথক কর। আমি আমাকে দেখিতে তোমাকে দেখিব, আমাকে পাইতে তোমাকে পাইব এমন করিয়া 'এক' করিয়া লও। আমি আর নিজের ভার, ব্যবধান সহিতে পারিব না।···আজিকার আনন্দবাজারে রেণুর 'ঘরে-বাইরে' বইয়ের সমালোচনা বাহির হয়। রেণুর সমালোচনা 'রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার'—ইহা লেখা হইয়াছে। বেশ সমালোচনা হইয়াছে। যাহা নিত্যগোপাল বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া গেলাম। তাহা মানুষ একদিন নিবেই। না নিয়া উপায় নাই। আগামী বুধবারের সভার কথা পত্রিকাগুলিতে ছাপাইবার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিষয় 'শ্রীনিত্যগোপালের দৃষ্টিতে রাসলীলার ব্যাখ্যা'। ক্ষিতীশ দক্ষিণেশ্বর গিয়াছে। তারিণীবাবু আসিয়াছেন। অবধূত আশ্রম, পোড়ামাতলা ও দিয়াড়াপাড়া মঠে সভার কথা হইয়াছে। গোবিন্দ গোস্বামী মাইক আলো প্রভৃতির ভার নিয়াছে। রাধাদাস মোদক নবদ্বীপে নাই।

ক্রমশঃ

আমাদের 'চিনুদা'-র অকাল প্রয়াণ

সম্পাদিকা

[বর্ত্তমান সংখ্যা ৪ ফর্মা ছাপিবার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে]

আমাদের 'চিনুদা'—শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস—আর এই আলোবাতাসের জগতে নাই—গত ১৫ই মে ১৯৭১—৩১শে বৈশাখ ১৩৭৮—শনিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি সাড়ে বারোটায় চিনুদা তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের নিকট চলিয়া গিয়াছেন। বড় অকস্মাৎ বড় অকালে আমাদের চিনুদার এই নিষ্ঠুর প্রয়াণ ঘটিল। মাত্র উনিশ দিনের সাধারণ অসুস্থতায় তাঁহার মত অত্যন্ত দুর্বল মানুষের প্রতি হাসপাতালের হৃদয়হীন অব্যবস্থা তাঁহার এই অকাল পরিণতি টানিয়া আনিল। আমরা হতবাক হইয়া শুধু যাওয়া আসাই করিলাম, আমাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা কোন সুফল প্রদান করিতে পারিল না। আরও কথা এই—আমাদের বিবেচনামত কিছু করিবার কোন অধিকার আমাদের ছিল না। তাই যাহা উচিত বুঝিয়াছিলাম, তাহাও কিছু করিতে পারিলাম না। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। যিনি বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন, বাঁচিয়া থাকিয়া দেশের দশের তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের আরব্ধ কর্ম আগাইয়া নিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার বাঁচা হইল না। জীবনে যিনি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করিতে দারুণ অপছন্দ করিতেন, হাসপাতালের অব্যবস্থা দুর্ব্যবস্থা যিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জানিয়া হাসপাতাল হইতে শত হস্ত দূরে থাকিতে ভালবাসিতেন, আজ ঘটনা-চক্রে তাঁহাকেই অকালে অতর্কিতে মুখ্যতঃ হাসপাতালের গাফিলতির বলি হইতে হইল। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। চিনুদা বার বার হাসপাতালে শুইয়া শুইয়াই হাসপাতাল সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন, আজ তাই চিনুদার অন্তরাত্মার নিকট তাঁহার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিতেছি না—'রেণু, যাহা সাবধানতার জন্য বলিয়াছিলাম, আমার জীবনে তাহাই ঘটিল। রেণু, তোমরা আমাকে বাঁচাইতে পারিলে না'। চিনুদার যদি কোন কঠিন ব্যাধি হইয়া দেহান্ত ঘটিত, আমরা যদি তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রাণপণ প্রয়াসী না হইতাম, তাহা হইলে দুঃখ করিবার অবকাশ থাকিত না। কিন্তু এ যে অনেকখানি ভুলের মাশুলই দিতে হইল! প্রথমে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, সঙ্গে শ্বাসকষ্টও ছিল, কফ ছিল। অষ্টম দিন হইতে এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নবম দিনেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি ভুল বলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। হাসপাতালে যখন পৌঁছিলেন তখন তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, শ্বাসকষ্টও তেমন নাই, অত্যন্ত দুর্বলতা। সাতদিন শুধু হরলিক্স খাওয়াইয়া রাখিয়া হাসপাতাল এক্সরে, ইসিজি রক্ত পরীক্ষাদি করিয়া বলিল চিনুদার কোন কঠিন রোগ নাই—তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে। কিন্তু চিনুদা তখন অত্যন্ত দুর্বল—কথা বলিতে কষ্ট বোধ করেন। গত চৌদ্দ দিন তো তাঁর খাদ্য ছিল সামান্য মাত্র হরলিক্স! তাঁহার পেটের উর্দ্ধগতি বায়ুর কষ্টটা তাঁহার দীর্ঘদিনের—ভাবিয়া চিন্তিয়া হাসপাতাল বলিল তাঁহার পেট এক্সরে করিয়া দেখা হইবে। বুধবার এই কথার পরে তাঁহাকে ভাত ও ছানা দিতে বলায় বৃহস্পতি ও শুক্রবার সামান্য পরিমাণে উহা দেওয়া হয়। শুক্রবার খুশি হইয়াই তিনি ভাত খাইয়াছিলেন। শনিবার তাঁহার পেট এক্সরে করিবে বলিয়া শুক্রবার তাঁহার প্রতি এ্যানিমা (পায়খানার ওষুধ) প্রয়োগ করা হইল। ইহাতে বার চারেক পায়খানা করার পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন বিকেল ৪টা নাগাদ। তখন অক্সিজেন ইত্যাদি দিয়া রাখা হইল। শনিবার

পুর আড়াইটায় হার্ট স্পেশালিষ্ট দেখান হইল, কার্ডিওলজি
ভাগে রোগীকে স্থানান্তরিত করা হইল, ডাক্তার
তকগুলি ইনজেকশন ওষুধ লিখিয়া দিতে তাহা তখনই
নিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু ডাক্তার খাতায় সই করিয়া
ন নাই বলিয়া সে ঔষুধাদি প্রয়োগ করা হইল না।
নিবার রাত ৮৷৷ টায় ডাক্তার আসিয়া বলিল, আর কিছু
রার নাই—তখনও অন্ত ইনজেকশান কিনাইয়া গোটা
রি ব্যবস্থায় করিল বটে—কিন্তু আর কিছু করার অবস্থা
ল না। শুক্রবার বিকেল ৪টা নাগাদ অতিরিক্ত দুর্বলতায়
রখানা করিয়া যিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন—কোনো
স্ব আছে বা হইয়াছে বলিয়াও হাসপাতাল বলিল না,
হাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে শনিবার রাত্রি ৮৷৷ টার আগে
ন বিশেষ কিছুই করা হইল না। আমরাও করাইতে
রিলাম না। ২৮ ঘণ্টার উপরে অজ্ঞান থাকিয়া ঐ ক্ষীণশক্তি
ষেটি বিনা ওষুধে আর কি ভাবে সুস্থ হইতে পারেন? ২৮
1 পরে ওষুধ ইনজেকশান দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করা
না—ইহা তো সকলেই বুঝি। ঐ অজ্ঞান অবস্থাতেই
র ১২।টায় চিন্ময়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন!
হইতেছে দুর্বল শরীরে খাদ্যের স্বল্পতা ও হাসপাতালীয়
হীন অব্যবস্থার হাতেই চিন্ময়া বলি হইলেন—অথচ
পাতালে এই বিপদ সম্বন্ধে তিনি আমাদের কতই
ধান করিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল তাঁহার উপযুক্ত
পড়িতেছে না, তথাপি করিতে কিছুই পারিলাম না।
ায় আমাদের চোখের উপর এইভাবে তাঁহার মৃত্যু
আমাদের সীমাহীন বেদনা দিতেছে। তাঁহার তো
কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া একবারও হাসপাতাল
না, তবু তো তাঁহাকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম
-তাই তো নিজেদিগকে অপরাধী মনে করিতেছি।
নিজেদের অক্ষমতার বোঝা মাথা পাতিয়া লইয়া
ছি যে এমনিভাবে ভারতবর্ষের—বুঝি বা বিশেষ
া পশ্চিম বাংলার—হাসপাতালগুলিতে প্রতিদিন অসহায়
কত শত রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই
হৃদয়হীনতা, এই যে কর্তব্য কর্মে সীমাহীন গাফিলতি,
করা—মানুষের প্রাণের মূল্য যাহাদের কাছে একেবারেই
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—জাতির এই যে রোগ এই রোগ
দূরীকরণের প্রচেষ্টাই আজ মনে হয় আমাদের প্রধান কাজ।
ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মানুষ কোন্ অতলে নামিয়া
গিয়াছে! পারস্পরিক হানাহানির পথই যাহাদের জীবনে
বাঁচিয়া থাকিবার মন্ত্র, অপরকে বাঁচাইয়া রাখাটাকে যাহারা
এত কম মূল্য দেয়, তাহারা তো মনুষ্যত্বের উপর মানুষের
সভ্যতার ইমারত দাঁড় করায় নাই। আমাদের পরমাত্মীয়ের
এই মৃত্যু জাতির এই রোগ দূরীকরণের প্রচেষ্টাতেই
আমাদিগকে আরও অধিকতরভাবে নিয়োজিত করিতেছে!

চিন্ময়া আর দেহে নাই—তাঁহার এই না-থাকা যে
নরনারায়ণ আশ্রমের কত বড় দুর্যোগ—তাহা আশ্রম
সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত যাহারা জানেন, তাঁহারাই
বুঝিতেছেন। চিন্ময়ার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
একটী নূতন যুগের,—একটী আগতপ্রায় যুগের—জীবন-
দর্শন—একটী মুক্ত স্বচ্ছ সামগ্রিক জীবনদর্শন—লইয়া
আসিয়াছিলেন। বর্তমানের আবহাওয়ায় এই জীবন-
দর্শনেরই আকৃতি—কিন্তু তাহাকে যেরূপে যেভাবে
প্রস্থাপন করিলে মানুষের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেই
প্রস্থাপনের লোকের বড় অভাব। মানুষ এক বিচার
বিবেচনাহীন, মনুষ্যজাতীয়বিরোধী পারস্পরিক
অভিভবের, সংঘাতের তথা ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।
শ্রীনিত্যগোপাল পরস্পর-বিপরীতের সমন্বয় দর্শনের মধ্য
দিয়া তত্ত্বগতভাবে মানুষের সামগ্রিক জীবন লইয়া বাঁচিবার
পথের কথা সর্ব মানুষের সামনে প্রস্থাপন করিতে
চাহিতেছেন। যিনি এই সর্বসমন্বয়ের সামগ্রিক জীবন-
দর্শনকে নিজ জীবনে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে
মানুষের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাকে
অকালে এইভাবে সরাইয়া লইবার কি প্রয়োজন বিধাতা
পুরুষের থাকিতে পারে, তাহা তিনিই বুঝিবেন, তাহা
বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। মনে পড়ে, বিশ বৎসর
আগে আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের
জামাতা একদিন অত্যন্ত অল্প বয়সে অতর্কিতে আততায়ীর

হইয়াও বলিয়াছিলেন, 'শ্রীভগবান একটী কাণাকড়িও কাহারও নেন না সেখানে একটী মোহর না রাখিয়া'। চিনুদাকে সরাইয়া লইয়া কোন্ মোহর ভগবান রাখিলেন বা রাখিবেন তাহা আমরা দেখিতে দূরের কথা ভাবিতেও পারিতেছি না। কিন্তু বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কথাই তো আর আমরা জানি না বা বুঝিও না—তাই বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিব যে এতবড় দুর্যোগেরও আবার কল্যাণের দিক আছে—এ মৃত্যু নূতন কিছুর জন্মদান করিবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেবলই মনে হয় চিনুদার এ মৃত্যু ঠেকাইতে আমরা আর কি করিতে পারিতাম? আমাদের দিক হইতে কি করা হইল না? আমাদের কোন্ ত্রুটির ফাঁক দিয়া মরণ আসিতে পারিল?

—এ জিজ্ঞাসার, এ আর্তির উত্তর নাই। বিশ্ব এই জন্যই ভীষণ সুন্দর, এই জন্যই তাহার রস কোনদিন ফুরাইয়া গেল না!

চিনুদা নাই। নাই কেন? তাঁহার দেহ নাই—কিন্তু মহৎ-প্রাণ তিনি—তাঁহার সঙ্গে আদর্শ ও কর্মগত যে একাত্মতা ছিল সেই একাত্মতার মধ্যেই তো তিনি আছেন, চিরদিন থাকিবেন। একদিকে তাঁহার মহৎপ্রাণ বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে, আর একদিকে তাহা তাঁহার আদর্শ ও কর্মের মধ্যে চির অম্লান হইয়া রহিয়া গিয়াছে। চিনুদা নাই ইহা যেমন বলিতে পারিব না, তেমনি তাঁহার দৈহিক অনুপস্থিতিও বেদনা দিতেছে প্রচুর। তবু তিনি আছেন, তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদর্শ ও কর্মের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবন দান করিতেছেন।

চিনুদার জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই ১০।১২ বৎসর বয়স হইতেই নিজের ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কোন মাথাব্যথা ছিল না, কে কোথায় অসুস্থ, কার কি প্রয়োজন এই করিয়াই তাঁহার কৈশোর কাটিয়াছে, যৌবন হইতেই দেশের কাজে নিজেকে সর্বতোভাবে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও বিনা পড়াশুনায় প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার আর পড়াশুনা হইল না। এই পড়াশুনা না করার জন্য পিতার কাছে চিনুদাকে বহু তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে—কিন্তু কিছুতেই পাশ করা বিদ্যালাভে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশের কারাগারে যেমন কয়েকবারই তিনি বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তেমনি বাহিরেও ধরা না পড়িবার জন্য নানাভাবে বার বার আত্মগোপন করিবার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। দুই দুইবার তিনি নিজেকে পাগল প্রমাণিত করিয়া পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া তাঁহার জীবন-তন্ত্রী রহিয়া আসিয়াছিল। স্বাধীনোত্তর কালে বাঙ্গালা বিভাগের ফলে অধিক লাঞ্ছনা যখন চরমে উঠিল তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে একটি চাকুরী পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা বিভাগের পরিণতিতে অগণিত বাস্তু-হারা যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে ভিড়িতে করিতেছিল, তখন কয়েকমাস সেখানে তাহাদের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে এমনও হইয়াছে যে দিনের পর দিন তিনি রাত্রিতেও বাড়ীতে যান নাই, শিয়ালদহ ষ্টেশনের বেঞ্চিতেই সামান্য বিশ্রাম করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। একজন বন্ধুর পতিত জমির অংশ পরিষ্কার করিয়া চিনুদা কয়েক বৎসর নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে লাঙ্গল চাষও করিয়া কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্টির আনন্দ আস্বাদন করিয়াছিলেন।

ইহার পরই তিনি চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে জীবন ও জগতের নূতন মূল্যবোধের দার্শনিক দিকটী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহাকে দীক্ষাদিনে নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি—পুরাণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বোঝেকেনা আর চলিবে না—এই কবিতা শুনাইয়া নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি নিজের সমস্ত শক্তি ও সম্বলকে ঐ চাকুরী করার ফাঁকে এই নূতন যুগের জীবন-দর্শনকে নিজ জীবনে আয়ত্ত ও মানুষের নিকট উপস্থিত করিবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

তবে একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনকালীন জেল ও জেলের বাহিরের লাঞ্ছনা, অপর দিকে তৎপরবর্তী কালে

সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে বাঁচিয়া থাকার প্রচেষ্টা—সে বাঁচিয়া থাকাও আবার ব্যক্তিগত একক বাঁচিয়া থাকা নয়—এই উভয়ের ফলে এবং সর্বোপরি নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করার ইচ্ছা ও জ্ঞানের অভাবে চিনুদার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। স্নায়বিক দুর্বলতা তাঁহাকে মাঝে মাঝে একেবারে কাজের বাহিরে আনিয়া দিত। চিরকাল তিনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করিতেন এবং ঐ চিকিৎসা-তেই চালাইয়া যাইতেছিলেন। চলিয়া যাইবার সময় পাছে হোমিওপ্যাথিককে শত্রু করিয়া যরিয়া রাখিলে ভুল হয় এইজন্য এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন—কিন্তু শ্রীভগবানের কি অদ্ভুত বিধানে এ্যালোপ্যাথিকের তথা হাসপাতালের হৃদয়হীন পাশ্চিলতিতেই তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইল।

আমাদের 'চিনুদা'র ছিল কুসংস্কার বা অর্থহীন সংস্কারহীন একটি বিপ্লবী মন। তাই একদিকে যেমন তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তথা শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দের সর্ব সমন্বয়ের সামগ্রিক জীবনবাদের মুক্ত স্বচ্ছ হৃদয়ধর্মী মানসিক-তাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উত্তরসাধক মানববাদী স্বদেশ-বন্ধুদের নবমানববাদ প্রস্তাবিত বর্তমান যুগোপযোগী অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভিত্তিক সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রকেও সাদরে বরণ করিয়া শেষ কয়দিন উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণ ভরিয়া আনন্দের সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন। অথচ দেহ যে তাঁহার কত দুর্বল তাহা বুঝিতে পারিলেও সারাইবার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা তিনিও করেন নাই, আমরাও তিনি ঠিক কতখানি দুর্বল তাহা অনুধাবন করিতে পারি নাই। আমরা যতটা ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, বুঝিলাম তাহা পর্যাপ্ত হয় নাই। তাই বড় অকালে আমাদিগকেবড় অসহায় করিয়া এত কাজের জন্য দিনগুলির মাঝখান দিয়া তিনি চলিয়া পড়িলেন তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের কোলে।

চিনুদার আরও কতকগুলি গুণ সকলকে আকৃষ্ট করিয়া-ছিল। তিনি অতি প্রাণবান মানুষ ছিলেন, তাঁহার সুমিষ্ট হাসিপূর্ণ ব্যবহার সকলকে তৃপ্তি দিত। আমরা যতদিন দেখিয়াছি তাঁহার কথায় ও আচরণে কোথাও গরমিল পাই নাই। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীসুনীতি সান্যাল তাঁহার পূর্বেই তাঁহার গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম বাল্যকাল হইতেই জীবনে একটি মিথ্যাচরণ করিতেও তিনি তাঁহার দাদাকে দেখেন নাই। হাতের পাঁচ রাখিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, মনে একরকম মুখে আর এক রকম করিয়া চিনুদা কাজ করিতেও পারিতেন না, ব্যবহার করিতেও পারিতেন না। এই কয়দিন আগে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছিলেন—আমি নিজেকে ষোল আনা দিয়া মানুষের নিকট হইতে ষোল আনা চাহিয়া থাকি—আধাআধি ভাগাভাগি পারিয়া উঠি না। যেমন তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট, তেমনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবের নিকট অহংকারশূন্য এই মানুষটীর স্বভাব তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়াছিল।

চিনুদা নাই, চিনুদা আছেন—শ্রীনিত্যগোপালের সকল আদর্শ সকল কর্মের মধ্যেই তিনি জড়াইয়া ওতপ্রোত হইয়া আছেন। আশ্রমের যে সকল কাজ তিনি করিতেন, এখনও যেন তিনিই করিতেছেন—আমাদের অন্তরের প্রীতির মধ্যে যে তিনি আছেন। চিরদিন তিনি থাকুন—শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দকে ঘিরিয়া, নয়নারাম আশ্রমকে ঘিরিয়া তিনি থাকুন।

চিনুদার সংসার-জীবনের যাহারা আজ গভীর বেদনা পাইতেছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সকলের বেদনা যোগ করিয়া দিলাম—যোগ করিয়া দিলাম আমাদের গভীর শ্রদ্ধা প্রীতি। উপনিষৎ বলিয়াছেন 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি……—সকলেই আনন্দ হইতে জাত, আনন্দের মধ্যেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, আনন্দের মধ্যেই প্রয়াণ করে। চিনুদা তাহাই ছিলেন—তাঁহার সৎ স্বভাব আনন্দপূর্ণ স্বভাবই প্রমাণ করে তিনি আনন্দ হইতে জাত হইয়া-ছিলেন, সারা জীবন তিনি আনন্দের মধ্যেই জীবিত ছিলেন—ইহা তাঁহাকে যাহারা জানেন তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন—ঘরে চাল নাই—দেশের কাজের সহযোগীদের লইয়া বেলা শেষে বাড়ী আসিয়াছেন—চাল নাই শুনিয়া

হাসিয়া বলেন—কড়াই ভর্তি বালি জ্বাল দিয়া দাও—সকলে তাহাই পাইয়া থাকিব! আর আনন্দের মধ্যেই তিনি প্রয়াণ করিয়াছেন। কেননা তিনি যে জ্ঞানানন্দময় ছিলেন—শ্রীনিত্যগোপালজ্ঞানানন্দের শিষ্য তিনি আনন্দের মধ্যেই যাত্রা করিয়াছেন, জ্ঞানানন্দের মধ্যেই লীন হইয়াছেন।

বিগত ২১শে মে শুক্রবার নরনারায়ণ আশ্রম নিভৃতে নীরবে চিনুদার প্রয়াণের ষষ্ঠদিনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-চরণে তাঁহাকে আহুতি দিয়াছে। আর পরবর্তী রবিবার ২৩শে মে বহু স্বজনদের সঙ্গে একত্র হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছে, সকলের শ্রদ্ধাপ্রীতি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছে, আনন্দের মধ্যেই তাঁহাকে আগাইয়া দিয়াছে। সেদিন প্রায় দেড়শত জন প্রসাদ পাইয়াছেন।

'উজ্জীবনভারত' পত্রিকায় চিনুদার (শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস নামে) গত কয় বৎসর কিছু কিছু লেখা বাহির হইয়াছে। তাঁহার চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ ছিল, পুরুষোত্তমতত্ত্বে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল, ভাষার উপরও তাঁহার মোটামুটি দখল ছিল। তাঁহার রচনা পড়িয়া অনেকেই খুব তৃপ্তি লাভ করিতেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার নরনারায়ণ আশ্রমে প্রতি রবিবারে মুখ্যতঃ গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার খুব চিন্তা ছিল তাঁহার চলিয়া যাইবার পর কে এই গীতা পাঠ করিবে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দও অতর্কিতে চলিয়া গেলেন আজ হইতে ১৩ বৎসর আগে। চিনুদাকে বলিলাম, এখন আপনাকেই পাঠ করিতে হইবে; অন্তরে ভীত হইলেও তিনি পিছপা হইলেন না। কোনদিন তাঁহার গীতা পাঠ করা তো নয়ই, নিয়মিত বক্তৃতা দিবারও অভ্যাস ছিল না—অথচ তাঁহার ভিতরে ছিল একটী বিপ্লবী মন—কোন কিছুতেই না পিছপা হইবার নয়—যে কাজ ঘটনাচক্রে ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে—তাহাকে সাহসের সঙ্গে সমাধান করিতেই হইবে। কিশোর বয়সেও তাঁহার এই স্বভাব ছিল। আর ছিল তাঁহার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সঙ্গে সঙ্গে একটী আত্মনিবেদনময় ভক্ত প্রাণ। তাই চিনুদা সাহসের সঙ্গে আরম্ভ করিলেন। চাকুরীস্থল কল্যাণী যাইবার ট্রেনে বসিয়া তিনি গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—ইহা ছাড়া সময় ছিল না। প্রতি রবিবারে পাঠ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত চালাইয়া গেলেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের গীতা ও অন্যান্য রচনাও পাঠ করিতেন। মোটামুটি ভালই বুঝাইতেন। লিখিবার অভ্যাসও চিনুদার কোনকালে ছিল না। আমি বলিলাম, আপনি উজ্জীবন-ভারত পত্রিকায় কিছু লিখুন, অন্ততঃ গীতা সম্বন্ধে লিখুন। তিনি আরম্ভ করিলেন—বেশ ভাল হইত। সময় ও স্বাস্থ্যহীনতাজনিত শক্তির স্বল্পতায় যতটা আকাঙ্ক্ষা করিতেন তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। যাইহোক—তাঁহার পুরুষোত্তম-যাত্রা আনন্দময় গতি লাভ করিয়াছে—ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। জয় শ্রীনিত্য-গোপাল, জয় শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ।

দেহস্থ আত্মার দেহ ত্যাগ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন না। যেরূপ আমি এক গৃহ পরিত্যাগে অন্য গৃহে গমন করিলে আমি যাহা তাহাই থাকি, তদ্রূপ আত্মা এক দেহ ত্যাগে অপর দেহাবলম্বী হইলেও তিনি যাহা, তাহাই থাকেন।

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

আমার নিত্যকালের দাদা

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

আমার দাদা (আর সকলের চিনুদা) আজ আর নেই। আমার সেই 'দাদারে' এই প্রিয় ডাক আর কোনদিন ডাকতে পারব না। কেমন করে যেন ঠাকুর তাঁকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। আজকে শুধু ঠাকুরকে বলতে ইচ্ছে করে আমার দাদার মত এই সুন্দর ফুলটি তুমি কেনই বা এমন করে ফোটালে, আমাদের ত পাঁচজনকে ঘিরে যে ফুল সকলকে আনন্দ দিচ্ছিল, দিচ্ছিল অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা—তাকে তোমার এতই তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নেবার কেনই বা দরকার হল ?

একই মাতৃক্রোড়ে পিঠাপিঠি ভাইবোন আমি ও দাদা মেছিলাম। আজ দাদাবিহীন শূন্য হৃদয়ে কত কথাই মনে পড়ছে! শিশুকাল থেকে হতে না হতেই সুস্বাস্থ্যের ১২।১৩ বছর বয়স থেকেই দাদাকে দেখেছি দুঃখের দুঃখ কষ্ট শুনলে পাগল হয়ে যেত—ছুটে যেত যার কতটুকু সাহায্য করবে। কত কলেরার রোগী—বসন্তের রোগীর সেবা দিনরাত করেছে ঐটুকু বয়স থেকেই। কার বাড়ীতে ওষুধ আনার লোক নেই, পথ্য দেবার ব্যবস্থা নেই, শুশ্রূষা করার লোক নেই, তার চিনু সেখানে হাজির। পড়াশুনা হয় না বলে বাবার কত তিরস্কার—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশের শাসনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেটি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত সৈনিক দলের চিনু আরও যেন বেশী করে গর্জে উঠল। ১৪ বছর থেকে ৩৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন কারাগারে বন কাটতে লাগল। কতবার অন্তরীণ, কতবার পালিয়ে যা, পাগল সেজে পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া, বার বেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া এই ছিল তাঁর প্রথম যনের ইতিহাস। যে কটা দিন জেলের বাইরে থাকত, কোথায় কার অসুবিধা তা দূর করবার জন্য তাঁর এতটুকু আলস্য ছিল না। মনে পড়ে একটি ঘটনা—আমাদে টাঙ্গাইলে সেবার ভীষণ বন্যা—সমস্ত গ্রাম শহর জলমগ্ন গ্রামের বস্তুহারা শহরের নানা জায়গায় স্থান নিয়ে মানুষে খুবই ক্ষতি করছে। এই অবস্থায় একদিন রাত প্রায় দুটে নাগাদ বহুদূর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। দাদার ঘুম ভেঙ্গে গেছে কোথা থেকে ওই কান্নার শব্দ—ঐ অত রাত্রে কে বা বিপদে পড়েছে এই মনে হয়ে অস্থির হয়ে উঠল। সেই কান্না লক্ষ্য করে প্রায় ২।১ মাইল মত দূরত্বে সাঁতার দিয়ে রওনা হল—সেখানে গিয়ে দেখে এক বিধবা মহিলার একটি মাত্র পুত্র টাইফয়েড জ্বর ছেড়ে গিয়ে collapse করছে। সেখান থেকে ভেলা নিয়ে দাদা ডাক্তার ডেকে আনে আবার বাড়ী ফিরে আসে মাকে বালি জাল দিয়ে দিতে বলে—আবার সেই পথ্য নিয়ে রোগীকে খাইয়ে তাকে চাঙ্গা করে। এই রকম ছিল তাঁর ছেলেবেলার জীবন-চর্যা।

পাকিস্থান হয়ে গেল, সপরিবারে চলে এল দক্ষিণেশ্বরে চাকুরী নেই—কত দারিদ্রের ভেতর দিয়ে জীবন কাটে কিন্তু মানুষের সেবায় তার এতটুকু ত্রুটী নেই। শিয়ালদ ষ্টেশনে আর্ত মানুষের ভীড়। দাদা স্বেচ্ছাসেবকের কাজে নেমে পড়ল। রাতে বাড়ী ফেরবার সময় ২ জন ৩ জন লোক তার সাথে থাকেই। প্রায় ২।৩ মাস শিয়ালদ প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে কাটিয়েছে। বাড়ীতে কোনদিন চাল নেই বাক্সে টাকা নেই। সকলকে খাওয়াব কী—উত্তরে বলত বালি জাল দিয়ে সকলে মিলে খাব। কিছুদিন বাদে চাকুরী পেল। যে মাইনে পায় তার অর্ধেক দুস্থের সেবায় ব্যয় হয়। কার সংসার চলে না, কার বাবার শ্রাদ্ধ হয় না, কার monthly ticket-এর পয়সা হয় না—দাদা

কলার দারিদ্র্যের কষ্ট, নিজেরও উপযুক্ত খাদ্য নেই, পরণে বস্ত্র নেই।...এত কষ্টেও কোনদিন তার মুখের হাসি মলিন হতে দেখিনি।

এইভাবে চলবার পথে পেল স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের স্পর্শ। জীবনের গতি আরও বৃহত্তর সুন্দরতর পথে এগিয়ে নেবার সারথি পেল। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন-সর্বস্ব পুরুষোত্তমানন্দের দাদা আমার পুরুষোত্তম-সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবার সংকল্প নিয়ে নতুন যাত্রা পথে পা বাড়াল। কিন্তু সারা জীবনের কারাবাস, অনিয়ম ইত্যাদিতে দেহে নানা রোগের বীজ প্রকাশ হতে থাকল। ধীরে ধীরে সেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা সুন্দর, নিখুঁত দেহখানা বেলেঘাটা সংক্রান্তির রাত ১২।টায় শ্রীনিত্যগোপাল কোলে চির বিশ্রাম নিল।

আজ কী আর আছি বলে দাদা! আমার পরম জীবনে, আদর্শ জীবনে—তুমি আমার শুধু দাদাই ছিলে না—ছিলে আমার দরদী সাথী। সংসার জীবনে তুমি আমার পাশে না থাকলে আমি কোথায় ভেসে যেতাম। আদর্শ জীবনে তুমি আমার নিত্যকালের। আজ চোখের জলে বলি—দাদা আমার! আবার তুমি মাটির জগতে তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার মত দরদী বন্ধুর আজ এই নিষ্ঠুর হাহাহানির জগতের বড় প্রয়োজন। তুমি নতুন দেহে আবার এস—তোমার সেই তীব্র বাসনা—আশ্রমের সেবা নরনারায়ণের সেবা, নিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দের সেবা, তাকে রূপ দেবার জন্য—তুমি আসবে—আমি শুধু সেই আসাতেই বুক বেঁধে বসে থাকব। আমি তোমার স্নেহের ঋণ কী ভাবে শুধব! আমি বিশ্বাস করব—তুমি নিত্যগোপালের—নিত্যগোপাল তোমার চিরকালের। তুমি অনন্ত জীবন ধারায় তাই হও। আমার বেদনাক্ত দিনে তোমাকে প্রণাম জানাই।

সহস্র সালাম

॥ শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

পূব বাংলার গণরথের যে মহাসারথি
মাতৃমুক্তি-পণে যার পাঞ্চজন্যের গতি,
সার্দ্ধ-সপ্ত কোটি মনে যে এনেছে নব উন্মাদনা
শাহী-শাসন নাশি সংবিধান যে করে রচনা,
শিকল ভাঙার গান যার কণ্ঠে-সুরে অবিরাম—
সালাম, সালাম তারে সহস্র সালাম।

নব ইতিহাস যার লিখে মহাকাল
যার নামে মত্তা পদ্মা হয়েছে উত্তাল;
তরঙ্গ তুলি নাচে বুড়ীগঙ্গা ভিক্টা ধলেশ্বরী
মেঘনায় ক্ষেপা উঠে মূর্তি তার ভীমা ভয়ঙ্করী।
মরা গাঙে যে এনেছে জোয়ার উদ্দাম—
বঙ্গবন্ধু সে মুজিবে সালাম সালাম।

লৌহ কপাট ভাঙি যে করিল সত্তা খান খান;
বিশ্বেরে বিস্মিত করি উড়াইল মুক্তির নিশান,
আকাশে বাতাসে যার ঘন ঘন উঠে জয়ধ্বনি
পূর্ব্বাপার দ্বারে যেবা নবোদিত দীপ্ত দিনমণি,
যার স্বপ্নে রূপ নিতে কোটি বীর করিছে সংগ্রাম—
জয় বাংলার সে বাদশাহে সালাম, সালাম।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ভাষাস্রষ্টা মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
ধর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
কল্যাণের ব্যাখ্যা	১·৫০
কর্মে গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

হাটদের গল্পগুচ্ছ	১·৫০
বিদ্যাসাগর	১·২৫

17 JUN 1971

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার কবি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	২·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

সব মানুষের জন্য সব কলমের জন্য

সুলেখা

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পারমানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক ★ ক্রিমসন
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু
রেড ★ গ্রীন

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের
গৌরব-ধন্য

সুলেখা
একজিকিউটিভ
পারমানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীন
স্কারলেট রেড

সুলেখা
জেনারেল
পারমানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল :
রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীবিত্যাগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্ত-
অচৈতন্ত সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৮, ১৯৭১ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র চতুর্বিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

নমস্কার

আপনি ইউবিআইতে আসায় আমরা আনন্দিত।

এখানে মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে জমানো শুরু করতে পারেন। ইউবিআইতে টাকা রাখা নিরাপদ—টাকাটা সুদে বাড়বে আর তোলাও সহজ—এখানে টাকা জমানোর অনেকরকম ব্যবস্থাই আছে।

ইউবিআইতে টাকা জমানো মানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা।

ভাবনা কিছু নাই
সকল কাজে পাশে আছে
ইউবিআই।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭১ চতুর্বিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

"আদৌ শ্রদ্ধা"

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

ভারতবর্ষ তাহার সাংস্কৃতিক যাত্রাপথের 'আদি'তে স্থাপন করিয়াছিল শ্রদ্ধাকে। শ্রদ্ধা হইতেই যাহার শুরুয়ানো, শ্রদ্ধাতেই তাহার গতি, শ্রদ্ধাতেই তাহার পরিণতি। শ্রদ্ধা শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে 'শ্রৎ' অর্থাৎ সত্যকে ধারণ করিবার উপযোগী মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধাহীন কখনও সত্যের সন্ধান পায় না, জ্ঞানের অধিকারী হয় না। ভগবান পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে তাই 'শ্রদ্ধার' দ্বারা বীর্য্য লাভের পর স্মৃতির উন্মেষের স্তর স্থাপন করিয়া তাহারই ভিত্তিতে সব কিছুর সমাধান ও তাহার ফলস্বরূপ প্রজ্ঞাফল লাভের উপদেশ দিয়াছেন। যাহার শ্রদ্ধারূপ সম্পদ্ লাভ হয় নাই, সে বীর্য্যবান হয় না, যাহার বীর্য্য নাই, সে নিজের আত্মবিস্মৃতিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কখনও আত্মস্বরূপের খোঁজ পাইবে না; এবং আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার যাহার হয় নাই, সে কি করিয়া আত্মসমাহিত হইবে? আত্মসমাধানের পরই শুধু সর্ব্বসমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়, তখনই শুধু প্রজ্ঞালোকে জীবন ভাস্বর হইয়া উঠে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করেন। যাহার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, যে অতীতকে বীর্য্যরূপে ধারণ করে নাই, সে কিরূপে গড়িবে, কাহাকে গড়িবে? অতীতই বর্ত্তমানে গড়িয়া উঠিবে এবং বর্ত্তমান গড়িয়া উঠিবে ভবিষ্যতে। ভূত (অতীত) পিতা যখন আমার দেহ-প্রাণ-মনে বীর্য্যরূপে প্রকাশশীল অথচ অব্যক্ত, সেই ভূত, অব্যক্ত বীর্য্যরূপী পিতাকেই না আমি সৃষ্টি করিব বর্ত্তমান আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সন্তান রূপে পুত্ররূপে? মনীষী মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন—"A people that feel no pride in the past, in his history or literature, has lost the mainstay of the national character."—যে জাতি তাহার অতীত, তাহার ইতিহাস ও সাহিত্যে গর্ব্বানুভব না করে, সে জাতি তাহার জাতীয় স্বভাবের স্থিতি-ভূমিই হারাইয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন স্বভাবতঃই বীর্য্যহীন এবং বীর্য্যহীন স্বভাবতঃই ক্লীব অর্থাৎ সৃষ্টিতে অক্ষম। অথচ সৃষ্টি করিয়াই জীব জীবপদ বাচ্য হয়। জ্ঞানে আমরা আজ শ্রদ্ধাহীন, কর্ম্মে আমরা শ্রদ্ধাহীন। জ্ঞানে শ্রদ্ধা থাকিলে আমরা পরীক্ষায় পাশ ও ডিগ্রী পাইয়া তৃপ্ত হইতাম না, জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য উন্মত্ত হইতাম, কর্ম্মে শ্রদ্ধা থাকিলে বেকার হইতাম না, কর্ম্মের স্বয়ং-মর্য্যাদা প্রদান করিতাম, বাঙ্গলায় পোপা, নাপিত, গাড়োয়ান, ট্যাক্সি চালক, ঝাড়দারী, আলো টেলিফোনের মিস্ত্রি, ফলওয়ালা প্রভৃতি বাহির হইতে আমদানি হইত না। আমরা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া অতীতকেও হারাইয়াছি, অতীতের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া যে বর্ত্তমানকে গড়িতে পারিতাম, তাহাও খোয়াইয়াছি। শ্রদ্ধাহীনের অতীত নাই, অতীত না থাকার ফলে বর্ত্তমানও নাই।

এই শ্রদ্ধার মধ্যে অন্ধ বিশ্বাসের কোন অবকাশই নাই। 'বিচার' করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা বজায় রাখিয়া যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আমরা তাহাকেই 'শ্রদ্ধা' শব্দদ্বারা বুঝাইতে চাহিতেছি। অতীত তাহার সবটুকু লইয়াই তো বর্ত্তমান

হইবে না. অতীত শুধু যোগাইবে বর্তমানের বীর্যসত্তা. অতীতের বীর্যই বর্তমান দেশ কাল পাত্রের আবেষ্টনে রূপায়িত হইবে। যে অতীত বর্তমান দেশ কালে গড়িয়া উঠে না, সে অতীত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার পাত্র নহে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাই হইতেছে বর্তমানের বীজ। বীজই অঙ্কুর হয়, বৃক্ষ হয়, ফল ফুলে সুশোভিত হয়। অতীত ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা-সাধনার ভিতর দিয়াই বর্তমান ভারতে উদ্ধুদ্ধ ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষ তাহার অন্তরের সুপ্ত পুরুষোত্তম-বীর্যকে সৃষ্টি করিয়াই উদ্বুদ্ধ ভারত হইবে। বাহির হইতে বীর্যাধানের প্রচেষ্টা ব্যভিচার মাত্র। পাশ্চাত্যের বীর্যে, রাশিয়ার বীর্যে ভারত ভারত হয় নাই, হইতে পারে না।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ভারতবর্ষের পরমাত্মা, পরম বীর্য সত্তা। পুরুষোত্তম-বীর্যকে বর্তমান যুগোপযোগী গড়িয়া তুলিয়াই ভারত স্বস্থ হইবে, স্বরাট হইবে। ভারতবর্ষ এতদিন নেতি-মূলক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিল, আজ আবার তাহার আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন আসিয়াছে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত কৃষ্টিই পুরুষোত্তম কৃষ্টি। এই কৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের বিরোধী জড়-অজড় কৃষ্টির সমন্বয় রহিয়াছে বলিয়া তাই বর্তমান বিশ্বকে যাবতীয় সন্ত্রাসের হাত হইতে ত্রাণ করিতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতীয় বেদবেদান্তের অতীত ভাষ্য-ব্যাখ্যা আমাদিগকে বহিরাক্রমণের হাত হইতে ত্রাণ করিতে পারে নাই, আমরা নিজেদের মধ্যে হইতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘুরে সরাইয়া দিয়াছি, শুধু ঘুরে সরাইয়া নাই, তাহাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার ঠেলিয়াও দিয়াছি। সনাতন ভারতকে একরূপ আমরাই ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছি। আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিন আসিয়াছে. সত্যই যদি আমরা ভারতের প্রতি, ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতাম, তবে কোনও এক যুগের শাস্ত্রকে, সমাজ-ব্যবস্থাকে টানাটানি করিয়া পরবর্তী যুগে তাহাদ্বারাই কাজ চালাইতে চাহিতাম না। শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই স্থিতিধর্মী মনোবৃত্তি নহে, উহা dynamic। শ্রদ্ধাবানের কাছে সনাতন চির নবীন রূপেই উদ্ভাসিত হয়। শ্রদ্ধার নামে আজ যাহা এদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চলিয়াছে, তাহা অন্ধ গোঁড়ামি। জীবন্ত শ্রদ্ধাই অতীত বেদবেদান্ত নূতন ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া নবরূপে উদ্ভাসিত হইবে। বেদান্তের যে ব্যাখ্যা সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শন খণ্ডন করিয়াছে, সেই ব্যাখ্যাকে আমরা বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই নবীনরূপে গড়িয়া তুলিব। যেমন আজ আমরা 'একজগৎ' না হউক, অন্ততঃ 'একভারত' রচনার জন্যও বদ্ধপরিকর। 'একভারত' গড়িতে হইলে চাই কপিল-পতঞ্জলি-গৌতম-কণাদের সঙ্গে বুদ্ধ মহাবীরের কোলাকুলি, বেদান্তবাদী শঙ্কর রামানুজ মধ্বাচার্য প্রভৃতির কোলাকুলি। অখণ্ড ভারত-বর্ষের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাই শাস্ত্র ব্যাখ্যার পারস্পরিক কাটাকাটি, রক্তারক্তি হইতে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ভারতবর্ষ রচনা করিতে পারে। ঐকদেশিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যার উপর ঐকদেশিক শ্রদ্ধা গোঁড়ামিই আনিয়া দেয়, যাহার জন্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এত বাদ বিসম্বাদ। আজ অখণ্ড ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের অখণ্ড বেদবেদান্তকে আবার নবরূপে গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে। শ্রদ্ধাই এই পথে তাহাকে নবীন শক্তি ও নবীন বীর্য যোগাইবে। বন্দে মাতরম্

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—
(৮৭)

…যত্র ত্রিদর্গমৃষা (ভাগবতের প্রথম শ্লোকের মধ্যে আছে)—ত্রিসর্গ মানে হচ্ছে ভূত সৃষ্টি, ইন্দ্রিয় সৃষ্টি, দেব সৃষ্টি। ভূত ও দেবতার মাঝখানে যোগাযোগ রক্ষা করছে ইন্দ্রিয়…। আমার জীবনের আদর্শের দিকটা দেবতা, বাস্তব ক্ষেত্র ভূতক্ষেত্র…। জীবনের ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম যখন আদর্শের ভাবে ভাবিত হয় তখন তারা সার্থক।…আমি আদর্শ বাদ দিয়ে যখন স্পর্শের লোভে ছুটি তখন আমি চ্যুত…। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভূত আদর্শকে বাদ দিয়ে চলে না…। দেবতা বিরাট অপরিচ্ছিন্ন, ভূত পরিচ্ছিন্ন…। আজ দেবতা (সমষ্টি) ভূতে (ব্যষ্টি) বিনিময় হচ্ছে…। সমষ্টি ব্যষ্টিকে রক্ষা করে, ব্যষ্টিও সমষ্টিকে সৃষ্টি করতে পারে, রক্ষা করতে পারে। পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করে, সৃষ্টি করেই আজ চলতে হবে, বাঁচতে হবে।…পুরুষোত্তম ব্যষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করবার সাহস দিয়েছেন…। একবার আমি সমষ্টি, একবার আমি ব্যষ্টি…। হৃদয় দিয়ে ছাড়া এই সব যা বললাম এগুলি হয় না…। হৃদয় যেখানে নেই সেখানে তুমি সমষ্টির অধীন…। মানুষ সমাজকে সৃষ্টি করে, সমাজও মানুষকে সৃষ্টি করে।…এতদিনের ও আজকের এ সমাজও থাকলে চলবে না, নূতন সমাজ সৃষ্টি করতে হবে—সেদিন এসে গেছে।…ভূতেরা দেবভাবে ভাবিত হবে, দেবতারা ভূতক্ষেত্রকে সার্থক করবে…আদান প্রদান হবে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে…। বিনিময় বাদ দিলে ইন্দ্রিয় বাধা দেবে…। যার দেবতা নেই, আদর্শ নেই, সে তো ভূত…। যিনি মহাদেব, তিনিই ভূতনাথ…। আমরা সমাজের তৈরী, আবার আমরা সমাজকে তৈরীও করব…It is as true to say that God creates world as that world creates God…। যুগে যুগে একজন মানুষের পুরুষোত্তম সত্তার চাপে ও স্পর্শে সমাজ গড়ে উঠেছে।…

২.৪.৫৭ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভক্তভাগবতে মিতাগোপালায়…।

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২

ভাগবতের প্রথম তিনটী শ্লোকেই ভগবান বেদব্যাস তাঁর সাধনা ও সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে বলেছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে রয়েছে যে ভাগবতের ধর্ম প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে উজ্ঝিত অর্থাৎ ত্যক্ত করা হইয়াছে যাহার মধ্যে কিতব+ক=কৈতব=ছল। ভাগবত-ধর্মে কোন ছলনার, কোন অভিসন্ধির কোন স্থান নেই। 'প্রশব্দেন অত্র মোক্ষাভিসন্ধিঃ অপি নিরস্তঃ।' কোন অভিসন্ধিই থাকবে না—মুক্তি কিংবা কোন কিছুর জন্যই ভগবানকে চাইতে পারব না—ভগবান গৌণ হয়ে পড়েন যেখানে যে কোন অভিসন্ধিই থাকুক না কেন।…টাকা প্রয়োজন সেজন্য ভগবানকে চাই, ধর্ম চাই সেজন্য ভগবানকে চাই—ভগবান না হইলে ধর্ম হয় না—তাই ভগবানকে চাই—এই অতএব-এর ভগবানের কথা ভাগবতে নাই—ভাগবতে আছে অপ্রয়োজনের ভালবাসা।…প্রয়োজন হলেই তো কাম হয়ে গেল…ভগবান চাইতে সুখ দুঃখ ভাল মন্দের কোন বিবেচনা

ব না। আমার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য ভগবান ···ভগবানকে কেন চাই—there is no why of ·কেন চাই? ভগবানকে ভাল লাগে তাই চাই—ব ছাড়তে পারি না তাই চাই—এই ভাল লাগাই বত ধর্ম।···ভাগবতের প্রেরণা কোথায়? মহাভারতেও কথা আছে—কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্র-বাদেন···; কিন্তু বতে কৃষ্ণকথাই কইব এইজন্যই কৃষ্ণকথা কওয়া··· কে ভালবাসি বলেই কৃষ্ণকথা কইব অথচ প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়...। ভিখারী অভিসন্ধি নিয়ে একটী য় জন্য জগজ্জননী প্রভৃতি গালভরা ডাকে ডাকে··· শিশু ভালবাসে বলেই হার পায়···। প্রয়োজনের চাইলে কতটুকু পাবে? কিছুই না·····আর ভাল র জন্য ভালবাসলে সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়···। তস্মিন্ তে সর্বম্ এব বিজ্ঞাতম্—তস্মিন্ তুষ্টে সর্বং তুষ্টম্...। চাগোপাল বলছেন যে একটা উত্তম বৃক্ষ লাভ হইলে কল তো এমনিই লাভ হয়—তাই উত্তম বৃক্ষ কি পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হয়।···মূলকে ধরতে ভাগবতে এই অপ্রয়োজনের ভালবাসার ধর্মের কথা য়েছে। ওরও সঙ্গেও এই অপ্রয়োজনের সম্পর্ক···। । বিষ অমৃত করে দাও, হাতীর পায়ের তলা থেকে । রক্ষা কর···প্রহ্লাদ এই সব প্রয়োজন বোধে ভালবাসেন নি।···কৃষ্ণকে ভাল লাগে, ভাল না পারেন না···তাই কৃষ্ণকে ভালবাসতেন।···তুমি ব রক্ষা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করব—এটাই সবটুকু কথা নয়।···বিরাট বিশ্বে কে কবে চেয়ে ? শিব চান না—তাই শিবের দুয়ারে কুবের ।।···সবাইকে তাই বলি কিছু চেয়ো না—কেবল কাজ করে যাও, আর প্রাণ দিয়ে ভালবাস...যত াজ কর আর যত পার ভালবাস।···ভগবান আমার পাহারা দেবার জন্য দরোয়ান?···চাইতেও তো ।...বিশ্বের কতটুকু জান? কি চাইবে? ছোট্ট মিষ্টি চিনাবাদাম লক্ষেস পর্যন্ত চাইতে পারে—বলে যে একটা জিনিষ আছে তা সে জানে কি?··· যে সন্তানকে মা নিজের রক্ত দিয়ে গড়েছেন, সেই মায়ের কাছে কি চাইব?···শুধু প্রাণ খুলে বল—কোন প্রয়োজনের জন্য আসিনি, শুধু ভালবাসার জন্য এসেছি।···আজকের সংসারে দয়া গেছে, মায়া গেছে···হৃদয় শুকিয়ে গেছে। অথচ ভেতরে ভেতরে কিন্তু এই হৃদয়ের ধর্মই আজ প্রকাশ পেতে চাইছে। দেখ না সামাজিক আইনের শাসন, সেখানকার সমস্ত হৃদয়হীন বিধিনিষেধ মানুষ মানছে না, মানতে চাইছে না, মানতে পারছেও না—সেই সত্যিকারের হৃদয়ের ধর্ম প্রকাশ পাবার আগে যে ভাঙন এল তাতে দেখা যাচ্ছে দয়া মায়া আর কিছুই নাই।··· ভগবানকে কোন প্রয়োজনের মধ্যে এনো না···। প্রয়োজন বড়, না ভগবান বড়?···আজকের স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও কি হৃদয়ের ধর্ম আছে?·····বিশ্বনাথের মধ্যে সব প্রয়োজন আছে·····। সংসারের মানুষ বড় আত্মঘাতী—ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্য বড় প্রয়োজন হারিয়ে ফেলে। আজকের মানুষ—অর্থাৎ জীবন্তের ঘরের মানুষ যা প্রয়োজনীয় নয় তাকেই প্রয়োজনীয় করে তুলেছে...। নিত্যগোপাল, আমার বুদ্ধি শুদ্ধ করে দেও···। বায়ুর প্রয়োজনবোধ কেউ করে না—কিন্তু বায়ু আমাদের অপরিহার্য—না চেয়েই তা আমরা পেয়ে যাচ্ছি—এটা অপ্রয়োজনের ভালবাসায় পাওয়া···এ রকম ভালবাসা মানুষ বোঝে না.. দুটো টাকা দিলে বোঝে।···ভাগবত এসেছেন এই প্রোজ্ঝিত কৈতবের ধর্ম নিয়ে···আজকের বিশ্বে এই ধর্মই সার্থক হয়ে উঠবে··· সেই দিকেই বিশ্বের গতি।···জগন্নাথ নিত্যগোপাল...।

৩।৪।৫৭। ওঁ নমো ভগবতে···। কাল বলেছি ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম বলা হয়েছে। সংসারে মানুষ একটা প্রয়োজন যুক্ত না করে বস্তুর নিজস্ব মূল্য স্বীকার করতে পারে না·একটা নিজের ছাপ না দিয়ে পারে না—অথচ এতেই বস্তুর রূপ পালটে যায়..। ভাগবতে বাস্তব বস্তু কি করে পাওয়া যায় তারই কথা বলা হয়েছে—বস্তুর নিজের মধ্যে নিজের যা রূপ···ভগবান, বস্তুর যে অর্থ দিয়েছেন।...আমার ছেলেমেয়ে স্ত্রীকে আমার বলে ভালবাসি—এতে কৈতব আছে। মানুষের অন্তরের

তাকে দেখি। ···মৎসর অর্থ হচ্ছে পরের ভাল যারা সইতে পারে না · এ হেন লোক বাস্তব বস্তুকে ভালবাসতে পারে না · মৎসর যার নেই সেই নির্মৎসর। যারা নির্মৎসর সৎ পুরুষ তারাই ভাগবতের এই প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম পাঠন করতে পারে। যারা নির্মৎসর নয়, তাদের বাস্তব বস্তু অপেক্ষা স্বীয় কল্পনাই ভাল লাগে। স্বীয়ের অন্তরালে তার যে সত্য মানুষ সত্তা—সেটার খোঁজ তারা রাখে না—সেখানে যে তার একটা ঔৎকর্ষ থাকতে পারে সেটা তারা সইতে পারে না।···নির্মৎসর মানে এও বলা যায় মায়ার ভিতরে যে ঔৎকর্ষ আছে, ছোটর ভিতরে যে ঔৎকর্ষ আছে, তা আমরা দেখতে জানি না, দেখতে ইচ্ছাও করি না।···এ অযোগ্যতা যাদের আছে তারা ভগবতধর্ম বুঝবে না···। প্রজ্ঞাবাদী মায়ার ঔৎকর্ষ স্বীকার করে নি, তারা নির্মৎসর নয়। ছোট্ট বিড়ালের খেলায়, শিশুর চঞ্চলতার ঔৎকর্ষ বুড়োরা দেখতে পায় না। · প্রকৃতির গুণ, প্রকৃতির ঔৎকর্ষ কয়জন স্বীকার করতে পারে? ছোটর ঔৎকর্ষ ভাল লাগত বলেই ভগবান ছোট রাখাল হয়ে জন্মালেন।··· ছোটর শ্রী দেখতে না পারলে নির্মৎসর হওয়া যাবে না · । এ ঔৎকর্ষ দেখতে গেলেই সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়—বড়ছোটর সমন্বয়···। কিতব বা ছল মানে হচ্ছে যে বস্তুর যে মূল্য নেই—তাকে তাই দেওয়া অর্থাৎ ছলনা...। যদি নির্মৎসর হয় ও বাস্তব বস্তুকে দেখতে জানে তাহলে আর কিতব থাকে না।... যে সাধু নয় সে যখন দেরদা পরে সাধুত্ব প্রচার করে, তখন সেটা ছলনা।···মাছ খাওয়া নির্দোষ বলে জানলে লুকোতে হয় না···যেটাতে পাপ বুদ্ধি থাকে, সেটাই তো সাধারণ মানুষ লুকায়···। কিন্তু কৃষ্ণকে রাসের কথা লুকাতে হয় নি।···নিত্যগোপাল সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নির্মৎসর হওয়ার, কৈতবহীন হওয়ার কথা বলেছেন।···

৪. ৪. ৭৭ · ভাগবতের ২য় শ্লোকের শুরু চরণে যে বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে বলে বলেছে সে বস্তু শিবদ, মঙ্গলপ্রদ এবং তা তাপত্রয়ের একেবারে মূলশুদ্ধ উন্মূলিত করে। কালও বলেছি এই পুরুষোত্তম-বস্তুকে জানতে হলে নির্মৎসর হতে হবে। পরোৎকর্ষ অসহনম্ নির্মৎসরঃ। পরের উৎকর্ষ দেখতে না পারা—এটা পরশ্রীকাতরতা নয়, সাধারণ মাৎসর্যও নয়। এটা তত্ত্বগত। মায়া ব্রহ্মের অধীনা, ব্রহ্ম মায়ার অধীন নন—এটা মায়া সম্বন্ধে অসহ্য ভাব—মায়াকে তিনি সহ্য করেন না—ব্রহ্ম থাকলে মায়া থাকতে পারবে না ···নিত্যগোপাল এটা নিজের করে বললেন, মায়াব্রহ্মসমন্বয় —মায়ার যা গুণ ঔৎকর্ষ, তাতে মুগ্ধ হয়ে ব্রহ্ম মায়ার গুণ গতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন, মায়াকে তিনি ব্রহ্মগুণে পরিণত করেন।...কৃষ্ণ-বিশ্বাস ও বিশ্ব-বিশ্বাস ভাগবত ছুটোকে সমন্বিত করেছেন, ব্রহ্ম-মায়ার মধ্যে রসলীলা দেখিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন, উভয়ের সমকক্ষতা প্রমাণ করেছেন···। কখনও কৃষ্ণের অতিমূল্য দিয়েছেন, কখনও রাধার অতিমূল্য দিয়েছেন—তাহলেই সমকক্ষতা হল—কোন একজনকে চিরদিনের জন্য কুলীন করে রেখে দেন নি... কখনো কৃষ্ণ রাধাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন, কখনো রাধা কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিচ্ছেন...।···শ্রীধর লিখছেন—ব্রহ্মবস্তুর অংশ জীব, ব্রহ্মবস্তুর শক্তি মায়া, ব্রহ্মবস্তুর কার্য জীব।.. প্রত্যেক মানুষ নিজের মত করে জগৎ গড়ে—বোসাঙ্কেও এই কথা বলেছেন। · একজন পুরুষকে না দেখে ছেলে, স্ত্রী দেখছে স্বামী, সন্তান দেখছে পিতা । সে কে? সে তো মায়ের একান্ত পুত্র নয়, স্ত্রীরও একান্ত স্বামী নয়..সব মিলিয়ে সে। ···কিন্তু মানুষ টুকরো করে না দেখে সমগ্র করে দেখতে জানে না—একান্ত পুত্র হলে সে তো পুতুল হয়ে গেল কেননা সে তো তখন মরে গেছে। ···কোন একটা দিককে একান্ত করলেই পুতুল হয়ে যায়···। বাস্তব বস্তু দেখতে হলে প্রদক্ষিণ করে ঘুরে ঘুরে মায়ের চোখে, স্ত্রীর চোখে সব চোখের দেখা এক করে দেখতে হবে ··। গৌর মানেই তো তাই—কৃষ্ণের চোখ দিয়ে কৃষ্ণকে দেখা আবার রাধার চোখ দিয়ে কৃষ্ণকে দেখা—এই মিলিয়ে গৌর···। সাধারণতঃ মানুষেরা কেউ অন্যের চোখে দেখতে চায় না···অথচ আমার মত করে দেখার বাইরেও তো বাস্তব বস্তু রয়েছে।···এই সব রকম করে দেখতে পারলেই তো আমি নিরঞ্জন হব—সব হতে যখন পারব, তখনই আমি মুক্ত।···মানুষ কর্ম করে কিন্তু কর্মের বাস্তবতা দেখে না—কেবল নিজের নির্দোষত্ব প্রমাণ করে···কাজ হল কি না তার খেয়াল থাকে না···সব সময়

কেবল সাফাই গায়...। ভ্রষ্টা ভগ কর্ম সব সম্বন্ধেই বাস্তবমন্ত্র বস্তু বেস্তম্...। আমার সামনে দিয়ে কাজ নষ্ট হয়ে যাবে তা হতে পারে না...। শরীর রক্ষা করতে হবে কিন্তু যে রকম করে চললে কাজ হয় সেই রকম করে চলব—কাজের উপযোগী নিজেকে গড়ে নেব...আমার সুযোগ সুবিধামত কাজ হবে তা নয়—কাজের অনুযায়ী আমার সুযোগসুবিধা করে নিতে হবে...। মহানির্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপাল ভারতীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কি বিপদে পড়া গেল—মায়া কাজ থেকে না...টাকা নাই কাজ হবে কি রকম করে? নবদ্বীপে প্রচার বন্ধ থাকবে, টাকা নাই...। আমি বলছি তা হয় না—টাকার অভাবে পিতৃ-শ্রাদ্ধ, দেনের দায়ে আটকায় না, কেবল ঠাকুরের কাজই আটকাবে?. কোথা থেকে টাকা আসবে?—জানি না—তবু কাজ আরম্ভ করে দেব—চিরদিন এইভাবেই কাজ করেছি।... নবদ্বীপের প্রচার কাজে শেষ পর্যন্ত আমাকেই দেনার গটা দিতে হয়েছিল, তারিণীবাবু ৩০৲ টাকা দিয়েলেন।...বস্তুতন্ত্রন্ তবেৎ জ্ঞানম্, কর্তৃতন্ত্রন্ তবেৎ কর্ম... াটা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করলে সেটা দের কর্মপদবাচ্য—শঙ্কর সে কর্মকে নিষেধ করেছেন...। করে পারি না, না করে উপায় নেই...আমার ইচ্ছা খেয়ালের উপরেও যা নির্ভর করে না তাই জ্ঞান...। ত বস্তু ব্রহ্মবস্তু...। নিত্যগোপালের ব্রহ্ম মায়া সমন্বিত ই ধরার ধূলি হবে ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্মষ।...

৫।৪।৫৭—ভাগবতের বেদিতব্য বিষয় যে বাস্তবমন্ত্র জানতে পারলে তিন রকম তাপের মূলশুদ্ধ উৎপাটন , তাই আর তাপ জন্মায় না।...দেহযন্ত্রে রক্ত যদি াছুটি করতে পারে তাহলে তাপ হয় না -কোনস্থানে বাধা পড়ে গেলে তাপ সৃষ্টি হয়...। তাপ সৃষ্টি হয় ? রক্তের সহজ গতিকে বাধা দিয়ে যখন আমি ছা করলাম, তখনই তাপ সৃষ্টি হয়। হাত যদি বলে ার রক্ত আমি আমার সীমানার মধ্যে বেঁধে রাখব, হাত বাঁচবে না—সে জানে না সমগ্র দেহের সঙ্গে আছে বলেই সে বেঁচে আছে। যখনই আমার রক্ত আমার বলে হাত বাঁধ দিল, সে জানে না সমগ্র জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলেছে—মৃত্যু তার অবধারিত...। রক্তে চাপ লাগছে মানে সমগ্রের সাথে মিশবার প্রেরণা... হৃদ্রত অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে রক্ত ধরে রাখতে চাইল—এটা হাতের অবিদ্যা, অজ্ঞানতা।...রক্ত (জীবন) জানে সে একলা সুস্থ থাকতে পারবে না...। ছেড়ে দাও...যা ছেড়ে দেবে তাই ফিরে পাবে, বিশুদ্ধ করেই পাবে।.. উপায়?—বাঁধ দেব না—আমিত্ব বাঁধ দেব না।...মানুষের তাপ—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক...। ভিতরে বাইরে সহজ ভাবে গতি—এটাই সহজ অবস্থা...। কিন্তু দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা...। ত্রিতাপ সম্বন্ধেও একই কারণে তাপের সৃষ্টি—সমগ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই সমস্ত তাপের কারণ। তাপের মূল ব্যষ্টি-জীবনের সঙ্গে সমষ্টি-জীবনের বিচ্ছেদ।...আধ্যাত্মিক তাপ হয় আমার জীবনের এই একপোয়ার অস্তিত্বের সঙ্গে বাকি তিনপোয়া যা মূল ইন্দ্রিয়ের বাইরে রয়েছে, তার সঙ্গে এবং বিশ্বাতীত সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে তাপের সৃষ্টি হয়।...আধিদৈবিক তাপ হয় আমি ব্যষ্টি মানব বিশ্বের দেবশক্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই বলে...আধিভৌতিক তাপ হয় সমস্ত মাটির সঙ্গে আমার দেহ-মাটি যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়...চোরডাকাত প্রভৃতি থেকে যে তাপ তা-ও আধিভৌতিক...। Self life ও cosmic life-এর harmony জীবনে আনতেই হবে...। কৃষ্ণ নন্দের ছেলে হয়েও বিশ্বরূপ...হাতের কাছের দেহটা বিশ্বরূপ... বিশ্বের সঙ্গে বিযুক্ত হলেই তাপ হয়...। পুরুষোত্তম হলেন ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যিনি যুক্ত করতে পারেন...কৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবনকে সার্থক করছেন, কখনও রাধাকে, কখনও গোপীদের...। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমভাবে বিচরণ করতে পারেন যিনি তিনিই পুরুষোত্তম।...পা paralysed হয়ে গেছে মানে রক্ত আর পা-কে সার্থক করতে পারছে না...কারো পারিবারিক স্রোত, কারো সমাজের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়...ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি...। মাথায় আটকে যাওয়া রক্তকে পুরুষোত্তম পায়ে আনিয়ে দিতে পারেন...। কেউ কর্মে আটকা পড়ে, কেউ ভালবাসায়, কেউ জ্ঞানে...

সবটাতেই তাপ সৃষ্টি হয়।...যে মুহূর্তে আমি রাধানাথ, সেই মুহূর্তেই আমি বিশ্বনাথ—না শুধু গোপিকারমণ ভগবান্ ...অখিল প্রাণের অন্তরাত্মদূত—রাধানাথ হয়েও, কুরুক্ষেত্রের সারথী হয়েও তিনি পরমাত্মা।...তাপ মানে আমার অন্তরের মধ্যে সহজ জীবনের জন্য একটা আকুপাকু আরম্ভ হয়ে গেছে।...সেইজন্যই বিতাগোপাল জড়াজড় সমন্বয় করতে বলেছেন...সর্ব সমন্বয় করতে বলেছেন...

১১।৪।৭১—শ্রীনিতাগোপাল তাঁর সারা জীবনে বিকেন্দ্রীকরণের মন্ত্র শুনিয়ে গেছেন, নিজ জীবনে আস্বাদন করে গেছেন।—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবই এতদিন কেন্দ্রীভূত ছিল—। লোভ তাই-ই যখন দশজনকে ফেলে, দশজন থাক না থাক খোঁজ না নিয়ে খেতে ইচ্ছা হয়।...ক্ষুধা পাপ নয়—কিন্তু অন্যের সম্বন্ধে কোন ভাবনাচিন্তা না করে, অন্যকে বঞ্চিত দিয়ে নিজে খেতে চাওয়া লোভ—সেইটে পাপ। কামের বেলাতেও তাই...বিশ্বের থেকে ছিন্ন করে এনে আমার স্ত্রীকে শুধু আমার সেবাতেই লাগাব—এটা কাম, এ মনোবৃত্তি কেন্দ্রীভূত মনোবৃত্তি।...যদি ভালবাসা বিকেন্দ্রীভূত হতো, যদি লক্ষ লোককে ভালবাসতে পারতাম...তাহলে মোহ আসত না, কেন্দ্রীভূত হতো না...। চণ্ডীর যা দেবী সর্বভূতেষু ইত্যাদি মন্ত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কথা আছে।...সর্ব মায়ের মধ্যেই মাতৃত্ব দেখব।...নারীত্বকে ভালবাসে না, একটি নারীকে ভালবাসে, পুত্রত্বকে ভালবাসে না, একটা পুত্রকে ভালবাসে—এ অবস্থাটাই আসক্তি আনে।...এই বিকেন্দ্রীকরণের স্পর্শ যেদিন পেয়েছি সেদিন থেকে আর ভাল খেতে ভাল লাগে না, একা খেতে ভাল লাগে না...। আমার স্ত্রীপুত্রকন্যাকে বিশ্বের করবার জন্যই তো সকলকে নিয়ে লবণ আইন অমান্যে বেরিয়ে ছিলাম।...স্বেচ্ছাসেবকরা হেঁটে যাবে, আমি গাড়ীতে যাব—তা পারি নি।... অহংকার এসে যায়—এটা কেন্দ্রীভূত মনোবৃত্তির থেকে হয়।...আমার জন্যটা তো আর এক জনের উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত নয়।...আমি ভোটে জিতলে দামামা বাজাই—সেটাও কেন্দ্রীভূত মনোবৃত্তির পরিচয়।...প্রত্যেক ঘটনা বিকেন্দ্রীকরণের মনোবৃত্তি নিয়ে চালান যায়। সরকারের টাকা নেওয়া এই জন্যই আমার হল না। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কেন্দ্রীভূত, ধনিকের ধন কেন্দ্রীভূত, কুলীনের কৌলীন্য কেন্দ্রীভূত—এই সব centralised মনোবৃত্তি নিয়েই একে অপরের উপর অত্যাচার করে। ব্রাহ্মণত্বের কৌলীন্যের চাপ দিয়ে অপরকে কি কম অপমান করা হয়েছে এদেশে?...তোমার যা কিছু ধন আছে—পাণ্ডিত্য ধনই বল, কৌলীন্যই বল, অর্থই বল—যা কিছু বৈশিষ্ট্য তোমার আছে—তা ছড়িয়ে দাও, তা দিয়ে মানুষের সেবা কর সবলে নিলে নিলে খাও, নিলে নিলে চল:... সারা জন্ম এইভাবে চলেছি। একলা খাওয়া কেন্দ্রীভূত, সবাইকে নিয়ে খাওয়া বিকেন্দ্রীভূত।...পক্ষপাতবিনির্মুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর—কোন পক্ষের সঙ্গেই identified হয়ো না...। সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য কেন্দ্রীভূত হলেই পাপ সৃষ্টি করে।...শ্রীনিতাগোপাল ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের মন্ত্র শুনিয়ে গেছেন।

১১।৪।৭১। ভগবানের জন্যই ভগবানকে ভালবাসতে হবে—যে কোন বস্তুকেও সেই বস্তুর জন্যই ভালবাসতে হবে—তোমার নিজের মনস্ত্ব বা কর্তৃত্ববোধের ছাপ দিয়ে নয়।...বাইরের আচরণ কথাবার্তা একরকম, ভিতরের বুদ্ধি অন্য—এ রকম হয়োনা।...কিছুর জন্য ভালবাসাটা অভিসন্ধি. শিশু যেমন মাকে, নানের নেশায় ডাকে—এই ভাবে ভালবাসতে হয়।...বস্তুকে বস্তুর মূল্যে প্রচার করা ভাগবত ধর্ম. সংসারকে ব্রহ্মমূল্যে আস্বাদন করবার চেষ্টা কর...। অভিসন্ধি নিয়ে চললে শেষপর্যন্ত ঠকতে হয়।... 'জন্য' না থাকলেই বেশী পায়।...কিছু বাগানো নি যায়—সংসারের মানুষ এই বুদ্ধিতেই চলে. আদায় করাই সংসারের ধর্ম. তাই তো মানুষেরা order পাওয়ার জন্য ভেট পাঠায়।...বাস্তব বস্তুই বেস্ত...। কিছুর জন্য না হওয়াটাই বাস্তবতা...। নারীত্ব স্ত্রীর বাস্তব বস্তু—সেই মানুষ...নারীকে ভালবাস...। ভগবানের নিকটও ভিক্ষা করো না...তাঁর সঙ্গে এক হও—তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে, আপন হয়ে গেলে বড় জিনিষ পাওয়া হয়।

ক্রমশঃ

একটি নিঃশব্দ সাধনা অন্তে

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

(পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য পার্বতীনাথ বিশ্বাসের পরলোক গমনে)

জীবনের সার্থকতা ভোগে নয়, ত্যাগে—
ভারতের সাধনার এ শাশ্বত বাণী—
জীবনে গ্রহণ করে কত জন হয়েছে অমর ;
তাদের জীবন-কথা লেখা আছে উজ্জ্বল অক্ষরে
নানা গ্রন্থে চিরন্তনী হয়ে—
প্রণাম জানাই নিত্য তাঁদের চরণে।

তুমি ছিলে সাধারণ, অতি সাধারণ।
তোমার জীবন-কথা কোনদিন লেখা হবে নাকি,
উঠবে না তোমার ছবি কোনও 'কাগজে',
দেবে না ফুলের মালা সভা করে তোমার ছবিতে।
এসেছিলে নিঃশব্দে একাকী
জীবন সাধনা অন্তে চলে গেলে তেমনি জীবনে।
কত যাওয়া আসা চলে প্রতিদিন, এখানে ওখানে,
কে তার খবর রাখে, কে এলো, কে গেলো—
তুমিও হারিয়ে গেলে তেমনি, তেমনি।

অথচ দেখেছি আমি কী সুন্দর তোমার জীবন,
স্নিগ্ধ প্রদীপের মত সতত জাগর,
মানব সেবায় রত নিরলস দুইখানি হাত।
নিজেকে বিলিয়ে তুমি দিয়েছিলে এই সেবাব্রতে,
চাওনিক' এতটুকু নিজের পানেও।
যা পেয়েছ তা'তে তুষ্ট, না পেলেও কোন অভিযোগ
করনিক, কোনদিন। হাসিমুখ সদা দুঃখে সুখে।
সন্তোষের মহৈশ্বর্যে পূর্ণ ছিল তোমার অন্তর,
দারিদ্র্য ঘুচল ভাই, বাহিরের কোন আকর্ষণ
বিভ্রান্ত করেনি' ওই চিত্ত সদা শুদ্ধাত প্রাণ—
যে-গুরুর কাছে দীক্ষা নেবা, আনন্দের।

অনেক অনেক পথে যাওয়া-আসা ছিল না তোমার ;
তবু যেই পথে তুমি চলেছিলে, সেই পথে যারা
এসেছিল, পেয়েছিল তোমার প্রীতির
সুখস্পর্শ, আনন্দ অমল ;
তারা আজ বেদনার্ত, ব্যথিত অন্তর।

জীবন যন্ত্রণা আজ নানা অপশক্তির প্রভাবে,
বড় ক্লান্ত, অসহায় ; প্রাণ চায় প্রাণ,
মন চায় মনের মতন
আর একখানি মন, যেখানে আশ্রয়
কিছুকাল মেলে স্নিগ্ধ তৃপ্তির আধার ;
তেমনি একটি স্নিগ্ধ তৃপ্ত মন প্রাণ
চলে গেল—আর দেখা মিলবে না তার।

সার্বভৌম চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট আবেদন—

মহাশয়,

আপনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং ভারতের সংবিধান অনুসারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীও বটেন। অপর অনেকের মতো আপনিও দেশের বর্তমান অবস্থায় খুসী নন, সুখী নন, নিশ্চিন্ত নন। আজ কারো জীবনেরই নিরাপত্তা নেই, কে কখন খুন হবে সেই ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত; অপরের নিকট থেকে সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা নেই, দুর্নীতিপরায়ণ দেশবাসীর মধ্যে কে কখন ঠকাবে তার কোন স্থিরতা নেই, পরস্পরের প্রতি ভয় অবিশ্বাস দুর্ভাবনা নিয়েই পরস্পরের সঙ্গে আচার ব্যবহার চালাচ্ছি; ঘরে ঘরে বেকার, মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিত্যই অনটন; শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, ছাত্র-শিক্ষকে অহি-নকুল সম্বন্ধ; পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে সম্প্রীতি নেই, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই; সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর দায়িত্ব-জ্ঞান-হীনতার ফলে রাষ্ট্র দুর্বল, সমাজ-জীবনে পরস্পর পরস্পরকে হারিয়ে আপন প্রাণ বাঁচানোটাকেই একমাত্র নীতি বলে আঁকড়ে ধরে সমাজ-জীবনকে অচল করে দিচ্ছি। এক কথায় সমাজের সর্বস্তরে এমন এক গভীর ও ব্যাপক বিপর্যয় সুরু হয়েছে যে পারিবারিক জীবন সম্ভবতঃ ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই তো গেল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অবিশ্বাস সন্দেহ ভয় এত বেশী, স্বার্থের কাড়াকাড়ি এমনই উলঙ্গ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এমনই নিষ্ঠুর ও নীতি-বিগর্হিত হয়ে উঠেছে যে, পারমাণবিক যুদ্ধে সমগ্র মানব জাতিই বুঝি নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ এক মহা সংকটে কেবল আপনার আমার সংসার পরিবারই নয়, সারা দেশ সমগ্র পৃথিবী এই সর্বব্যাপী সংকটে ভুগছে। এ সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় করতে না পারলে সমগ্র মনুষ্য সমাজই ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত অনেক স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে পরম যত্নে গড়ে তোলা সংসার পরিবারও ধ্বংস হবে।

যদিও আশার আলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তথাপি আমরা আশাবাদী। আমরা বিশ্বাস করি যে, এ সংকট কাটিয়ে উঠতে মানুষ পারবে, কারণ মানুষ চিন্তাশীল জীব, চিন্তা সুরু করলেই এ সমস্যার সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করতে সে সক্ষম হবে। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, চিন্তা আমরা করি না। সমস্যা সমাধানের জন্য যে একটা সঠিক চিন্তা-পদ্ধতির সাহায্যে চিন্তা করতে হয়, নতুবা সমস্যার সমাধান হয় না, সেটা আমরা ভুলে গেছি; শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে সঠিক চিন্তা-পদ্ধতি শেখানকে নির্বাসন দিয়েছি; তোতা পাখীর মতো, যে সব কথা সবাই বলে সে সব কথাই আমরা সকলে কপচিয়ে এসেছি, নেতাদের কথা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেছি; আজ তারই অনিবার্য ফল ভোগ করছি।

১৯২১ সাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বলা হয়েছিল ইংরেজ তাড়াতে পারলেই স্বরাজ আসবে এবং সেই সঙ্গে সকলের সব দুঃখ দূর হবে, সকল আশা পূর্ণ হবে। ইংরেজ গেল, কিন্তু দুঃখ গেল কই; আশা মিটল

কই। যা ছিল আজ তাও তো যেতে বসেছে। এর কারণ আমরা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিনি—চিন্তা করিনি।

রাষ্ট্র তো কেবল কতকগুলি আইনের সমষ্টি ও সেই সব আইনকে কার্যকরী করার জন্য একদল মানুষ। ইংরেজ রাজত্বেও তা ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্রের আইন কি রকম হবে, যাতে সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হবে, আশা আকাঙ্ক্ষা মিটবে তা কি আমরা কোন দিন ভেবেছি? অপরে, নেতারা যা বলেছে তাই বিনা প্রশ্নে, নিঃসন্দেহে, পরম বিশ্বাসে আত্মস্থ করে নিয়েছি। তারই ফল আজ ভুগছি।

এ সংকট দূর হবে সেদিন যেদিন সাধারণ মানুষ মাথা ঘামিয়ে, চিন্তা করে তার নিজের কথাটা বলবে, এবং সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাটা পূর্ণ করার মতো আইন কানুন রচনা করতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সাধারণ মানুষকে দিয়েই কি রকম আইন কানুন রচিত হওয়া উচিৎ, কি রকম কাঠামো হওয়া উচিৎ, যেখানে তারা তাদের গায়েতে বসে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে সেই সব আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে তা তাদেরই দিয়ে বলানো ও করানোর পরিকল্পনা আমরা রচনা করেছি।

সকল দুঃখের মূল বর্তমান রাষ্ট্র। এর সকল আইন কানুনের পরিবর্তে বিকল্প সব আইন-কানুন এক নতুন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা আমরা করেছি। এই সব আইন-কানুন রচনা আমরা করব না, করবে সকল সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ তাদেরই চিন্তাশীল অংশ। আমরা কেবল সেই সব মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই সব আইনের খসড়া প্রণয়নে সাহায্য করব ও এই নতুন রাষ্ট্রের একটি ছায়া-রূপ গড়ে তুলে সকলের সামনে তুলে ধরব। তখন তা দেখে সকলে বুঝবে বর্তমান রাষ্ট্র ও তার আইনসমূহের সঙ্গে এই নতুন রাষ্ট্রের তফাৎ কি। তখন লোকে সহজেই বুঝতে পারবে যে, বর্তমান রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত রূপের পরিবর্তে নতুন রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত রূপটি কিভাবে তাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবে, আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। তখন সকলে এই পুরাতন রাষ্ট্রের মধ্যেই এই নতুন সব আইন-কানুন চালু করতে চাইবে এবং ধীরে ধীরে পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যেই নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকবে।

আপনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি, সমাজের অর্থ নীতি, শিক্ষানীতি, প্রশাসন নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু না কিছু বক্তব্য নিশ্চয় আপনার আছে, এবং একটা বিষয়ে হয়তো অনেক কিছুই বলার আছে। সে-সব কথা বলুন; আপনাকে বলতেই হবে, আমরা আপনার সেই বক্তব্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের সময় কাজে লাগাব।

যে সব আইন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগকে পরিচালিত করে সে সব আইনের খসড়া জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল তাদের দিয়ে প্রণয়ন করাবার জন্যে কতকগুলি কমিটির পরিকল্পনা করেছি। এই সঙ্গে সেই সব কমিটির তালিকা পাঠালাম। আপনি এর মধ্যে যে কোন একটি কমিটিতে যোগ দিতে পারেন এবং আপনার চিন্তার সাহায্যে সেই কমিটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। এই সব কমিটির দ্বারা প্রস্তুত আইন কানুনের নীতি ও রূপরেখার খসড়ার ভিত্তিতে সমগ্র পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধি এনে এক ছায়া-পার্লামেন্ট ও ছায়া-বিধান সভার অধিবেশন ডেকে এই সব আইনের খসড়া পেশ করব এবং যথারীতি

গৃহীত হবার পর তা দেশের কাছে তুলে ধরব। তখন দেশের সকল পূর্ণ বয়স্ক লোক (অর্থাৎ সকল ভোটাররা) তাদের স্থানীয় পঞ্চায়েতে বসেই এই সব আইন কানুনের খসড়া প্রকৃত লোকসভা ও বিধান সভায় গৃহীত হয়ে যেন প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায় সেই রূপ নির্দেশ দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। নির্বাচনের পর সেই সকল প্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে বিধান সভা ও লোকসভায় চলতে থাকলেই পঞ্চায়েতী রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।

আশাকরি আমাদের এই প্রচেষ্টায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা পাব। ইতি

১লা জুলাই, ১৯৭১
র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট হল
১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বিনীত
মানববাদী স্বদেশরঞ্জন
সাধারণ সম্পাদক
সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠন সমিতি

সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের আইন কানুনসমূহের মূল নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠন সমিতির সভ্যগণ বিশ্বাস করে যে, যে সংকটের আবর্তে পড়ে আজ সারা পৃথিবী ভুগছে সেই বিশ্বব্যাপী সংকটের অংশ রূপেই ভারতের নানা সমস্যার উদ্ভব।

এই ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তারের যুগে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা দূর করতে একদিকে যেমন ধনতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি কমিউনিজিমের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও ডিকটেটরী শাসন-ব্যবস্থা আরো বেশী ব্যর্থ হচ্ছে, যদিও লিবারেল মতবাদের সংসদীয় গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দোষ ত্রুটি মুক্ত করে ব্যক্তি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অঙ্গীকার নিয়েই কমিউনিজিমের আবির্ভাব ঘটেছিল।

ব্যক্তি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা দূর করতে যে এরা পারছে না তা কিন্তু এরা স্বীকার করে না, বরং ভয়ংকর জেদের সঙ্গেই বলে থাকে যে তাদের তুল্য এমন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সভ্যতার ইতিহাসে কখনো হয়নি, হবে না। এ কথা তারা কেবল প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকে না, অস্ত্রের সাহায্যে অবিশ্বাসীদের বুঝিয়েও দিচ্ছে। বুদ্ধি বলে অস্ত্রের মারণ ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে যখন পরমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে এদের বাধেনি, তখন উভয় পক্ষই যে উভয়কে কে কত মূর্খ তা প্রমাণ করতে একদিন সমগ্র মনুষ্য প্রজাতিকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পরমাণবিক যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে সে সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

জনগণকে ধাপ্পা দিয়ে ভোট আদায় করার উদ্দেশ্যে বিরোধী পার্টিকে নিন্দা ও ছোট করতে কত মিথ্যাচার ও অন্য সব কলা কৌশলকে প্রশ্রয় দিতে হয় তা দেখে এই সব পার্টিদের ওপর জনসাধারণের, বিশেষ করে, সামরিক নেতাদের ও সরকারী কর্মচারীদের শ্রদ্ধা অটুট রইল না। যুদ্ধোত্তর যুগের অনেক নতুন স্বাধীন দেশের সামরিক

ইনীয় নেতারা এই সব পার্টিরাজের হুকুম না মেনে
ন্যাই রাজা হয়ে বসতে সুরু করে এবং পার্টি নেতাদের
ন পুষে ও হত্যা করে প্রনাশ করে দিচ্ছে যে উভয় পার্টি
ছই জনগণ কতখানি উদাসীন। জনগণের কাছে
রাজ ও সামরিক শাসনের মধ্যে তফাৎ নেই, অবশ্য যদি
রিক শাসকরা আইন অনুযায়ী শাসনটা বজায় রেখে
ত পারে।

ব্যক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তখনই পূর্ণ হতে পারে
ব্যক্তি মানুষ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,
-সাংস্কৃতিক ও মানসিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সার্ব-
ক্ষমতা প্রতিনিধিদের হাতে ব্যালট বাক্সের মারফৎ
র না করে, অন্যসব ভোটারদের সঙ্গে স্থানীয়
হতে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষভাবে তা ব্যবহার করে
দের পছন্দ মতো অর্থনীতি, সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা
তুলতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বিধান সভা ও লোক
নির্বাচনের পর ভোটাররা পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে
ত হয়ে বসে সেই সব প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলবে,
আইন-কানুন রচনায় নির্দেশ দিয়ে চলবে—
নিধিকেও তা মানতে হবে।

খন অর্থনীতিতে উৎপাদকই তার উৎপাদনের সম্পূর্ণ
ারী হতে পারবে, শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যক্তির যুক্তি বুদ্ধি
নী ক্ষমতার বিকাশ সাধনের পক্ষে সহায়ক হবে।

ই রূপ শোষণমুক্ত অর্থনীতির ওপর স্থাপিত জন-
ধারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত রাষ্ট্রকে '**সমবায়ী
ন্তী গণতন্ত্র**' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ত পঁচিশ বছর ধরে এই সংগঠন সমিতির উদ্যোক্তাগণ
ন অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করে এসেছেন।
ন এইরূপ রাষ্ট্রের সম্যক রূপটি যাতে জনগণের
সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং এই নতুন রাষ্ট্রের কার্য-
সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে সেই জন্য এক ছায়া-
সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেই প্রচেষ্টা
রছেন।

এ পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের ছায়া-সংগঠনের দ্বারা এক দিকে বোঝা যাবে, অন্যদিকে পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই এই নতুন রাষ্ট্রের নতুন মূল্যবোধ মানুষের মনে গড়ে উঠতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে এই ছায়া-রাষ্ট্রই জনগণের আস্থা ও আনুগত্য অর্জন করে পুরাতন রাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করবে।

১। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের কাঠামো ও স্বরূপ

এই পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কমিউনিষ্ট ডিক্টেটরী রাষ্ট্রের মূল পার্থক্য দেখা যাবে রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান ও অধিকারের ক্ষেত্রে।

নগর ও পল্লীর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যুগ শেষ হবার পর থেকে, গত দুহাজার বছর ধরে যত প্রকার রাষ্ট্ররূপ পৃথিবীর নানা দেশে দেখা গেছে তার কোনটিতেই ব্যক্তিকে স্বীকার করা হয় নি; সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয় নি; মানুষের সৃজনী-ক্ষমতার সাহায্যে নিজ নিজ জীবনকে গড়ে তোলার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি। ওপর থেকে পরিচালিত এক পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরবশ পরাধীন জীবন যাপন করতে ব্যক্তি-মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে। বলা হয়ে এসেছে যে, ব্যক্তি-মানুষ মনগড়া ধারণা মাত্র—**an abstraction only**, বাস্তবে ব্যক্তি সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র—**individual is only a cog in the wheel of a mechanised social organism**; অর্থাৎ সমাজ রূপ চাকা ঘুরলে তার ব্যক্তিরূপ স্পোক্ ঘুরবে, সমাজ-চাকা থামলে ব্যক্তিও থামবে, ব্যক্তির নিজস্ব কোন স্বাধীন সত্তা নেই।

পক্ষান্তরে এই পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রে ব্যক্তি-মানুষ স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্রষ্টা। প্রতিবেশীর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানের দায়-দায়িত্ব নিজেদেরই—**Individual man is the archetype of society, cooperative social relationship contribute to develop individual potentialities.**

এই পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল গ্রামে গ্রামে,

পঞ্চায়েতের সভ্য হবে এলাকার সকল ভোটার। এক একটি পঞ্চায়েত অনধিক হাজার ভোটারকে নিয়ে গঠিত হবে। এই সব পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করার জন্য একটি কার্যকরী সমিতি থাকবে মাত্র, তাঁরা এই সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকবেন, ঠিক যেমন মন্ত্রীরা বিধান সভা বা লোক সভার নিকট দায়ী থাকেন।

এই সব পঞ্চায়েতের মানুষরা নিজ নিজ যুক্তিবুদ্ধি ও সৃজনী ক্ষমতার সাহায্যে সকলকার সমস্যার সমাধান করে একটি পরিকল্পনা মতো সকলকার জীবনকে সম্ভোগ্য করার জন্যে একটি অর্থনীতি ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বর্তমান আইনসমূহের পরিবর্তন সাধন করবে ও নতুন সব আইনের খসড়া রচনা করে বিধান সভা ও লোক সভার প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়ে সে সকল খসড়াকে বিধিবদ্ধ করিয়ে আইনে পরিণত করবে। সেই সব আইন যাতে ঠিক মতো প্রযুক্ত হয় সে জন্য প্রতিনিধিদের মারফৎ শাসন পরিচালন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বর্তমানের মতো আমলাদের মন্ত্রীরা নিয়ন্ত্রণ করবে না, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে সংগঠিত জনগণই তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে প্রতিনিধিদের মারফৎ। সুতরাং বর্তমানের মতো মন্ত্রীরা, আমলারা আর জনগণের ভাগ্যবিধাতা থাকবেন না। সংগঠিত জনগণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

এই ছায়া-রাষ্ট্রকাঠামোর কার্য পরিচালন-পদ্ধতির দ্বারা দেখা যাবে যে :

(১) দেশশাসনের সকল দায় দায়িত্ব ঘাড়ে চাপার সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষ চিন্তাশীল হতে বাধ্য হয়েছে;

(২) চিন্তাশীল মানুষই যে নীতিপরায়ণ মানুষ সে তত্ত্বও বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে;

(৩) এই সব চিন্তাশীল মানুষ পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে বসে যুক্তিসঙ্গত ও নীতিপরায়ণতার সঙ্গে সকল প্রকার ভাবোন্মাদনা থেকে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষ হয়েই সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। দেখা যাবে যে, চিন্তাশীলতা ও ভাবোন্মাদনা মনের দুই প্রান্তের দুই বিপরীত ধর্মী কাজ। পূর্বাপর চিন্তা করার সময় ভাবোন্মাদ হওয়া যায় না, ভাবোন্মাদ হলে পূর্বাপর চিন্তা করা যায় না;

(৪) কোন পঞ্চায়েতেই এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না বা কাজ কর্ম করছে না বা অপর কোন পঞ্চায়েতের গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৫) লক্ষ লক্ষ পঞ্চায়েতের দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমন্বয় সাধনের সমস্যাও যেমন দেখা দিচ্ছে না, তেমনি এই স্বায়ত্ত শাসিত পঞ্চায়েতগুলিও একান্ত ভাবে নীতি-পরায়ণই হচ্ছে, সংখ্যা লঘুর প্রতি পীড়ন মূলক শক্তিকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠছে না;

(৬) মানুষের দায়-দায়িত্বের সঙ্গে চিন্তা করার ফলে অতি দ্রুত চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটছে; অন্তর্নিহিত নানা শক্তি ও বৃত্তির স্ফুরণ হচ্ছে, নতুন নতুন মূল্যবোধ জাগছে, দেশশুদ্ধ মূঢ় মূক মানুষ চিন্তা-শক্তির বিকাশে নতুন সব মূল্য বোধে ও অন্তর্নিহিত বহু সম্ভাবনার উন্মেষে উন্নতির পথে ছুটে চলেছে।

২। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের অর্থনীতি

রাষ্ট্র-ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশে শোষণহীন সমবায় নীতি-ভিত্তিক এক নতুন অর্থনীতির প্রবর্তন ঘটবে। এই অর্থনীতিতে উৎপাদকই হবে উৎপাদনের মালিক ও ভোক্তা। এই অর্থনীতিতে কল-কারখানার মালিক হবে শ্রমিক, কৃষি-ভূমির মালিক হবে কৃষিকর্মে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত কৃষক।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও বেসরকারী আফিস আদালতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের শ্রমশক্তির বিনিময়ে পারিশ্রমিকের হার ধার্য হবে জাতীয় আয়ের মান অনুসারে, সর্বনিম্ন পারিশ্রমিকের হার হবে প্রয়োজন-ভিত্তিক, এবং যোগ্যতা অনুসারে বেতনের হারের কম বেশী হবে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শোষণ-মুক্ত অর্থনীতিতে এ ব্যবস্থা সহজেই করা সম্ভব হবে। ধনতন্ত্রের মতো উৎপাদনের উদ্দেশ্য যদি বাজারে বিক্রী করে লাভ করা না হয়ে মানুষের প্রয়োজন মেটানো হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক না হয়ে সহযোগিতামূলক হয় এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি হয়, তা হলে সকল মানুষের হাতেই একটা না একটা উৎপাদনের

উপায় থেকা সম্ভব হবে, এবং পাঁচ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে। তখন অভাব ও দারিদ্র্য কারো থাকবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য নীতি

শোষণহীন অর্থনীতিতে একদিকে যেমন উৎপাদকই হবে উৎপাদনের মালিক অর্থাৎ উৎপাদন উৎপাদকদের মধ্যেই বণ্টিত হবে, অন্যদিকে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ধনী ব্যবসায়ীদের লাভের উদ্দেশ্য উৎপাদককে কম দরে বেচতে ও ভোক্তাদের বেশী দরে কিনতে বাধ্য করার ব্যবস্থাও লোপ পাবে।

বিনিময় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে স্বাধ্য খরচে উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেওয়া। সেইজন্য এই বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে উৎপাদক ও ক্রেতাদের যুক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই যৌথ সমবায় সমিতি-সমূহ দেশের সকল উৎপাদনের স্বাধ্য পাইকারী ও খুচরা দর ধার্য করবে এবং খুচরা ক্রেতা সমবায় সমিতিকে ও খুচরা ব্যবসায়ীদের পাইকারী দরে বিক্রয় করবে। তারা নির্ধারিত খুচরা মূল্যে ক্রেতাদের বিক্রয় করবে।

পাইকারী আড়তদারী ও খুচরা দোকানদারী একটি বিদ্যা; তা ধৈর্য সহকারে শিখতে হয়। মাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহন ঠিক মতো না হলে অপচয় ঘটে, পণ্য নষ্ট হয়, খরচ বেশী পড়ে। সেই জন্য অনভিজ্ঞ অদক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে ভোক্তা সমবায় সমিতিসমূহের পরিচালন ব্যবস্থায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই লোকসান, অব্যবস্থা এবং বহু ক্ষেত্রেই কর্মকর্তারা দুর্নীতি পরায়ণতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। তার কারণ, একদিকে যেমন পরিচালকগণ অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ, অন্যদিকে তেমনি আমলা-তন্ত্রের দ্বারা ধনতন্ত্রের নিয়মে পরিচালন ব্যবস্থা, এবং পরিচালকগণের ব্যক্তিগত দুর্নীতি-দুর্নীতি পরায়ণতার উপর নির্ভরশীলতা। একে সমবায় বলে না।

উৎপাদকগণ যখন তাদের পণ্য বিপণন করার জন্য সমবায় গড়ে তুলবে, তখন সরকারী আমলাতন্ত্র থাকবে না, তখন উৎপাদকগণের নিরন্তর সতর্কতার ফলে দুর্নীতি পরায়ণতার সুযোগ বিশেষ থাকবে না। উৎপাদকরাই সুদক্ষ ব্যক্তিদের হাতে পণ্য-সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহনের দায়িত্ব দেবে।

তা ছাড়া বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মতো মানুষ তখন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীব-মাত্রই থাকবে না, মানবিক মূল্যেও মূল্যবান হবে; তখন কেবল টাকা-পয়সার বাটখারা দিয়েই মানুষের মূল্যায়ন হবে না, চুরি জোচ্চুরি জালিয়াতি করে, ওষুধ খাবারে ভেজাল মিশিয়ে যেন তেন প্রকারে অর্থলাভকেই পরম পুরুষার্থ মনে করবে না। স্নেহ দয়া মায়া প্রেম প্রীতি, পরার্থে আত্মত্যাগ, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, চারু ও কারুকলার চর্চা, অন্তর্নিহিত গুণ ও সম্ভাবনা-সমূহের বিকাশের জন্য অনুশীলনই হবে তখন মানুষকে মাপার বাটখারা—মাপকাটি; তখন দুর্নীতি-পরায়ণতা লোপ পাবে, এবং সকল মানুষ নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং তখনই প্রকৃত সমবায় সমিতিসমূহ গড়ে উঠবে এবং তা ভালভাবেই চলতে থাকবে।

খুচরা স্তরে অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে বিক্রয়-ব্যবস্থা ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারের মারফৎ করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য ক্রেতা ও ভোক্তাগণের সুবিধার জন্য বর্তমানের মতো খুচরা দোকানদারদের মারফৎই খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পাইকারী সমবায় সমিতি কর্তৃক পাইকারী ও খুচরা পণ্যের দর ধার্য করে দিলেই এই সব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত দোকানদারগণ কালোবাজারী করে ক্রেতাদের ঠকাতে পারবে না; অথচ কোটি কোটি মানুষের চাহিদা মেটান সহজেই সম্ভব হতে পারবে।

মুদ্রা নীতি (Currency Policy)

আধুনিক ধনতন্ত্রে মুদ্রা কেবল বিনিময়ের মাধ্যমই নয়, মুদ্রা নিজেই এক পণ্য, যা বেচাকেনা করে লাভবান হওয়া যায়। ফলে সরকার ও জনসাধারণ প্রায়ই ধনী ব্যবসায়ী-দের কারচুপির জন্য কৃত্রিম অভাবে ভোগে, কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাসের ফলে ক্রেতারা, উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শোষণহীন অর্থনীতিতে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা শোষণ করে ব্যক্তিগত লাভ করার কোন অবকাশ থাকবে না। মুদ্রা কেবল মাত্র বিনিময়েরই মাধ্যম হবে। যে

সমাজে সকল উৎপাদকই উৎপাদনের মালিক, উৎপাদনের উদ্দেশ্য যেখানে মানুষের প্রয়োজন মেটান, বাজারের চাহিদা পূরণ করে লাভ করা নয়, যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারের জন্য সকল মানুষের হাতে, যেখানে সমাজের সকল মানুষ নিজ নিজ পল্লীর পঞ্চায়েতে সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করে, যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ একাত্ম হয়ে যায়, সেখানে মুদ্রা নোট উৎপাদনের ও বাজারের নোট চাহিদার পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মুদ্রিত হবে, সেখানে কখনো মুদ্রা-স্ফীতি বা অভাব দেখা দেবে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারের মাধ্যমে ঘটবে ও পণ্য বিনিময়ের পরিমাণের দ্বারা দেনা-পাওনা নির্ধারিত হবে। অবশ্য তখন আন্তর্জাতিক বিনিময়ের জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মুদ্রা থাকবে, যার মূল্য স্থির থাকবে, সেই স্থির মূল্যের হিসাবেই আন্তর্জাতিক বাজারে দেনা-নির্ধারিত হবে। মজুর যখন দিন-মজুরির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তার উৎপাদনের মালিক হবে তখন উৎপাদন বেড়ে চলবে, পড়তা কম পড়বে, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য তুলনায় কম থাকায় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে এবং রপ্তানি বাণিজ্য ভালই চলবে।

যখন বিশ্বের সকল রাষ্ট্র মানববাদী পঞ্চায়েতী রাষ্ট্র হয়ে যাবে তখন কেবল মাত্র সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন চলবে। যে দেশে যে জিনিষ সস্তায় উৎপন্ন হয় সেখানে সেটা উৎপাদন হবে, যেখানে সেটা হয় না সেখানে সেটা কিনবে, তখন এক রাষ্ট্র, এক অর্থনীতি, এক বাজার, এক পরিকল্পনা কমিশন পৃথিবীর যাবতীয় উৎপাদন বিনিময়ের ব্যবস্থা করবে, তখন মুদ্রাও একান্তভাবে বিনিময়ের মাধ্যমই হয়ে যাবে।

৩। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টির পরিকল্পনার নীতি

এই পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র বর্তমান মানবিক মূল্য ধ্বংসকারী নগরকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্প-ভিত্তিক সভ্যতার পরিবর্তে মানবিক মূল্য বৃদ্ধির সহায়ক বিকেন্দ্রিত শিল্প বাণিজ্য-ভিত্তিক সভ্যতার প্রবর্তন করবে। কলকাতার মতো অতিকায় নগরের কেন্দ্রীভূত শিল্প বাণিজ্য ও সরকারী বেসরকারী দপ্তর সমূহকে ধ্বংস ও মহামৃত্যু সহযোগে বিকেন্দ্রিত করবে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চান্নটি হাজার গ্রামও যেমন উন্নত ও শ্রীমন্ডিত হয়ে উঠবে, তেমনি কলকাতারও ভিড় কমে বাসোপযোগী হয়ে উঠবে।

আমাদের মানববাদী সভ্যতা বর্তমান ecology-বিজ্ঞান-ভিত্তিক হবে; যার উদ্দেশ্য মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্থায়ী মঙ্গলের পথে সভ্যতাকে পরিচালিত করা। যে সভ্যতা বর্তমানের নগরকেন্দ্রিক, বৃহৎ শিল্প-ভিত্তিক, মানবিক গুণ ও মূল্য ধ্বংসকারী বিলাস ব্যবহার, নানা ঐশ্বর্যে ভারাক্রান্ত, সে সভ্যতার পরিবর্তে আমাদের সভ্যতা হবে বিকেন্দ্রিত, যথাসম্ভব বৃহৎ শিল্পবর্জিত, সহজ সরল অনাড়ম্বর এবং মানবিক গুণ ও মূল্য বিকাশের সহায়ক।

পল্লী উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ হবে, দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষের উৎপাদনের উপায় যে জমি, তার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা, তার জন্য :

(১) প্রথমেই কৃষকের ছিন্ন ভিন্ন মাঠময় ছড়ানো জমির সম পরিমাণ জমি এক জায়গায় চকবন্দি আকারে কৃষককে দিতে হবে (**Consolidation of holding**)। তা হলেই কৃষক তার নিজ চেষ্টা ও উদ্যোগে নিজের টাকায় বা ধার করে কোন না কোন প্রকার সেচ-ব্যবস্থা করে বছরে একাধিক উচ্চ ফলনশীল বীজের দ্বারা চাষ করে জমির আয় অবিলম্বে তিনগুণ বাড়িয়ে দেবে। তার ফলে হেকটর প্রতি (২॥ একর) যে বাড়তি উৎপাদন হবে, তাতে প্রতি বছর একজন করে শ্রমবহুল (labour intensive) কাজের সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় ৬০ লক্ষ হেকটর কৃষি-জমিতে প্রতি বছর ৬০ লক্ষ নতুন কর্ম সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা হবে, ভারতের পনর কোটি হেকটর জমিতে পনের কোটী নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা হবে, তখন বেকার আর কেউ থাকবে না; অথচ প্রতি বছর নতুন কর্ম সৃষ্টি হতে থাকবে। তখন যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেবে, এবং labour intensive, শ্রমবহুল কাজের পরিবর্তে মূলধন-

হল, capital intensive কাজের সৃষ্টি হয়ে জীবন যাপনের মান বাড়িয়ে চলতে থাকবে।

(২) গ্রামে গ্রামে গোচরের জন্য কিছু জমি চিহ্নিত করে রাখতে হবে;

(৩) যে সব কৃষকের জমি আড়াই একরের চেয়ে কম আছে, তাদের সরকারের খাস জমি থেকে নিয়ে আড়াই একর পুরিয়ে দিতে হবে (Economic holding);

(৪) অকৃষকের হাতে জমির হস্তান্তর বন্ধ করা হবে;

(৫) যারা ভূমিহীন কৃষক তাদের সকলকে যখন জড়ো করে এক একটি লাঙলজনক জোত দেওয়া যাবে হবে না, তখন তাদের ভূমির ক্ষুধা মেটানর জন্য প্রথমতঃ কিছু জমি নিয়ে তাদের সকলের জন্য একটি যৌথ কৃষি-ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে।

(৬) কিন্তু তাতে তাদের জীবিকা পুরোপুরিভাবে মিটবে না। সেই জন্য সহরাঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে গ্রামাঞ্চলে বিকেন্দ্রিত করে তাদের হাতে ও অন্যান্য বেকারদের হাতে দিতে হবে। পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাঁচা মালের সরবরাহ ও বিপণনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা করতে পারলেই যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প যে কোন পল্লীতে চলতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।

(৭) পল্লী ও সহরের ঋণগ্রস্ত মধ্যবিত্ত কৃষক ও শ্রমিককে ঋণমুক্ত করার জন্য ভবিষ্যতে ঋণগ্রস্ততার হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য কৃষকের জোতকে যেমন চকবন্দি করে দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করে তার উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়ান হবে, ভূমিহীনদের ও বেকারদের ক্ষুদ্র শিল্প দেওয়া হবে, তেমনি পল্লী ও সহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের কৃষি বাণিজ্যের আয় বাড়িয়ে তাদেরও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ঘটাতে হবে।

শোষণমুক্ত অর্থনীতির উদ্দেশ্য উৎপাদকই তার উৎপাদনের মালিক হবে। সেই নীতি অনুসারে কারখানার মালিক শ্রমিক হবে, কৃষির মালিক কৃষক হবে। সেই নীতি অনুসারে সহরাঞ্চলের স্থায়ী ভাড়াটেরাও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিবন্দি হারে মূল্যধন শোধ করে দিয়ে ভাড়াটে বাড়ীর একক ভাবে বা যৌথ ভাবে মালিক হতে পারবে।

এক কথায় দেশ শুদ্ধ সকল মানুষের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ঘটিয়ে দেশের সকল মানুষকে দারিদ্র্য জ্বালার হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করবে।

৪। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের শিক্ষা সংস্কৃতির নীতি

শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক আইন কানুন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হবে, এক দিকে যেমন প্রত্যেককে একটা না একটা পেশাদারী শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া, অন্য দিকে তেমন সকলকে সঠিক ভাবে চিন্তা করার পদ্ধতিটি শেখান, যাতে সকলে সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে (সঠিক চিন্তা করতে না পারলে সৃজনশীল হওয়া যায় না), এবং জীবনের নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে অর্থকরী বিদ্যাটা কিছু শেখান হয় বটে, কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শেখান হয় না, সেই জন্যই আজ এত সমস্যা।

৫। রাষ্ট্রীয় করণ সমাজতন্ত্র নয়, উৎপাদনের উপায় সমূহকে সমাজীকরণ করাই সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের অর্থ যাবতীয় উৎপাদনের উপায়সমূহকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা নয়। রাষ্ট্রীয়করণের নাম রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র—State capitalism;—কারণ ধনতন্ত্রের মতো এই ব্যবস্থাতেও মানুষের দিন মজুরির দাসত্ব ঘোচে না, মালিকানা বদলায় মাত্র। উৎপাদনের উপায়সমূহকে সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদককেই তার উৎপাদনের মালিক করার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থায় কলকারখানার উৎপাদনের মালিকানা হবে শ্রমিকের, কৃষির উৎপাদনের মালিকানা হবে কৃষকের; সমগ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সকল ব্যক্তি-মানুষের হাতে তুলে দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজকে সমার্থক ও এক করাকেই সমাজতন্ত্র বলে। পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই প্রকৃত পক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৬। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য নীতি

দেশশুদ্ধ মানুষের যদি স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ

সুবিধা না থাকে, দায়-দায়িত্ব পালনের অবকাশ না থাকে, সবই যদি ওপর থেকে নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, তবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও জনস্বাস্থ্য, পথঘাটের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যায় না, পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব বোঝানো যায় না। ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর হবে, শিক্ষা-সংস্কৃতি বাড়বে, পঞ্চায়েতের হাতে সকল ক্ষমতা এলে সকল মানুষ নিজ নিজ চেষ্টাতেই পথ ঘাটের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে চলবে, পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সন্তান-সংখ্যা সীমিত রাখতে বিশেষ চেষ্টা করবে।

৭। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের আইন বিভাগের নীতি

রাষ্ট্রের আইন বিভাগের উদ্দেশ্য হবে সকল আইন ও বিচার ব্যবস্থা যেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়, প্রত্যেকে যেন অবিলম্বে বিনা ব্যয়ে সুবিচার পায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সেই রূপ আইন ও নিয়মকানুন পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা।

৮। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়-নীতি

গত দু হাজার বছরের মধ্যে যত প্রকার রাষ্ট্ররূপ দেখা গেছে তাতে রাষ্ট্র নায়কগণ ওপর থেকে জনগণের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে শোষণ করে এসেছেন। শোষণ কার্যটা যাতে যথাসম্ভব অজ্ঞাতে চলতে থাকে সেই জন্য কর ধার্যের নীতিতে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ করের ব্যবস্থা থেকে এসেছে বেশী। কিন্তু পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের রূপ যখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র তখন সকল প্রকার করই প্রত্যক্ষ ভাবে ধার্য হবে। রাজস্ব ব্যয়ের নীতি হবে—যথা সম্ভব রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে সংগঠিত জনগণই যেন তাদের পঞ্চায়েত মারফৎ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়িত্ব ও পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হবে। অবশ্য যে সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দায় স্থানীয় ক্ষমতার সাধ্যাতীত হবে, সে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়া হবে। অবশ্য আয়কর, আমদানী-রপ্তানী কর প্রভৃতি থেকে অর্জিত আয়ের একটা অংশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের একটা উদ্বৃত্ত অংশও সকল পঞ্চায়েত পাবে।

৯। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নীতি

পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের শাসন পরিচালন নীতির ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। ওপর থেকে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হয় বলে এক বিপুল সংখ্যক আমলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পঞ্চায়েতী শাসন-ব্যবস্থায় যখন স্থানীয় পঞ্চায়েতসমূহ নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করবে, স্থানীয় পথঘাট নির্মাণ ও রক্ষা করবে, কৃষিশিল্প ও সাধারণ অর্থ নীতির উন্নতি ও সমন্বয় সাধন করতে থাকবে, এবং অর্থনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সহযোগিতা ও সমবায়মূলক হবে তখন এই আমলাতন্ত্রের কার্য পরিচালন পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনগণকে সংগঠিত করে স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগ-সুবিধা ঘটানো ও বাধা অপসারণ করা—জনগণের জীবনকে কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। সুতরাং যে রাষ্ট্র সব চেয়ে কম শাসন করতে চায়, তার আমলাদের সংখ্যাও যেমন একদিকে অনেক কমে আসবে, অন্যদিকে কাজের ধারাও উলটো মুখে বইতে থাকবে: ওপর থেকে তলাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, তলা ওপরকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১০। পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি

পঞ্চায়েতী-রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ও বৈদেশিক নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। বর্তমানে সকল রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদের ভিত্তির ওপর সংগঠিত। কোন রাষ্ট্রেই সার্বভৌম ব্যক্তি একক নয়, জাতিই একক। তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জাতিই একক, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে মানুষ একক নয়; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের স্বীকৃতি নেই, অস্তিত্ব নেই, বাস্তবতা নেই। সে জন্যই জাতির কল্যাণের দোহাই দিয়ে সেই সব রাষ্ট্রের সরকার যখন ব্যক্তির মানবিক অধিকারসমূহ হরণ

করেন, উৎপীড়ন করেন, হত্যা করেন, তখন সেই সব নিগৃহীত মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা কোন বিদেশী ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের নেই। কারণ স্বরূপ বলা হয়, অপর কোন জাতির বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতি-সংঘের বয়স পঁচিশ বছর পার হবার পরও জাতীয়তাবাদ এখনো আপো স্তরের এক প্রবল মনোবৃত্তি। এই জাতীয়তাবাদ যতদিন প্রবল থাকবে ততদিন প্রত্যেক জাতিকেই তার আত্মরক্ষা ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী রাখতেই হবে। কিন্তু এই পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ একক যেমন ব্যক্তি হবে, তেমনি বৈদেশিক নীতিতেও যাতে সকল জাতি তাদের সংকীর্ণ মধ্যযুগীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মানববাদকে গ্রহণ ক'রে সার্বভৌম ব্যক্তিকেই একক রূপে গ্রহণ করে এই রাষ্ট্র তার জন্য চেষ্টা করে চলবে।

আত্মরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সামরিক প্রস্তুতি অপেক্ষা সকল দেশে মানববাদ প্রচারের প্রতি দৃষ্টি দেবে বেশী। এটাও বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, এই প্রচারের ফলে পৃথিবী থেকে জাতীয়তাবাদ লোপ পেয়ে সকল জাতির সাধারণ মানুষ যেমন মানববাদ গ্রহণ করতে থাকবে, তেমনি জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমে লোপ পেতে থাকবে।

বর্তমানের ইউনাইটেড নেশনস অর্গ্যানাইজেশন যে জাতি-সংঘ যাতে তার এই জাতীয়তাবাদী নীতির পরিবর্তন সাধন ক'রে জাতিকে একক হিসাবে না নিয়ে, পৃথিবীর সকল ব্যক্তি-মানুষকে একক ধরে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে সেই সব দেশের ব্যক্তি-মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করে তার জন্যে এই রাষ্ট্র চেষ্টা করে চলবে এবং U. N. O. নাম পরিবর্তন করে Cosmopolitan Organisation of Man নামকরণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

পঁচিশ বছর পূর্বে মানবেন্দ্রনাথ রায় বর্তমান বিশ্বসংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এই সংকট ত্রাণের উপায় স্বরূপ যে উদ্ভাবিত নিউ হিউম্যানিজিম দর্শনকে বিশ্বমানবের সামনে রাখেন। আমাদের এই প্রচেষ্টা সেই দর্শনের অন্ধ অনুকরণ মাত্র নয়। এই সংগঠন সমিতির উদ্যোক্তাগণ তাঁদের যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষে নিউ হিউম্যানিজিমকে যুক্তিসঙ্গত ও লজিক্যাল বলেই গ্রহণ করেছে; এবং গত বিশ বছর ধরে যুগোস্লাভিয়ায় মানববাদী-কমিউনিজিমের বাস্তব রূপায়ণ প্রচেষ্টার আশ্চর্যজনক সাফল্যে নিউ হিউম্যানিজিম যে বাস্তবেও রূপায়িত হতে পারে এবং বর্তমান সংকট থেকে পৃথিবীকেও উদ্ধার করতে সক্ষম হবে সে বিশ্বাস জন্মেছে।

যুগোস্লাভিয়ার সংবিধান অনুসারে কলকারখানার শ্রমিকীকরণ, ক্ষেত খামারের কৃষকীকরণ এবং সকল সার্বভৌম ক্ষমতা স্থানীয় কমিউনের হাতে অর্পণের ব্যবস্থা রায়ের মানববাদের নীতিভিত্তিক। টিটো যেমন মানববাদী কমিউনিজিম গ্রহণ করে যুগোস্লাভিয়াকে লিবারেলিজিম ও কমিউনিজিমের উর্ধ্বে তুলে ধরে ষ্ট্যালিনের গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচিয়েছিলেন, এবং হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশসমূহকে তাদের কমিউনিজমকে মানববাদের দ্বারা পরিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যার ছোঁয়া রুশিয়ার মানুষকেও স্পর্শ করেছে, যার জন্যে সেখানেও ষ্ট্যালিনী কমিউনিজিম থেকে অনেকটাই সরে গিয়ে কিছু কিছু সংস্কার সাধন করতে হয়েছে, তেমনি ভাল ভাবে মানববাদকে বিশ্বমানবের কাছে তুলে ধরতে পারলে একদিকে যেমন লিবারেলিজিম সংস্কৃত ও পরিশ্রুত হয়ে উঠবে, অন্যদিকে কমিউনিজিমও সংশোধিত হয়ে বিশ্বকে যে বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত করবে সে বিশ্বাস বর্তমান উদ্যোক্তাদের হয়েছে।

পঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের উপরিবর্ণিত দশটি আইন কানুনগুলিকে বাইশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ছায়া পার্লামেন্টের অধিবেশনে সেগুলি পেশ করার পূর্বে বাইশটি কমিটির দ্বারা পরিচালিত নিম্নলিখিত বাইশটি আলোচনা চক্রে সেই খসড়াগুলি আলোচিত হবে।

বাইশ দিনে বাইশটি আলোচনা-চক্র

(Symposium)

১। ভোটার পঞ্চায়েতসমূহের হাতে সার্বভৌম

ক্ষমতা আনার জন্য সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

২। কল-কারখানাসমূহকে শ্রমিকীকরণের জন্য প্রস্তাবিত আইন সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৩। কৃষির কৃষকীকরণ ও চকবন্দি আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাবিত আইন সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৪। শিল্প বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ, কলিকাতা ও গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত আইন সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৫। ক্ষুদ্র শিল্প রক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত আইন সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৬। শিল্প বাণিজ্যের নীতি পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৮। মধ্যশিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

৯। প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১০। নীতি-শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১১। সমাজ-শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১২। ছাত্র ও যুবকদের জীবনবাদ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১৩। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১৪। নৃত্যনাট্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র প্রসার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১৫। জন-স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১৬। ক্রীড়া ও ব্যায়ামাগারের প্রসার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১৭। পরিবার পরিকল্পনা কার্যকরী করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা-চক্র।

১৮। বিচার বিভাগের সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

১৯। কর নির্ধারণ নীতি পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা চক্র।

২০। প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা চক্র।

২১। আরক্ষ ব্যবস্থার নীতি পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র।

২২। বৈদেশিক ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) সহিত সম্পর্কের নীতি পুনর্নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা-চক্র।

২৪তম দিনে ও ২৫তম দিনে **ছায়া পার্লামেন্টের** অধিবেশন বসবে এবং বাইশটি আলোচনা-চক্রের স্থায়ী সদস্যগণই এই ছায়া-পার্লামেন্টের সদস্য হবেন—যা হবে সংখ্যায় ৬৮০।

ছায়া-পার্লামেন্টের অধিবেশনের পর গৃহীত প্রস্তাবিত আইনগুলির খসড়া দেশের সকল ভোটার পঞ্চায়েতের নিকট প্রেরণ করা হবে। সেই খসড়াগুলি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ও সেগুলি প্রকৃত পার্লামেন্টে ও বিধান সভায় গ্রহণ করবার নির্দেশ সহ প্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র গড়ে তোলার আন্দোলন, **Radical Humanist Democracy** গড়ার আন্দোলন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (**Radical Democracy and Co-operative Commonwealth**) সুস্পষ্ট রূপটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্যে যে ছায়া-পার্লামেন্টের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেখানে আলোচনা ও গ্রহণের জন্য যে সব নতুন আইনের খসড়া রচনা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং তার জন্য যে বাইশটি আলোচনা-চক্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে, সে সব আলোচনা-চক্র গঠন ও পরিকল্পনা করার জন্য বাইশটি কমিটি গঠন করা হবে। যিনি মনে করেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলার ও করার আছে, তিনি যে-কমিটিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে যেন সংগঠন সমিতির দপ্তরে আবেদন করেন। নিবেদক—

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট হল,
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মানববাদী স্বদেশরঞ্জন,
সাধারণ সম্পাদক
সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠন সমিতি,

যুক্তিবাদী ছাত্র ও যুবসংঘের ঘোষণা পত্র

[**যুক্তিবাদী ছাত্র ও যুবসংঘ** নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যুক্তিবাদ প্রচারই এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য। সংঘের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছে **শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য**।

সংঘের ঠিকানা ঃ—১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ত্রিতল, কলিকাতা-১২]

র্তমানে ছাত্র ও যুব-আন্দোলন যেমন ব্যাপক ও শক্তি-হয়ে উঠেছে, তেমনি বিষয়বস্তু ও কর্মক্ষেত্রের দিক ও তা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়েও সামাজিক ও াতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তার কারণ ঃ রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্রদের ও যুবসমাজকে । ক্ষমতা কাড়াকাড়ির বলিস্বরূপ ব্যবহার করছে। থকে মুক্তির উপায়ও দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে ণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এমন কষ্টকর হয়ে , অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভয় দুর্ভাবনায় বাক্তিমন এমনই ত যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে এই ওয়ার বাইরে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্য এই সব থেকে দেশকে অবিলম্বে বাঁচাবার জন্য রাজনৈতিক দল-কর্মসূচী তাদের আকর্ষণ করছে। কিন্তু রাজনৈতিক ার আন্দোলনে ও কর্মসূচীতে যেমন যুক্তির অভাব, ছাত্র ও যুব-আন্দোলনও সেইরূপ অযৌক্তিক পথে নিত হচ্ছে। সেইজন্যই রাজনৈতিক দলগুলি যেমন সমাধান না করে তা কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ছাত্র ও যুব-আন্দোলনও কোনো সুফল প্রসব করতে না।

া-জগৎ থেকে মনুষ্য-জগৎকে পৃথক করেছে এই যুক্তি। ঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে পারে না—মানুষ পারে। ানুষ যে সভ্য মানুষে উন্নীত হল তা এই যুক্তি-াহায্যেই। আজ সেই যুক্তিবাদ জীবনবাদ থেকে, ত থেকে নির্বাসিত হয়েছে। আজ যুক্তির স্থান য়েছে অযুক্তি, জ্ঞানের স্থান নিয়েছে অন্ধবাণী—ইনটুইসন ও অন্ধ বিশ্বাস, যুক্তিবাদ-পরিচালিত বৈপ্লবিক সৃজনশীলতার পরিবর্তে ভাবাবেগ-তাড়িত ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধির যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। সেই যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে যদি ইনটুইসন ও ভাবোন্মাদনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তবে সমস্যার সমাধান না হয়ে বেড়ে চলে। এবং সেই জন্যই আজ দেশের কোনো সমস্যারই সমাধান হচ্ছে না। ছাত্র ও যুব-আন্দোলনকে সেই যুক্তিবাদের পুনর্বাসন করে দেশকে পথ দেখাতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের শুভ প্রভাতে মাত্র বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে সমগ্রভাবে সারা সমাজের জীবনের মান বাড়িয়ে দেওয়া যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে আজ যখন তেল, বিদ্যুৎ ও পরমাণবিক শক্তি মানুষের করায়ত্ত, প্রযুক্তি বিদ্যা যখন অটোমেশন ও চাঁদে গিয়ে পৌঁছল, তখন মানুষ অনায়াসেই সমস্যার সমাধান করে জীবধর্ম পালনের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না কেন? তবু যে তা হচ্ছে না, তার কারণ ক্ষুদ্রতা, সঠিক চিন্তার অভাব, যুক্তিবাদের নির্বাসন। আজ বিজ্ঞান বলে ভাঁড়ারে সব আছে—পাতে কিছু নেই; ক্ষুধার জ্বালায় হাত কামড়াচ্ছি। এটা ক্ষুদ্রতা ছাড়া কী? ছাত্র ও যুব-সমাজ পুনরায় যুক্তি বাদের প্রবর্তন করে এই ক্ষুদ্রতা থেকে মনুষ্য-সমাজকে মুক্ত করুক।

রাষ্ট্রে, আর্থিক ব্যবস্থায়, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিপ্লব ঘটাবার আগে ভাব-জগতে বিপ্লব ঘটাতে হয়। ভাব-জগতে বিপ্লব ঘটাবার প্রধান অস্ত্র যুক্তিবাদ। ইউরোপে রেনেসাঁস

ভাব-জগতে বিপ্লব এনেছিল এই যুক্তিবাদের সাহায্যেই। আমাদের দেশেও বিপ্লব ঘটবে না, যতদিন না যুক্তিবাদের সাহায্যে ভাব-বিপ্লব ঘটছে। ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হোক সেই ভাব-বিপ্লব ঘটানো।

আধুনিক যুগ শুরু হয়েছিল ব্যক্তি-মানুষের সার্বভৌমত্ব ও স্বরাটত্ব ঘোষণায়। এই মানববাদী উদ্দেশ্যকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করার অঙ্গীকার নিয়েই ইউরোপের রেনেসাঁসের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই অঙ্গীকারকে পূর্ণতা দানের জন্যই ফরাসী বিপ্লব রাজার সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-মানুষের হাতে আনার চেষ্টা করেছিল। যুক্তিবাদই ছিল সেদিনকার প্রধান অস্ত্র। কিন্তু বিপ্লব সার্থক হবার আগেই সে অস্ত্র হারিয়েছে। সেই জন্য ফরাসী বিপ্লবের অবদান থেকে আজো ব্যক্তি-মানুষ বঞ্চিত। ছাত্র ও যুব-সমাজ সেই হারানো যুক্তিবাদ পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসুক; অপূর্ণ ফরাসী বিপ্লবকে পূর্ণতা দান করুক; ব্যক্তি সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত হোক।

সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করার অভ্যাস দেশে গড়ে তোলা হয়নি—হচ্ছে না। তা হচ্ছে না বলেই ব্যক্তি-মানুষের ওপর থেকে শোষণ-শাসন বন্ধ করার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শোষণ-শাসনমুক্ত অর্থনীতির রাজনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না; কোন্ পথে যে সাধারণ মানুষ সকল প্রকার পরবশতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করার জন্য স্বাধীনতা পাবে সে পথের সন্ধান মিলছে না। সঠিক চিন্তার অভাবে শুধু যে সে পথের সন্ধান মিলছে না তাই নয়, দৈবাৎ যদি পাওয়াও যায় তবে তা রাখা যাবে না, অচিরেই হারাতে হবে।

রাজতন্ত্রে, ডিকটেটরি শাসনে ব্যক্তি-মানুষের কোনো অধিকার বা দায়িত্ব না থাকাতে কোনো স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন হয় না। রাজা, স্বৈরাচারী, ডিকটেটররাই সে সব কাজ করে থাকেন, আর জনগণ কেবল তা মেনে চলেন। সাধারণ মানুষের কোনো চিন্তা ভাবনার দরকার হয় না বলে, বা স্বাধীন চিন্তা শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক বলে তাদের পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি শেখানো হয় না। ব্রিটিশ রাজ স্কুল-কলেজ খুলেছিল কেরাণী তৈরীর কারখানা হিসাবে। বর্তমানের পার্টিরাই ব্রিটিশের সেই শূন্যস্থান পূরণ করে রাজত্ব চালাতে চাইছেন। এদেরও কেরাণীর দরকার হয়, উপরন্তু প্রয়োজন হয় স্বাধীন চিন্তাহীন অনুগামী ও অন্তঃপ্রবেশের। সেই চাহিদা মেটাবার তাগিদে তারা সেইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থাই চালু রেখেছেন। প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে, মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজে, যেখানে সকল মানুষেরই সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় সঠিক মতামত জানাবার দায়-দায়িত্ব থাকে, সেখানে এই ক্রীতদাসের শিক্ষা-সংস্কৃতি চলে না। সেইজন্য যে শিক্ষাদান পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ সঠিক চিন্তা করতে শিখবে, যুক্তিবাদী হবে, নীতিপরায়ণ হবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবে, সুস্থ জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবনকে সুন্দর আনন্দময় ও সম্ভোগ্য করে তুলতে পারবে তা আমাদের আবিষ্কার করে প্রবর্তন করতে হবে।

মানব সমাজকে কল্যাণের ও প্রগতির পথ দেখিয়ে, কিংবা পরহিতে ও আদর্শ জীবন যাপন করে ইতিহাসে যে সব মানুষ স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন তাঁদের অবশ্যই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। কিন্তু তাঁদের জীবন-কালে তাঁরা যে কর্মসূচী অনুসরণ করে যুগ প্রবর্তন করে-ছিলেন বা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তা আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করব না, যুক্তির আলোতে যাচাই করে নেব। স্মরণ রাখব যে, তাঁরা সকলেই যুক্তিবাদী ছিলেন। তাঁদের সমকালের সমস্যা সমাধান করতে তাঁরা তাঁদের যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে যে কর্মসূচী রচনা করেছিলেন, যা অনুসরণ করে তাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা যে ভবিষ্যতেও চলবে তার কোন নিশ্চয়তা যে নেই সে কথা তাঁরা জানতেন, এবং তাঁদের নিজ নিজ জীবনের মধ্য দিয়েই তাঁদের বারে বারে মত ও পথের পরিবর্তন ও বিকাশ সাধনের দ্বারাই সেকথা প্রমাণ করে গেছেন। স্থান কাল পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে কর্মসূচীরও পরিবর্তন ঘটে। অতএব অতীতে মহাপুরুষদের প্রণীত তাঁদের দেশ কাল পাত্রের সমস্যাসমূহ সমাধানের পক্ষে উপযোগী কর্মসূচী আমাদের দেশের একালের সমস্যা সমাধানের জন্যেও অন্ধের মতো অনুকরণ না করে তাঁদের যুক্তিবাদ মাত্র

হণ করব। যুক্তি দিয়ে যদি দেখা যায় তাঁদের কর্মসূচী কালের ও এ দেশের মানুষের পক্ষেও উপযোগী হচ্ছে সে অবশ্যই তা গ্রহণ করব; নতুবা তাঁদের প্রদর্শিত ক্তিবাদের সাহায্যে নতুন কর্মসূচী প্রণয়ন করে নেব।

ছাত্রদের ও যুবকদের মধ্যে বর্তমানে অনেক সংস্থা, নেক সংগঠন আছে; কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কাজ ছেন না। সেইজন্যই এই যুক্তিবাদী ছাত্র ও যুব ম সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এই সব সংস্থার ন্ন আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরা নিরপেক্ষ। দের কাজ করুন, তাঁদের কর্মসূচী আমরা যুক্তিবাদের কষ্টি দিয়ে বিচার করব। যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, সমর্থন ব; অযৌক্তিক হলে ভুল দেখিয়ে দেব—প্রতিবাদ করব। বরং তাঁদের সাদরে ডেকে আনব, তাঁদের যুক্তি শুনব। রপর নিছক নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ আলোচনের ানিক পদ্ধতিতে তা বিচার বিবেচনা করব, এবং সেই ার-বিবেচনার ফল সর্বসমক্ষে তুলে ধরব।

যুক্তিবাদের সাহায্যে দেশে রেনেসাঁস এনে ভাব- ব ঘটাবার উদ্দেশ্যে এই **যুক্তিবাদী ছাত্র ও যুব-** ব গঠিত হল। প্রত্যেক স্কুল কলেজে এবং পাড়ায় য়ে এই সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সংঘে যোগ ার জন্য সমগ্র ছাত্র ও যুব-সমাজকে আমরা সাদর ান জানাচ্ছি।

কর্মসূচী

এই **যুক্তিবাদী ছাত্র ও যুব-সংঘ** নিম্নলিখিত দাবী- লির যুক্তিযুক্ততা কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও জনসাধারণের ে প্রমাণ ক'রে এগুলি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন ব:

১। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ন ও একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন;

২। প্রত্যেক শ্রেণীর সর্বোচ্চ ছাত্র সংখ্যা হবে পঁচিশ;

৩। বিশেষ কারণ ও সিলেবাসের পরিবর্তন ব্যতিরেকে পুস্তক পরিবর্তন করা চলবে না;

৪। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান কে বাধ্যতামূলক করতে হবে;

৫। শরীর-চর্চাকে বাধ্যতামূলক করা ও বিনামূল্যে লযোগের ব্যবস্থা রাখা;

৬। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৭। ড্রয়িং-শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে হবে; এবং সমাজ-বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর দান কথায় এবং লেখাকনের দ্বারা দেবার নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে। এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ হল, পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যেমন ত্রিমাত্রিক, সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তেমন নয়। সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে চোখে দেখা যায় না, মনে মনে কল্পনা করে নিতে হয়। একই বিষয় ও সংজ্ঞার মানসিক চিত্র বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে। সে জন্যই পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ধারণা নিয়ে যেখানে কোন মতান্তর হয় না, সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সেখানে মতান্তরের অন্ত থাকে না। অথচ এই মতান্তর কেবল ভুল বোঝাবুঝির জন্যই হয় বেশী। কিন্তু যদি ছবি এঁকে ত্রিমাত্রিক রূপরেখার মাধ্যমে বিষয়গুলির সংজ্ঞা ও ধারণা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সমাজ-জীবন থেকে অনেক রক্ত ও অশ্রুপাত বন্ধ হবে, এবং সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতি অতীত ও বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকবে। এই কারণেই সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে:

৮। পঠন-পাঠন ও শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ও পদ্ধতির দ্বারা যেন ছাত্রের চিন্তাশক্তি অনুশীলিত ও বিকশিত হতে থাকে, যুক্তিশীলতা বুদ্ধি পায়, সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি শেখে, সেদিকে শিক্ষকদের ও কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে;

৯। শিক্ষকদের পক্ষে গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ করতে হবে;

১০। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুরূপ যোগ্যতার জন্য যে রূপ বেতনের হার ধার্য আছে, শিক্ষকদের বেতনের হারও সেই হারে বর্ধিত হবে, এবং সর্বনিম্ন বেতনের হার প্রয়োজন-ভিত্তিক হবে;

১১। প্রত্যেক বিদ্যালয় পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে এবং হাতে কলমে শিক্ষার দ্বারা কৃষিশিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি পেশা গ্রহণের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। দেখতে হবে এই সকল পেশা শিক্ষার ব্যবস্থা যেন ছেলে-খেলায় পর্যবসিত না হয়। সেইজন্য ছাত্রদের প্রকৃত কাজের লোক করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের এই টেকনিক্যাল অংশটি যেন এক বা একাধিক কৃষিক্ষেত্র ও কল কারখানার সহকারী অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠে। প্রকৃত কৃষিক্ষেত্রের ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের বাস্তব কাজে অংশ গ্রহণ করে ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও এসেম্বলী কাজের মধ্য দিয়ে যেন ছাত্রদের শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা থাকে।

ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে কাজের কর্মসূচী

১। যুক্তিশীলতা বাড়াবার জন্যে নিয়মিত বিতর্ক সভার আয়োজন ;

২। শিক্ষক-ছাত্র সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কর্ম-তালিকা অনুসরণ করা, যথা ছাত্র-শিক্ষকের সহযোগিতায় সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা, ভ্রমণ, বনভোজন, নাট্যসঙ্গীতের প্রযোজনা, খেলাধূলার ব্যবস্থা প্রভৃতি।

৩। ছাত্র ও যুবকদের রাজনীতি শিক্ষা

পরবশ পরমুখাপেক্ষী মানুষ তার দাবী আদায়ের জন্য দল বেঁধে চিৎকার করতে পারে, কিন্তু শাসক-শোষককে চাপ দিয়ে যতই আদায় করা হোক না কেন তাতে পরবশ মানুষের আশা পূরণ হয় না, আকাঙ্ক্ষা মেটে না, দুঃখ ক্ষোভ থেকেই যায়। রাজতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে, পার্টিতন্ত্রে, স্বৈরাচারী ডিকটেটরি তন্ত্রের অধীনে সাধারণ মানুষরা দলবেঁধে অনেক দাবী আদায় করলেও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটে না বলে বিক্ষোভ বিদ্রোহ লেগেই থাকে। সেইজন্য সর্বপ্রকার শাসন-ব্যবস্থাতেই পুলিশ গোয়েন্দা সৈন্য জেল নির্বাসন প্রভৃতির সাহায্যেই জনগণকে দাবিয়ে রাখতে হয়।

যুক্তিবাদী ছাত্র ও যুব-সংঘ এই দাবী রাখে যে আদায়ের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না ; পক্ষান্তরে এই সংঘ বিশ্বাস করে যে : যে দেশে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে এসে গেছে, অর্থাৎ পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি স্থাপিত হয়েছে, সে দেশে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যালট বাক্সে প্রতিনিধির হাতে হস্তান্তর করে নিজেরা নিঃস্ব হয়ে, পার্টিরাজ কায়েম করতে পার্টিদের সাহায্য করে, তারপর তাদেরই কাছে ভিক্ষুক না থেকে, যদি গ্রামে গ্রামে এবং সহরের পাড়ায় পাড়ায় সকল ভোটাররা পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে সংঘবদ্ধ হয়ে বসে কোন্ কোন্ আইন নাকচ করলে এবং কোন্ কোন্ আইন প্রণয়ন করলে সকলের অন্ন বস্ত্র এবং সুস্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্যাসমূহ দূর হবে তা নির্ধারণ ক'রে তা আইন সভায় গ্রহণ করাবার সর্তে প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে, তা হলেই সকলের সমস্যা নিজেরাই দূর করে নিজেদের জীবনকে পছন্দমত গড়ে তুলতে পারে। তখনই পরবশতা, পরনির্ভরতা ও দাসত্ব কেটে গিয়ে মুক্ত মানুষের দ্বারা গঠিত এক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অতএব ছাত্র ও যুবকগণ যাতে একুশ বছর বয়সে ভোটার তালিকাভুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব পঞ্চায়েতে বসে সঠিক চিন্তার সাহায্যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত পঞ্চায়েতের অন্যান্য সভ্যদের নেতৃত্ব দিয়ে সকলকার সার্বভৌম ক্ষমতাকে সৃজনশীল পথে চালিত করতে পারে, সেইজন্য ছাত্রাবস্থায় তারা সমাজবিজ্ঞানের তথ্য ও ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব শিখবে। পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ও বিতর্ক সভার মধ্য দিয়ে সমাজনীতি ও রাজনীতির বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির কলা-কৌশলের বিদ্যা শিখবে।

৪। ছাত্র ও যুবকদের জীবনবাদ

প্রত্যেক মানুষের জীবধর্ম পালনের পর প্রয়োজন হয় মনুষ্যধর্ম পালনের সুযোগ সুবিধা। বর্তমানে মনুষ্যধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। যাঁরা জীবনবিমুখ জীবনবাদে বিশ্বাসী, যাঁদের কাছে এই জীবন মায়া, পরকালে স্বর্গলাভের পথের ক্ষণস্থায়ী পান্থশালা, পরকালে অনন্ত সুখ লাভের

জন্য ত্যাগ, তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্র সাধন করার সাধন ক্ষেত্র মাত্র তাঁদের কথা আলাদা, তাঁদের কথা বলে দিচ্ছি। যাঁরা জীবনমুখী জীবনবাদে বিশ্বাসী, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই জীবন মায়া নয়, ক্ষণস্থায়ী হলেও সে ক্ষণও তুচ্ছ নয়, এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সুখে-স্বচ্ছন্দে আনন্দে আহ্লাদে ভরে তুলে জীবনকে সম্ভোগ করাই এই জীবনের একমাত্র সার্থকতা, পরম পুরুষার্থ, তাদের জীবনবাদ হবে অনন্ত সম্ভাবনাময় এই জীবনের সকল শক্তি ও বৃত্তিসমূহকে অনুশীলিত ও বিকশিত ও তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবনকে নিত্যনতুন রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে সম্ভোগ্য করে তোলার জীবনবাদ।

এই বিকশিত ব্যক্তিত্বের জীবনবাদই জীবনকে নিবিড় ভাবে ভালবাসতে পারে। ইউরো-আমেরিকাতে এই বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদী জীবনবাদের অভাবেই জীবন থেকে লোকের মনোবৃত্তি লেখা দিচ্ছে। হিপিবাদ ও অস্তিত্ববাদ, নেশা করে জীবনকে অস্বীকার করার ঝোঁক, উত্তেজক, ভয়, রোমাঞ্চকর নাটা নৃত্য সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এই লোকের মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদ এই অবক্ষয়ী রোগ থেকে যুব-সম্প্রদায়কে বাঁচাবে।

এই বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদের চর্চা যাতে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে একটা রেওয়াজে পরিণত হয়, সকলে যেন দেহের, স্থির, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে ও বিকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সে জন্য এই সংঘ আন্দোলন করে চলবে।

৫। সর্বপ্রকার মানসিক কুসংস্কার ও উৎপীড়ন মূলক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান

মানসিক বন্ধন

মধ্যযুগীয় জড়তা, অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের ফলে সাধারণ মানুষের মানসিক জড়ত্ব ও সামাজিক বন্ধন কাটছে না, প্রগতি বন্ধ হয়ে আছে। এ সবের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে হবে।

তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ি-ফুঁকাফুঁকি, ভূতপ্রেত, বারবেলা-কালবেলা, তিথিবার, মাদুলি কবচের প্রতি আস্থা, অদৃষ্টবাদ, বিধিলিপি, হস্তরেখা-কোষ্ঠির ফলাফলের প্রতি বিশ্বাস আজো অনেক মানুষের পুরুষকারকে, উদ্যোগ-উদ্দীপনা কর্মপ্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে রেখেছে। যে অন্ধ তমসাচ্ছন্নতার জন্য এই সব কুসংস্কার চলে আসছে তা জ্ঞানের আলোকে দূরীভূত করতে হবে। যে অদৃষ্টবাদের বন্ধনে কর্মপ্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে রেখেছে তা যুক্তিবাদের খড়্গে খণ্ডন করতে হবে।

সামাজিক বন্ধন

যে সব সামাজিক প্রথা জনগণকে পীড়িত লাঞ্ছিত শোষণ করে এসেছে, যার জন্যে মানুষ পরস্পরকে সন্দেহ ভয় ঘৃণা করতে বাধ্য হয়েছে, ফলে সমাজ-জীবন শতধা বিভক্ত হয়ে মানুষের কষ্ট বাড়িয়েছে, প্রগতিকে স্তব্ধ করে রেখেছে, সেই সব জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে নানা ব্যয়বহুল লৌকিক প্রথা ও আচার আচরণ প্রতিপালনের বাধ্যতামূলক অনুশাসন সমাজে আজো চলে আসছে। এই সব নিয়ন্ত্রণ কারণ প্রথা ও আচার আচরণ অবিলম্বে নিশ্চিহ্ন হওয়া প্রয়োজন।

জাতিভেদ প্রথা অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের পক্ষে ব্যক্তির পদবী ও নাম এক মহা বাধা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চানের পরিচয় তার নামের পদবীতে লেগা থাকে। তার ফলে বাল্যকালের সংস্কার কাটিয়ে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠা কঠিন। মানুষের মনে ছোট-বড়, উচ্চ নীচ সংস্কার এমন ভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকে যে, মন থেকে কিছুতেই জাতিভেদের সংস্কার একেবারে মুছে ফেলা কঠিন। সেই জন্য নামের শেষে পদবী ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। পিতা বা জন্মস্থান বা অন্য কোন ভাবে ব্যক্তির প্রথম নামের প্রথমে বা শেষে লিখলে কিছু দিনের মধ্যেই দেশ থেকে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা উঠে যাবে।

তা ছাড়া অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইনের মর্মার্থ ও শাস্তি মূলক ধারার কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইনের বিধানে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

সাম্প্রদায়িকতার জন্ম মধ্যযুগীয় মনোভাব থেকে। আধুনিক প্রগতিমূলক সংস্কৃতির প্রসারের ফলেই এই সাম্প্রদায়িকতা দূর হতে পারে। সংস্কৃতির প্রসারের ফলেই ইউরোপে থেকে সাম্প্রদায়িকতা লোপ পেয়েছে। বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও সাম্প্রদায়িকতা লোপ পাচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসারের ফলে। ইউরোপে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে গেছে, বাংলা দেশেও হতে চলেছে। ভারতকেও এই পথ গ্রহণ করতে হবে। মুসলমান ক্রীশ্চান হিন্দু সকলকেই ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। সেই জন্য মুসলমান ও ক্রীশ্চানকেও আরবী ও ইংরেজি ভাষায় নাম না রেখে ভারতীয় ভাষায় নাম রাখতে হবে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার রূপেই গণ্য করতে হবে। এই পথেই দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর হবে। তুর্কী প্রমুখ অনেক মুসলমান দেশ নিজ নিজ দেশের ভাষায় নাম রাখে, আরবী ভাষায় রাখে না, ইউরো-আমেরিকার অনেক মুসলমান নিজ নিজ দেশের ভাষাতেই নিজেদের নাম রাখে; আমাদের দেশেও অনেক খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীর নাম ভারতীয়।

কন্যার বিবাহে পণপ্রথা বেড়েছে বই কমেনি, যদিও পণপ্রথা আইন-বিরুদ্ধ। এই সঙ্গে কন্যা-পক্ষকে নিমন্ত্রিতদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করাও বাধ্যতামূলক অনুশাসনে দাঁড়িয়েছে, যদিও অতিথিনিয়ন্ত্রন আইন বলবৎ আছে।

বরপণের বাহুল্য দেখিয়ে ও বিবাহ আসরে অতিথিদের ব্যয়বহুল ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করে ধনী পিতার ঐশ্বর্য প্রদর্শনের একটা উপলক্ষ মিলতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রথাগুলি এমনই সার্বজনীন হয়ে উঠেছে যে, গরীবদেরও এই প্রথা মেনে চলতে বাধ্য হতে হয়। ফলে গরীব পিতার কষ্টের সীমা থাকে না, এবং এই কষ্ট চলতে থাকে ঋণের বোঝা বইতে বইতে বহুদিন ধরে, হয়তো বংশ বংশ ধরে। আজ এই পণপ্রথা তুলতে হবে প্রচারের মাধ্যমে, জনমত গড়ে ও ক্ষেত্র-বিশেষে পণপ্রথা নিবারণ আইনকে ও অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনকে প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। যে সব বিবাহে এই দুই আইন ভঙ্গ করা হবে তার জন্য এই সংঘই বাদীর ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পণপ্রথা নিবারণ আইনের বিধানে ছয় মাস জেল ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা আছে।

অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধানে গৃহকর্তাসহ মাত্র পঞ্চাশ জন নিমন্ত্রিতের ব্যবস্থা আছে। এই নিয়মভঙ্গকারীর কারাদণ্ড ও জরিমানার ব্যবস্থা আছে।

৬। ইহা ব্যতিরেকে ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক সর্বপ্রকার কার্য করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত কার্যগুলিও করবে:

(ক) অক্ষম ছাত্রের স্কুল কলেজের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ ও বই ঋণ দেবার ব্যবস্থা;

(খ) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মশালির সংবাদ সরবরাহ;

(গ) মফঃস্বলের ছাত্রদের কলিকাতায় বা অন্যত্র কলেজে ভর্তি হতে সাহায্য করা;

(ঘ) অপেক্ষাকৃত সস্তায় বই কাগজ, কলম ও কালি সরবরাহ;

(ঙ) পত্র-বন্ধু পাতানোর ব্যবস্থা;

(চ) সহরের পাড়ায় পাড়ায় পল্লী-নগর মিতালি সংঘ প্রতিষ্ঠা;

(পল্লী-নগর মিতালি সংঘের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পৃথক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৩৯)

অবধূত আশ্রমে সভা করিতে হইলে জায়গা পরিষ্কার করিবার জন্য ৮।০ টাকা লাগিবে। কেমন করিয়া পথের বাধা অতিক্রম করিয়া আগাইয়া যাওয়া যায়, সেই রহস্য বরিশালের ষ্টীমার ষ্ট্রাইক-এর সময়ে চকবাজারের দোকানদারদের opposition দিবার মনোবৃত্তিকে 'কে আমি কেন আমার জারে তাপত্রয়' প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভুর উক্তি 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য-কৃষ্ণদাস' উক্তিদ্বারা দোকানদারদের ৩ দিন হরতালের প্রতিশ্রুতি আদায় করি, তাহা বলি। সমগ্রের ক্ষেত্রে জয়জয়কার হইলে ব্যষ্টি-মানুষ দবিয়া যায়—ইহা আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। মঠের সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযোজ্য। আগাইয়া গেলে সকলেই যুক্ত হইবার জন্য পাগল হইবে।...

৭ই নভেম্বর

রাধারাণী, সজ্ঞবমূর্ত্তি আবার, বিশ্বের প্রতিটী স্পন্দনের বহুমূল্য কৈবল্য বিধান করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হাত ধরা-ধরির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়া চক্রাকারে তুমি রাসলীলা আস্বাদন কর। আমার মন্তরের প্রতিটী বৃত্তির মাঝে, বাহিরে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে বিশ্বে তোমার রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য রূপায়িত হউক। এক-বিশ্ব রচনার দেবী তুমি, এক-বিশ্ব রচনার ত্র তুমি নিয়া আসিয়াছ। সজ্ঞবরূপে দেখা দেও। সঙ্ঘ চনা করিব বলিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। আজও তা সে সাধ মিটিল না। নিত্যগোপাল মহাবৈত্রী ংস্থাপক। সকল জাতি-সমন্বয় স্থাপিত হউক। তোমার ই সঙ্ঘ-গঠন-অবতার জয়যুক্ত হউক।...মঠে যাই। গিয়া খি কাশী হইতে নগেন প্রামাণিক পুত্র-পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া গল ব্লাডারের বেদনায় কাতর হইয়া আসিয়াছেন। তারিণীবাবু পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে দেখাইবার কথা বলেন। আমি হোমিওপ্যাথিকের কথা বলি।...রেণুর স্বাস্থ্যের দিকে ও নবদ্বীপের অনিয়মের দিকে চাহিয়া রেণুর না-যাওয়ার কথা বলি।...উমাঙ্গিণী বলে, রেণুর যাওয়া প্রয়োজন প্রচারের দিক দিয়া। প্রতিভা সন্ধ্যায় মঠে যায় তারিণীবাবুর কাছে এই কথা আলোচনা করিতে যদি সেখানে রেণুর থাকার একটী ভাল বন্দোবস্ত করা যায় তবে সে যাইতে পারে। তারিণীবাবু তাহা পারিবেন কিনা। রেণু যায় তাহা তারিণীবাবু নীলরতনবাবুরও মত। তারিণীবাবু তাহা পারিবেন বলিলেন।...আসে, তাহাকে তাহার পুত্রের ভর্তির জন্য ১০০ টাকা হাওলাত দেওয়া হয়। নবদ্বীপের সভার জন্য পোষ্টার ও চিঠির draft মঠে বসিয়া করা হয় তারিণীবাবু ও নীলরতনবাবুর সামনে।

৮ই নভেম্বর

ঠাকুর, আমি নিরাবরণ হইব, আমার বিকল্প বসন তুমি কাড়িয়া লও, আমি উলঙ্গ হইব, অকপট হইব। কিছু আমি আড়াল করিব না, সকল আবরণ ছিঁড়িয়া সহজ বেশে তোমার কাছে দাঁড়াইব। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলঃ নির্গুণশ্চ।' তুমি নির্গুণ, তুমিই আবার সর্বব্যাপী যুগপৎ। আমাকে তোমার আলোর রূপ দেখাও, অন্ধকারের রূপ দেখাও। কি উজ্জ্বল আলো, কি স্নিগ্ধ অন্ধকার! চোখের পক্ষেও যেমন, জীবনের পক্ষেও তেমনি দুই-ই সমান উপযোগী।...তুমি আমি

অন্তরে বাহিরে নিরাবরণ। এই অনাবৃত, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত প্রেম আমাকে দাও। আসন করি (১৫০)। কালিকার উৎসবের জন্য মন্দিরে বসিবার কথা মনে হয়—কত আদর করিয়াই না পালন করিয়াছিলাম। আজ আমার আর নাই। রেণু ৫॥ টার পর বলিয়া আসে। সত্যেন শাস্ত্রী আসে ৫টায়···। খগেনবাবুকে পোষ্টার ও নিমন্ত্রণ পত্র দেখানো হয়, দাশরথিবাবুকে বক্তৃতা দিবার জন্য বলেন। বক্তৃতার সকল বন্দোবস্ত করিতে হইবে আমাকে, ঘাটে ঘাটে নিমন্ত্রণ করিতেও হইবে আমাকে। কেহ খবরও রাখিবে না। এই কি বিচার! সিনেট হলের সেই এ্যাডভোকেট ভদ্রলোক গিয়া ৬টার পর হাজির। তিনি 'ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ'—শ্লোকের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। যোগমায়াতত্ত্ব ব্যাখ্যা করি। দেহাত্মবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়তত্ত্ব সম্বন্ধে বলি। নারীর যে একটী মোক্ষদাত্রী রূপ আছে তাহা জোর দিয়া বলি। সকালে ইহাদের কাছে বলিতেছিলাম, 'আমি সৃষ্টের দলের নই, আমি স্রষ্টার লোক'। বুক-ভরা কি সৃষ্টির বেদনা, অপরিছিন্ন ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিবার কি উন্মাদ লালসা! প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছি, ভাঙ্গিয়াছি, বুকের রক্ত দিয়া পালন করিয়াছি। ত্রিভঙ্গের সমানধর্মী না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। আগাইবার উন্মত্ততায় ভাঙ্গিয়াছি। আবার গড়িয়াছি। কেহই আমার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাই। আমি চলিয়াছি বুক চাপিয়া ধরিয়া।

৯ই নভেম্বর

রাসপূর্ণিমা—নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন। ঠাকুর, সেই কবে ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী পথে বাহির হইয়াছিলাম ব্রজমোহন স্কুল ছাড়িয়া। পথ চাহিয়া চলিয়াছি, আজিও বিরাম নাই। সত্যব্রত সমিতি, বিশ্বকল্যাণ সভা, কংগ্রেস, স্বরাজসেবক সঙ্ঘ, গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী, আনন্দমঠ—শেষে নরনারায়ণ আশ্রম! কত মানুষ আসিয়াছে এই পথিকের সঙ্গে—সকলেই পথে কতখানি আগাইয়াও দিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা বসিয়া পড়িয়াছে—'আমরা বসিতে চাই' বলিয়া। কত আসিয়াছে, ছাড়িয়া গিয়াছে। বেদনা-ভরা কৃতজ্ঞতা লইয়া আমি চলিয়াছি। আমার পথ চলা ছাড়া গতি নাই। পথ, ওগো অনন্ত পথ—নরনারায়ণ আমার এই পথের সাথী। নিতাগোপাল, নিতাগোপাল, বুকে বল দেও পথ চলিবার। এ পথের যে শেষ নাই। আমার তো তোমার মহানির্বাণ মঠেও স্থান নাই। প্রতিক্রিয়াশীল ইহাদের লইয়া আমি কি করিয়া চলিব? পথই আমার গতি। আমার সম্প্রদায় নাই, জাতি, কুল নাই। আমি পথ বহিয়া চলিব—আমি পথিক—ইহাই আমার একমাত্র পরিচয়। নরনারায়ণ আমার বুকে। আসন করি। উমারেখা সকালেই আসে। বিরজা আসে। নীলু আসে কন্যাত্বয়সহ। নিতাব্রত মন্দিরে নিয়া আসে ১২টার পর। সুধাংশু আসে বৈকালে। মঠে যাই। ৫টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। আজ মঠের টিনের চালার ভিত্তি বাঁধানো আরম্ভ হয়। 'ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ' শ্লোক, 'জগো কলম্' শ্লোক ব্যাখ্যা করি। সকলেই বিবাহিত নারী ইহা a-social। তাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কিন্তু ইহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বিশ্বজনীন রূপও আছে। বিশ্বের অন্তরে বাহিরে রসলীলা গূঢ়। কাম repressed হয় না। তাই কাপুরুষের স্ত্রী ঘর ছাড়িয়া উপপতির খোঁজ করে। ইহারই সমাধান রাসলীলা। 'যোগমায়া'-র ব্যাখ্যা করি। যেখানে একান্ত স্বকীয়ত্ব—সেখানেই মায়া—পরকীয় প্রেমই যোগমায়া। 'মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে'। বিশ্বের প্রতিটী সম্বন্ধ পরকীয়। স্বকীয় করিতে চাহিলেই বলাৎকার করা হইবে। ইহাই সৃষ্টির গুহ্যতম কথা। 'দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্'। Equilibrium disturbed হইলেই কাম। কৃষ্ণ সুস্থ কাম। তাঁহার পরশে জীবন সুস্থ হয়। বরিশালে প্রথমবার গ্রেপ্তারের সময়কার ডেপুটি জেলার সুরেনবাবু ও অন্যান্য অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১০ই নভেম্বর

ওগো মদনমোহন, সুস্থ নির্বিকার জীবন, আমার জীবনবল্লভ, তোমার পরশে আমার জীবন সুস্থ হউক। জীবনে যেখানে equilibrium disturbed, যেখানে সর্ববৃত্তি সামঞ্জস্য হারাইয়া পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত, সেইখানেই

রোপ কামের উদ্ভব। তোমার ব্রজবধূদের সঙ্গে
লা শুনিলে, ধারণ করিলে কামের জন্মই হয় না।
একবার জন্মিলে তাহা দূর করা শক্ত। তোমার
ীদার মধ্যে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ—উচ্চ-নীচের, লোকো-
ার সাযোর—psychology রহিয়াছে, তাহা ধারণ
ল কাম থাকে না, আপনি গলিয়া যায়। মদনের
র বিশ্ব আজ ব্রস্ত। তোমার পরশে আলো ছড়াইয়া
। ধরার ধূলি হউক ব্রজ-ধূলি, ধরার মানুষ হোক
নুষ। আসন করি (১৫০)। ৪টার পর মঠে
তারিণীবাবুর পথচলার চং বদলাইলে তিনি মঠের
ং গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার টাকা আছে,
আছে, কর্ম করিবার শক্তিও আছে। ঐগুলিই নেতা
র যোগ্যতা। প্রাণও তাঁহার আছে। কিন্তু একটি
া আছে। গুরুভ্রাতাদের অশোভন কিম্বা মঠের
ুল আচরণকারী গুরুভ্রাতার সঙ্গে কি ভাবে শ্রদ্ধা
াও কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয় তাহা জানেন না।
। তীব্র দ্রোণকে গভীর শ্রদ্ধা করিয়া, পূজা করিয়াও
করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'সমোঽহম্
ভ্যু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি
ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'। অর্জুন দুর্যোধন
হইলেও ভক্ত বলিয়া অর্জুন আদরের, আর দুর্যোধন
কর্মক্ষেত্রে এই নীতি না অনুসরণ করিলে কোন
ই প্রচারিত হইতে পারে না। যখন মহাত্মাজী
ুর সঙ্গে pact করেন, তখন গান্ধীজীকে উপরোক্ত
লিখিয়াছিলাম। কোনও উত্তর দেন নাই।
ুল আচরণকারী প্রভুর পায় এমন কোনও ব্যবহার
া তাহা গুরু-চরণে অপরাধ করা হয়। এরূপ চলিতে
ল দুর্যোধনের হাতে রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া অর্জুনকে
যাইতে হইত। তারিণীবাবুরও হয়ত তাহাই
া আছে। যেই মঠ সেই মঠ থাকিবে। জওহরলাল
পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তবে কংগ্রেসের বাহির হইতে
সের সেবা করিতে পারিবেন—আলোচনা হয়।...
তো আমাকে কটাক্ষ করিয়াই বলা। ঠাকুর যাহা
রিও। তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম। ১০ই নভেম্বর

নিত্যগোপাল সখা আমার, এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে আমার জীবন-রথের সারথি তুমি। তোমার প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগী আমায় গড়িয়া তোল, তেমন যোগে যোগী কর তোমার বারতা দিকে দিকে পৌঁছাইবার জন্য। আমার সঙ্গী বন্ধু! তুমি বলিয়াছ, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'—তোমার মন দিয়া আমি মনন করিব, আমি তোমার ভক্ত হইব, আমার জীবন তোমার মাঝে আহুতি দিব, তোমায় নমস্কার, সকল দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহঙ্কার দিয়া নমস্কার, বার বার নমস্কার।...তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা যাহা আমার দরকার, তুমি আমাকে তাহা দেও—আমার এই আবদার পূরণ কর। আমাকে 'বিবেকানন্দ' হইতেও শক্তি দান কর। ওরা শ্লেষ করিয়া বলে, আমাদের 'বিবেকানন্দ' নাই। বিবেকানন্দ না হই, যাহা আমার আছে তাহা দিয়াই সেবা করিব।...বি, কে, পাল ৩ সপ্তাহ আসিতেছেন না। আর বোধ হয় আসিবেন না। নিজের অতীত সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করিয়া মানুষ কতদিন আর আসিবে? এমন 'টান' তো সৃষ্টি করিতে পারি নাই যে টানের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সর্বসংস্কার ছাড়িয়া আসিয়া যুক্ত হইতে পারে। ঠাকুর, আকর্ষণ করিবার শক্তি দেও, কৃষ্ণত্ব দেও। নহিলে কাজ হইবে কি করিয়া? মনস্তত্ত্বের চুলচেরা বিচারে তো ফুলাইতেছে না। আমার কি হৃদয় নাই? আমি কি সকলকে ভালবাসি না! আমি 'বুদ্ধিমানে'-র চেয়েও কি 'প্রাণবান' বেশী নই? ঠাকুর, আমাকে তোমার আকর্ষণী শক্তি দেও যাহাতে মানুষ আর আমাকে ছাড়িতে চাহিবে না। জয়ার আসার কথা ছিল, অপেক্ষা করিলাম। আসিল না। ১২ই নভেম্বর

ভগবানেরও ভজনীয় যিনি তুমি রাধারাণী। তাই তুমি মহাভাবস্বরূপিণী আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ। যাহা ছিল এতদিন 'means' রস (প্রকৃতি), তাহাই আজ 'End' (পুরুষ ভাব)। এই বিপরীত রতি বিশ্বের বুকে চলিতেছে। ভাব-কৃষ্ণ আজ বিপরীত রতিতে রস-কৃষ্ণ। রস-রাধা আজ ভাব-রাধা। ভাবই তো পুরুষের ধর্ম, রস হইতেছে পরিণামিনী প্রকৃতির ধর্ম। ভাবময় গোলোক

রসরাজ আজ ধরার ধূলিতে অবতীর্ণ। গোলোকের ঠাকুর আজ জীবের প্রেম-ভিখারী—জীবের সখা সাথী বন্ধু শরণ সুহৃৎ স্বামী। শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয় ধন শ্রীরাধা। গোলোক বৈকুণ্ঠের ভজনার ধন এই মাটি। বড় আজ ছোট, ছোট আজ বড়রও বড়। ঠাকুর, তোমার আসনে তুমি আমায় টানিয়া লইয়াছ, আমাকে তোমার চাচে গড়িয়া তোল। তোমার শক্তিরূপে পরিণত না হইলে, তোমার 'আমি'-র মধ্যে প্রবেশ না করিলে কেমন করিয়া তোমার কাজ করিব? তোমাকে যেমন মানিব, আমি যদি তোমার 'আমি' বনিয়া যাইতাম, তবে আমাকেও সেইরূপ মানিত। না মানিলে—সঙ্ঘর্ষের পথে কাজ কেমন করিয়া করিব? আমি তোমার 'আপন' হইব, 'স্ব' হইব, তোমার বিকাশ হইয়া বুঝিব। আসন করি (১৪০)। ৯টায় মনোরঞ্জন গুপ্ত ও হীরালাল দাশগুপ্ত আসে। ২ ঘণ্টা কথা হয়। প্রথমে আমার ব'সে দিবার কথা, তাহারা একদিন বরিশালে আমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদিগকে আবার আমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা - নিত্যগোপাল ও রামকৃষ্ণের differentia—বিদ্যাতত্ত্ব ও অবিদ্যাতত্ত্বে নামার কথা—নিত্যগোপাল-অরবিন্দের মধ্যে পার্থক্য—descent ও assent যে মনঃকল্পিত—অস্পৃশ্যতার জন্য দায়ী শুদ্ধ-কৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য—সোহহংবাদ ও অধ্যাত্মবাদে রাসলীলার মধ্যে সমন্বিত—বুদ্ধের অবিদ্যা ও শঙ্করের অবিদ্যা কিভাবে 'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন' শ্রীনিত্যগোপালের এই বাণীর মধ্যে সমন্বিত—ইত্যাদি আলোচিত হয়। শতবার্ষিকীর সাহায্যের কথা বলি। ইহারা রীতিমত গীতা-ক্লাশ করিতে বলে গীতা-ভবনে। বেলা ৪টায় জয়া আসে রেবুর পরীক্ষা-পাশের সন্দেশ রাজভোগ ও দুটি টাকা লইয়া। উপরের শিশুদিগকে দেওয়া হয়। জয়ার সঙ্গে বাহির হই—আমি মঠে যাই, সে বাড়ী যায়। নবদ্বীপের সভার পোষ্টার আজ আসিয়াছে, আবেদনও আসিয়াছে। চিঠিও আসিয়াছে। শতবার্ষিকী তহবিল হইতে ৬০৲ টাকা দিয়াছে। নীলরতনবাবু ১০৲ টাকা দিলেন। পোষ্টারে ২০৲ টাকা লাগিল (৪ শত)। ১৩ই নভেম্বর

পরাণপুতলী রাধারাণী আমার, তুমিই 'মধ্যম প্রাণে'র শক্তি, জীবন-নদী দুকূল আলিঙ্গিয়া, দুকূল ভাঙ্গিয়া, দুকূল জড়াইয়া, দুকূল ছাড়িয়া অনাদি অনন্তে উন্মাদিনী বেগে ছুটিয়াছে। কোনও কূলে তুমি আটকাইয়া পড়িলে না, তুমি সর্বসঙ্গ অসঙ্গ, সর্বলিপ্ত অলিপ্ত। আজ বিশ্ব মনের স্তর—Law of excluded middle-এর স্তর—ছাড়িয়া প্রাণের স্তরের জন্য, প্রাণস্পর্শ লাভ করিবার জন্য পাড়ি জমাইয়াছে। ওগো প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, মহাপ্রাণ - ধরা দেও তোমার সমগ্রত্ব লইয়া। মন বুদ্ধি postmortem dissection policy লইয়া চলিয়াছে। Dissection করিলে রস বাহির হইয়া যায়, তখন আর জোড়া লাগান যায় না। প্রাণ আমাদের উপাস্য। সে অখণ্ডত্ব বজায় রাখিয়াই বিশ্লেষণ করে। তুমি 'অখণ্ডিত'। মন-বুদ্ধি তাই সমগ্রের উপাসনায় ব্যর্থ। একবার descend ও ascend রূপে দ্বিধা ভাগ করিলে সমগ্র প্রাপ্তি অসম্ভব হইবে। আরম্ভও সমগ্র হইতে করিতে হইবে। সমগ্র জীবনেও রস বহির্মুখী হয়, অন্তর্মুখী হয়। মনের বিভাগ bloodless category মাত্র। প্রাণ হইতেই যাত্রা সুরু, প্রাণেই পরিসমাপ্তি। আসন করি। আজ সন্ধ্যার পর রেণুর ৩১ খানি ক্লাশ VI এর বাঙ্গলা rapid reader পড়া শেষ হয়। ৪টার পর আমি কুসুম ও প্রতিভা মঠে যাই। ৪৸টায় ধীরেনবাবুর গান্ধারী চরিত (মহাভারত) আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৮ দিনই দুর্যোধন গান্ধারীর কাছে যুদ্ধ-জয়ের বর চাহিয়াছিলেন। ঐ ১৮ দিনই গান্ধারী 'যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ' বলিয়াছিলেন। ১০০ পুত্র মারা যাওয়ার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকেই ইহার জন্য দায়ী মনে করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে তোমার বংশও ধ্বংস হইবে, তুমি মরিবে বীভৎস মরণ। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতেন, মাথা পাতিয়া নিয়াছিলেন। নগেনবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও হরিস্মরণানন্দের ইচ্ছায় একজন নরওয়েজিয়ান সাহেব মন্দিরের বারান্দায় এদেশী নর্তক-নর্তকীর নাচসহ মহানির্বাণ মঠের ফটো নিয়া গিয়াছে দুপুরের পর। এমন ব্যক্তিত্বশূন্য মানুষ মঠের একজন কর্মকর্তা! সকল দুর্নীতির প্রশ্রয় ইহারা দেয়, ইহাদের

নিজেদের কোনও নীতি-বোধ নাই। ইহাদের সম্পর্কীয় কাহারও কোনও স্থায়ীনতা নাই। মঠের ধ্বংসের কারণ ইহারা। তবে ভরসা এই যে এখন ইহার আলোচনা (?) মধ্যে হয়। প্রতিটী ঘটনার আলোচনা আজ হয়। ৮টায় ফি'র। শ্রোতা সব শুদ্ধ ৭০ জন হইবে।

১৪ই নভেম্বর

নিত্যগোপালে, সঙ্গী আমার, তুমি শুনাইয়া গিয়াছ—'শরৎ, তুমি যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'। কত মানুষ আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, আঘাতে আঘাতে আমার দেহমন ভাঙিয়া যাইতে পারিত যদি না তুমি আমাকে বুকে করিয়া রক্ষা করিতে। আমি তোমার পাদুকাবাহী ভৃত্য, পতাকাবাহী (?), তোমার পাদপদ্ম শিরে বহিয়া বুকে ধারণ করিয়া আজও যে চলিতে চাহিতেছি তাহা শুধু তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। আজও যে কাঁপাইয়া পড়িতে চাই, তাহা তো শুধু তোমার স্পর্শের ফলে। বুকে আজও যৌবন বোধ করিতেছি। কিন্তু দেহে তো আর যুবক নই।... শুধু ১০টায় প্রেসে যায়।...বৈকালে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার বরিশালে জেল হওয়ার সময়কার ডেপুটী জেলার) যাসেন। কেন আমি কংগ্রেস ছাড়িয়া এই পথে প্রবেশ করিলাম তাহা ব্যাখ্যা করি। অস্পৃশ্যতাবর্জন প্রভৃতি প্রোগ্রামে কংগ্রেস আটকাইয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ ী, আর, দাস প্রভৃতিদের 'no method is too mean'-র সঙ্গে লড়াইও কংগ্রেস-ত্যাগের কারণ। দার্শনিক ফটা বিপ্লব ব্যতীত কিছুতেই এ জাতির সত্যিকার গ্রগতি সম্ভব হইবে না। তাই আলীপুর সেণ্ট্রাল রলে থাকাকালীন উপনিষৎগুলির ভাষ্য লিখি। তাহাকে লা ও ছানা খাইতে দেওয়া হয়। আষাঢ় হইতে কার্তিকের জ্বলন্ত ও ১খানি উপোপনিষৎ শেষ। মঠে যাই। গেনবাবুর সঙ্গে তাঁহার দীক্ষাকালীন বিবরণের কথা হয়। াত্রি ১২টার পর রাসপূর্ণিমার সময় সরোজ অধিকারী । নগেনবাবু তাহাদের এক বন্ধুসহ আমপুলিয়া পাড়ার াজমে যান। ঠাকুর ভাত সামনে নিয়া বসিয়াছিলেন। হইতে আসিয়াছে'? নগেনবাবু ও সরোজবাবু প পরের দিন নগেনবাবুর দীক্ষা হয়। দীক্ষার সময় তাঁ ভাবান্তর হয়, অনেকক্ষণ বেহুঁসের মত থাকে তারিণীবাবু সিঁথী গিয়াছেন, দেখা হইল না। কথা বলিবার ছিল। কি করিয়া ইহাদের নিয়া র করিব? আমার হইয়াছে মরণ। ঠাকুর, ঠাকুর দেও। ব্রহ্মানন্দবাবু নবদ্বীপ উৎসবের জন্য ১০ টা দেন।... ১৫ই নভে

ঠাকুর, ...তুমি নিজে না খাইয়া আমাদের খাওয়াইয় সমানভাগে ভাগ করিয়া খাইয়াছ—তবুও তো আ তোমার হইলাম না। আমাদের প্রতি জনে জনে কল্পনাই তুমি প্রদর্শন করিয়াছ? আজ সব ভুলিয়া নিজে ছোটছোট কামনা লইয়া কি না করিতেছি!...তোম প্রকাশ করিবার মত বল দেও, বীর্য দেও। তুমি 'সর্বভূ গূঢ়:' মদনমোহন—আমার নিগূঢ় ধন প্রকাশিত হও, আ মদনমোহন হইব। আসন করি (১৫০)। আজ রে ৩১ খানা rapid reader-এর review করা ও ত লেখা শেষ হয় রাত্রিতে।...শ্রীনিত্যগোপালের এত যুগসংগঠনকারী দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ইহার অধিক হইয়াছি, ধন্য হইয়াছি। আজ ইহাদিগকে বলি, আম জড়াইয়া থাকিও, দূরে দূরে থাকিও না। এই বি কয়জন এই দর্শন পাইয়াছেন, তাহা জানি না। অ ঠাকুরকে কি চক্ষে দেখিতাম তাহা আমার চিঠিগুলি (তাঁহার নিকট লিখিত) ব্যক্ত করিয়াছি। সেই সব তাঁহার ভক্তদের শুনাইয়াছেন। প্রকারান্তরে আমার য তাঁহার সম্পর্কের খবর ইহাদের নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছে আমার বুকভরা এত সাহস, এত উন্মাদনা, সকল র ডিঙাইয়া আগাইবার জন্য এত প্রাণপণ প্রচেষ্টা এক ঠাকুরের স্পর্শ হইতেই পাইয়াছি। একদিন য দেখিয়াছি—আমি যেন মশারী খাটাইয়া শুইয়া আ ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, 'ওঠ, আমায় খাব'। অ বলিলাম। আমি তো শক্তির উপাসক। ঠাকুর বলিতে 'শক্তি তো আমারই শক্তি। ওঠ, আমায় খাব'। অ

ঠাকুর আমাকে টানিয়া বাসে লইয়া, রাধারূপ দান করিয়া দেখাইলেন।... রাধারূপ দেখিলাম। এই স্বপ্ন তাঁহার নিকট বলা হইয়াছিল। আমার রূপ-স্বরূপ রাধারূপ আস্বাদন করিতেই হইবে। কুমারের বাবা প্রিয়নাথ মৈত্র বৃন্দাবনে একদিন বলিয়াছিলেন—শ্রীনিত্যগোপাল যদি গৌর হন, তবে আপনি নিশ্চয়ই গদাধর। বৃন্দাবন যেন আমার কত পরিচিত; আমি আর বৈকালে মঠে যাই না। সকালে মঠে গিয়াছিলাম। তারিণীবাবু নবদ্বীপ গিয়াছেন।

১৩ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে সারাজীবন খুঁজিয়া বেড়াইলাম, কলিকাতার বুকে সত্যব্রত সমিতি, পরে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুলে কার্যে করাকালীন বিশ্বকল্যাণ সভা, পরে বরিশালের কংগ্রেস, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ, পরে আনন্দমঠ, কলিকাতায় গৌরাঙ্গগোষ্ঠি ও সর্বশেষ নবনারায়ণ আশ্রম করিলাম। সঙ্ঘরূপে তোমাকে তো পাইলাম না। দেখা দেও প্রাণ-সঙ্ঘ রূপে। তুমি মহান মহীরুহ, আমি তাহাকে জড়াইয়া আছি ক্ষুদ্র লতিকা। তোমার পরশে আমি পত্রপুষ্প সুশোভিত, তোমার আদরে আমি বাড়িব, সুন্দর হইব। তোমার পরশে আমি মহান হইব। তুমি লিখিয়াছ, 'এই বিশ্ব আমার মহামঠ'। তোমার এই বিশ্ব-মহামঠে আমি তোমার পূজারিণী,...। হরিস্মরণানন্দ তারিণীবাবুর পিছনে লাগিয়াই আছে। তারিণীবাবু কফির বাগান করিয়াছে, সেই আয় দেখিয়া কর্পোরেশান ট্যাক্স বসাইতে পারে, অতএব কফির চাষ বন্ধ রাখা হউক। কি আর হয় যে কর্পোরেশান ট্যাক্স বসাইবে? এমন নোংরা ইহারা?...সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ গৃহস্থ ক্ষিতীশবাবুর কাছে করা হইয়াছে, অতএব সন্ন্যাসীরা উহা বয়কট করিয়াছে। ষোলহয় গৃহস্থ খগেনবাবুর নিমন্ত্রণ (নবদ্বীপ সভার জন্য) পাইয়া ইহারা সেখানে কেহ গেল না। চিদানন্দ তো গতবার কতবার সন্ন্যাসীর দ্বারা নিমন্ত্রণ করার কথা বলিয়াছে। মঠ হইতে বেদনা পাইয়া আসি। ওখানে যেন যাইতেও ইচ্ছা করে না। কি করিব, ঠাকুরকে নিয়া বিপদে পড়িয়াছি: না গিয়া তো পারি না।

১৭ই নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি কি অপরিচিতই থাকিয়া যাইবে? কাঁথা মুড়ি দিয়াই কি চলিয়া যাইবে? তোমার মঠের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে কেমন করিয়া যে তোমার মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশিত হইবে, তাহা বুঝি না। সকলেই তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছে। অথচ তোমার নাম করিয়াই যে যাহার অভিসন্ধি লইয়া চলিয়াছে। এমন খল প্রকৃতি হইয়াছে। ওগো খলসংখলনাবতার, তোমার প্রেমযমুনার এক পাশে ইহারা বিষাক্ত একটী হ্রদ তৈয়ারী করিয়া বসিয়াছে। কে ইহাদের সংযমন করিবে তুমি ছাড়া? তুমি 'অদৃষ্টচেষ্ট' ও 'প্রধ্যানবপুঃ' যদি হইতে, যদি মহিমায় ও মাধুর্যে তুমি বাড়িতে থাকিতে (আমি তো তাহাই চাই) তবে দল কালীয় সুস্থ হইত। ঠাকুর, কেন আমার বুকে এত তাড়না, এত বেদনা দিলে যদি তুমি প্রকাশিতই না হইবে? আমায় পথ দেও, শক্তি দেও।...নবদ্বীপ যাইবার প্রস্তুতি হইতেছে...। সেবানন্দ কালী মহারাজের সেবা করিবে তাহার শরীর ভাল না থাকিলেও, কিন্তু ক্ষিতীশবাবুর করিবে না—ইহা নিতান্ত অন্যায় কথা। আমি ইহা বরদাস্ত করি না। সেবানন্দকে বলি—আমারও তোমার কাছ হইতে কোনও সেবা নেওয়া চলে না, আমি এ ভেদবুদ্ধি বুঝি না। তাহার পর রাজী হয়। আসিবার কালে নগেনবাবু, ব্রহ্মপতিবাবুর কাছে আশীর্বাদ কামনা করি। নগেনবাবুকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে যাই, তিনি দেন না। তাঁহার চক্ষু ছলছল। আজ সকালে 'জীবন-দেবতার'-র শেষ লাইন শুনি—'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আবার নবীন জীবন-ডোরে'। নবদ্বীপে আবার নূতন বিবাহ হইবে, নূতন করিয়া যাত্রা সুরু হইবে। কুসুমকে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করার কথা বলি সকালে। মাখনবাবু আসিয়াছিল। সে স্থায়ী হইয়াছে, ইন্টারভিউতে সফল হইয়াছে। তরকারী কিনিয়া উপরে দেওয়া হয়। কাল সকালে উপরে খাইব।

১৮ই নভেম্বর

ক্রমশঃ

মা

॥ শ্রীকৃত্তিদাস সাহা ॥

ক'দিন ধরেই দেখছিলাম মহিলাটিকে। দেখছিলাম যাতায়াতের পথে দমদম ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে। মহিলাটি আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে। সদ্যাগতা যে তা সহজেই ধরা পড়ে, পুরোনোদের সঙ্গে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। চেহারায় গৃহ-জীবনের চিহ্ন তখনও মিলিয়ে যায়নি, অপরিচ্ছন্নতার গ্লানি তখনও দেহ-মন ছেয়ে ফেলেনি।

একটি ছেঁড়া মাদুরে বাস করছেন মহিলাটি ষ্টেশনের এক কোণে। একাকিনী নন মহিলা। সঙ্গে দু'টি সন্তান দু'টিই পুত্র সন্তান—বড়টি বছর তিনেকের, ছোটটি মাস দুয়েকের। উভয়ের ছুটছুটে চেহারা গায়ের রং কর্সা, চোখ দু'খানি ভাগর ভাগর, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, দারিদ্র্যের ছাপ তখনও পড়েনি দেহে, সৌন্দর্যের চিহ্ন তখনও সারা গায়ে। ছেলের নিয়ে মা সংসার পেতেছেন ওখানে। সংসার শুরু হয়েছে কয়েকটি থালাবাটি আর একটি মাই-পোষ নিয়ে।

ওতেই সংসার চালিয়ে নিয়েছেন মহিলাটি। যতদিন দেখেছি তার অধিকাংশ দিনেই দেখেছি ওঁকে দুধ গরম করতে, নয়তো শিশুটিকে কোলে করে মাই-পোষে দুধ খাওয়াতে। বড় ছেলের দুধও খাওয়াতে দেখেছি কোন কোন দিন। বড় ছেলেটি পাশেই বসে থেকেছে, মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে। ওকেও অনেকদিন দেখেছি ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে, ভাইয়ের কান্না থামাতেও দেখেছি কখনও কখনও। তখন মহিলাকে দেখিনি ওখানে, কোথায় গিয়েছেন সে হিসাব রাখার আগ্রহ আগেনি কখনও। কিন্তু চোখকেও এড়িয়ে যায়নি। ওঁকে কয়েকদিন দেখেছি দ্বারে দ্বারে—ভিক্ষে করতে।

দেখে একটু ভেবেছি। ভেবেছি মহিলার দিকে চেয়ে। কিছুদিন আগেও ওর ঘর ছিল, ছিল একটা সুন্দর সংসার। [illegible] বাংলা তথা ভারতের নিম্ন মধ্যবিত্তেরা বুঝি অসহায় এ ভাবেই পথে বেরিয়ে আসে একদিন। দেখেছি ভেবেছি। মনে একটু বেদনার উদ্রেক যে না হয়েছে নয়। ঐ পর্যন্তই। তারপর অন্য ভাবনা এসে ভাবনা চলে গিয়েছে, ভদ্রমহিলা কোথায় মিলিয়ে গিয়ে

কিন্তু আজও মিলিয়ে যায়নি সেদিনের স্মৃতি—। যাবেও না কোন দিন।

ষ্টেশনে গিয়েছি। দেখছি অদূরে ভীড় জমে উ উঁকিঝুঁকি মারছে অনেকে। চলার পথে একবা দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে রেখে যাচ্ছে নি মন্তব্য।

একজনকে বলতে শুনলুম—মারবে তবুও বাঁচতে না।

অপর ব্যক্তির মন্তব্য—বাস্তব বুদ্ধির একান্ত অ এমনটি হচ্ছে। তা না হলে এমন দুর্মূল্যের বাজারে যখন তিন টাকা কিলো, তখন কি এ সুযোগ কেউ ছা

আর একজন বললে—মহাভুল করছে মেয়েছে এখন ও বুঝতে পারছে না, কিন্তু বুঝতে পারবে পরে।

মেয়ে-ছেলেটা? কেমন যেন চিন্তা হলো অ ঔৎসুক্য হলো। তবে কি সেই মহিলা?

অগ্রসরে এগিয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, সেই মহিলাই। ওঁকে ঘিরে যেন লোক পড়েছে, স্থানটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে।

চারিদিক থেকে উপদেশের বর্ষণ হচ্ছে মহিলার উপ

শুনছ গো মেয়ে, এ সুযোগ তুমি ছেড়ো না। ব বলছি এ ভুল তুমি করো না।

আর একটি উপদেশের কণ্ঠ—তুমি বাঁচাতে [illegible]

অন্য একজন বলে উঠলো—যা হয়ে তুমি কি চাও না তোমার ছেলে বেঁচে থাকুক ?

আর একটি—এমন ধৃতিভ্রম তোমার হচ্ছে কেন ? নিষ্ঠুর বাস্তবকে অস্বীকার করছ কেন ?

এই রকম নানা উপদেশ, নানা আদেশ। একলব্য মুরুব্বিয়ানা।

কিন্তু সে-দিকে খেয়াল নেই মহিলার। দৃষ্টি নেই কোন দিকে। ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তিনি। চোখে মুখে ভয়ানক ভীতি। প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে যেন সন্ত্রস্ততায়। আতঙ্কে অস্বাভাবিক হয়ে গেছেন মহিলা। ছেলেটিকে ওরা ছিনিয়ে নেবে এই আতঙ্ক ওঁর মনে। মুখমণ্ডলে তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। চারিদিকের লোকগুলো ওঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত জনটাই যেন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটা তখনও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি।

পাশের একজনকে শুধালাম—ব্যাপার কি বলুন তো ?

বলতে পারলেন না তিনি।

জিজ্ঞাসা করলাম অপরকে।

জানেন তিনি। বলতে থাকলেন—এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোক এসেছিল ওর কাছে। অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে তার। কিন্তু অভাব ওর সন্তানের। তাই এসেছিল এই মহিলার কাছে, ছোট-ছেলেটির জন্যে। বিনিময়ে দিতে চেয়েছিল পাঁচ শ টাকা। কিন্তু রাজী হয়নি মহিলা। একদিন নয় আজ নিয়ে তিন দিন এলো সেই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক। অনুরোধ করল বারবার। মহিলা প্রত্যাখ্যান করলো সে অনুরোধ। ভীত হলো সে। কেঁদে ফেলল অহঙ্কারে।

থেমে গেলেন লোকটি।

আমি শুনছিলাম শুধু, বলতে পারিনি কিছু।

ফিরে এসেছিলাম সেদিন।

পরদিন গিয়েছিলাম, তারপরেও।

কিন্তু মহিলাকে আর দেখতে পাইনি সেখানে।

একটী কথা

'উজ্জয়ন্তভারত' পত্রিকার পাঠক ও অনুরাগীদের প্রতি আমাদের এক আবেদন আছে—আজ চব্বিশ বৎসর উজ্জয়ন্ত ভারত চলিতেছে—নানা ঘটনাবর্ত ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছিল। উজ্জয়ন্তভারত-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ হেরো বৎসরাধিক কাল দেহে উপস্থিত নাই, তবু ইহা চলিতেছিল। যে অধ্যাত্মবাদ বিকৃত হইয়া মানুষকে অনুজ্জীবিত করার পরিবর্তে কূপমণ্ডুক করিয়া ক্লীব বানাইয়া তোলে, যে অধ্যাত্মবাদ বাস্তব জগৎকে মায়া মিথ্যা বলিয়া পরকালে অনন্ত সুখভোগের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া মানুষকে পরগাছা করিয়া রাখে, সে অধ্যাত্মবাদের কথা যেমন উজ্জয়ন্তভারত কখনও বলে নাই, দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়া তীব্রভাবে এই জীবন-বিমুখতাকে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, আবার যে জীবনমুখিতা মানে ভোগসর্বস্বতা, কেবল 'আছি পরিব থাকিব সুখে'র মনোবৃত্তি, সে ভোগবাদও যে মানুষকে ক্লীবই বানাইয়া দেয় তাহাও আমরা বলিয়া আসিয়াছি। এই দুই ঐকান্তিক চিন্তাধারাকে সমন্বিতভাবে সামঞ্জস্যভাবে সুসমঞ্জস মাত্রাবোধের মাধ্য গ্রথিত করিয়া জীবনকে সর্বভূতের সেবামুখী করিয়া আনন্দময় করিবার প্রচেষ্টাই আমরা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বর্তমান দুর্যোগের মধ্যে আমরা এ প্রচেষ্টাদ্বারা এমন পরিবেশ—এমন অঞ্চল, লোকবল—সৃষ্টি করিতে পারি নাই যাহাতে আমরা উজ্জয়ন্ত-

ভারতকে চালাইয়া নিতে পারি। পক্ষান্তরে বিভিন্ন রকম কাজের চাপ এবং ঘটনার প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত থাকিতে হইতেছে। এমতাবস্থায় উদ্বোধনের আগামী ২৫শ বর্ষ হইতে অর্থাৎ ১৯৭২ হইতে ত্রৈমাসিক হিসাবেও বাহির করা সম্ভব হইবে কি না বুঝা যাইতেছে না। যদি পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যে লোক ও অর্থ উদ্বোধনের জন্য সংগৃহীত না হয় তাহা হইলে গভীর বেদনার সঙ্গে আমাদের চলা বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

উদ্বোধন নরনারায়ণ আশ্রমের এই চিন্তাধারাকে জনের কাছে উপস্থিত করিবার কাজ একেবারে বন্ধ করিবে এমনও আমরা ভাবিতে পারিতেছি না—বৎসরে একটী সংখ্যা পূজার সময় বড় করিয়া করিবার বাসনা ও চেষ্টা আমাদের রহিয়াছে। কিংবা পত্রিকার অবয়ব আরও ছোট করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখা ঠিক কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যে ১১খানি উপনিষৎ ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ৯ খানা ছাপা হইয়াছিল, বাকি দুইখানা—বৃহৎ কলেবরের বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য—এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। ঐ দুইটী মুদ্রিত করিবার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা সকলের নিকট ঐ দুইটীর কথা জানাইয়া রাখিলাম।

উদ্বোধনে মানবসেবী স্বদেশবাসীর যে সমস্যা পঞ্চাশেতী গণতন্ত্র সমন্বীয় সকল দেশের সকল মানুষের জন্য অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আলোচনা চলিতেছে আমরা সকলকে সে আলোচনা উপলব্ধি করিয়া সেইজন্য চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

"সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা, তারই সঙ্গে সঙ্গে যে, লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে—সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চেলা।"

"আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানিনে।"

".....যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র—সবচেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।"

—ফাল্গুনী, রবীন্দ্রনাথ

বাটার সর্বাধুনিক ওয়েদারপ্রুফ জুতো

বাটার ওয়েদারপ্রুফ জুতো টেকসই হবার তৈরি তাই মহিলে
কষ্টকল্পিত হয় না। তিরতির উৎকৃষ্ট কাপড়ের আস্তর এর ভেতরে
বৈশিষ্ট্য বৃষ্টির মধ্যে হাঁটবার সময়েও পায়ের
আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে সারাক্ষণ।
তাই আজই বাটার দোকানে যেয়ে
নিন আপনার মনের মতো একজোড়া
ওয়েদারপ্রুফ জুতো।

মডেল ৬৭৫
১৭.৯৯

ওয়েদার কম্বিনেশন
৮.৯৯

ওয়েদার স্পোর্টস
৮.৯৯

ওয়েদার স্পেশালিস্ট কম্বিনেশন
১.৯৯

মডেল ৭৫
১৪.৯৯

Bata

ভাষাশিল্পী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) ৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৭·৫০
ঋষিবাণী ১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১·০০
ভারত-আত্মার বাণী ৬·০০
Soul of India Speaks ৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০
পকেট গীতা ৫·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ ১·৫০
বিদ্যাসাগর ২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী ৩·০০
বীরত্বে বাঙালী ২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪·৫০
বাংলার ঋষি ৩·৫০
বাংলার বিদুষী ৩·০০
বাংলার মনীষী ১·৫০
জীবন গড়া ·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন ২·৫০
আচার্য জগদীশ ২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ২·৫০
রবীন্দ্রনাথ ২·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

সব মানুষের জন্য-সব কলমের জন্য
সুলেখা

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু
রেড ★ গ্রীন

সুলেখা
একজিকিউটিভ
পার্মানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীন
ব্রাইলেন্ট রেড

সুলেখা
জেনারেল
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল :
রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহাদ

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৮, ১৯৭১ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র চতুর্বিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
ব্রহ্মর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	২·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

সব মানুষের জন্য·সব কলমের জন্য

সুলেখা

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু রেড ★ গ্রীণ

সুলেখা
একজিকিউটিভ
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীণ ক্যারমেট রেড

সুলেখা
জেনারেল
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল : রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

উজ্জ্বলভারত

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭১ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ ও অপূর্ণ

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে প্রেমে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি পূর্ণানন্দময়, আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। কিন্তু চৈতন্যে ও আনন্দে এমন যে 'পূর্ণ' আমি, সেই আমাকেও রাধাপ্রেম উন্মত্ত করে। আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও 'জানি না' রাধার প্রেমে কত বল আছে, যাহা আমাকে সর্ব্বদাই বিহ্বল করিতেছে। আমি পূর্ণ হইয়াও উন্মত্ত, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূঢ়, পূর্ণ হইয়াও বিহ্বল।

যে রাধাপ্রেম 'পূর্ণ' শ্রীকৃষ্ণে উন্মত্ততা, মূঢ়তা ও বিহ্বলতা আনিয়া দিয়াছে, সেই রাধাপ্রেমের বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন—

"রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা হইতে গুরু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—যে রাধাপ্রেম 'বিভু' বলিয়া বাড়িবার ঠাঁই নাই, সেই রাধাপ্রেম ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়াই চলিয়াছে, যাহার অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু আর হইতেই পারে না, সেই রাধা-প্রেমই ঐশ্বর্য্যলেশ সম্পর্কশূন্য, নিতান্ত সহজ। যাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্ম্মল স্বচ্ছ আর দ্বিতীয় কোন-কিছুর কল্পনাই করা যায় না, সেই রাধাপ্রেম সর্ব্বদাই বাম্য অর্থাৎ প্রতিকূলতা এবং বক্র ব্যবহারদ্বারা জটিলতাপূর্ণ, বিদগ্ধতে 'একত্র মিলন'।

কিন্তু এই পূর্ণতা, মূঢ়তা ও উন্মত্ততার আশ্রয় (synthesis) কে হইতে পারেন, এবং কাহার জীবনেই বা প্রেমের বিভুত্ব ও ক্রমবর্দ্ধমানতা, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মূঢ়ত্ব সমন্বিত হইয়া মিশিয়া উঠিয়াছে, তাহারই সন্ধান দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"আমি যৈছে পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেমন পূর্ণতা ও উন্মত্ততার, সর্ব্বজ্ঞতা ও মূঢ়তার, পূর্ণতা ও বিহ্বলতার আশ্রয়, ঠিক তেমনি বিভু প্রেম ও তাহার ক্রমবর্দ্ধমানতা, গুরু হইয়াও প্রেমের গুরুত্ব বর্জ্জিত হওয়া, সহজ প্রেমেরও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলা রাধাজীবনে মূর্ত্ত, ঘন হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ণের সৃষ্টি-প্রয়োজন বিমূর্ত্ত বুদ্ধির কাছে অবোধ্য

আজ শ্রীকৃষ্ণের মুখে একি অসম্ভব রহস্যের কথা শুনিতেছি? যিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, তাঁহার ভিতর হইতে কোনও সৃষ্টির 'তথা'ও কি কেহ এতদিন যুক্তিতর্ক দ্বারা কল্পনায় আনিতে পারিয়াছেন, আনন্দ-আস্বাদন তো দূরের কথা? যিনি 'পূর্ণ', তাঁহার কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। 'প্রয়োজন' যাহার আছে, সে নিশ্চয়ই অপূর্ণ। পূর্ণ কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্টি করিবেন? অপূর্ণই নিজকে পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে বাহিরের বস্তু লইয়া টানাটানি করে—ইহাই তো সর্ব্বত্র দেখিতেছি। পূর্ণের এইরূপ প্রয়োজনের টানাটানি কি করিয়া সম্ভব? পূর্ণের একটা কিছু 'প্রয়োজন' স্বীকার করিলে 'পূর্ণ' হইতে দ্বিতীয় এমন কোন বস্তুর অস্তিত্বের স্বীকৃতিও আপনা আপনি আসে, যাহার টানে 'পূর্ণ'ও উন্মত্ত ও বিহ্বল হইতে পারেন।

পূর্ণ বলিয়া যিনি 'এক' ও অদ্বিতীয়, তাঁহার পাশাপাশি দ্বিতীয় 'অনেক' বস্তুর কল্পনা কি করিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি (abstract intellect) করিবে? যাহা 'এক', তাহা একই। এক কখনও বহু হইতে পারেন না; বিশু বিশুই, তিনি কখনও অংশে অংশে থাকিতে পারেন না। তবে যে শ্রুতি বলিতেছেন—"একোঽহম্ বহু স্যাম্—'এক আমি বহু হইব'—উহার অর্থ হইতেছে এই যে, বস্তুত 'এক' একই রহিয়াছেন, আমরাই শুধু কল্পনার দৃষ্টি লইয়া অবিদ্যার পাকে পড়িয়া একের উপর বহুত্বের আরোপ করিতেছি, যেমন করিয়া মানুষের সর্পতে রজ্জুভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্তানুযায়ী দ্বৈতদর্শন ভ্রমদর্শনই হয়, ভ্রমবিদ্যার দূরীকরণ হইলে একবে 'এক' বলিয়াই বোধ হইবে, বহুদর্শন নিরস্ত হইবে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এই সংসারে 'নানা' (অনেক) বলিয়া কিছুই নাই—এই শ্রুতিবাক্যের ভিতর। 'নানা' বলিয়া কিছুই যদি বস্তুতঃ না-ই থাকে, তবে 'নানা' বলিয়া যাহা দেখিতেছি, তাহা তো নিশ্চয়ই অবস্তু, মিথ্যা। অতএব এই 'নানা'-দর্শন, অবস্তু-দর্শনের হাত হইতে রেহাই পাওয়াই মুক্তি। ইহা অদ্বৈতবেদান্তবাদীদের প্রচলিত ব্যাখ্যা।

পরস্পরবিরোধীদের যৌগপদ্য সম্ভব—শ্রীকৃষ্ণবাণী

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সব পরস্পরবিরুদ্ধদের সমন্বয়ের রহস্যই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। যে মতবাদের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়া, তাহার মূল কথা হইতেছে যাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ, তাহারা কখনও পরস্পরসমন্বিত হইতে পারে না। যাহারা antagonistic (বিরুদ্ধ), তাহারা কি করিয়া complementary (পরিপূরক) হইবে? বিরুদ্ধও যে পরস্পরেরই একটী দিক, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সে দিন বিশ্বে আসিবার সুযোগ পায় নাই। যাহারা সে যুগে বিরুদ্ধকে শুধু বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াই সর্বসমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই যুগে সর্বপ্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিরুদ্ধদের মাঝে শুধু বিরুদ্ধতারই আবিষ্কার করিয়াছেন। আলো-আঁধার, স্থিতি-গতি পরস্পরবিরুদ্ধ। হয় আলো, নয় আঁধার, হয় স্থিতি, নয় গতি—যে কোনও একটীকেই তোমায় নিতে হইবে। আলো-আঁধার কখনও যুগপৎ থাকিতে পারে না। অতএব পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, সর্বজ্ঞতা ও মূঢ়তার যৌগপদ্য (simultaneity) কখনও সম্ভব নয়।—এই-ই ছিল তাঁহাদের কথা।

পাশ্চাত্যদর্শনের "Law of Excluded Middle"

যাহা এদেশের দর্শনে চলিয়া আসিয়াছে, ও দেশের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস খুঁজিলেও তাহাই মিলিবে। পাশ্চাত্যে এই প্রকার যুক্তি সর্বপ্রথমে কুক্ষণ লইয়া এরিষ্টটলের যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। তিনি 'Law of excluded middle'-এর সাহায্যে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 'বিরুদ্ধ' বিরুদ্ধ ছাড়া অ-বিরুদ্ধ কিছুতেই হইতে পারে না। "The law asserts that everything must be either A or not-A, whatever A may be"। এই Law of excluded middle এই কথাই জোর দিয়া বলিতেছে যে, প্রতিটি বস্তু হয় 'A' হইবে কিংবা 'not-A' হইবে, তা 'A' বলিতে আলো বা স্থিতি যাহাই বুঝা যাউক না কেন। হয় আলো, নয় আঁধার, হয় স্থিতি, নয় গতি। এই বিধিতে আলো-আঁধারের 'মাঝখানে' (middle) যাহা-কিছু আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে বাদ দিয়াই (exclude) চলিতে হইবে। ইহার দৃষ্টি দুই বিপরীত প্রান্তের (opposite poles) উপর নিবদ্ধ।

বর্তমান বিজ্ঞানে ইহার অসারতা

এই নীতির মধ্যে মাঝখানের হাফ-টোন (halftones), ক্রমিকতা (gradualness), অস্পষ্টতা (vagueness) বর্জিত (excluded) হইতেছে। অথচ ইহারা আমাদের বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে স্পষ্টভাবেই আত্ম-প্রকাশ করে। হাফ-টোন ছবির মধ্যে আলো-ছায়ার (light and shade) সমন্বয় রহিয়াছে, সেখানে আলো ক্রমে ক্রমে (gradually) আঁধারে পরিণত হইতেছে,

আলো-আঁধার সংমিশ্রণে একটি অস্পষ্টতার (vagueness) সৃষ্টি হইতেছে। যথার্থতা এই সমস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 'Law of excluded middle'-এ বিশ্বাসী নৈয়ায়িকগণ করেন নাই। জেমস্ জিন্‌স্ তাঁহার 'Physics and Philosophy' নামক গ্রন্থে ইহারই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সব ভুল "arises out of philosophical practice of depicting the world entirely in black and white, and so ignoring all the half-tones, gradualness and vagueness which figure so predominantly in our experiences of the actual world. The obvious example of this is provided by the law of excluded middle, which has dominated formal logic, with devastating results, from the time of Aristotle on. Page, 93

ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া জেমস্ জিন্‌স্ বলিতেছেন—"The philosophers still think in a way which dates back to the earliest days of their subject, to times when no instruments of measurement were available of greater precision than the five senses; they still describe them in terms of effects they produce on these senses, while the scientist describes them in terms of the effects they produce on his sensitive instruments of measurement. The philosopher not only speaks but thinks in subjective, and the scientist in objective, terms."

—Page 89

—'দার্শনিকবৃন্দ আজও এমন একটী পথ ধরিয়াই চিন্তা করেন, যে পথে প্রাচীনতম যুগের দার্শনিকেরা তাঁহাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন এবং এমন এক সময়ের দিকে তাঁহাদের চিন্তাকে ঠেলিয়া লইয়া যান যখন মানবের পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া যখন অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত মাপিবার কোন যন্ত্রই পাওয়া যাইত না; তাঁহারা আজও সেই সব প্রভাবের দিকে তাকাইয়াই বস্তুর বর্ণনা করেন যেগুলি বস্তুসমূহ এই সব স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিকগণ সেই সব প্রভাবের দিকে তাকাইয়াই বস্তুর বর্ণনা করেন ও চিন্তা করেন, বস্তুসমূহ যেগুলিকে মাপিবার উপযোগী সূক্ষ্মতম স্পন্দনগ্রহণক্ষম যন্ত্রের উপর উৎপাদন করে।'

স্থূল পঞ্চেন্দ্রিয়ের সিদ্ধান্তের পরে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পরিমাপ

"Law of excluded middle" তাহাকেই 'সত্য' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে যাহা আমরা স্থূল চক্ষে দেখি, স্থূল কানে শুনি। কিন্তু স্থূল চক্ষের দৃষ্টিতে যাহাকে 'কাল' দেখি, তাহা যে সূক্ষ্মতম যন্ত্রের সাহায্যে দুইটী আলোক তরঙ্গের সম্মিলনভূমির নির্খুঁত ছবিও হইতে পারে, তাহা বুঝিবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এতদিন আমাদের ছিল না। স্থূল চক্ষের ভিতর, স্থূল মনের ভিতর বিচারের যে আরও কত সূক্ষ্মতম যন্ত্র রহিয়াছে, তাহা প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানীরা ধরিতে পারেন নাই। আজ বিজ্ঞান অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। মনঃসমীক্ষণ আমাদের শিখাইয়াছে যে, 'যাহাকে' আমরা 'যাহা' বলিয়া মোটা বুদ্ধিতে দেখিতেছি, 'তাহা' বাস্তবে 'তাহা' না হইয়া অন্যও হইতে পারে। প্রত্যেক স্থূল বস্তুর অন্তরে অনন্ত সূক্ষ্ম স্তর রহিয়াছে, প্রত্যেক স্থূল ইন্দ্রিয়ের অন্তরেও ইন্দ্রিয়ের অনন্ত সূক্ষ্ম স্তর রহিয়াছে। লাল চশমা দিয়া দেখিলে বস্তু যেমন লালই দেখা যায়, অথচ বস্তু বাস্তবে লাল নয়, ঠিক তেমনিই রাগবশতঃ যাহাকে খুব মিত্র মনে করিতেছি, সে যে মিত্র নাও হইতে পারে এবং দ্বেষবশতঃ যাহাকে শত্রু মনে করিতেছি, সেও যে শত্রু নাও হইতে পারে, তাহা কি আমরা আজও বুঝিব না? স্থূল ইন্দ্রিয়ের আপাতদৃষ্টিতে যাহা আপন পর, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা আপন পর নাও হইতে পারে। রাগদ্বেষই বস্তুকে ইষ্ট বা অনিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত করায়। স্থূল ইন্দ্রিয়ের এই আপাতদৃষ্টির সিদ্ধান্তকে মানিয়াই Law of excluded middle-এর

উপাসকগণ যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের 'অনুকূল' তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে এবং যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল তাহার উপরই বিদ্বিষ্ট হইয়াছে। অথচ স্থূল ইন্দ্রিয়ের অন্তরে যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তর রহিয়াছে, সেখান হইতে দেখিলে অনুকূলও যে প্রতিকূল হইতে পারে, প্রতিকূলও অনুকূল হইতে পারে, তাহা ধরা পড়ে নাই।

আঙুর ফল টক কেন ?

ঈশপের যে খেকশিয়ালটী 'আঙুর টক' বলিয়া আঙুর পাওয়ার লোভ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, তাহার এই 'নিবৃত্তি' কি সত্য সত্যই নিবৃত্তি, না উহার পশ্চাতে রহিয়াছে বারংবার আঙুর পাইবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হওয়ার ফলস্বরূপ একটা পরাজিতের মনোবৃত্তি ? 'জগৎ মিথ্যা'-বাদের অন্তরেও এই পরাজিতের মনোবৃত্তিই কাজ করিতেছে। জগৎও মিথ্যা ছিল না, আমার ভোগ করিবার লালসাও মিথ্যা ছিল না, সবই মিথ্যা হইল উভয়ের সংযোগ-কৌশল না-জানার জন্য। স্বার্থপর মানুষ যখন সমগ্র পরিবারকে বঞ্চিত করিয়া একাই সব সুখ ভোগ করিতে চায়, তখন তো সে ও সংসার দুই-ই মিথ্যা, কেননা পারস্পরিক সম্বন্ধে কেহই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে না। সমগ্র বিশ্বের আলোকে বিশ্বের দিকে তাকাইলে দেখিব, আমি সত্য, বিশ্ব সত্য, বিশ্বের ভোগও সত্য। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিপূর্ণ স্থূলদৃষ্টি কামুকের দৃষ্টি-কোণে যে নারী নরকের দ্বার, 'ঘিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী', পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ বিশ্বরূপ দৃষ্টি-কোণে সেই নারীই মহীয়সী, 'মুক্তেরেইভুক্তা সনাতনী'। নারীর এই মহিমময়ী মূর্ত্তিই বিশ্ব শ্রীরাধা-জীবনে প্রত্যক্ষ করিবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"আমি বৈছে পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়।।"

কামুক শুম্ভ-নিশুম্ভের দৃষ্টিতে যে নারী দংষ্ট্রাকরালবদনা, ভীষণাৎ ভীষণা, প্রেম-দৃষ্টিতে তিনিই 'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষা সৌন্দর্য্যত্বতিসুন্দরী', প্রেমাধী, সর্ব্বমঙ্গলা, যোগমায়া। শ্রীরাধাই যোগমায়া। তিনি একাধারে deeper nature, চিন্ময়রূপিণী ও মৃণ্ময়ী, বৃষভানুনন্দিনী মানবী রাধা। কামুকের কাছে যে প্রকৃতি "যো মাং জয়তি সংগ্রামে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি" বলিয়া যুদ্ধ-ঘোষণা (challange) করিয়াছিলেন, বৈরসনাদিনীরূপে (brute nature) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই রুদ্র মূর্ত্তিই দ্বৈতাদ্বৈতসমন্বিত ভক্তিসাধনার শান্ত হইল, ভক্তের সকল স্নেহের নিংড়ানো 'রমণীয়' কন্যা মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

বিচার শুধু Quality দিয়া নয়, Quantity দিয়া-ও

দার্শনিক আজ বৈজ্ঞানিক সাজিল, তাহার qualityর উপাসনা আজ quantityর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া নিজেও বাস্তব রূপ ধারণ করিল, সংখ্যা-মাত্রা-পরিমাণের ক্ষেত্রকেও সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিয়া তুলিল। "The philosopher usually thinks in terms of qualities, the scientist in terms of quantities. The philosophical lecturer may be telling his audience that a lump of sugar possesses the qualities of hardness, whiteness and sweetness, while his colleague in the science room next door may be explaining coefficients of rigidity, of reflection of light and hydrogen-ion concentration—measures of the degree to which the qualities of hardness, whiteness and sweetness are possessed."—Page 89.

—'দার্শনিকবৃন্দ সাধারণ 'গুণের' ভাষায় চিন্তা করেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তা করেন পরিমাণের ভাষায়। দার্শনিক অধ্যাপক যখন তাঁহার শ্রোতাদিগকে বলিতেছেন যে, একটি শর্করাখণ্ডের মধ্যে শুধু কাঠিন্য, ধবলতা ও মধুরতারূপ গুণগুলিই রহিয়াছে, তখন পাশের বিজ্ঞানের কামরায় তাঁহারই সহযোগী হয়ত ব্যাখ্যা করিতেছেন—কত গুণক (coefficient) কাঠিন্য, কত গুণক আলোক-প্রতিফলন এবং hydrogen-ion এর কত গুণক

concentration (ঘনীভবন) ঐ পর্বতাখণ্ডের ভিতর রহিয়াছে"। অর্থাৎ কোন্ মাত্রায় কাঠিন্য, তরলতা ও মৃদুতা রহিয়াছে তাহারই মাপ বৈজ্ঞানিক শিখাইতেছেন। জেমস্ জিনস্ ইহারই স্বাদদর্শনের দিকটা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—

"The scientist, on the other hand, knowing that everything will generally possess some A-ness and some not-A-ness, is very little concerned as to whether an object is classesd as A or not-A ; what he wants to know is how much A-ness it possesses."
—Page 93.

—'পক্ষান্তরে প্রত্যেক বস্তুতে সাধারণতঃ কতখানি A-ness এবং কতখানি not-A-ness বর্তমান আছে, বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বটি অবগত হইয়া এই সম্বন্ধে অতি অল্পই আগ্রহশীল যে, কোনও বস্তু A-শ্রেণীভুক্ত হইবে, অথবা not-A-শ্রেণীভুক্ত হইবে। যাহা সে জানিতে চায়, তাহা শুধু এই যে, বস্তুটির মধ্যে কতখানি A-ness বিদ্যমান আছে।'

যেখানে এতদিনের দার্শনিকগণ শুধু 'গুণের' মানদণ্ডে 'পূর্ণ', 'এক' প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিয়াছেন, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণ সেখানে পূর্ণের degree, একের degreeর মাপ দিয়া দিয়াছেন। তাঁহার জীবনে পূর্ণকে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম ও পরিপূর্ণ এই চারিটি স্তরেই আস্বাদন করিয়া বিশ্ব ধন্য হইবে। বিশ্বের কোথাও নিছক পবিত্রতা বলিয়া কোন 'গুণ'ই নাই। প্রতি বস্তুর অন্তরে গুণগত পরিমাণই রহিয়াছে। যাহাকে দার্শনিকগণ একান্ত ভাবে 'নির্গুণ' বলিয়াছেন, উহাও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে গুণেরই একটি আস্বাদন, গুণের সূক্ষ্মতম আস্বাদন। প্রকৃত বাস্তব নির্গুণ যাহা, তাহা দার্শনিকদের নির্গুণকে ব্যাপিয়া আছে, বৈজ্ঞানিকের সগুণকে ব্যাপিয়াও আছে। সগুণ-নির্গুণে রহিয়াছে স্তরগত পার্থক্যই শুধু; দার্শনিকের একান্ত নির্গুণ বলিয়া কোনও কিছুই নাই। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পূর্ণের অনন্ত মাত্রা রহিয়াছে, তাই গীতা ব্রহ্মকে 'পূর্ণ' না বলিয়া 'আপূর্য্যমান' (Becoming full) বলিয়াছেন। কোনও বস্তুই একান্ত 'এক' নয়; প্রত্যেক বস্তু একাধারে এক ও বহু, এক ও পৃথক্। উপনিষদ্‌কার "নানা" শব্দের অর্থ তাই 'অনেক'ও বটে, 'অসত্'ও বটে। আমি 'এক'; অথচ একাধারে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, আরও 'অনেক' কত কি, যাহাকে 'অসত্' বলিলে তো চলিবে না। আমি এক না বহু? এক ও অনেক আমার জীবনে সহজভাবে যুক্ত—ইহাই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—মন্ত্রের অর্থ। গুণের মানদণ্ডে আমি এক, মনুষ্যত্বসম্পন্ন একই বস্তু, কিন্তু পরিমাণের ক্ষেত্রে আমার ভিতরে মনুষ্যত্বের কত স্তরই তো রহিয়াছে।

শ্রীনিতাগোপাল লিখিয়াছেন—"আত্মাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি কোন বিষয়ে 'অপূর্ণ' নহেন। সেই জন্য তাঁহাকে অসঙ্গত, অসক্রিয় বলিলে তিনিও 'অপূর্ণ' স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে বলিয়া তিনি সগুণ-সক্রিয়ও বটেন। যাহাতে সমস্ত আছে, তিনিই 'পূর্ণ'; আত্মাতে সমস্ত আছে, সেই জন্যও আত্মা পূর্ণ। আত্মা ব্যতীত 'সমস্ত' আছে বলিয়া আত্মা ও 'সমস্ত' অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্মা এবং সমস্ত অভেদ হইলে আত্মা 'পূর্ণ' শব্দবাচ্য বিশেষিতই হইতেন না। পূর্ণ শব্দ অদ্বৈতবাচক নহে। আত্মাকে পূর্ণ বলিলে, আত্মা ব্যতীত কিছু নাই বুঝিবার কোন কারণ নাই। যেমন 'পূর্ণ কুম্ভ' বলিলে কেবল মাত্র কুম্ভ বুঝিবার কোন কারণ নাই, পূর্ণ কুম্ভ বলিলে সেই কুম্ভ কোন বস্তু দ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়, তদ্রূপ 'পূর্ণাত্মা' বলিলে—আত্মা কোনও বস্তুদ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়। আত্মাকে 'এক' বলা হইয়াছে। অনেকে ঐ 'এক' শব্দের অদ্বিতীয় অর্থ করিয়া থাকেন; কিন্তু অদ্বিতীয় শব্দে কেবল 'এক' এই অর্থ হয় না। 'অদ্বিতীয়' শব্দের দ্বিতীয়াধিক্য অর্থ হইতে পারে ও সেই জন্য অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ 'বহু'ও হইতে পারে।—সিদ্ধান্ত দর্শন পৃঃ ২৩১-২৩২

শ্রীনিতাগোপালের মতে এক'ও একটি সংখ্যা। ব্রহ্মকে 'এক' বলিলে তাঁহাকেও সংখ্যার গণনার মধ্যেই আনা হয়। যদি তাঁহাকে সংখ্যার মধ্যেই আনা যায়, তবে

হাকে এক, দুই প্রভৃতি সর্ব্ব সংখ্যা বাচক কেন বলা হইবে না? বস্তুতঃ দার্শনিকদের 'এক' মৃত, static, র্শনিক-বৈজ্ঞানিকের 'এক' dynamic, জীবন্ত।

সমগ্র বস্তুর প্রতিটি প্রকাশই তুলামূল্য

দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমান যুগে তাই পূর্ণ হইয়াও বস্তু পারমার্থিক ভাবেই অপূর্ণ, এক হইয়াও বহু, দতীত হইয়াও অনাদ্যন্ত, নিরংশ থাকিয়াও তিনি অংশ; deeper nature শ্রীরাধার প্রেমপ্রভাবেই পূর্ণব্রহ্ম অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিতে করিতে ছুটিয়া ছেন। "আনন্দঃ ব্রহ্মেতি"—উপনিষদ্‌ক এই মন্ত্রের মধ্যে আজ মায়া, বিশ্ব, বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা, র জীবত্ব ও বিশ্বেরই সার্থক হইবার জন্য অনাদি ন্ত রাসলীলা আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। Law excluded middle আজ অচল। এই সমগ্র বস্তুবস্তুরই তুলামূল্য আস্বাদন রূপে পূর্ণ-অপূর্ণ, ঈশ্বর, কার্য্য-কারণ সব সার্থক হইবে। বীজের বৃক্ষে যেমন ফল রহিয়াছে, ফলের বৃক্ষেও তেমনি বীজ রহিয়াছে। একান্ত বীজের মানদণ্ডে ফলকে দেখা চলিবে না, ফলের মানদণ্ডেও বীজকে দেখা চলিবে না। বীজ ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়া অঙ্কুর, চারা-গাছ প্রভৃতি স্তরগুলি স্তর ছিড়াইয়া ফলরূপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আজ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক মানুষ সব স্তরগুলিরই পৃথক্ পৃথক্ স্বয়ংপূর্ণ রসসমূহ আস্বাদন করিতে চাহিতেছে। বীজের আস্বাদন ফলে নাই, ফলের আস্বাদনও বীজে নাই। বীজ হইতে ফল, ফল হইতে বীজ—অনাদি অনন্তে এই রসাস্বাদন চলিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ শুনাইতেছেন—"ভূমাৎ ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে"—'ভূমা হইতে ত্বেরই এবং ত্বের হইতে ভূমার প্রশ্ন হইতেছি।' ভূমা হইতেছে 'এক', মহান, পূর্ণ; ত্বের হইতেছে 'বহু', বৈচিত্র্যের স্থান, অপূর্ণ। আমরা আজ ভূমা ত্বেরের যুগলমিলন-রস শ্রীকৃষ্ণজীবনে আস্বাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণই যুগপৎ পূর্ণ ও অপূর্ণ, শ্রীরাধা তাঁহারই যোগমায়া শক্তি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

(১৯৩৮—এর ৪র্থ সংখ্যা উদ্বোধন হইতে)

ত্মবাদী সম্প্রদায়সমূহ বলিতেছে—'ন মদন্যৎ অস্তি'—'আর কেহ নাই'। এক মতবাদ অপরকে শেষ না করিয়া যেন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণই করিতে পারে না! নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজন অন্যের নিঃশেষ নির্ব্বাণ। এমন করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া পরস্পরের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ধোত্তম-বেদে নাই। গীতা 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্'-এর মধুর শাস্ত্র। গীতাশাস্ত্র পরস্পরের 'বোধ' নভাবে জাগ্রত করিতেই অবতীর্ণ, যাহার ফলে 'শাস্ত্র-সঙ্ঘ' সম্ভব হইবে। জীবন-বেদই তেমন ন্ত্র-সঙ্ঘ।"—ব্রহ্মসূত্র অবধূত ভাষ্য।

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

ভাগবত ১০।১৪।৫৫

—শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা। তিনিই এই জগতের হিতের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কৃপাশক্তির উপাশ্রয়ে 'দেহী ইব' প্রতিভাত রহিয়াছেন। শ্লোকের প্রথম চরণে বিশ্বমানবের 'সাধ্য' নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্ত্তী চরণে তাহার 'হেতু' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'মানুষ' শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা হইলেন কোন্ যুক্তিতে ও যোগ্যতায়, এবং ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শরূপে ভজন করিয়াই বা কোন্ যোগ্যতার অধিকারী হইয়াছে, আজ তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ভারতের ভাগবত বিশ্বাস করেন এবং চুল-চেরা যুক্তিদ্বারা প্রমাণও করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই অখিলাত্মার আত্মা। কিন্তু কি তাঁহার যুক্তি? ভাগবত স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণজীবন দ্বারাই জগতের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও বস্তুসমূহের—আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম, ইহলোক, দেব-মানব-পশুপক্ষী, সর্ব্ব-ধর্ম্ম, সর্ব্ব অধর্ম্ম, 'সত্যং চ অনৃতং চ', 'বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ', বিদ্যা অবিদ্যা, সব হু ও সব কূ, সব কাম ও সব অকামের ব্যাখ্যান ও আস্বাদন বাস্তবের দেশে বাস্তবের আলোতে সম্ভবপর। ভগবান বেদব্যাস এই কৃষ্ণবস্তুকে সামনে রাখিয়াই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন, 'এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ'। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই সর্ব্বব্যাখ্যানমূর্ত্তি। শ্রীরূপ গোস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন, 'ওগো রাধাধাম, হে শ্যামসুন্দর, তোমাদের অবতরণ যদি জগতের বুকে সম্ভব না হইত, বিশ্বের কোন ঘটনারই কোন অর্থ মিলিত হইত না, বিশ্বমোহনকারী কাব্যের কোনও ব্রহ্মরূপ কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।'

জীবের দিক হইতে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনায়, বিশ্বময় কাব্যের মাতামাতির যে ব্যাখ্যা এতদিন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টির সার্থকতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেই তাহার একটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যান মিলিয়াছে। কাব্যের এবং মানব জীবনের যাবতীয় ভালমন্দ বৃত্তির যে একটি ভাগবত রূপ আছে, সেই ভাগবত রূপ আস্বাদন করিবার জন্যই যে মানুষ স্বর্গ-নরক, দেবযান-পিতৃযান ছুটাছুটি করিতেছে, ভালমন্দ সমস্ত বৃত্তির ব্রহ্ম-রূপ আস্বাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে মানুষের কিছুতেই স্বস্তি নাই, কোনও রকমে বৃত্তিনিচয়কে চাপা দিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্ম-লোকে পলাইয়া বাঁচিতে চাহিলেও যে সেখান হইতে একদিন 'কামায়নী' বিশ্বশক্তি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আবার প্রকৃতির খেলার ভিতরে ছাড়িয়া দিবেনই, আজ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনালোকে তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

কি যে গুণ, কি যে দোষ, কেন যে গুণ এবং কেন যে দোষ—ইহার বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক জীবন্ত মীমাংসা কি কেহ আজ পর্য্যন্ত দিতে সাহসী হইয়াছেন? কেহ বলিয়াছেন—গুণের মহিমা প্রকাশের জন্যই দোষ; যাহা জীবনের স্থিতি-সহায়ক, তাহাই গুণ। কিন্তু গুণ দোষের এই ব্যাখ্যায় কি বিশ্বের কিছুই হিত হইয়াছে? দোষকে গুণের সহায়করূপে, সিঁড়িরূপে স্থাপন করিলে কি শেষ পর্য্যন্ত গুণের চরম অনবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয় না? দোষ যদি গুণের সিঁড়ি, পাপ যদি পুণ্যের সিঁড়ি, অসৎ যদি সতের সিঁড়ি, অন্ধকার যদি আলোর সিঁড়ি, তাহা হইলে তাহাদ্বারা কি অন্ধকারের আপেক্ষিক আলোর স্বয়ংসিদ্ধত্ব সিদ্ধ হয়? আপেক্ষিক অন্ধকারের পরও তো আপেক্ষিক আলো থাকে, তবে আপেক্ষিক এই আলোর পরও তো আপেক্ষিক অপর অন্ধকার থাকিতে বাধ্য। কেননা আলো-অন্ধকার

দুইই আপেক্ষিক। হয় আলো-অন্ধকার দুইই সমান ভাবে আছে, নয় কিছুই নাই, নিছক শূন্য—যুক্তি ইহার অতিরিক্ত আর যাইতে পারে না। কিন্তু আলো 'নাই', অন্ধকার 'নাই', অসৎ 'নাই', সৎ 'নাই'—শুধু এই সব 'না'-এর মধ্যে কি positive জীবনের দাঁড়াইবার কোনও স্থান মিলিবে? তাই আজ আলিঙ্গনাছে সৎ-অসৎ সমন্বয়ের তত্ত্ব।

ভারতবর্ষ যে একটি দার্শনিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় মৃত্যুবাদের ভিতর 'নেতি নেতি' বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেখান হইতে আকর্ষণ করিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণ'। যিনি আকর্ষণ করেন, যিনি জীবনকে আকর্ষণ করিয়া একটি positive কৃষ্টি গড়িয়া তোলেন, তিনিই 'কৃষ্ণ'। 'অন্ধেনৈব নীয়মান' অন্ধ বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণই চক্ষু দান করিলেন। তিনি সত্যই 'জগদ্ধিতায়'। 'জগতের', জাগতিক বৃত্তিনিচয়ের, গতি-ধর্মের সত্য বাস্তব 'হিত' শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেই বিশ্ব স্পষ্ট দেখিয়াছে। ভারতবর্ষ জগতের 'গতি'কে স্থিতির চাপে নিষ্পেষিত করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ সেই গতিধারাকে পুনরায় মুক্ত করিয়া দিলেন, গতির চতুর্দ্দিকের প্রাচীর-বেড়া স্থিতি ভাঙ্গিয়া স্থিতি গতির সমন্বয় আনিয়া দিলেন। তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি স্থিতি-গতি সমন্বয়, সত্য-মিথ্যের সমন্বয়, হিংসা-অহিংসার সমন্বয়, কাম-অকামের সমন্বয়। বিশ্ব তাঁহারই জীবনে মূর্ত্ত; তিনি তাই বিশ্বাত্মা। বিশ্বের সকল সম্ভাবনার মূর্ত্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। পরিমাণ হিসাবে তিনি ছোটই বটেন, কিন্তু ব্রহ্মের মানবও তা পরিমাণ নয়, সংখ্যাও নয়। ব্রহ্মের মানবও নিয়ন্ত্রিত জীবন, যে জীবন ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে, গড়িয়া ভাঙ্গিতে পারে।

বিশ্ব-জীবনের প্রতি স্পন্দনের এক অর্দ্ধেকে রহিয়াছে হিংসা-প্রবৃত্তি, অপরার্দ্ধে রহিয়াছে অহিংসা-প্রবৃত্তি। যে ফুল হাসে যায়, সেই ফুলই কি নিজের সন্তানকে মরণ পণ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে না? সৃষ্টি-ক্রিয়ার গোড়ায় রহিয়াছে 'অদিতি'র বেদনা, 'অদন'-এর বেদনা; এখানে সবলেই সকলকে অদন করে, ভক্ষণ করে। কিন্তু ইহাই কি সমগানি সত্য? আর একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, বিশ্বপ্রাণী আমার নিজের বুকের রক্ত অপরকে দান করিয়া নিজে নিশ্চিহ্ন হইতেও চায়। 'And animate nature...presents other aspects than that of a relentless struggle for a scanty subsistence. It has its aspects of beautiful plenty and of peaceful happiness. But, above all, animal life is not expressible in terms of economics of modern commercialism. Its foundations are laid on the facts of sex and parenthood. In the attraction of mate for mate and in the care of offspring, as well as in the further acts of association and co-operation in flocks and herds, we can see prefigured the altruistic virtues which form the staple of our human morality.'—The Idea of God. P, 84.

কেহ কি বিশ্বের মহাসত্য এই দুইটী জীবনধারার সত্য বাস্তব জীবন্ত ব্যাখ্যান দিয়াছেন? ঋষিগণ একান্ত স্থিতি-ধর্ম্মী অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির গুণ গাহিয়াছেন? কিন্তু স্থিতিধর্ম্মী এই অহিংসা ও সত্য কি বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দানে সমর্থ? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ঋষিদের পরে আবার ঋষিদেবও সৃষ্টিকর্ত্তা অবাকী শ্রীভগবানের শাস্ত্র বলিবার প্রয়োজন হইত না।

সৃষ্টি ধারার এক অংশ যেমন হিংসাময় এবং অপর অংশ অহিংসাময়, তেমনি হিংসাধারারই অপর অংশ অহিংসা এবং অহিংসাধারারও অপর অংশ হিংসা। হিংসা-অহিংসা সৃষ্টির প্রতিটি অণুর মধ্যে ওতপ্রোত। হিংসা ছাড়া অহিংসা হয় না, অহিংসা ছাড়া হিংসা হয় না। হিংসার অপরার্দ্ধ অহিংসা, অহিংসারও অপরার্দ্ধ হিংসা। হিংসাই যে সব সময়ে হিংসা, তাহাও নয়, আবার অহিংসাও যে সব সময়ই অহিংসা তাহাও নয়। হিংসা করিয়াও

অহিংসাকেও রক্ষা করা যায়, অহিংসা দ্বারাও হিংসা করা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে আমরা হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি। যিনি হিংসার মধ্যে অহিংসা এবং অহিংসার মধ্যে হিংসা দেখেন, তিনিই হিংসা-অহিংসার কৃৎস্নদর্শন লাভ করিয়াছেন। তিনিই বলিতে পারেন, 'যত্র নাহঙ্কৃতো ভাবঃ বুদ্ধির্যত্র ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে'। 'ইমান্ লোকান্' হনন করিয়াও কোন্ কৌশলে মানুষ হনন না করিয়া পারে, বদ্ধ না হইয়া পারে, তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত বাস্তবের দেশে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্য বাস্তব অপরূপ হইয়াছেন। 'যত্র নাহঙ্কৃতো ভাবঃ বুদ্ধির্যত্র ন লিপ্যতে' —এই অর্দ্ধাংশ যখন 'হত্বাপি স ইমান্'এ যুক্ত, তখনই কৃৎস্নদর্শন ফুটিয়া উঠে।

মুনিঋষিপ্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্যের ক্রমবিকাশের রূপ আমরা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে দেখিয়াছি। গোপালতাপনী শ্রুতিতে ব্রজ-গোপীগণ গান্ধর্ব্বিকা (রাধা)-কে সামনে রাখিয়া মুনি দুর্ব্বাসাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী?' আজ যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই গৃহের কোণে লুকানো ভারতের অসূর্য্যম্পশ্যা নারীকুল পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, সর্ব্ব কর্ম্মক্ষেত্রকে অধিকার করিয়াও বসিয়াছেন, পুরুষের সঙ্গে তাঁহাদের অবাধ মিলন যখন কিছুতেই আর রোধ করা সম্ভব হইবে না, তখন ব্রহ্মচর্য্যের নব রূপের খোঁজ করা ছাড়া উপায় আছে কি? বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনে ব্রহ্মচর্য্যের কি রূপ হইবে, আজ সেই প্রশ্নই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব করিতেছে। খাঁচায় পুরিয়া আহার না দিয়া বাঘকে যখন আর বশে আনা চলিবে না, বাঘ যখন খাঁচা ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেই, তখন খাঁচামুক্ত বাঘকে কি করিয়া বশে আনা যায়, ইহাই তো ভারতবর্ষের সনাতনীদের কাছে প্রশ্ন। নারীকে কি আর খাঁচায় পুরিয়া রাখা সম্ভব হইবে? অসম্ভব। সে 'বাহির' হইয়া পড়িয়াছে। এই বাহির হইয়া পড়াকে ভারতবর্ষের শ্রীমান কোন্ বাস্তব আছেন, যিনি 'ঘরে'র সঙ্গে সমন্বয় করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন? মুনিঋষি কামতত্ত্বে পলাতক; নারীর আকর্ষণকে তাঁহারা ভীতিগ্রস্ত চিত্তে এড়াইয়াই চলিতে চাহিয়াছেন। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা নারী-প্রকৃতিকে জয় করেন নাই। একমাত্র 'অত্রি' মন্ত্রের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই কামাখ্যা প্রকৃতির এই challange গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি-জয়ী হইয়াছিলেন। তাই 'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী' এই প্রশ্নের উত্তরে গোপালতাপনী শ্রুতি শুনাইতেছেন. 'যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি'—যিনি কামদ্বারা কাম কামনা করেন তিনি কামী; পক্ষান্তরে যিনি অকামদ্বারা কাম কামনা করেন, তিনিই অকামী।' ঋষিরা কাম ত্যাগ করিয়া অকামী হইবার উপদেশই দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যর্থতা আমরা বহু বড় বড় জীবনে দেখিয়াছি। কাম কামনার উপর চাপ না দিয়া অকাম-দ্বারা কাম কামনা করাই শ্রীকৃষ্ণজীবনের 'অকাম' হওয়া। যে-সৃষ্টির গোড়ায় রহিয়াছে 'কাম'—'সোঽকাময়ত', সেই সৃষ্টির মধ্যে বসিয়া কামের সঙ্গে লড়াই করা ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। স্রষ্টা যিনি, তিনি তো কাম কামনা-দ্বারা 'কামী' হইয়া পড়েন নাই, অথচ কাম কামনা ছাড়িয়া আমাদের মত অকামী হইতেও চাহিতেছেন না। কাম ত্যাগ করিলে যে তাঁহার সৃষ্টিই মুছিয়া যাইত। তাই তিনি যে-কৌশলে কাম কামনা করিয়াও অকামী, আজ সেই কৌশল শিখিবার দিন আসিয়াছে, যদি সৃষ্টিকে কামভোগ বা কামত্যাগের বীভৎস ক্লৈব্য হইতে রক্ষা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণজীবনে এই কৌশল বাস্তব রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই তিনি বিশ্বস্রষ্টা। স্রষ্টাই সৃষ্টির কৌশল জানেন। বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কামপ্রবৃত্তির বাস্তব কৌশলকে বাস্তবের দেশে কোন্ পুরুষ স্থাপন করিয়াছেন? তিনিই মূর্ত্তিমান সুখ 'কাম', যাঁহার কামে অসংসৃষ্ট কাম-বিকারের মধ্যে পড়িয়া জাতির চৌচির হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে না। কাম কেমন করিয়া অব্যাহত সুখ সুন্দর সৃষ্টি করে, সৃষ্টি রক্ষা করে এবং সময় মত সার্থকতার সহিত সংহারও করে, তাহার বাস্তব চিত্রই শ্রীকৃষ্ণজীবন।

বিশ্বজীবনের যাহা কিছু সার্ব্বজনীন, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই ঘন ব্যাখ্যান। কাম সার্ব্বজনীন; কৃষ্ণ তাহারই ঘনীভূত ব্যাখ্যান। শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই সাম্প্রদায়িক নন। 'কাম'

াই এমন কোনও জীব আছে কি? তাল বাসেনা এমন কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব কি? বিশ্বজনীন ামতত্ত্ব, বিশ্বজনীন প্রেমতত্ত্বেরই ঘন 'অর্থ' হইতেছেন কৃষ্ণ। তাই নিজকে, নিজের কাম ক্রোধকে, নিজের িংসা অহিংসাকে যেমন সকলেই ভালবাসে, তেমনি ঐ ব মানবীয় পরস্পরবিরোধী বৃত্তিনিচয়ের মূর্ত্তিমান পরম াধানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম জ্ঞানে কে না ভালবাসিয়া ারেন? হউন কেহ ভারতবাসী, হউন ইংরেজ, হউন হ রাশিয়ান, হউন কেহ কোল ভিল, মূর্ত্তিমান কাম-াধান শ্রীকৃষ্ণকে কে অন্তরের অন্তরে ডাল না বাসিবেন? খানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বজীবের সর্ব্ব-তত্ত্বেরই ঘন অর্থ ও ঘন াস্বাদন, সেখানে তিনিই বিশ্বমানবের। কৃষ্ণের টবরবপু'ই মানবমাত্রের নটবরবপু, কৃষ্ণের 'বংশী' মানবেরই বংশী, কৃষ্ণের গোপ-জীবনই বিশ্বমানবের াপজীবন, কৃষ্ণের রাসবিলাস বিশ্বমানবের ঘনীভূত াশ ও আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই সমস্ত বিশ্ব নিজ স্বা বলিয়া জানিতে বাধ্য, যদি না ঐকদেশিকতার ীর্ণতায় সে আটকাইয়া পড়ে। মানুষ নিজের জীবনের তম প্রদেশের একটি 'পরম অর্থ' রাধাকৃষ্ণ-জীবনে পায় াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'রাই উন্মাদিনী', 'গোষ্ঠলীলা', ল মিলন' প্রভৃতি লীলার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চায়।

শ্রীকৃষ্ণ 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি'। তাঁহার জীবনে কোনও াঠাবিভাগ নাই; তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রকে তাহার মূল্যে অর্থবান করিয়া উহাদের পরস্পরানুগমনের ভিতর া পন্থা গড়িয়া তুলিয়া চলিয়াছেন। তাই তিনি ত্তিতায় রূপে 'অজ' (এই বিশ্বের বুকে) 'আকৃতি' তিভাত হইতেছেন)। কিন্তু তাঁহার এই 'জান' ব হইতেছে 'মায়য়া' মায়াশক্তির উপাশ্রয়ে। এই াই যোগমায়া, এই যোগমায়াই organic nature। ার অর্থ কৃপাও হয়। কল্পায়ন এই মায়াশক্তি দ্বারাই নি 'দেহী ইব' (যেন দেহী)। কামাসক্ত যে সব দেহী া নিয়া, কাম নিয়া বিব্রত, কাম যাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন রিয়া, হৃতবীর্য্য করিয়া ঘুণধরা বাঁশের মত করিয়া দিয়াছে, ই সব দেহীদের সামনে তিনি যেন তাহাদের মত দেহী হইয়া তাহাদের আকর্ষণ করিয়া নিজ মদনমোহনধর্ম্মে, আকাশ-ধর্ম্মে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
ভাগবত

এমন ক্রীড়াই তিনি করিয়া গিয়াছেন, যাহা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ লাভ করিয়া মানুষকে তৎপর করিয়া তুলিবে, মদনমোহন করিয়া তুলিবে। তাই রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভাগবত লিখিয়াছেন,

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিণোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভাগবত
১০।৩৩।৩৯

—'ব্রজবধূদের সঙ্গে বিষ্ণুর (যাপকতম মানুষ-কৃষ্ণের) বিশেষ ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করেন, এবং তৎপর বিশ্বজনের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগ ঐ কামকে আশু দূর করেন।'

রাধাকৃষ্ণের ব্রজ-ক্রীড়াশ্রবণে কামের হৃদ্ই আরম্ভ করা সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরূপ, বিশ্বরূপ। যিনি বিশ্বরূপ হন না, তিনি মদনমোহনও হন না। বিশ্বরূপই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহকে বিশ্বদেহ বলিয়াই জানিতেন, বিশ্ব-দেহেরই নিংড়ানো রসরূপে নিজ দেহকে আস্বাদন করিতেন। মানুষ নিজ দেহকে বিশ্ব দেহের ভিতর গড়িয়া তুলিয়া ভাগবত বিশ্বরূপ লাভ করিবার জন্যই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভ্রমণ করিতেছে। ব্রহ্মমন্ত্র বিচারণ করাই তাহার সর্ব্বভূত-চিত্তরঞ্জনের মুখ্য প্রয়োজন। মানুষের দেহও নিত্য। সে সর্ব্বদেহের ভিতর দিয়া তাহার নিত্যদেহ, সর্ব্বরসের ভিতর দিয়া তাহার নিত্য রস, সর্ব্বস্পর্শের ভিতর দিয়া নিত্যস্পর্শ, সর্ব্বগন্ধের ভিতর দিয়া নিত্যগন্ধ, সর্ব্বশব্দের ভিতর দিয়া নিত্যশব্দ লাভে সমর্থ, বিশ্বরূপ দেহী হইবার জন্য কি উন্মাদ লালসাই না ছুটিয়াছে!

একটী মূর্ত্ত আদর্শ (আকাশের নয়) জীবের সঙ্গে সঙ্গে

না থাকিলে কে তাহাকে বাস্তবের টান, মর্ত্যের টান সামলাইয়া আগাইয়া নিয়া যাইবে? উপনিষদের ব্রহ্ম intellectual, ভাগবতের ব্রহ্ম practical; উপনিষদের ব্রহ্ম যখন ঘন হইয়া বাস্তবের দেশে বাস্তব পশুপক্ষী দেব-মানবের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখনই তিনি 'কৃষ্ণ' হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে নমস্কার দ্বারা বন্দনা করিল; মানুষ স্বজাতীয় সগোত্র বলিয়া পা ধরিল, পা' ধরাইল, কাঁধে উঠিল, কাঁধে উঠাইল; গো-সকল তাঁহার পা' চাটিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল। যশোদা নিজ স্তীবধাবে তাঁহাকে অভিসিঞ্চিত করিল; প্রেমময়ী গোপীকুল তাঁহাকে মান করিয়া তর্পনা করিল; অর্জুন রথে সাবথ্য বরণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে গীতা শ্রবণ করিল; উদ্ধব বিদুরের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—

'অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥' ভাগবত ৩।২ ২৩।

শ্রীকৃষ্ণ তাই 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'। সর্বভূতের আত্ম-ভূত (আত্মতুল্য) হইয়াছে যাহার আত্মা (দেহ), তাঁহারই চরণস্পর্শে পৃথিবী বিহ্বলিত হয়, যমুনা উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া উজান বয়। তাঁহারই গায়ে গা' লাগাইবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতি অঙ্গের কান্না আজ দিকে দিকে জমিয়া উঠিয়াছে। তিনি আজ আবার সচ্চিদানন্দময় দেহ লইয়া, দেহ-দেহীর ভেদ ঘুচাইয়া দেহের সম্ভাবনা ও আত্মার সম্ভাবনাকে সার্থক মূর্তি দান করিয়া 'দেহী ইব' প্রকট হইতে চাহিতেছেন। আজ তিনিই বিশ্বমানবের সামনে নৃত্য বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছেন। কে তাঁহার এই নৃত্যগতি রোধ করিবে?

যে-ভারতবর্ষের বুকেই একদিন সর্বদেহের ব্রহ্মনৃত্য ঘন হইয়াছিল, সেই ভারতবর্ষই তাঁহাকে সর্বাঙ্গে আস্বাদন করিয়া বিশ্বদেহকে, বিশ্বমানবকে, বিশ্বরাষ্ট্রকে ব্রহ্মঘন শ্রীকৃষ্ণছাঁচে গড়িয়া তুলিবার যোগ্যপাত্র। ভারতের শ্রীকৃষ্ণ ভারতকে বিশ্বভারতে, উজ্জ্বলভারতে গড়িয়া তুলিবার জন্য 'অগন্থিতায় দেহায় দেহীব আভাতি মায়য়া'। আমরা বিশ্ববাসী তাঁহার তত্ত্ব জন্মবাসরে তাঁহারই ঐ রাসনৃত্যকে আমাদের সকল স্পন্দনে বরণ করিতেছি। বন্দে মাতরম্

(১৩৫২ উজ্জ্বলভারত হইতে পুনর্মুদ্রিত)

শ্রীকৃষ্ণ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর সেই দুর্যোগময় তিথিটিতে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-উৎসব করবে। আমরা যারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি, দেশের উন্নতিবিধানের জন্য আমরা যারা পার্টি-পলিটিক্স করি বা তা না করেও দেশের ও দশের জন্য কিছু করবার চেষ্টা করি, সেই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করব না। কিন্তু আমাদের মত মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের বাইরে যে অগণিত জন-সমাজ পড়ে রয়েছে, তাদের জীবনের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি ও প্রভাব। এ স্মৃতি কুসংস্কার বা অনর্থক উৎপাত কি না সে বিচার পরে হবে, কিন্তু এ যে আছে এটা বাস্তব সত্য ঘটনা, একটা fact। দেশের সেবার কথা আমরা যখন চিন্তা করি, তখন দেশের নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত এত বড় একটা বাস্তব ঘটনার ইতিহাসকে বিচারের মধ্যে গণনা না করলে সমাজতত্ত্ব অনুধাবনে আমাদের গলদ থেকে যাবে, এ সহজ কথাটাকে যেন আমরা না ভুলে যাই।

ভারতবর্ষের সেবা করতে হলে ভারতবর্ষকে বুঝতে হবে, এ কথাটা সহজ। কিন্তু সেই ভারতবর্ষের পরিচয় কী? কী তার স্বরূপ আর কী তার রূপ? তার দীর্ঘ

দিনের ইতিহাস বহু শাখা বিস্তার করে দূরে দূরে তার শিকড়কে ছড়িয়ে দিয়েছিল। আজকের ভারতকে পেতে হলে, বুঝতে হলে তার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিকে যেমন অতীতের দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বুঝে দেখতে হবে, তেমনি এই ভারতেরই রাজা থেকে শূদ্র, উচ্চ থেকে নীচ, ধনী থেকে নির্ধন প্রত্যেকেরই মননীতে যে আর একটি স্পন্দন চেতন অচেতন ও অবচেতনের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে তারও খবর নিতে হবে। বুঝে দেখতে হবে কী তার অর্থ, কেন সে শ্রীকৃষ্ণ নাম বা এমনি অনেকেরই নাম উচ্চারণ করে, এই স্মৃতির কোনও প্রভাব তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে পড়ে কি না, পড়লেই বা তা কি ভাবে কাজ করে।

কেবল অর্থনীতি বা রাষ্ট্রকাঠামো বেলালেই ভারতের কৃষ্টির এই বিশেষ দিকটির বদলে যাবে, একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। এই প্রত্যেকটিই সমগ্র জীবনের এক একটি বিভাগ। কোন একদিকের পরিবর্তনেই অন্য দিকটি আপনা আপনিই পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এমন কথা সত্য নয়। একটিকে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকের কিছুটা পরিবর্তন হলেও আমূল পরিবর্তনের জন্য সেদিক দিয়েও একটা আন্দোলন করার অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। দেহের মধ্যে মস্তিষ্ক যত বড় অংশই হোক না কেন, তার অসুস্থতাকে দূর করলেই দেহের অন্যান্য অঙ্গের অসুস্থতাও বিদূরিত হবে—এটা বাস্তবও নয়, যুক্তিসহও নয়। অন্য অঙ্গকে সুস্থ করবার জন্য সেইদিকেও বিশেষ কিছু করা দরকার। তাই নূতন ভারতের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় পুরণো ভারতের হৃৎস্পন্দনের সবগুলি কম্পনকেই বিচারের মধ্যে আনতে হবে।

এই দিক থেকে এবং ভারতের কোটি কোটি শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারী দীর্ঘকাল ধরে পূজা করে আসছে বলেও বটে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আজ আমরাও স্মরণ করব, তাঁর জীবন ও বাণীর একটু পরিচয় নেবার প্রয়াস পাব। মানুষের ধর্ম-সাধনা তার কর্মসাধনা থেকে একেবারে পৃথক কোনও ব্যাপার নয়। মানুষের প্রতিটি দিক অন্য প্রতিটি দিকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। তাই ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনের প্রয়োজনেই কোন্ এক বিস্মৃতপ্রায় যুগের এক ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতম একটি অন্ধকার রাত্রিতে সমস্ত ভারত জুড়ে এক বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লবের মাঝখানে কংস-কারাগারে জাত ঐ বিপ্লবী ঈশ্বর-মানুষটিকে আজ আমরা স্মরণ করি, তাঁকে বুদ্ধোক্তঃ আমরা নমস্কার করি।

আজকের দিনে আমাদের সমস্যা কতগুলি? রাষ্ট্রীয় সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবনে নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে সমস্যা—কত সমস্যা। আমরা ঘরে এক রকম, অফিসে আর একরকম, ক্লাবে বা খেলার মাঠে আরও এক রকম, পার্টিপলিটিক্সের বেলায় ঠিক সেই রকমই নই, সাহিত্য যখন লিখি তখন নূতন এক রকম, আবার নিজের বিবাহাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেই আমিই আরও এক রকম। আমাদের এই এতগুলি আমির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই, কেন না আমাদের সামনে কোন একটি সর্বাঙ্গীণ আদর্শ নেই যা জীবনের সবগুলি দিককে সুসমঞ্জসের রসে ভরে তুলতে পারে।

বাস্তবের জগতেও আমরা দেখি এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ব্যবহার দাবী করছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ মানুষোচিত হওয়ার পথে দেখতে পাই জগৎ জুড়ে কত যে বাধা! অথচ মানুষই বোধ করে তার অন্তরের মধ্যে এমন মানুষোচিত হওয়ার প্রেরণা। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই। আন্তর্জাতিক হতে গিয়ে আমরা কেউ কেউ জাতীয়তা নষ্ট করে ফেলি, সমাজ বা সমগ্র মানবে গিয়ে ব্যক্তিসাতন্ত্র্য আর তার সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও প্রকাশকে ব্যাহত করি। কেউ বা আবার দেশ বা জাতির স্বার্থকে দেখতে গিয়ে বিশ্বের আর সকলেরই মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভুলে যাই। আমাদের এ দ্বন্দ্বের সমাধান মিলবে কোথায়? আরও দেখি, প্রত্যেক বিশেষের মধ্য দিয়ে মানুষ তলিয়ে যেতে চায় একেবারে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে, আবার সে-ই আহ্বান শোনে বিরাট বিশ্বের যখন সে বলে—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে,
আমার হৃদয়ে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে।"

ব্যক্তিগত জীবন যাপনের রস মানুষের জীবনে অপরিহার্য

সত্তা, তবুও এই আহ্বান। কেমন করে সে মেলাবে? এই পরস্পরবিরুদ্ধতার দ্বন্দ্বে মানুষ উৎপীড়িত—গভীর হলে তার বিস্তৃতিকে সে হারিয়ে ফেলে, বিস্তারকে বজায় রাখতে গেলে জীবনের রসকে সে বিকারে পরিণত করে। এ অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে কেমন করে সে বাঁচবে, কেমন করে সে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবে?

এমনই বিপর্যস্ত মানুষের কাছে এসে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমগ্র জীবনখানি নিয়ে, তাঁর আশ্চর্য-সহজ অথচ অবোধগম্য কথা নিয়ে। তাঁর বিরাট জীবনের বহু ও বিচিত্র কাজ ও কথাগুলিকে অনুধাবন করলে দেখি, পরস্পর বিরুদ্ধ বলে যাদের মেলাতে না পেরে জীবনের কাছে আমরা বোকা ব'নে যাচ্ছি, সেই সমস্ত বিরুদ্ধতাগুলিই তাঁর জীবনে এক অলক্ষ্য ও অনির্বচনীয় সূত্রে গাঁথা পড়ে গেছে। এই সবগুলির মধ্য দিয়ে যে একটি সুসঙ্গতির মহিমা ছড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে কমনীয় করে তুলেছে, তা যেমন অভিনব, তেমনি আকর্ষণীয় আর চিত্তাকর্ষক। তাই তো তাঁর জীবন কাব্য হয়ে উঠেছে। এই কথাটি বুঝতে পারলেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়কে আমরা কিছুটা জানতে পারব। কিন্তু সেইটিই আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই অমন বিপুল ঘটনাপ্রাচুর্যের ঘন বুননীর বিরুদ্ধতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন হারিয়ে যেতে পারল আমাদের কাছে, কালের তরী বেয়ে সে এসে পৌঁছল না আমাদের ঘাটে। কিন্তু বন্ধ হয়ে যাওয়া খেয়া-পারাপার আবার বুঝি চলতে সুরু করল। বিশ্বমনস্তত্ত্বের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝবার সূত্রটি আজ কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আজকের বিশ্বের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবমূর্তি বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ডাক পড়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনে জীবন্ত মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন দিকগুলি আস্বাদিত হয়েছে, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে একটি 'সমগ্র মানুষে'র, একটি 'পরিপূর্ণ মানুষে'র পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা কেউ রাজনীতিবিৎ, কেউ সাহিত্যিক, কেউ চিত্রকর, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ অল্প-একটা-কিছু; কিন্তু আমাদের কারুর পরিচয়ই মানুষ হিসেবে নয়। শ্রীকৃষ্ণ নিপুণ রাজনীতিবিৎ, রাষ্ট্রপতি; তিনি সাহিত্যিক—তাঁর গীতার দিকে তাকিয়ে সে কথাও বলা যায়। বৃন্দাবনে তিনি গোপগোপী ও গরু নিয়ে রাখালের জীবন যাপন করেছেন। প্রাচীন সভ্যতার একটি চিত্র দেখানে দেখি, যা মাটিতে-দেখানো একটি মধুর কাহিনী, অথচ যা গ্রাম্য নয়, যা সাধারণ হয়েও জীবনের গভীরতর মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করে ও তাকে ছাড়িয়ে যায়; আর সেইখানেই সে হয়ে উঠে মহনীয় ও মধুরতর। বৃন্দাবনের পরে তাঁর মধুরাজীবন আসে, যেখানে তাঁর রাজকর্ম, চলাফেরা তাঁর বৃন্দাবনজীবন থেকে একেবারেই আলাদা। গোপগোপীর বন্ধু কিশোর বালকটি আজ প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ, ভারতের সে-সময়কার রাষ্ট্রবিপ্লবের জটিলতার মধ্যে একজন পথপ্রদর্শক। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, মথুরাদ্বারকার কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ—কত প্রভেদ। মেলান কঠিন, তথাপি একই কৃষ্ণ, এবং সব কয়টির মধ্য দিয়েই মানুষ-শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ফুটে ওঠে। মানুষের গভীরতম প্রকৃতির (deeper nature) দিকে চাইলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নেই। আজকের দিনে এ কথাটা আমরা সহজে বুঝব। মানুষ যখন শুধু কোন-একটা-কিছু, তখনই সে সৌত্তলিক, তখনই সে মৃত, তখনই সে ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অফুরাণ। যুগ যুগ ধরে কত লোকে তাঁকে কত রকম করেই দেখল, কিন্তু আজও তিনি ফুরিয়ে গেলেন না। তিনি যে একই সঙ্গে গভীর ও বিস্তীর্ণ। 'বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ বিবিধং ভগলক্ষণম্'; তাই তিনি ভগবান, আর তাই তো তিনি ফুরিয়ে যান না। সাধারণতঃ মানুষ হয় গভীর হয়, নয় বিস্তীর্ণ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা এইখানেই যে, গভীর হতে গিয়ে তাঁর বিস্তার নষ্ট হয়ে যায় না, বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করেও তিনি অন্তরের দেবতা—তাই-ই তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। তিনিই স্বয়ং-ভগবান্; কেননা তাঁর এই ভগবত্তা কারো কাছ থেকে ধার-করা নয়। এই জন্যই কোন বিশেষ কালে কোন বিশেষ রূপে তিনি ধরা পড়ে যাননি: তিনি সর্বরূপ ও সর্বকাল-বিধৃত। তাই এক একজন তাঁকে এক এক রকম করে দেখতে পারল। আর এই জন্যই তিনি বলতে পারেন—'যে যথা মাং

প্রণতঃ তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' "কৃষ্ণ কেমন? যার কাছে যেমন।" তাই তো ভাগবত বললেন,—"মল্লদিগের পক্ষে তিনি বজ্র, মানুষদের কাছে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ—তাই তিনি পুরুষোত্তম, স্ত্রীলোকদিগের কাছে তিনিই মূর্তিমান কন্দর্প; গোপ-গোপীরা তাঁকে নিজেদের স্বজন ও আত্মীয় বলেই মনে করেন, অথচ সেই সময়েই অসৎ ক্ষিতিভুক যারা তারা মনে করছে ঐ আমাদের শাস্তিদানকারী যম, আর কৃষ্ণের পিতামাতা মনে করেন আমাদের সে তো কোলের শিশুটিই। রাজপতি কংসের কাছে তিনিই মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, বিদ্বানরা তাঁকে বিরাট মনে করে তাঁর থেকে দূরে রইল, যাদবদের কাছে তিনিই পরতত্ত্ব বৈকল্য, বৃষ্ণিকুলে জন্মে' স্ত্রিদের তিনি পরম দেবতা।" যোগীদের যিনি বৈকল্য, সৎ রাজাদের তিনিই শাসক—মনে হয় ছুটি কত বিপরীত! একটি হচ্ছে জীবনের অতীত্ব একটি সত্তা, ব কিছুকে ছাড়িয়ে যেখানে তিনি বিশেষত্বহীন বিশেষ; অথচ সেই সঙ্গেই তিনি একেবারে বাস্তবের ই দেশে অসৎ রাজাদেরও শাসক, যেটা এই জগতেরই ধার।

বুদ্ধির কাছে একই মানুষের সব-কিছুকে বিধৃত করে 'কা ছুটো বিরুদ্ধ। এই বিরোধকে কেবল বুদ্ধির মধ্যে ছুতেই মেলানো যায় না। জীবন্ত জীবনের সমগ্রতায় যাই শুধু—যেখানে বুদ্ধি আছে, প্রাণ আছে এবং দুই নিয়ে যেখানে এমন একটি বস্তু আছে কেবল বুদ্ধি দিয়ে ছুতেই যার তল পাওয়া যায় না।—সেইখানেই শুধু টী সত্তায় এই পারস্পরিক বিরোধকে তাদের বৈশিষ্ট্যে ায় রেখেও মেলান যেতে পারে। সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূর্তির মধ্য দিয়ে যে ঐক্য, যে ব্রহ্মবস্তু,' বাস্তব জগতে । অচল। সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ছিটিয়ে রেখেও তাদের যা যে মিলনক্ষেত্র-রচনা, তাই ব্রহ্মঘন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ সমগ্র জীবনখানি নিয়ে যখন পুরুষোত্তম-তত্ত্ব হলেন, নে সেই জীবন বুদ্ধিকে নিয়েও বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়। ণ আর বুদ্ধিকে জড়িয়ে সে অপূর্ব মহিমান্বিত হয়ে

প্রতীপটুকু, আর দাওয়ার কোণের তুলসীমঞ্চ, আর সেই সাথেই অনন্ত কালের অনন্ত বিশ্বের সীমাহীনতার আহ্বান। সীমার সঙ্গে অসীমের, বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের, কামের সঙ্গে অকামের দ্বন্দ্ব শ্রীকৃষ্ণজীবনে তাই বড়।

মানুষ কি হতে পারে, কী অনন্ত সম্ভাবনাময় তার জীবন, তারই একটি চিত্র তিনি অঙ্কিত করে গেছেন। রবির মুক্তি আলোর মধ্যে, মানুষের মুক্তি তার সর্বাঙ্গীণ প্রকাশের স্নিগ্ধতায়—রাষ্ট্রপতি শ্রীকৃষ্ণ, বৈষয়িকপতি শ্রীকৃষ্ণ আর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই স্নিগ্ধতার একটি পরিপূর্ণ চিত্র রয়ে গেছে। তাই তো তিনি অধরা—রাজনীতিতে তিনি ধরা পড়েন নি, কৈবল্যে তিনি ধরা পড়েন নি, প্রেমে তিনি ধরা পড়েন নি; সবখানেই তিনি আছেন, অথচ কোন-একটিতেই একান্ত করে নেই।

কিন্তু আমরা ধরা পড়ে গেছি। আমরা যে-কোন-একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্যে নিজেকে শক্ত করে খাপ খাওয়াবার জন্য তীব্র সবেগে সাধনা করি। অথচ জীবন স্বরূপতঃ তা তো নয়। তাই আমরা একটি বিশেষ হয়ে পড়ি, সর্ব বিশেষের মধ্য দিয়ে প্রতি বিশেষকেই ছাড়িয়ে যাই না। তাই তো কেউ আমরা কর্মী, কেউ জ্ঞানী, কেউ ভক্ত, কেউ কবি, কেউ রাজনীতিবিৎ, কেউ দেশসেবক, কেউ সংসারী, কেউ বা সন্ন্যাসী। মানুষ আমরা কেউ নই।

আমরা কোন-একটা-কিছু বলেই তো আমরা যা করি, ধৈর্য প্রশ্নের বেড় নিয়ে তা একটি বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, যাকে আমরা দেখতে ছুঁতে পারি, আমরা বুদ্ধিতে যার হিসেব পাই। কিন্তু পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষই যা কিছু করে গেছেন তার হিসেব পাওয়া কঠিন; এক কথায় তাকে আমরা নস্যাৎ করে দিতে পারি, দিয়েও থাকি। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ কি করে গেলেন? তাঁদের জীবন ছুঁয়ে তো কেবল ব্যর্থতার চিত্রই দেখছি। কী করে গেলেন বুদ্ধ, যীশু কিংবা এই সেদিনের মহাত্মাজী? এঁদের কোন আদর্শই তো পৃথিবীতে টেঁকে নি, আর প্রত্যেকেরই হয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে

সত্যিই তাই! আমাদের বুদ্ধি যাকে ছওয়া বা করা বলে, এঁরা তার কিছুই করেন নি, বা হননি। তথাপি পৃথিবীর ভোরকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে এঁদের প্রতি প্রণতি উৎসারিত হয়ে এসেছে। কেন? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পৃথিবীতে যা কিছু সবলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি, যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেলতে পার, তখনই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসল-ক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা'। এঁদের প্রয়োজন এইখানেই। পৃথিবীতে যত আইডিয়া, যত আদর্শ, পথ চলার যত ছন্দ, সে সব এঁরাই যে নিয়ে এলেন। এঁরাই যে আমাদের দেখিয়েছেন চলার পথের নিশান।

তাই ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কয়েক হাজার বৎসর আগে তাঁর জীবনের কর্মের মধ্য দিয়ে আর তাঁর গীতায় নিজমুখে যে কথা বলে গেলেন, পৃথিবীর আকাশে বাতাসে তা ছড়িয়ে পড়েছিল; অলক্ষ্যে অজানিতে মানুষ তার কোন না কোন কথাকে রূপ দেবার চেষ্টাও করে এসেছে। সেই কথাকে সেই জীবনকে বিশেষ করেই আজ পাওয়া যাচ্ছে আজকের দিনের রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, নরনারী ধনিকশ্রমিক উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধেতে —সর্বত্র।

বিশ্বের অনন্ত পথের তিনি পথিক; আমাদেরও তিনি সেইখানেই আহ্বান করেছেন। আমাদের পরিমাপের সীমা-অসীম, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে, সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে অনন্ত পথে তিনি বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন। তাঁর বাঁশীতে সুর মেলাতে পারলেই জীবনের ছন্দ আপনি ধরা পড়বে, গান জমবে, পথ আর পথের শেষ সেইখানেই আনন্দের মধ্যে মূর্তিলাভ করবে। ধন্য তিনি, ধন্য তাঁর এই মাটির জগৎ, ধন্য তাঁর চলার ছন্দ!

মানুষের পূর্ণতার সম্ভাবনার চিত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পাওয়া যায়; এ তাঁর জীবনের এক দিক। আর একদিকে ঈশ্বরের পূর্ণতার চিত্রও তাঁরই মধ্যে পাই—এই দুইয়ে মিলিয়েই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ পরিচয়। তাই ভক্ত-কবি গাইলেন, 'নববৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়।' ঈশ্বর ও মানুষের সমন্বিতমূর্তি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আজ বারবার বন্দনা করি।

'বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥'

(১৫৫৪ বঙ্গাব্দে উজ্জলভারত হইতে)

লড়াইয়ের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

জয় করতে হবে—এ বিশ্বে মানুষের মত মানুষ হতে গেলে জয় করতে হবে। বন্ধুকে জয় করতে হবে, বিষয়কে জয় করতে হবে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে জয় করতে হবে, ঘটনাকে জয় করতে হবে, মানুষকে জয় করতে হবে। যে কোন কিছুর সঙ্গে এ সংসারে সম্পর্ক স্থাপন করার অর্থই হচ্ছে তাকে জয় করা। জয় করব কেমন করে? বাঘকে খাঁচায় পুরে, তাকে খেতে না দিয়ে, আফিং খাইয়ে তার শক্তিকে কাবু করে দিয়ে, তার ব্যাঘ্রত্বকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে জয় করব, না বাঘকে বাঘ রেখে, তার স্বরূপে স্থিত রেখে, তাকে স্বাধীন স্বস্থ পুষ্ট রেখে তার সঙ্গে লড়াই করে তাকে জয় করতে হবে? সাপের বিষদাঁত ভেঙে সাপকে জয় করব, না সাপের বিষদাঁত রেখেই তাকে জয় করার

পথ আছে? ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আহার না দিয়ে শুকিয়ে রেখে ইন্দ্রিয় জয় করব, না ইন্দ্রিয়কে তার স্বাভাবিকতায় স্থিত রেখে ইন্দ্রিয় জয় করব? রাজনীতিক্ষেত্রে শত্রুকে ছলে বলে কৌশলে দুর্বল করে তাকে জয় করব, না শত্রুর হাতে অস্ত্র দিয়ে তাকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করে তাকে জয় করব? নারীতে তার মুক্ত স্বরূপে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জয় করব, না নানা বাধা নিষেধের সহস্র বাঁধনে তাকে বেঁধে রেখে জয় করব? সমাজের ছোট মানুষদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পাওয়ার চেষ্টা করব, না তাদের ছোটলোক বলে ঘুরে সরিয়ে নানাভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাদের আমার কাজে লাগাব? মানুষের কাছে এই প্রশ্ন

সাধারণ মানুষ অবশ্য সব ক্ষেত্রে প্রথম পথই বেছে নেয়—গাধাকে ঘাসের পুরে আস্তিং বাইয়ে বশ করে সে সার্কাসে দেখিয়ে নিজের বীরত্বের পরিচয় দেয়; সাপের বিষদাঁত ভেঙে ফেলে সাপ খেলা দেখিয়ে বাহবা অর্জন করে সাপখেলোয়াড়, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আহার না দিয়ে শুকিয়ে বিষয় থেকে নিজেকে সর্বদা দূরে রেখে মুনি ইন্দ্রিয় জয়ের গৌরব ঘোষণা করেন; দুর্বল শত্রুকে দুর্বল মুহূর্তে আঘাত করে জয়ের গর্ব অর্জন করে সবল; নারীকে বেঁধে রেখে, পুরুষোচিত আবদ্ধ করে ফেলে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে' তার প্রভু হয় পুরুষ। ছোটলোকের মানুষকে ঘৃণা করে নিজের সমাজের সীমা থেকে নিজের স্থান করে নিয়েছে অভিজাত। প্রবাদ আছে 'Give your dog a bad name and then hang'। অপর পক্ষকে দুর্বল করে, লাঞ্ছিত করে, তার মুক্ত স্বরূপকে মেরে ফেলে তাকে যে জয় করা, সে তো ভীরুর জয়, কাপুরুষের আস্ফালন। পাকিস্তান ভারতবর্ষকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, যাতে এর পরে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবার কথা তার স্বপ্নেও না হয়। কিন্তু এ তো মানুষের পথ নয়, এ যে দুর্বলের নিজ দুর্বলতাকে গোপন করবার ছলনা, এ যে বন্ধের শত্রুকে বেঁধে রেখে নিজের বন্ধনকে ভুলবার প্রয়াস।

তাহলে এ জিজ্ঞাসার উত্তর? উত্তর আছে—

অসাধারণ মানুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের কাছে নূতন পথের কথা নিয়ে এলেন, বন্ধকে জয় করবার নূতন মন্ত্র ঘোষণা করলেন। ভীরু মানুষ মনে করেছিল মুক্তি দিলেই বুঝি বন্ধু হাতছাড়া হয়ে যাবে, বেঁধে না রাখলেই বুঝি আর তাকে পাওয়া যাবে না। ভীরু মানুষ কেবল তাই-ই মনে করে নি, সে আরও মনে করেছিল যে, বন্ধুর বুঝি নিজস্ব কোন স্বাধীন সত্তা নেই, সে বুঝি নিতান্ত মৃত জড়—মানুষ তাকে যেমন ছাঁচ মেরে রেখে—সেই ছাঁচেই বুঝি সে কেবল চিরদিন ধরে পরিচিত হতে থাকবে। অথচ শাস্ত্রে রয়েছে 'বস্তুশক্তিঃ বুদ্ধিং ন অপেক্ষতে'—বস্তু-শক্তি মানুষের বুদ্ধির বাইরেও থাকে। ভীরু মানুষ আরও একটা কথা মনে করেছিল—মনে করেছিল বন্ধু থেকে সরে আসা যায় —এই তিন ভাবনায় ভুল করে ভীরু মানুষ বস্তুশক্তির কাছে যখন পরাজিত, তখন দীপ্তাগ্নির মূর্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তম বললেন, বন্ধুকে তোমার করতে চেয়ো না, তাকে মুক্তি দাও, তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার কর; সে মৃত কিছু নয়; বন্ধুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক প্রভু ভৃত্যের নয়—স্বাধীনের সঙ্গে স্বাধীনের প্রীতির সম্পর্ক। যাকে জয় করতে হবে তাকে তিনি শুধু মুক্তি দিলেন না, তাকে সম্ভাব্য সমস্ত রকম অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসতে দিলেন। নিজস্ব বা বন্ধু থেকে ভয়ে ঘুরে এসে তিনি বন্ধু জয় করেন নি, বন্ধুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে নিজেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিয়েছেন, তারপর তাকে জয় করেছেন। নারী-কীর্তি যাদের আছে, তারা সমাজ-গঠন করেছেন নারীকে নানা বিধিনিষেধে আটকে রেখে, তার সত্তাকে সীমায়িত করে; নারীকে মুক্তি দিয়ে, তার মানুষ-স্বরূপকে ফুটে উঠতে দিয়ে তার মুক্ত স্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের সাহস, সমাজ গঠনের সাহস সাধারণ মানুষের হয় নি। কিন্তু অসাধারণ মানুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয়কে তথা নারীকে ঘুরে রাখলেন না, কোনো বন্ধনের মধ্যে রাখলেন না—তাদের প্রত্যেকের যথা স্বরূপে তাদেরকে নিজেকে আক্রমণ করতে দিলেন। তাই তাঁর জীবনভর লড়াই। আর জীবনভর সে লড়াইতে তিনি জয়ী। ভাগবতের রাসের মধ্যে এই তত্ত্বই তিনি চূড়ান্ত করে প্রমাণ করলেন যে সহস্র নারীর সহস্র আক্রমণকে

আক্রমণ হিসাবে নিয়েই তিনি তাদের জয় করেছেন, হৃদয়ের মধ্যে তাদের এক করে নিয়েছেন, মদনমোহন হয়েছেন। হৃদয়ের পথে একান্ত করার সাধনায় অপর পক্ষের বিসর্বাত ভেঙে গেল—মানুষের সাথে মানুষের মিলন হল।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত জীবনই এই লড়াই-এর জীবন, তাঁর দর্শনও লড়াই-এর দর্শন। তাই তাঁর জীবন ঘটনাবহুল। ঘটনাকে, বিষয়কে বা বস্তুকে তিনি সরিয়ে রাখেন নি—অর্থাৎ পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে বিশ্বে তিনি জীবিত ব্যক্তির মতই বাস করেছেন। বস্তুকে, বিষয়কে, ঘটনাকে দূরে রেখে যারা চিত্ত জয় করলেন বলে মনে করে নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁরা একটা প্রবাদ বাকি রেখে দিলেন যে, বস্তুর মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে, ঘটনার মধ্যে পড়ে গেলে তাঁরা নিশ্চিন্তে চিত্তের প্রশান্তি রক্ষা করে, আসক্তি বিদ্বেষের চক্রাবর্তে পড়ে না গিয়ে পারেন কি না—ঘটনাকে তার নিজস্ব মূল্যে স্বীকৃতি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন কি না। রসগোল্লা থেকে দূরে থেকে নির্লোভভাবে পরিচয় মনের যে স্তরের মুক্তি ঘোষণা করে, রসগোল্লা খেয়েও লোভ না হওয়া মনের আরও গভীরতর মুক্তি ঘোষণা করে। শ্রীকৃষ্ণ এই গভীরতর বা গভীরতম স্তরের মুক্তির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সংসারে বেঁচে থাকলে ঘটনা ঘটবে—সেই ঘটনাকে কি ভাবে জয় করে, যে ঘটনার ওপারে যেতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধনা শিখিয়ে গেছেন। এ সংসারে প্রত্যেকটী ঘটনা-জয়ই একটি লড়াই-জয়। এ কথা বলা যেতে পারে যে, জীবনের চলার পথে প্রথম থেকে সবাই আমার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে বসে আছে—এখন আমাকে সেই ঘটনাগুলিকে লড়াই করে জিতে নিতে হবে। জল স্থল আকাশ বাতাস মাটি অন্ন বস্ত্র স্বজন পরিজন আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই বলছে, আমাকে জয় করে নাও—'জয় করে তবে মিলিবে হৃদয়ে অজানা অদৃষ্টেরে'। অমনি পাওয়া বলে এ সংসারে কিছু নেই—পড়ে পাওয়া জিনিষ নিয়ে গর্ব করবার জন্ত বিধাতা মানুষের সৃষ্টি করেন নি। মানুষকে তিনি দিয়েছেন অনন্ত সম্ভাবনাযুক্ত করে, তাই তাকে করেছেন সব চেয়ে অসহায়। জীবজন্তু জন্মের পর কত সহজে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের অন্নের সংস্থান করে, কতকগুলি স্বভাবজ অস্ত্র তাদের বিধাতা দিয়ে দিয়েছেন—যা তাদের আয়ত্ত করতে হয় না, জন্ম থেকেই আয়ত্তে থাকে। কিন্তু মানুষের কথা স্বতন্ত্র—তাকে প্রতিটি যোগ্যতা লড়াই করে আয়ত্ত করতে হয়, প্রতিটি ঘটনা লড়াই করে জয় করতে হয়।

জয়ের এই পথের কথা শ্রীকৃষ্ণ যেমনটী বলেছেন, সেইটে বীরের পথ। যাকে জয় করতে হবে তাকে নানাভাবে সীমায়িত করে, তাকে দুর্বল করে, তাকে তার মুক্ত স্বরূপে স্বীকার না করে যে জয়, সে জয় শ্রীকৃষ্ণের জয় নয়। মানুষ সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বস্তুকে নিজের মনের প্রলেপ দিয়ে তাকে নিজের মত করে পাওয়ার মিথ্যা-জ্ঞানজাত ব্যর্থ প্রয়াস করে এসেছে বটে, কিন্তু কারো সত্য স্বরূপকে চিরদিন ধরে ঢেকে রাখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কয়েক হাজার বৎসর আগে যে লড়াইয়ের জীবনদর্শনকে নিজে আস্বাদন করে গিয়েছিলেন, আজ কালের গতিতে সেই তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে আস্বাদন করবার দিন এসে গেছে। বস্তু আজ তার মুক্ত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ও করতে চাইছে। তার এই মুক্ত স্বরূপের সঙ্গে আজ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। কোন রাষ্ট্র আজ কোন রাষ্ট্রের চাপের মধ্যে থাকতে রাজী নয়—বিশ্বজোড়া দেখ না তাই কি রকম ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ হবে আজ প্রীতির—বড়-ছোটর বা শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ নয়। সমাজে আজ এক জাত অপর জাতের চাপের মধ্যে আর থাকবে না। বিষয়ের কথা বারই দিলাম—আমাদের দেশের দিকে ভাল করে এবং স্মৃতিশক্তিকে বজায় রেখে চেয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, জাতির উচ্চাবচের যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে টিকে এসেছিল, আজ কি তা টিকতে পারছে? ছোটলোক বলে যাদের মানুষের সম্মান দেই নি—কুকুর শৃগালের মত যারা ঘরে ঢুকলে আমার জল অশুদ্ধ হয় বলে জল ফেলে আমার উচ্চতাকে দীর্ঘদিন ধরে প্রমাণ

করে আসছিলাম—আজ কি আর তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে? জাতির জন্মগত শ্রেষ্ঠতা কিংবা বিশেষ জাত বলেই তার চিরন্তন শ্রেষ্ঠতা আজ কি আর মানতে পারা যাচ্ছে? ছোটলোককে যেমন পদে পদে নানা বাধা-নিষেধের জোরে ছোটলোক করে রাখা যাচ্ছে না, তেমনি নারীকে আজ আর কেবল ভোগ্য বস্তু করেও রাখতে পারা যাবে না। কিন্তু যে শাস্ত্র দিয়ে নারীকে, শূদ্রকে কেদিন অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলাম, ঘটনার চাপে রূপান্তর হলেও শাস্ত্রের তো বদল হল না—শাস্ত্র-আধার সে বইগুলি থেকে সে পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে ফেলাও হল না, বদলে লেখাও হল না। তার কি প্রয়োজন নেই? অথচ এ জন্য কারো মাথা ব্যথা তো দেখা যাচ্ছে না। সন্তান আজ পিতামাতার একান্ত অনুগত নয়, ছাত্র আজ শিক্ষকের আজ্ঞাবহ নয়—এগুলি এল কোন্ পথ বেয়ে? এগুলির কতটা বিকৃতি, কতটা গ্রহণযোগ্য, কোন্ রূপে? আরও এগোলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের অনেক ধারণা যা এতদিন বহু সংস্কারের চাপে ছিল, আজ আর তা থাকতে পারছে না। তাই চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত বস্তুর মূল্যমান আজ সর্বত্র ঘোষিত হয়ে গেছে। কেবল মানটাকে কোন মাত্রায় কোন্ রূপে আজকের সমাজে স্থাপন করা যায় তারই অপেক্ষা!

এই মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে যেখানে প্রত্যেকে তার স্বীয় সত্তায় বিরাজিত, সেইখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। এই সম্বন্ধস্থাপন একই ক্ষেত্রে বস্তু-অনুগ ও বস্তু-অতীত—অর্থাৎ পরকীয়। স্বীয়ে স্বাধীনে প্রেমের নাম পরকীয় প্রেম। এ সংসারে যত ঘটনা, বস্তু, চিত্তবৃত্তি, মানুষ যা কিছু বল—একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধই এই পরকীয় স্তরে—কেউ কারো স্বকীয় মধ্যে থাকবে না—অথচ প্রত্যেকের মধ্যে থাকবে তাদের অনাবিল প্রীতির অব্যাহত ধারা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ধ্যান করলে এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। কত অসংখ্য না, কত বিচিত্র রূপরসের—তার হিসাব যা আছে তা প্রত্যেক ঘটনার অতীতেও তিনি আছেন। অতীতে না থাকলে এত ঘটনার মধ্য দিয়ে এমন আশ্চর্য রস-সঙ্গী জেগে আসত না সুদীর্ঘকালের পথ বেয়ে। সে সঙ্গী কাকে না মুগ্ধ করছে?—ব্রজগোপীদের যেমন তা মুগ্ধ করেছিল, উদ্ধবকে যেমন তা মুগ্ধ করেছিল, মহর্ষি নারদকে যেমন তা মুগ্ধ করেছিল, মহারাজ পরিক্ষিৎকে যেমন তা মুগ্ধ করেছিল, মুগ্ধ করেছিল অর্জুনসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে—এমনি আরও কত কত কত জনকে। এ যেমন করেছে সেদিন, তেমনি এই দীর্ঘ কালের পথ বেয়ে কত পণ্ডিতকে কত অপণ্ডিতকে, কত কুলীনকে, কত পতিতকে, কত রাজাকে, কত ভিখারীকে, কত মীরাবাঈকে, কত অজামিল বিল্বমঙ্গলকে মুগ্ধ করেছে—কে তার হিসাব নেবে? সেই সামগ্রিক জীবনের সেই রস-সঙ্গীত আজও বেজে চলেছে অনাহতভাবে—যার দিব্য শ্রুতি লাভ হয়েছে সে শোনে বৈ কি।

নিজেকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করবার অবকাশ যেটুকু পান নি বলা চলে। যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য হতেও বললেন আবার রাজা ভোগ করতেও বললেন—তাঁকে নিয়ে বিলাস করবার অবকাশ কোথায়? তাঁর নিজের একটানা জীবনখানার মধ্যে সেই গোষ্ঠের দিনগুলি থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবনের দিনগুলি, যেখান থেকে মথুরায় তাঁর ঘটিল রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ, মথুরা-দ্বারকার জীবন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—আরও কত কত ঘটনা—তার তিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যোগীজনবাঞ্ছিতধন—তিনি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান—নিজেকে তিনি পুরুষোত্তম বলে ঘোষণা করলেন। তাঁকে নিয়ে বিলাসের অবকাশ কোথায়? অর্জুন তো ঘটনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ না করে বৈরাগী হতে চেয়েছিলেন—কিন্তু আশ্চর্য মানুষটী বললেন, না যুদ্ধ করে বৈরাগী হতে হবে। এই-ই ভারতবর্ষের মূল মর্মকথা—এই-ই শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম—যুদ্ধ করে বৈরাগী হতে হবে। সংসারটা যুদ্ধের স্থান, লড়াইর স্থান—লড়াই করতেই হবে। ঐ শ্রীকৃষ্ণ লড়াইয়ের ঠাকুর। কিন্তু এ লড়াইটা, এ যুদ্ধটা কিংবা যুদ্ধ জয়টা তোমার নয়

তোমার আমার ভাল মন্দ লাগা, পছন্দ অপছন্দ, অহঙ্কারের প্রকাশ দিয়ে যুদ্ধ করা চলবে না। সংসারে আমাকে কাজ করতেই হবে, লড়াই করতেই হবে—কিন্তু সেই আমার ব্যক্তিগত কাজ নয়, তাই সেটা বিষয়ী বা সংসারী মানুষের কাজ থেকে একেবারেই আলাদা। একান্ত ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা বলে সত্তাই কিছু নেই। রামদাস শিবাজীকে রাজা দিয়েছিলেন—সেটা শিবাজীর ব্যক্তিগত রাজা নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাজ্য ভোগ করতে যখন বলেন, সেটাও অর্জুনের ব্যক্তিগত রাজ্যভোগ নয়। এমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবন! ঐ লড়াইয়ে ঠাকুরটি এসে বললেন, যুদ্ধ তোমাকে করতে হবে, কিন্তু সেটা তোমার ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে বিশ্বহিতার্থে শ্রীকৃষ্ণ যে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়ে গেছেন—তুমি সেই যুদ্ধ করবে। আজকের দিনে আমাদের পক্ষে সেটা কি? শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে নিজেকে মণ্ডিত করে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে বিশ্বজনের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন করে জীবন চালিয়ে গিয়েছিলেন, যেমন করে জীবন চালাতে বলে গিয়েছিলেন, যেমন করে বহু পরস্পর-বিরোধী ঘটনাকেও তিনি পরিপাক করে এগিয়ে গেছেন—তেমন করে তাঁরই প্রীতির জন্য তাঁর সংসারে কাজ করে যাওয়া। আমার অহঙ্কার দিয়ে গড়া, আমার ভাল-মন্দ দিয়ে তৈরী কোন ব্যক্তিগত জীবনের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ নন।

ভাদ্র মাসের এই কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কয়েক হাজার বৎসর আগে এই লড়াইয়ের ঠাকুরটি একদিন এই মাটির ধরায় মোহন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে বিলাসের অবকাশ তিনি রাখেন নি বটে, তবু মানুষ সে বিলাস করে। তাঁকে পটের ঠাকুর সাজিয়ে শুধু ভোগ আরতিতে তাঁর পূজা করা কি তাঁকে নিয়ে বিলাস করা নয়? আজকের দিনে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যায়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যায় যে লড়াই আত্মপ্রকাশ করেছে—তারই মূর্তিমান সমাধান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে দিয়ে এই সমস্ত সমাধান না খুঁজে শুধু মন্দির বানিয়ে তাঁর পূজা করলে কি হবে? তোমার আমার জীবনের প্রতি পদের সমস্যায় তাঁকে নামিয়ে আনতে হবে—তাঁর জীবন ও তত্ত্বকে অনুধাবন করতে হবে। এই তাঁর শুভ আবির্ভাব-দিনে এই সুন্দর মনোমোহন লড়াইয়ের ঠাকুরটীকে আমরা ধ্যান করি, অনুধ্যান করি; আমাদের সমস্ত কর্মে,সমস্ত সমস্যায় তাঁর জীবন রূপ লাভ করুক, আমরা তাঁর মত লড়াইয়ে হব, তাঁর মত জীবন্ত জীবন লাভ করে।

এই লড়াইয়ের ঠাকুরটির সব চেয়ে বড় লড়াই জেতার সংবাদ পাওয়া যাবে এই একটি মাত্র পংক্তিতে—'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা'। ব্রহ্মাদিকে জয় করে সংরূঢ় হয়েছে দর্প যার, সেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে তিনি মদনমোহন হয়েছেন। কন্দর্পকে তিনি মোহিত করেছেন, তাঁর পায়ের কাছে কন্দর্প শিশুর মত খেলায় রত। কন্দর্পের দ্বারা তিনি মোহিত হন নি, কন্দর্প তাঁর দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিল। লড়াই জেতার এর চেয়ে বড় সংবাদ আর কি হতে পারে? এ লড়াই-এ জিততে হবে আমাদেরকেও—তাই এই লড়াইয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের পরম প্রয়োজন। তাঁকে তাই আমাদের নমস্কার জানাই, এই ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে মদনমোহন এই লড়াইয়ে ঠাকুরটীকে আমাদের নমস্কার জানাই, বার বার শতবার নমস্কার জানাই—তাঁকে সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে নমস্কার নমস্কার—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্বঃ।

(১৯৭৮-র ভাদ্র উচ্ছলভারত হইতে)

অবনীন্দ্রে অর্ঘ্য

।। শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ।।

ভারতীর চিত্রকলা যেদিন কৃষ্ণপক্ষ বিধুবৎ নিষ্প্রভ বিধুর—
বিমোচিতে সে কলঙ্ক তুমি এলে ভগীরথ অবনীতে অবন ঠাকুর।
আনিলে অলকানন্দা শিল্পের মন্দাক্রান্তে ঘন ঘন তুলি শঙ্খধ্বনি
ঘোষিয়া চন্দন তরু চারু কারুকলাবৃক্ষে সৃজিলে নন্দন বন তুমি গুণমণি।
বিমূর্ত্ত ভাবের মূর্ত্তি নীলাঞ্জিত তুলিকায় অন্তরঙ্গ অনুরাগে করেছ রঞ্জিত
ইন্দ্রতুল্য-অবনীন্দ্র সুরঙ্গ পটুয়া রূপে তাই সারা পৃথিবী-পূজিত।

সাহিত্যেরও মানসের ছিলে তুমি মালাকর গাঁথিয়াছ কত পুষ্পমালা
হৃদয়ের অন্তরঙ্গ আবেগেতে সাজায়েছ বাণীমার বরণের ডালা।
তোমার কথাকাব্য ছন্দ প্রবাহিত এক শান্ত স্বচ্ছ পুণ্য প্রস্রবণ
সবগুলি রোমান্সের নীলাঞ্জন মাখা—সর্ব্ব-মন বিমোহন।
পুরাণ ও ইতিহাস রূপ কথায় সযতনে একসূত্রে বাঁধি
করেছ অপূর্ব্ব সৃষ্টি সৃষ্টিধর কথকতার সুধা সুরে সাধি।
শিশুদের দাদুরূপে গড়েছ কত না খাদ্য মধুময় 'ক্ষীরের পুতুল'
কচি কাঁচাদের সত্য বন্ধু নাচা ও রচনা রূপে রসে সুগন্ধে অতুল।

শিল্প নব জাগৃতির উদ্‌গাতা, রেখে গেছ ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতি;
কালাপাহাড় মোরা ধ্বংসে মত্ত—সমতায় মোহে যার বিদ্যুতের গতি।
পূত সূত্রে তব সৃষ্টি;—অশ্লীল সাহিত্যে আজ আমাদের মন সদা ছুটে—
শুচিতা ফিরায়ে আন এ'মিনতি—শিল্পাচার্য্য-অপি অর্ঘ্য-রাঙা পায় পুটে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

চলুন হাওয়া-হাওয়া...

বাটা সানওয়ে

Bata

ইউবিআই তে আপনার জমানো টাকা

হাজার হাজার

কৃষক

কারিগর

খুচরো

ব্যবসায়ী

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা

যানবাহন পরিচালক

বৃত্তিজীবী লোক

ও আরো অনেককে

উন্নতিতে সাহায্য যোগাচ্ছে

10 SEP 1971

যথাসম্ভব সঞ্চয় করুন

আর মনে রাখবেন

- আপনার জমানো টাকার সুদ পাবেন শতকরা চার থেকে সোয়া সাত টাকা পর্যন্ত।
- বছরে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সুদের আয় করের আওতায় পড়ে না।
- দেড় লাখ পর্যন্ত আয়ের জমানো টাকা সম্পদকর মুক্ত।
- জমানো টাকায় উৎপাদন বাড়ে ও হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI-71-38

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
শুদ্ধ-অশুদ্ধ সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

শারদীয়া ১৩৭৮, ১৯৭১ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র চতুর্বিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পূজার অভিনন্দন

এই শুভ-অবসরে আমরা আবার আমাদের দেশবাসীগণের
সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করছি।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ASP/UCO-15/90

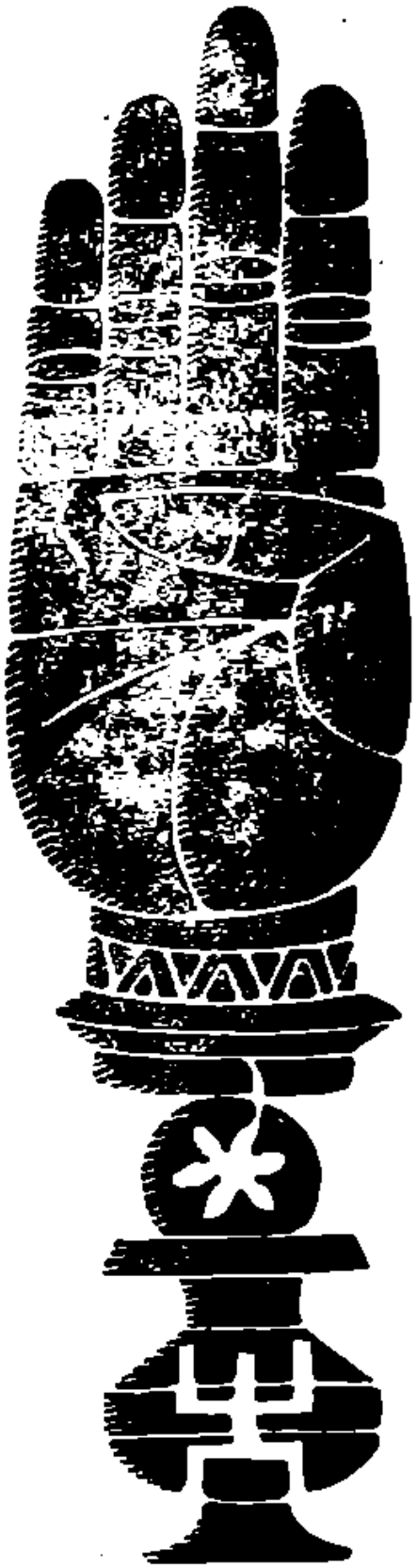

আলো:

"তমু হতে তব মহাপ্রকাশে
পূর্ণ করুণ দাও হে॥
দীনতা হতে মহান্ শিখরে,
সংশয় হতে সত্য-সন্ধানে,
ক্ষুদ্রতা হতে বৃহৎ জীবনে,
পূর্ণ করিয়া দাও হে॥"

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(একটি ভারত সরকারের সংস্থা)

BBB/UBI-470

সি, সি, কো ম্পা নী

—কন্টিনেন্টাল কম্যার্শিয়াল কোং লিঃ—

৮।৯, ডালহৌসী স্কোয়ার,

কলিকাতা।

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও

ছাপাই-এর কাজ :

টাইপরাইটার—ফাউণ্টেন পেন

বিক্রয় ও মেরামত :

—ষ্টীল ফারনিচার—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৪২৬৩

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

●

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা-৪

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৮৫
বঙ্কিমের গল্প	১·২৫
বিদ্যাসাগর	২·২৫
ছোটদের সেরা গল্প	৩·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

হুড়ায় জীবনী	১·২৫
শিশু রামায়ণ	১·০০
শিশু মহাভারত (শিক্ষা-বিষয়ক বই)	১·০০
শিক্ষা—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত	৮·৫০
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি	১২·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীরমণী সেনগুপ্ত

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	১২·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী	৪·০০
শিক্ষার ইতিহাস—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী	৪·০০

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	২·৫০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	২·৫০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	২·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	২·০০
সরল যোগ-ব্যায়াম	২·০০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	২·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	২·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৪·০০

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর (মহারাজ)

জেলে ত্রিশ বৎসর ও ভারতের বিপ্লব-সংগ্রাম	৫·০০

শ্রীরমেশচন্দ্র সরকারের

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	৫·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা ষাণ্মাষিক—২·৫০ টাকা
বার্ষিক—৫ টাকা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ষাণ্মাসিক—৫ টাকা
বার্ষিক—১০ টাকা

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৩৬৮১।৭১

সূচীপত্র ও শারদীয়া ১৩৭৮

১। সুভাষ বৈপ্লবিক ধারণা ১৩৯
রেণু মিত্র

২। সবের উপরে মানুষ সত্য ১৪৭
সুনীতি সান্যাল

৩। প্রাণের কথা ১৫০
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৪। গল্প নয় শুধু ১৫৪
কবিদাস সাহা

৫। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিধবাবিবাহপ্রসঙ্গ ১৫৬
সন্তোষকুমার অধিকারী

৬। প্রার্থনাকোলীন ভাষণ (৮৮) ১৫৯
পুরুষোত্তমানন্দ

৭। শিক্ষা-ব্যবস্থার সংকট-ত্রাণ ১৬৩
প্রাথমিক শিক্ষা
মানবরাণী স্বদেশরঞ্জন

৮। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৭২
১৯৪৪ (৪০)

৯। জাতীয় সংহতি ১৭৮
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

১০। সামাজিক ক্রমবিবর্তন ১৮২
—সমবায়ী গণতন্ত্রের পথে
মনোরঞ্জন গুপ্ত

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমার কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চটচটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল—সারা সকালে প্রসাধন ঠিক থাকে।

কেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

নিবেদন

উজ্জয়ভারতের গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুরাগী-বৃন্দকে জানাইতে চাই যে ১৯৭২ হইতে উজ্জয়-ভারতের পঞ্চবিংশ বর্ষ হইতে উজ্জয়ভারত একেবারে বন্ধ না করিয়া যত স্বল্প আকারেই হউক রক্ষা করিতে চাহিতেছি।

কার্যাধ্যক্ষ, উজ্জয়ভারত

CALCUTTA

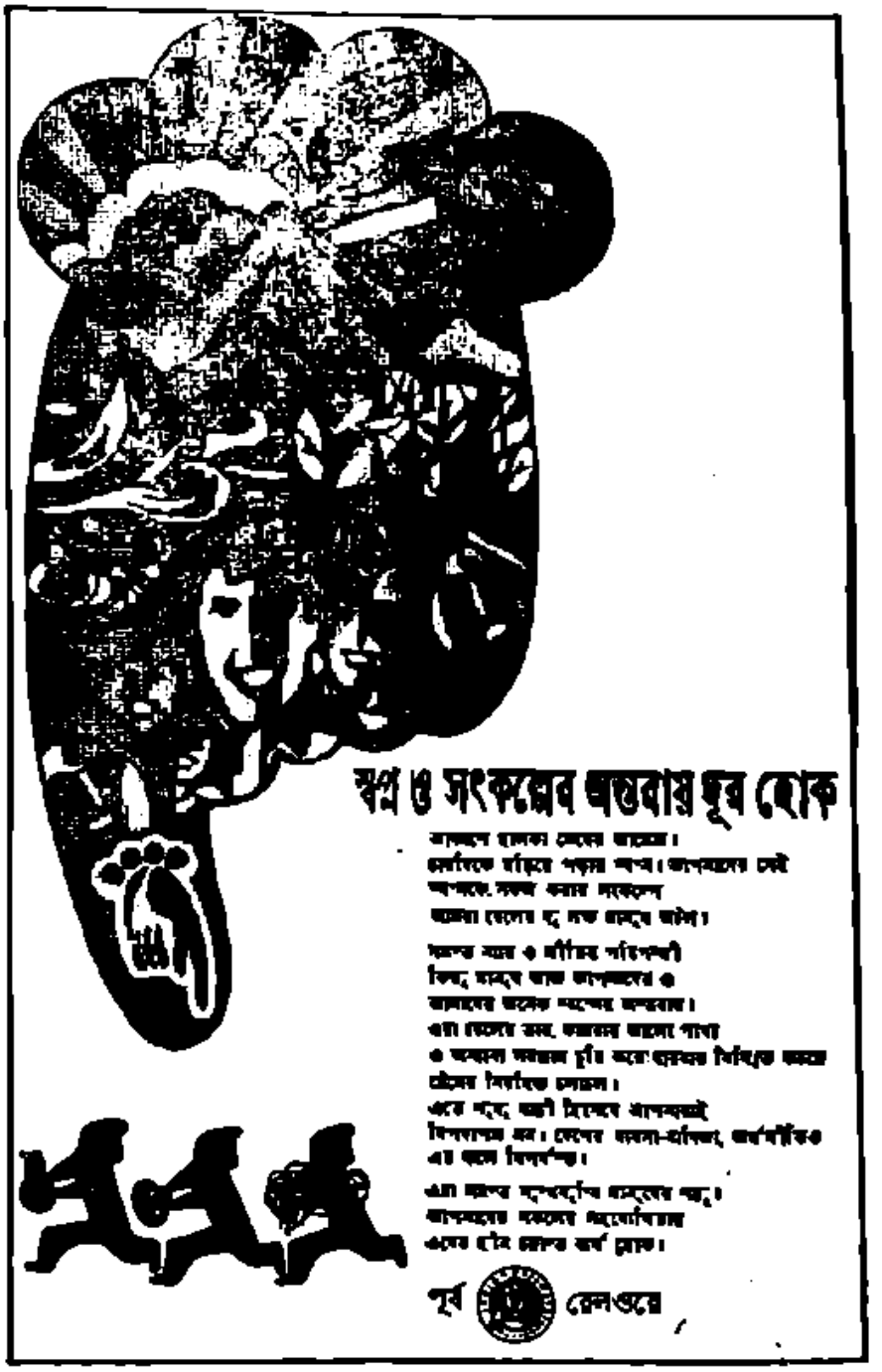

ভারত ঐতিহ্যের বাহক

দুর্গাপূজা, রাসের ও দীপান্বিতা ভারতের জাতীয়
ঐতিহ্যবাহী উৎসব

লক্ষ্মীবিলাস

দেশীয় শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী নাম। প্রতিটি উৎসবে
ও মৈলন্দিন প্রয়োজনে অপরিহার্য।

এল.এস.বি. এন্ড ব্রাদার্স প্রা: লি: ০ কলিকাতা

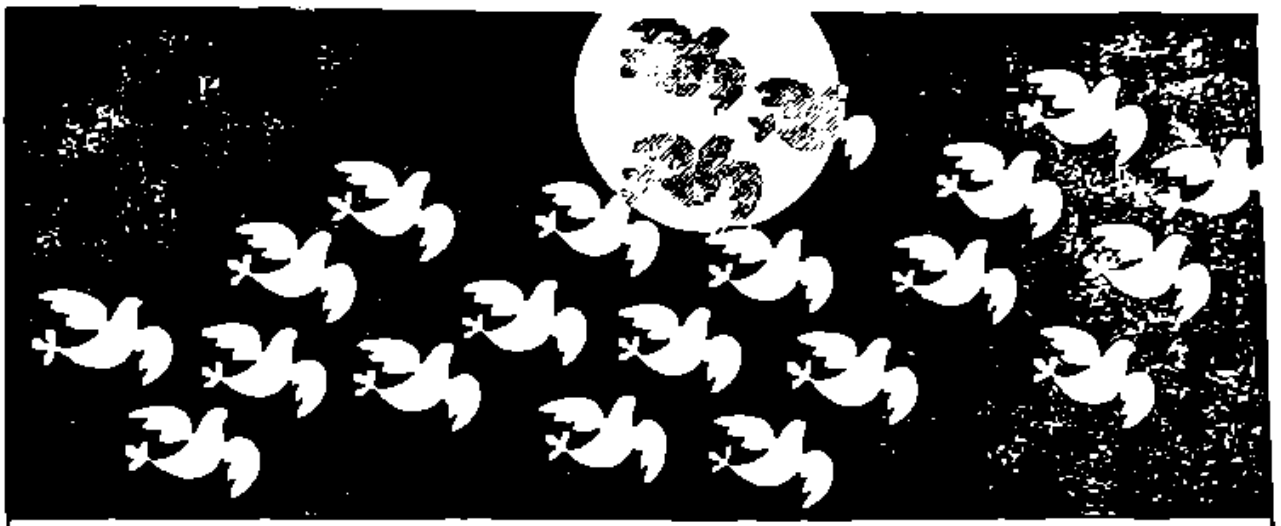

উজ্জ্বল
সোনালী দিন

চাঁদ বা তারার কাছে বিভ্রমণ নয়—
কিম্বা কল্পলোকে পক্ষ বিধুনন-ও নয়—
ইস্পাতোজ্জ্বল বাস্তব মাটির পৃথিবীতেই
আমাদের অনন্ত সফরণ।
উৎসব মুখরিত এই দিনগুলি হোক্
আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের সোনালী ছাকর।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

॥ সুলেখা মানেই উৎকর্ষ • উৎকর্ষ মানেই সুলেখা ॥

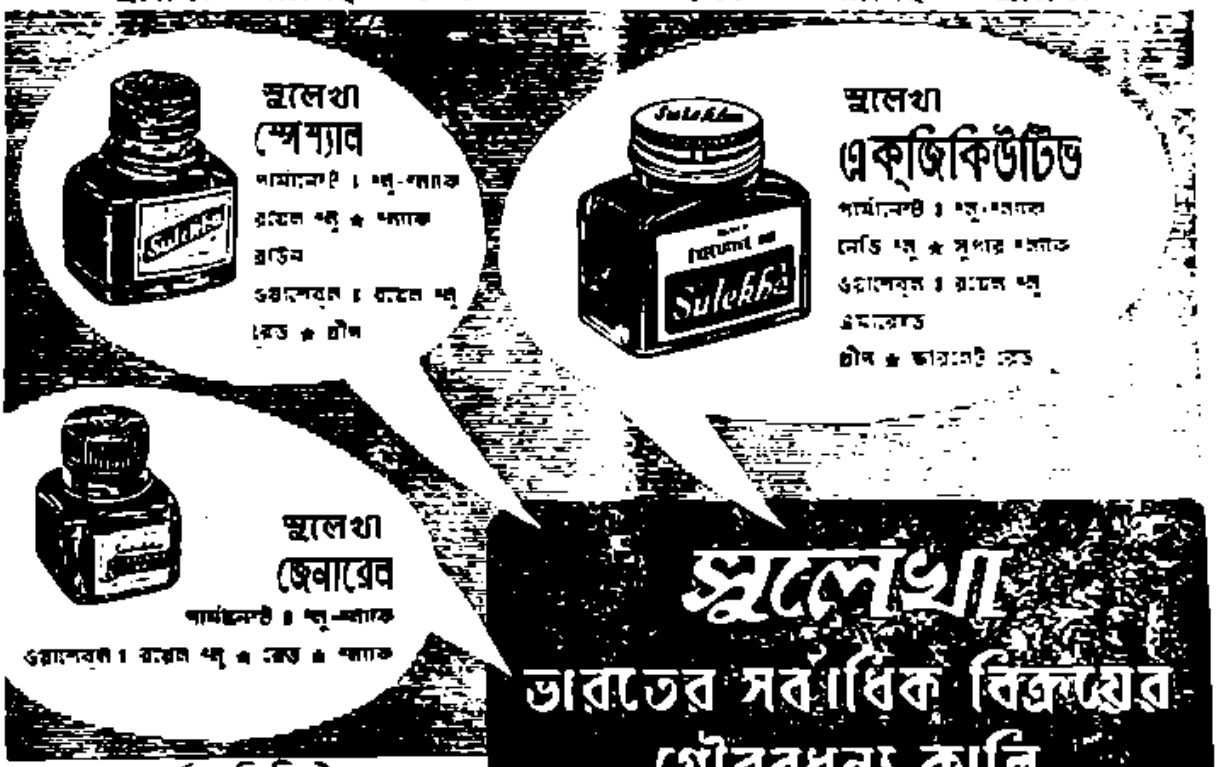

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড,

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতির নকশা

যেমন তরুণ মনের, তেমনি তরুণ পায়েরও তল পাওয়া ভার। বাটার কারিগরদের সারা জীবনের সাধনাই তো এই নিয়ে। বাটার দোকানে এলে তাঁদের সেই গবেষণা, অনুশীলন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পাবেন হাতে হাতে। আরামভরা ও টেকসই, বাহারেও মানানসই। ভাড়াও দেয়, আরামও দেয় একই সঙ্গে। বাড়ন্ত পায়ের দুরন্তপনার সকল ধকল সইতে পারে এমনভাবেই এই জুতো তৈরি। ছোটোদের বাবা যার নিজের জুতো বেছে নিতে দিন।

Bata

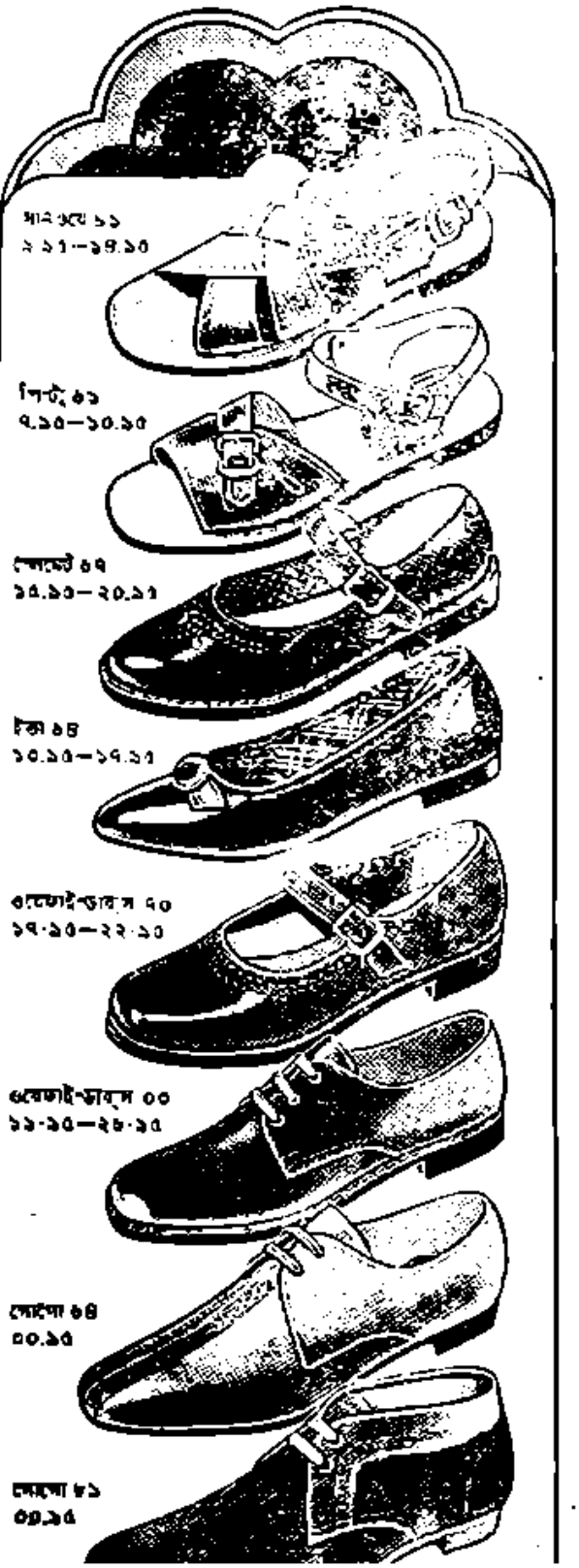

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

উদ্বোধন

আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭১ চতুর্বিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

পূজার বৈপ্লবিক ধারণা

॥ রেণু মিত্র ॥

বর্ষা ভারাক্রান্ত দিনগুলির অন্তে বাঙ্গালীর প্রিয় বহু বৎসরের পুরাণো শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল।

'পূজা' শব্দটী শুনিলে অনেকের চিত্তে দাহ উপস্থিত হয়, অনেকের বিরক্তি ও অবজ্ঞা, অনেকের আবার অন্য কিছু। তাহার কারণ সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী এই 'পূজা'-র ব্যাপারটীকে জীবন-বহির্ভূত কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত করিয়াছে—যে আচার অনুষ্ঠানগুলি একপেশে অবৈজ্ঞানিক অসুস্থ অন্ধ কুসংস্কারময় তমসিকতারই নামান্তর। অথচ যুগ যুগ ধরিয়া ইহাদিগকে টানিয়া বুনিয়া ধর্মের নামে চালাইতেছে। কোথায় অনন্ত ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্য মানুষকে অনন্তায়িত করিবে, তাহা নয় ধর্মের নামে এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানগুলি সাধারণ জগতকারী ভারত-বাসীকে কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারের কূপমণ্ডুক করিয়া জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় পূজা বলিয়া সত্য কোন অবস্থা যে আছে তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, '…জীবনে তোমারে পূজিতে'—আমরা জীবনের আচরণ দ্বারা পূজা করি না কেবল কতকগুলি প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র করি। যত কম্যুনিজম প্রচারিত হউক, লক্ষ্মীপূজা বুঝি বা ঘরে ঘরে সপ্তাহে সপ্তাহে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঘরের মেয়েরা কি লক্ষ্মী হইয়াছে? শিব হইয়া শিবপূজা করার নির্দেশ ছিল, লক্ষ্মী হইয়া লক্ষ্মী-পূজা করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার বা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা শিবও কেহ হইল না, লক্ষ্মীও কেহ হইল না—অথচ যুগ যুগ ধরিয়া পূজা করিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে কেননা একদল মানুষ পূজার উপর এত বিরূপ হইবে? যে পূজা মানুষের পুরুষকারকে নষ্ট করিয়া দেয়, সে পূজা অবশ্যই করণীয় নয়—এ কথা নিশ্চয় মানি। কিন্তু সব কিছুরই যেমন একটা পচনাবস্থা আছে, অথচ উহাই যেমন তাহার সত্য রূপ বা সবটুকু রূপ নয়, তেমনি পূজার যে বিকৃতি ভারত-বাসীর মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে যুক্তিহীন অমানুষে পরিণত করিয়াছে, সেই বিকৃতিও পূজা নয়। বিকৃতি আছে বলিয়া পূজা বলিয়া কিছু নাই তাহা বলিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

'ওহে জীবনবল্লভ, সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তর-ব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবনমন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব'…।

কিংবা যখন বলেন,

'আমি কি বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন।
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি
করো তারে আপনারি ধন—আমার হৃদয় প্রাণ মন'।

কিংবা যখন বলেন

'হে মহাপ্রবল বলী…
তব অভয় চরণে শরণাগত দীনহীন
হে রাজা বিশ্ববন্ধু'।

কিংবা

'জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ—
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ॥
…নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেম পরিপূর্ণ মধুর ভাতি।

তব হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে
দীনজনে সতত করো অভয় দান।

কিংবা

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'—

তখন কি রবীন্দ্রনাথের এ পূজায় কোনো বিকৃতি আছে? এ পূজা কি তাঁহার কুসংস্কার? এ পূজা কি তাঁহার পুরুষকার নষ্ট করিয়া দিয়াছিল? তাঁহার এ উপলব্ধি কি অনন্ত ভগবানকে সীমিত করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া তাঁহার জীবনকে কূপ-মণ্ডূক করিয়াছিল?

নিশ্চয়ই কোনটাই করে নাই।

যদি বল রবীন্দ্রনাথের করে নাই, সাধারণ মানুষের তো করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের করে নাই যেহেতু তিনি তাঁহার পূজার বাহিরের আচার অনুষ্ঠানকেই কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষকেই ঐকান্তিক করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত আরও তো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একাধারে ভাবুক বিপ্লবী মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া গোয় লুটাইতেন, তখন কি তিনি তাঁহার জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছিলেন? আপামর মানুষকে তিনি কি কোল বালেন নাই। তথাকথিত বর্ণাশ্রমের উচ্চ নীচ সমাজ-ব্যবস্থা পীড়িত অবহেলিত নিরক্ষরকেও কি তিনি ভগবৎ পূজার অধিকারী ঘোষণা করিয়া তাহাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে কোটানো সুপ্ত জীবন-চেতনায় উদ্বোধিত করিবার দুঃসাহস রাখেন নাই? তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেম তো তাঁহাকে জগৎ সম্বন্ধে, গতের মানুষ সম্বন্ধে বেহুঁস করে নাই? তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেম তা তাঁহাকে কাজীর শাসন ক্লীবের মত মানিয়া লইয়া দের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিরত করে নাই। তিনি তো ত শত মাদলমদল খোলকরতালে বজ্র হুঙ্কারে কাজীর দেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা রাখিতেন? যে বীর সন্ন্যাসী বেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে নিজেকে বিকাইয়া দিয়া লেন, সেই বিকাইয়া দেওয়ার জন্য দিয়াই কি সেই বেকানন্দ বিবেকানন্দ হন নাই। বিশ্বদরবারে ভারতের থা পৌঁছাইয়া দিবার বীর্যলাভ করেন নাই? সেই বেকানন্দই কি তৎকালীন বান্ধদাসেশের বুকে মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধ জাগাইয়া তোলেন নাই? একশত পনেরো বৎসর আগে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইয়াও বলিতেছেন, আমি বিশ্ব-নাগরিক, এই বিশ্বই আমার মহামঠ। সন্ন্যাসের সঙ্গে যে বিশ্বনাগরিকত্ব-বোধের বিরোধ নাই, সন্ন্যাসীকেও যে বিশ্বনাগরিক হইতে হইবে, কেবল জাতীয়তাবাদ দিয়া যে বর্তমান বিশ্বের সমস্যার সমাধান হইবে না, আবার তেমনি কেবল সন্ন্যাসদ্বারা অর্থাৎ বাস্তব জগতের অতীত হইয়াই যে সন্ন্যাস রক্ষা করা যাইবে না—এই বিশ্বটাকেই যে মহামঠ রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে চালাইতে হইবে, সন্ন্যাসীর পূজা যে এই মহামঠ বিশ্বেই সম্ভব ও উচিত এই সব বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার জীবন ও বাণীতে রাখিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস লইবার সময়ই তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ছিলেন এই মর্মে যে তাঁহার যখন যে বেশ পরিবার প্রয়োজন হইবে, তিনি তাহা পরিধান করিবেন। এবং সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটির ভোটদানে সন্ন্যাসী বলিয়া তিনি বিরত থাকেন নাই—ধুতি চাদর পরিয়া ভোট দিয়া আসিয়াছেন। এমনি বহু ঘটনাদ্বারা দেখান যায় শ্রীনিত্য-গোপালের জীবন কোন জীবনবিমুখতার নেতিবাদের উপর দাঁড়ানোও না, আচার প্রচারে কোন কুসংস্কার, ধাপ্পা, অসামঞ্জস্য তাঁহার জীবনেও নাই। সব সংস্কারমুক্ত একটী জীবনপ্রবাহ তিনি—গতি ক্ষেত্রে স্থিতি ক্ষেত্রে সমান বিচরণশীল। এই শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে পূজা তো বিকৃতি আনে নাই, কোন কুসংস্কারও সৃষ্টি করে নাই।

তাই বলি পূজার দোষ নাই, দোষ হইয়া গিয়াছে, পূজাকে ধর্মকে যে রূপে যে অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছিল, আচরণ করা হইতেছিল, সেই রূপ ও অর্থের রকমটার মধ্যে। সত্যি-কারের জীবনবাদকে স্বীকার করিতে পারিলে, উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহা হইতে পূজা বাদ পড়ে না, পড়া উচিতও নয়। ভগবান অসীম অনন্ত অফুরান বলিয়া তিনি শুধু আমাদের প্রত্যেকের বস্তিগত (subjective) চিন্তা-বুদ্ধি অনুভূতির বস্তু হইয়া থাকিবেন, তাঁহার objective রূপ কিছু থাকিতে পারিবে না—ইহাতেও তো তাঁহাকে সীমিত করিয়াই ফেলা হইল না? আমি যেমন ভগবৎ

তার একটি বিকাশ বা প্রকাশ, এই রকম যেমন লক্ষকোটী প্রকাশ রহিয়াছে, তেমনি আবার এই প্রকাশগুলি সব এক রকম হইতেছে না। একজন নিজের খাওয়া পরা প্রতিষ্ঠা ভোগ লইয়াই সদা ব্যস্ত, আর একজন নিজের খাওয়ার সাথে সাথে অন্যের খাওয়ার চিন্তা না করিয়া পারেই না—এই রকমের কত ভাবে পার্থক্য! তাই কোন কোন ভগবৎ প্রকাশ সাধারণের মত হইয়াও সাধারণের অতীত—ইহা তো খুবই স্পষ্ট। তাঁহারা তো ঐতিহাসিক অস্তিত্ব লইয়াই মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন? সেই রক্ত অতীত সত্তা মিলাইয়া যাহারা অনির্বচনীয় হইয়া আছেন, সাধারণ মানুষ তাহার আসক্তি বিদ্বেষ ঘৃণা ক্রোধ অহংকার সমাচ্ছন্ন মন দিয়া তাঁহাদের বুঝিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে রকমফের করিয়া দিয়াছে, বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে—তবু তাঁহারাই মানুষকে সত্যের কথা বলিতে পারেন, জটিল কুটীল সংসারকে স্বীকার করিয়াও ইহার আনন্দ স্বরূপের পথরেখাটা কোথায় দেখাইতে পারেন—তাঁহারা যে নিজেদের ক্ষুদ্র নিজত্বের ঊর্দ্ধে। তাহা হইলে এই সব ভগবৎপ্রকাশকে পূজা করিব না কেন? তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিব না কেন? তাঁহাদের ভালবাসিব না কেন? তাঁহাদের কাছে পথের কথা শুনিতে চাহিব না কেন? যুগে যুগে মানুষের মূঢ়তা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আবার এই মানুষের মধ্য থেকেই একজন আসিয়া সত্যের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের নমস্য। সত্যকে বিকৃতি হইতে যাহারা রক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রতি যে শ্রদ্ধার অভাব, পূজা-মনোবৃত্তির অভাব তাহা দূর করিয়া সত্যিকারের পূজা করিবার, জীবনের আচরণে আনিয়া পূজা করিবার মনোবৃত্তি আজ জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পূজার নামে বহুবিধ কুসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা মূঢ়তা অজ্ঞতাকেই জিয়াইয়া রাখিতেছে, আর অন্ধ অজ্ঞ মানুষের দ্বারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ পূরণ করিয়া লইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যোপলব্ধির নামে যাহারা বুজরুকি চালায়, তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে গিয়া আমরা যেন সত্যের সাধক যাহুকরকে ছুরে ফেলিয়া না দেই। সত্যোপলব্ধি (intuition) ব্যাপারটা ধোঁয়াটে বস্তু নয়—সে ধরা ছোঁয়ার জগতে যদি রূপ না পায়—তাহা হইলে সে মোটে সত্যই নয়। যে ভগবৎপ্রেম বাহিরে মানুষের সেবায়, কর্মের জগতে সুন্দরতর জগৎ-রচনায় রূপ পাইল না, তাহা ভগবৎ-প্রেম নয়, তাহা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি মাত্র। রাধাকৃষ্ণন্ লিখিতেছেন—'While it (intuition) liberates us from the prejudices of the understanding, it carries our intellectual conclusions to a deeper synthesis'। সত্যোপলব্ধির সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত বুদ্ধির বিরোধ নাই—বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তগুলিকে এই সত্যোপলব্ধি গভীরতর সামঞ্জস্যে গড়িয়া তোলে। তাহা যেখানে হয় না সেখানে উহা সত্যের সামগ্রিক উপলব্ধি নয়—উহা আংশিক নেশামাত্র। আমি তোমাকে ভালবাসি কিন্তু তোমার প্রয়োজনে এক গেলাস জলও আগাইয়া দিবার মত বুদ্ধি বা কর্মগত যোগ্যতা আমার নাই—ইহা ভালবাসা নয়, প্রেম নয়, ইহা নিছক কামুকতা। বাস্তব জীবনের আচরণ-দ্বারা প্রমাণ দিতে হইবে তোমার সত্যোপলব্ধি কি বস্তু। মানুষকে শিক্ষাদ্বারা একদিকে মহত্তের প্রতি, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিতে হইবে, অপর দিকে কুসংস্কার, মূঢ়তা, অজ্ঞতার প্রতি সচেতন করিতে হইবে।

মানুষকে মানুষ হইতে হইবে—সে মনুষ্যত্বের ধারণাটা কি? ধনিক শ্রমিক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, মুচিমেথর, কর্মীজ্ঞানী বা ভক্ত, ভারতবাসী বা আমেরিকান—ইহা আজিকার মানুষের পরিচয় নয়। আজ প্রথম কথা—আমি মানুষ, আবার আমাকে মানুষ হইতে হইবে যে দেশে যে অবস্থায়ই আমি জন্মগ্রহণ করি না কেন। আমার মধ্যে জীবত্ব আছে, শিবত্ব আছে, আমার ব্যক্তি-জীবন আছে, সমষ্টি জীবন আছে। আমার মধ্যে ক্রোধ আছে, অক্রোধ আছে, হিংসা আছে, অহিংসা আছে, আসক্তি অনাসক্তি দুইই আছে, আছে প্রেম বিদ্বেষ দুই-ই। আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে মনে হইবে পরস্পর বিরুদ্ধ। মনে হইবে একটে অভিভব করিয়া দাবাইয়া দিয়া অপরে টিকিয়া থাকিবে—

এই-ই বুঝি মানব জীবনের ইতিহাস। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ও মনস্তর্ধর্মতত্ত্ব তাহা বলে না—ভাল হউক আর মন্দ হউক—জীবনের কোন বৃত্তিকে ঢাকাইয়া রাখা যায় না। যে বৃত্তিগুলি দেখা যাইতেছে একদিক দিয়া ক্ষতি করিতেছে, সেগুলিকে মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বিশ্বকল্যাণে নিযুক্ত করাইয়া দিতে হইবে, সামঞ্জস্য আনিয়া দিতে হইবে। আপাত-বিরুদ্ধতাকে গলাইয়া উহাদিগকে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-কল্যাণব্রতে নিযুক্ত করিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সম্ভব হয় না, উহাদিগকে সমষ্টির ক্ষেত্রে, বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে, সার্ব-জনীনতার স্তরে লইয়া আসিতে হয়, তেমনি শুধু বুদ্ধিযুক্তি —প্রাণবর্জিত বুদ্ধিযুক্তি—দিয়াও হয় না। প্রাণধর্মী মানুষের জীবনের উদ্ভাসে এই বিরোধিতা গলিয়া যায়। যে জীবন যাহাদের আছে, সংসারে তাঁহারাই গড়েন, নূতন ভাঙা, নূতন পথ তাঁহারাই দেখান। তাঁহারা আমাদের নমস্য। যুগে যুগে সভ্যতার রূপবিবর্তনে এমন অনেকের মধ্যেই এই মানুষের সভ্যতার রহিয়াছে। শারদীয়া পূজার এ প্রাচীন যুগের ঐ রকম জীবনধর্মী মানুষের মহৎ চিন্তা, ধ্যান-চিন্তা বিভিন্ন দেশকালের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াও রহিয়া আছে। এই পূজার যে সামাজিক অবদান রহিয়াছে, তাহার মূল্য যেমন অনেক, তেমনই ইহার পিছনে যে মানবিক জীবন-তত্ত্ব রহিয়াছে তাহাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার বস্তু তো নয়ই, বিশেষ ভাবে অনুধাবন করার জিনিষ। আমরা সে অর্থ সে তত্ত্ব জানি না—কেহ ইহাকে বর্জন করি, কেহ গোলে হরিবোল দিয়া হৈ হৈ করিয়া সাজিয়া গাইয়া মাইক বাজাইয়া, ইলেকট্রিকে চারিদিক ভাসাইয়া পালন করি। কিন্তু আজ নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। আজ এই শারদীয়া পূজার অবসরে পূজাকে আমরা জীবনের মূল্যে বিচার করিয়া দেখিব। এ দিনের পূজাকে আমরা শ্রীমৎ পূর্ণযোগানন্দ অবধূতের শেষ ভাষায় এইখানে উপস্থিত করিতেছি—

"শ্রীশ্রীদুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী……শ্রীনিত্যগোপাল কে 'ভারতের মহাশক্তি' রূপে বর্ণনা করেছেন।…… ঐ শুম্ভ-নিশুম্ভের বুদ্ধিতে যে নারী দৃষ্টা করালবদনা, মাংস ভীষণা, প্রেমবুদ্ধিতে তিনিই 'সৌম্যসৌম্যতরাশেষা সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী, প্রেমাত্মী, সর্বমঙ্গলা, যোগমায়া।…… কামুকের কাছে যে প্রকৃতি 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি' বলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভৈরব-নাদিনীরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাহার সেই রুদ্র মূর্তিই দ্বৈতাদ্বৈত ভক্তিসাধনার শাস্ত হইল, ভক্তের সকল দেহের নিংড়ানো 'রমণীয়' রক্তামৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।…এই পূজার কয়েকটী ভাগ আছে—প্রথমে বোধন, তারপরে তিন দিন ধরে পূজা।…বোধন অর্থ জাগরণ।…মা ঘুমিয়ে আছেন, আমি তাঁকে জাগাব? তা নয়—আসল কথা আমি ঘুমিয়ে আছি বলেই দেখতে পাই না যে মা জেগেই আছেন।…তুমি যতটুকু ঘুমিয়ে পড়ছ অর্থাৎ তোমার অহঙ্কার যতটুকু লোপ পাচ্ছে, মা ততটুকু জাগছেন। বলতে শেখ—মা আস, আমার জীবনে অধিবাস কর, আমার সবটুকুকে অধিকার করিয়া বাস কর।…ভক্তিতে মা জাগ্রত হন, বাধ্য হন। অহঙ্কারবশত তুমিই মাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ…অহঙ্কারকে জয় করতে চেষ্টা কর।…অন্তরের শত্রুকে, অন্তরের দুষ্টবুদ্ধিকে বলি দাও—রক্ত বলি দাও। রক্তের টানে মানুষ কত কুকর্ম করে—ধৃতরাষ্ট্র রক্তের টানে দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দিয়েছে। রক্ত বলি চান না, বাইরের পাঠা বলি না। কাম ভেদের সৃষ্টি করে—যে কামে ভেদ থাকে না, সেই কামের অধিকারী হও, অনন্ত হও, অনন্যতাই বিদ্যা। অনন্য হলেই শুধু কাম থাকে না।…ব্রহ্মগ্রন্থি বিষ্ণুগ্রন্থি রুদ্রগ্রন্থিতে মানুষ আটকে আছে—…বিদ্যালাভের বাধক ঐ ভেদবুদ্ধি, ঐ গ্রন্থিগুলি—এই ভেদবুদ্ধি দূর করতে না পারলে দুর্গাপূজা হয় না।…আমি দুর্গাপূজা করে শ্রীনিত্যগোপালকে পেয়েছি…আমার দুর্গা আমায় নিশ্চিন্ত করেন নি।…যতকাল প্রকৃতি আছে, ততকাল শুম্ভনিশুম্ভ আছে, ততদিন কামবীজ আছে…চিরকাল বলে আমায় রক্ত বলি দিতে হবে।…মাগো, আজ তুমি সর্বক্ষণ: তবু একটা রাতি একটা দিনে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য তোমার চরণে সমাগত। মা, আমাদের মিলবার সামর্থ্য দাও।…সব শক্তটা চণ্ডীতে কতবার প্রযুক্ত হয়েছে দেখুন। সর্বভূতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও সেই অনুযায়ী জীবন-যাপনই মায়ের পূজা।…

পূজার তিন দিনে তিনটী গ্রন্থি ছেদন করতে হবে। ...সপ্তমী পূজা হচ্ছে – নূতন সৃষ্টির পথে মধু এবং কৈটভ—অতীতের স্থ ও কুসংস্কার বাধা দেয়। অতীতের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন মানুষ ঠিক কালকের মত করে আজকের দিনকেও চালাতে চায়। সে ভুলে যায় প্রতিদিন একটী নূতন দিন। ...ইংরেজ রাজত্বের উপাদানে স্বাধীন ভারতের গঠন তো চলবে না...। সপ্তমী দিনের মহাকালী বিপ্লবময়ী। নূতন করে গড়া হতে হবে—নূতন করে গড়া হবার শক্তি অর্জন করবার জন্যই বিপ্লবময়ীর পূজা করা।...অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ থাকলেও অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ।...অতীতকে আঁকড়ে থাকার বিপদ ঐ ব্রহ্মগ্রন্থি ছেদন করে মহাকালী হচ্ছেন একটা মুক্ত স্রোত। চারদিকে যার চৌহদ্দী দেওয়া সে তো বদ্ধ।...এই পাঁচজন আমার, এই গ্রাম আমার—যদি বল এর বাইরে যাব না—তাহলে তুমি তো ডোবা।...গঙ্গা নিত্য নূতন—তুমি নিত্য নূতন হও। নিত্য নূতন সৃষ্টির আনন্দ, বিপ্লব ও ব্যাপকতা হচ্ছে সপ্তমী পূজার কথা। ...আমি এইটুকু নিয়ে থাকব—তাহলেই মৃত্যু। ভাঙতে ভাঙতে চল। অহংকার থাকলে বিশ্বকে নেওয়া চলে না। একজনকে নিয়ে আঁকড়ে থাকার নাম মৃত্যু।...কৃষ্ণ মুক্ত—গড়ার মুক্ত...রক্ষার মুক্ত...ভাঙার মুক্ত। নিজের বংশ ধ্বংস করবার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। ...New orientation এসে গেছে—তা যদি না শোনেন বাঁচবেন কি করে?.....পুরোপোটাই নূতন নয়—দুটোর মধ্যে ফাঁক আছে...কোন দুটো ঘটনা গায়ে গায়ে লাগানো নেই—রাসলীলার মত যেখানে দুইটী ব্রজগোপীর মাঝখানে কৃষ্ণ তেমনি সংসারে প্রতি দুইটি মানুষের মধ্যে, প্রতি দুইটি ঘটনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান—বীজ আর অঙ্কুরের মধ্যে ভগবান—দুটো ফুলের মধ্যে যে ফাঁক তা মিলিয়ে দিচ্ছে সুতো। দুটো মানুষ মিলবে কি করে যদি মাঝখানে যোগসূত্র ব্রহ্মসূত্র ভগবানকে না রাখা যায়? আমার বুদ্ধি আর আমার স্ত্রীর বুদ্ধি মিলবে না যদি তার মধ্যে ভগবান না থাকেন। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও যিনি অপরিবর্তনীয় তিনি মহাকালী। অতীতকে অতীত রেখেই যিনি বর্তমানের নূতন রূপে ফুটে ওঠেন তিনি মহাকালী—সপ্তমীতে তাঁরই পূজা।

দুর্গাপূজায় cosmic life-এর ধরে আছে তাই এতবার সর্বকৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে—সর্বকৃতাত্মপুষ্টি বাদ দিয়ে ভারতের কোন পূজা হয় না...। সংসারের another half সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের another half সংসার... পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরস্পরকে অগ্রসর হতে হবে।... এই যে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে—বন্ধ করছে কেউ?...লোভীর অন্ন কখনও দেবতা খান না...লোভী হয়ে গেছে সমস্ত সংসারটা।..আপনারা শরণাগত হয়ে কাম-ক্রোধকে মায়ের কাছে বলি দিয়ে লোভের ওপারে যান—যজ্ঞ করুন, অর্থাৎ নিজের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য কোন কিছুই করেন না যেন। দেবতাদের দেওয়া জিনিষ দেবতাদের যজ্ঞভাগ না দিয়ে গ্রহণ করবেন না।... পুরোণো কথা নূতন হয়ে আসে, নূতন রং ফেলে নেয়...। মনু পছন্দ করুন বা না করুন মেয়েরা স্বাধীনতা পেয়েছে, জমিদারীপ্রথা লোপ পেয়েছে.....। এ সমস্ত নূতন মূল্যবোধের কথা সপ্তমী পূজার ঋষি ব্রহ্মার জানা ছিল না।...বিপদে পড়ে ব্রহ্মা শরণাগত হলেন মায়ের, আমরাও হব। আর এই সপ্তমী দিনে আমাদের এই প্রার্থনা—নূতন যুগের ভোরে নূতন মূল্য-বোধকে আমাদের বুঝতে দাও, মা, তোমার উপর নির্ভর করতে দাও।...প্রারব্ধ থাকলে কি করে নূতন সৃষ্টি করবে? অতীত ভীষণ শক্ত। ব্রহ্মার কথা—আমি আমার অতীতকে transcend করতে পারছি না মা, তুমি জাগো। এই অতীতের সঙ্গে লড়াই করাই সপ্তমী পূজার কাজ। সেই লড়াইতে মা জাগলেন, বিষ্ণু জাগলেন। মহাকালী, অতীতের যে সু বা কু সংস্কার আমাকে বেঁধে রেখেছে নূতন সৃষ্টির পথে, তা তুমি সংহার কর—অতীতের সংস্কার না ভুললে নূতন সংস্কার আসবে কি করে? বদলে যায় আবেষ্টন—বদলায় না মানুষ—তাই তো এত ঠেলাঠেলি! ...আবেষ্টন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বদলে নেব—সপ্তমী পূজার কথা এই।

পূজার দ্বিতীয় চরিত্র মহালক্ষ্মী—এই দিনের পূজার

ঃ বিষ্ণুর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই আজকের পূজার
ই বিষ্ণু। সপ্তমী পূজায় মানুষ অতীতের সংস্কার-মুক্ত
াতীত একটি আত্মির খোঁজ পেয়েছে। এই মুক্ত
মি দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধতার সাধনা করতে হবে। সপ্তমী
ায় ব্যক্তিগতভাবে বিশুদ্ধ হয়ে অষ্টমী পূজার দিন সঙ্ঘ-
হতে হবে।···আজকের দিনে আমাদের দেশে
ganised society গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেবশক্তি
ং সাত্ত্বিকতা-প্রধান মানুষ তমো বা রজোগুণ-প্রধান
ষদের অপেক্ষা অর্থাৎ অসুরদের অপেক্ষা অনেক
। disorganised। মহিষাসুর সমস্ত দেবশক্তিকে
উল্টে দিয়েছে। একলা একলা লড়াই করে কেউ
ল না। তখন সর্বদেবশরীরজ দেবী অসুর বধ
লেন।·····সমাজের সমস্ত লোক দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া
পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবে—অষ্টমী পূজার
ই তাৎপর্য। সঙ্ঘবদ্ধ না হলে বর্তমানে বাঁচবার
ন সম্ভাবনা নাই।...মায়ের পূজার উপকরণ দেখলেই
যেন সমগ্র বিশ্ব নিয়ে টান পড়েছে—এ তো বাস্তবের
সামাজিক মা—যাকে দেবতারা একত্র হয়ে সৃষ্টি
লন। হিন্দুরা ব্যক্তি মানুষ হিসাবে ভাল, কিন্তু
ও organised নয়। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কৌশল
ঘরের ঠাকুরের কাছেই ছিল কিন্তু হিন্দু কি তা নিয়ে
গড়ল? ··সকলের বল নিয়ে তো তিনি সৃষ্টি হয়েছেন—
ই যদি বিরাট হয়ে না নেই, তবে এতবড় দেবীকে আমি
া করব কি করে?·····সমাজ তাঁকে সৃষ্টি করবে,
ক্তে তিনি তারপর রক্ষা করবেন। সর্বদেবশরীরজ
তিনি কোন এক দেবতার থেকে বেশী।··ব্রাহ্মণ,
য়, বৈশ্য শূদ্র মিলবে কি করে? রাজনীতি ক্ষেত্রের
নয় ভদ্রলোক ছোটলোকের মিলন ঘটানো—এটা
পূজার কাজ।·····পূজা সকলের মিলনের জন্য·····
মনাংসি জানতাম্—সকলের মন সকলে জানলে কি
া হয়?

অষ্টমী পূজার দিনে আসুন আমরা প্রার্থনা করি, মা
রা মিলব। পশুর মধ্যে একটা দেহগত ঘৃণাভাব আছে,
প্রধান মানুষেরাও একসঙ্গে থাকতে সহ্য করে,
কিন্তু মনে মনে তাদের মিল থাকে না, কৃতজ্ঞতাও
নেই। দেবত্ব হল মনপ্রাণ দিয়ে মিলবার প্রবণতা।···
মা এসেছেন—তিনি কি পারিবারিক বা সামাজিক
কোন বিরোধ সইতে পারেন?...সর্বভূতের সুখরূপে,
পুষ্টি রূপে তিনি, তিনি কোন একজন বা একদলের পুষ্টি
রূপে নয়...। তাই তো নিত্যগোপাল বললেন—I am a
cosmopolitan।...ইংল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডকে ভালবাসে,
রাশিয়া রাশিয়াকে ভালবাসে—ভারতবর্ষ একটী মাত্র দেশ
যেখানে সর্বভূতের কথা বুঝতে পারার তত্ত্ব রয়েছে—
দেশ কাল পাত্র-নিরপেক্ষ সর্বভূতের প্রতি ভালবাসার
কথা আছে, কিন্তু এমনই অবস্থা যে আজকের ভারতবাসী
নিজের দেশকেই ভালবাসে না। মহালক্ষ্মীকে না চিনলে
না জানলে ইউএন-ও (UNO) সম্ভব করবে কি করে?
প্রত্যেকের পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রত্যেকে চলতে চায়
এটা মহিষাসুরের খেলা—এখানে সব কাড়াকাড়ির ব্যাপার
—প্রত্যেকে অপরের অধিকার কেড়ে নিতে চায়।···
কাড়াকাড়ির মধ্যে বল শক্তিহীন হয়ে পড়ে।···কিন্তু এমন
করে তো সমাজের সমগ্রতা থাকে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকবে,
কিন্তু তা এমন বিকৃত হবে না যে অপরেরটাও আমায় করে
নেতে হবে। ব্যক্তি ব্যক্তি থেকেই সমষ্টি। দুর্গাতত্ত্বে ছোটর
দান বড়র দান সমান·· যদি সেবা-বুদ্ধিতে দেওয়া হয়।
সবারই সুন্দরটুকু দিয়ে তাঁর সৃষ্টি।···ধনিক শ্রমিক কেউই
একক ভাবে সমাজ নয়—দুইয়ে মিলে সমগ্র সমাজ। ধনিকের
হাত পা develop করে না—শ্রমিকের মস্তিষ্ক নাই।···
মহালক্ষ্মীর পূজায় প্রত্যেকের, প্রত্যেক কর্মের নিজস্ব মূল্য
রয়েছে।···পারস্পরিক রক্ত যেখানে আমরা শোষণ করছি—
সেখানে কোন্ মাতৃপূজা হয়?···মায়ের আবার জাত
বিচার? সর্বদেবশরীরজ মায়ের এতখানি ব্যাপকতা, তাঁর
পূজা করতে করতে আমাদের এতখানি ব্যাপকতা কেন হবে
না? তাঁর পূজা করতে করতে আমি তিনিই হব।···এই
মা আমার আধ্যাত্মিক দেবী, রাজনৈতিক দেবী।···বিশ্বের
সকল মানুষকে আমি কোলে তুলে নেব—এই বুদ্ধি আসলেই
আমার দুর্গাপূজা সার্থক···আমি অসীম; মা, তোমার মত
আমি সর্বদেবতাময় হব, সকলের আধি হরণ করব....।

বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু—একটা পারস্পরিক ধারার মধ্যে যুক্ত না হলে কিছুতেই মানুষের শ্রেয় নেই।···বিশ্বে এমন কিছু নেই প্রয়োগ-কৌশল জানলে যা কাজে লাগানো যায় না···প্রয়োগ-কৌশলের উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। প্রত্যেক বস্তুরই দুই শক্তি—আগুন দিয়ে রান্না হয়, আবার আগুন ঘরও পোড়ায়; একই ভাত বলাধানও করে, আবার কারো কখনো মৃত্যুর কারণ হয়···, সীতা রাবণের ধ্বংস আনয়ন করেছিলেন, কিন্তু রামের তিনি লক্ষ্মী।··· সম্বন্ধবদ্ধতা এই বুদ্ধিতেই সম্ভব করে তুলতে হবে।—জীবনের সব বৃত্তির, সব কিছুর একটা ব্রহ্মময়ী রূপ অর্থাৎ ব্যাপক সত্তার কল্যাণী মূর্ত্তি আছে—সেইটে দেখতে পেলেই সম্বন্ধবদ্ধতা আসে।

তৃতীয় দিনের পূজাতত্ত্ব শিবের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল—সেদিনের ঋষি শিব মহাসরস্বতী-তত্ত্ব আস্বাদন করবেন।...সমস্ত বৃত্তি যেখানে সামঞ্জস্যীভূত হয়—তখনই সেটা মানব-মূর্ত্তি—মহাসরস্বতী মানবী।···মানুষের মধ্যে পশুলক্ষীত্ব থেকে দেবত্ব সব কিছুর অস্তিত্ব আছে।··· মানুষী তনুই সকল তনুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ...চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে মানুষ-দেহ লাভ হয়।...সার্ব্বজনীনতা মানুষের ধর্ম—পশুর সার্ব্বজনীনতা নাই।···আহার নিদ্রা মৈথুন ভয় —এতে পশু মানুষ সমান—সার্ব্বজনীনতা ধর্মেতেই পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ—ধর্ম না থাকলে পশু মানুষ সমান... সর্বদেবতার মিলন-ভূমি মানুষ···। যজ্ঞ নেই অর্থাৎ সেবাবুদ্ধি নেই তাই বিশ্বের ক্ষুধা মিটছে না—নিজের ক্ষুধা নিজে মেটাতে গেলে জীবনে ক্ষুধা আর মিটবে না—নিজের ক্ষুধা যখনই নিজে মেটাতে যাবে দেখবে সেটা অন্তহীন। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি পাঁচজনের সঙ্গে নিজের ক্ষুধাকে জড়িয়ে নাও, দেখবে তাতেই থাকবে ভাল। পিপাসা মেটে পাঁচজনকে জল দান করলে···। মানুষ শেষ কথা···। নবমী পূজার যিনি মূর্ত্তি তিনি মানবী —representative of all দেবতা।···মানুষের প্রতি দেবতাদের লোভ।···মানুষ হওয়া কষ্ট।···এই মানুষী দেবীর পূজায় আজ শিখতে হবে মানুষ হওয়া...। সরস্বতী মানে তিনি সরস্বতী। মহাস্নান লালসাই প্রেরণা দান করে— চালনা করে। এই রসকে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলেই জীবন হয় দুঃখময়। তাই নবমীপূজার একটী মাত্র কথা—ভোগ করব না, ভজনা করব। কোন বস্তুকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখব না, দেখব ভজনার দৃষ্টিতে; প্রত্যেক বস্তুকে মর্যাদা দেব, ক্ষুদ্র বৃহৎ কারোরই মানহানি করব না...। হরগৌরী-ব্রতে হরের শুরু গৌরী-গৌরীর শুরু হর—এইটে ভারতীয়ত্ব—এইটে প্রেম···কাম আর প্রেম এক জিনিষ নয়—কামে পৃথকবুদ্ধি থাকে—প্রেমে থাকে অনন্যতা আর পারস্পরিক মর্যাদা—এই বুদ্ধিতেই শুধু ভজনা হতে পারে। এই ভজনা শিখতে হবে মহাসরস্বতীর কাছে।...আমি না হলে সংসার চলে না, আমার কর্তৃত্ব, আমার সিদ্ধান্তই সত্য—এটা ভোগাকাঙ্ক্ষা। নবমী পূজায় এই আমির ভোগাকাঙ্ক্ষাকে জয় করতে হবে। ভোগাকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ ততক্ষণ ভেদ-বুদ্ধি থাকবে—ভেদ-বুদ্ধি গেলেই ব্রহ্মবিদ্যা নেমে আসে। এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটী বস্তু আমাকে challenge দিচ্ছে—বলছে যো মাং জয়তি সংগ্রামে।··· তাই সে challenge গ্রহণ করে আমাকেও যুদ্ধ করতে হবে—যুদ্ধ করে আমার বিশ্বের বস্তুকে গ্রহণ করতে হবে···। নারী যেন বলতে পেরে আমাকে জয় করে আমাকে নিতে হবে। মহাসরস্বতীর সম্বন্ধে চণ্ডীতে রয়েছে —শুম্ভনিশুম্ভের দূত দেবীকে বলল, আমাদের প্রভুরা তোমাকে বিবাহ করতে চাইছেন—তুমি তাদের এক-জনকে স্বীকার কর। তখন দেবী বললেন, হ্যাঁ, সে তো ভাল কথা; তবে বাল্যকালে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাকে সংগ্রামে জয় করে নিতে হবে—সেইটে তোমার প্রভুদের বল গিয়ে।··এমনি যেন আত্মমর্যাদাময়ী হয় প্রত্যেক নারী—যেন বলতে পারে জয় করে জিনে নিতে হবে। এই সৌরববোধ শিখতে হবে মহাসরস্বতীর কাছে।··· নবমী পূজার দিনের দান—প্রতি বস্তুকে সেবাবুদ্ধিতে গ্রহণ করতে হবে—এই সেবাবুদ্ধিই ব্রহ্মবিদ্যা। ···সেবাবুদ্ধি উঠে গেছে বলেই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্লাবন। ···যজ্ঞ মানে সেবা—বিলিয়ে দেওয়া...। বিলিয়ে দেওয়া বিশ্বের ধর্ম...ভগবান সেবকের কাছে চিরকাল বাধা··· শক্তিদম্ভের দাবী নিয়ে কিছু পাবে না এ সংসারে···।

সকলকে নিয়ে সকলের সঙ্গে চল।

...বস্তুকে যেমনই ব্রহ্মমূল্য প্রদান করা হল, ভেদ যেমনই ঘুচে গেল, সঙ্ঘ যেমনই রচিত হল—তখনই বিজয় লাভ হল—তখনই প্রীতি আলিঙ্গন—তখন স্বাধীনে স্বাধীনে কোলাকুলি।...আজ সর্বত্র সংঘর্ষ এসেছে কেন? —প্রত্যেকেরই সব কিছুকে ভোগ করতে চাওয়ার প্রতিক্রিয়া...। এই ভোগ-বুদ্ধিকে জয় করলেই বিজয় হয়। বিজয় লাভ করতে হলে ঘৃণা করা চলবে না, কাউকে ছোট মনে করলে বিজয় আসবে না...যেদিন ভারতবর্ষ নিজেদের মধ্যে ঘৃণা করেছে সেইদিন মুসলমান এসেছে, ইংরেজ এসেছে...। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মহাপ্রেমের মন্ত্র রেখে গেলেন—জড় অজড়ের মিলন, চৈতন্য অচৈতন্যের মিলন—দ্বৈত অদ্বৈতের মিলন—সকল পরস্পর বিপরীতের মিলন, কোলাকুলি ঘটান। এই তো বিজয়। এই বিজয়ার দিন যখন সকলের সঙ্গে মিলন হল তখন বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বের মধ্যে নূতন করে যাত্রা করি। এই নূতন করে যাত্রা করার সময়ের মন্ত্র—সংসারের প্রতি বস্তুকে ব্রহ্ম-মূল্যে দেখা, সব কিছুকে ভজনা করা—ভোগ করা নয়—সেবা-বুদ্ধি দিয়ে সঙ্ঘচেতনাকে জাগ্রত করা।..."

এই এত কথা আছে শারদীয়া পূজার অন্তরালে। এ কথাগুলি বাস্তব জীবনের কথা—এগুলির মধ্যে কোন ফাঁকি, কোন মায়াজাল, কোন যুক্তিহীনতার অস্পষ্টতা নাই। জগৎ ও জীবন মিথ্যা, মায়া—জগতের ওপারে গোলোকের টিকেট কাটাই আমাদের সাধনা এইসব কথার তীব্র প্রতিবাদই এখানে আছে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অন্যত্র লিখিতেছেন, "...'জগৎ মিথ্যাবাদের'-র অন্তরেও এই পরাজিতের মনোবৃত্তিই (আঙ্গুর ফল টক যে মনোবৃত্তিতে) কাজ করিতেছে। জগৎও মিথ্যা ছিল না, আমার ভোগ করিবার লালসাও মিথ্যা ছিল না—সবই মিথ্যা হইল উভয়ের সংযোগ-কৌশল না জানার জন্য। স্বার্থপর মানুষ যখন সমগ্র পরিবারকে বঞ্চিত করিয়া একাই সব সুখ ভোগ করিতে চায়, তখন তো সে ও সংসার দুইই মিথ্যা, কেননা পারস্পরিক সম্বন্ধে কেহই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে না। সমগ্র বিশ্বের আলোকে বিশ্বের দিকে তাকাইলে দেখিব, আমি সত্য, বিশ্ব সত্য, বিশ্বের ভোগও সত্য..." এখানে মানুষকেই একক ধরা হইয়াছে, অথচ সে একটী সমগ্রবস্তু, সে-ই বিশ্ব। মানুষত্বের কোন দিকটাই এখানে বাদ পড়ে নাই। তাই পূজা আছে—কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা ও আস্বাদন সবই নূতন হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তি, সমাজ ও সত্যতাকে এই দৃষ্টিতেও দেখিতে হইবে যদি সত্য চাই। এক-বিশ্ব রচনার পথের কথাও এখানে আছে। তাই শারদীয়া পূজার অবসরে পূজার এই বৈশ্বিক অর্থকে অনুধাবন করিয়া পুরাণোর সঙ্গে নূতন জীবন-চেতনার সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে আহ্বান জানাই।

'প্রজ্ঞাবাদী সম্প্রদায়সমূহ বলিতেছে—'ন মদন্যৎ অস্তি'—'আর কেহ নাই'। এক মতবাদ অপরকে নিঃশেষ না করিয়া যেন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণই করিতে পারে না। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন অন্যের নিঃশেষ নির্বাণ। এমন করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া পরস্পরের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা পুরুষোত্তম-বেদে নাই। গীতা 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্'-এর মধুর শাস্ত্র। গীতাশাস্ত্র পরস্পরের 'বোধ' এমনভাবে জাগ্রত করিতেই অবতীর্ণ, যাহার ফলে 'শাস্ত্র-সঙ্ঘ' সম্ভব হইবে। জীবন-বেদই তেমন শাস্ত্র-সঙ্ঘ।"—ব্রহ্মসূত্র অবধূত ভাষ্য।

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সবার উপরে মানুষ সত্য

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

ভক্ত কবি গাইলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"! আবার সেই ভক্ত কবিকেই গাইতে শুনি "ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি"। এ দুটীতে পরস্পর বৈপরীত্য বিদ্যমান। একটী বাস্তব জগতের অন্তর মন্থনেরই অবদান, অপরটী বাস্তবের মাঝে অনুস্যূত থেকেও আরেকটী সত্তার কথা। জীবনের একদিকে বাস্তব জগৎকে স্বীকার করেও আর এক দিকে জগদাতীত জগন্নাথের চরণে পরিপূর্ণভাবে শরণাগতি! শরণাগত জীবনে যে বাস্তব জগতের মানুষের অবদান আটকায় না তা আমরা ভক্ত কবির লেখনীতে স্পষ্ট দেখতে পাই।

শ্রীগৌরসুন্দর হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন আবার সেই গৌরসুন্দর মাটীর জগতের ক্ষুদ্র মানুষটীকে তার যথামূল্য দিয়ে কোলে তুলে নিতে অধীর হয়ে পড়েন। সেই মানুষটীই আবার রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ-অভিমান চূর্ণ করবার জন্য আপামর জনসাধারণের মাঝে তাঁকে দাঁড় করানোতে বজ্রের মতো কঠোর। আবার দেখি যিনি কৃষ্ণ-প্রেমে ঘর ছাড়লেন তিনি মায়ের খবর নিতে, স্ত্রীর জন্য শাড়ী পাঠাতেও ভুল করেন না। এই যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্দর সামঞ্জস্য, সামগ্রিক ছন্দবোধ—এটা মানুষের জীবনে কী করে সম্ভব! সমগ্র মানুষের জীবনে সম্ভব হয়।

আমরা যখন দেশের কথা ভাবি তখন ঘরের কথা ভাববার সেই হারিয়ে ফেলি, ঘর ছেঁটলিয়া হয়ে আমাকেই পীড়া দেয়, আবার যখন ঘরের ভাবনা নিয়েই মশগুল থাকি তখন দেশের জটিল অবস্থায় আমার বুকের নীড়কে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরি না। তা হলে এমন একটী অবস্থা নিশ্চয়ই আছে যার সঙ্গে আমার যোগসূত্র থাকলে জীবনের সব দিকগুলিই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে না।

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে ভারতের মানুষ এই ছন্দের খোঁজ পেয়েছে। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও কত কত মহামানব আমাদের সামনে রেখে গেলেন পথের নিশানা। ভক্ত-কবি যে ভাবে বলেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তেমনি একজন সত্য মানুষ। তাঁর জীবন থেকেই মানুষ লাভ করবে সত্য মানুষ হবার গৌরব।

কিন্তু বেদনার বিষয়, মানুষ-কৃষ্ণ যে রকম করে আমাদের মানুষ হবার কৌশল, মানুষ হবার বুদ্ধি ও প্রাণের কথা বলে গেলেন, আমরা ধীরে ধীরে সে পথকে হারিয়ে নিজেদের মনগড়া পথ ও মতকে আঁকড়ে ধরলাম, যার ফলে জাগতিক মঙ্গলামঙ্গল আমাদিগকে পীড়া দিল না। জগতের ওপারের ধ্যানে নিজেদের গেঁথে নিলাম। আরও ধীরে ধীরে আমরা শুধু সংস্কারসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। আমাদেরই চলবার ছন্দের ত্রুটিতে তাঁর পথের নিশান হয়ে গেল "কালের মহত্তা নষ্টঃ"।

এই যে সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধতা এর ফলে বর্তমান বিশ্ব আজ হিংসা, স্বার্থপরতা, হানাহানি, দম্ভ প্রভৃতির চাপে ত্রাহি ত্রাহি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে শ্রীকৃষ্ণ কি এমন করে জগতে চলার কথা বলে গেলেন? আমরাই কী আমাদের পরিচ্ছিন্ন স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে প্রকৃত ধর্ম বলতে যা বোঝায় তাকে জীবন থেকে বাদ দিলাম না? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আজিও তাঁদের ফেলেছু আমরা ব্যর্থ নমস্কারে"। তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে আমরা আমাদের খেয়ালেরই পূজা করে চলেছি। যে পূজার কথা তিনি বলে গেলেন তা হল জীবন দিয়ে জীবনের পূজা—জীবনের প্রতি কর্ম দিয়ে পূজা। ভাগবত লিখছেন "কর্মৈব গুরবীশ্বরঃ" এমন ছন্দে কর্ম করতে হবে যে সেই কর্মই মানুষের ইষ্ট হবে, মঙ্গলময় হবে। আমরা সারা জীবনের কর্ম কখন [illegible]

ঢাকে ঢোল পিটিয়ে—এমন পূজার কথা কৃষ্ণ বলেননি।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতি র্মতির্মম॥ অর্থাৎ আদর্শ ও বাস্তব কর্ম যেখানে সমন্বিত সেখানেই শ্রীবিদ্যমান, অনন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান, সু-নীতি বিদ্যমান। কিন্তু তা আজ কোথায়? বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষ আদর্শকেই বড় করে দেখেছিল, বাস্তবকে করেছিল "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" মন্ত্রে অস্বীকার। যার ফলে বাস্তবের ক্ষেত্রে দেখা দিল দারিদ্র্য, নীতিজ্ঞানশূন্যতা প্রভৃতি মহারোগ। যে জগৎকে মিথ্যা বলে পারলৌকিক ধ্যানেই মগ্নচিত্ত ছিল ভারতবাসী আজ বাস্তবের আঘাতে ধ্যান তার ভেঙে গেছে কিন্তু আজ সে দিশেহারা।

আবার কেউ বা ব্রহ্মকেই অস্বীকার করে একমাত্র জাগতিক ভোগ সুখকেই যথার্থ বিবেচনা করলেন, তাঁরাও সংযমিত ভোগ প্রবৃত্তির অভাবে উচ্ছৃঙ্খলতাকে জীবনে বরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ ও ভোগের অর্থ এরকম করে জগতের কাছে রেখে যান নি। এই বিকৃত অবস্থার ভেতর একদল মানুষ জন্ম নিলেন তাঁরা বিশ্ব সমাজে পরস্পর মিলনের কথা বললেন ও সেই মিলনের মধ্যে পথ দেখালেন। তাঁরা তাঁদের যুক্তি দিয়ে দেখালেন মানুষের জীবনের এই ধর্মান্ধতা কিছু আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ দ্বারা জীবন গড়ে না বরং ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। তাঁরা ধর্মকে বিসর্জন দিলেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, ...কিন্তু ধর্মের এই অর্থই কি সর্বাপেক্ষা অর্থ? ভারতবর্ষ কি ধর্মের সর্বার্থ সম্বন্ধের চিত্র বাস্তবের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করে নাই? ধর্মের এই সর্বার্থ, সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয় নামে কি দরবারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের যে অর্থ লইয়া ধর্মের ফলে মানুষ মানুষের রক্ত পান করিয়াছে আজ সেই ইতিহাসে তাহা অচল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের তাহার বর্ত্তমান রাষ্ট্র নেতারা ভারতীয় ধর্মের সাধনার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নন। তাঁহারা ধর্মের জীর্ণ অর্থকেই একমাত্র ধরিয়া ধর্মকেই বিসর্জন দিতে বসিয়াছেন। এই সব নেতারা ভারতীয় ধর্মের ক্রম-বিবর্ত্তনের সঙ্গে কত অপরিচিত, অথচ ইহাদেরই হাতে রাষ্ট্র রজ্জু।"

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকে অস্বীকার করেন নি, তাঁর প্রতিবাদ ছিল সেদিন ধর্মের গ্লানির প্রতি। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে সত্য ধর্ম, মানুষের ধর্ম, পুরুষোত্তম-ধর্ম স্থাপন করে গেলেন। সেদিনের চিত্রে দেখতে পাই অর্জুনকেও এই রকম ধর্মান্ধতায় পেয়ে বসেছিল। দুর্যোধন-শাসিত অত্যাচার-পীড়িত রাষ্ট্রকে অত্যাচার-মুক্ত করবার পরিবর্তে অর্জুন জ্ঞাতি বন্ধু গুরু বধে পাপ হবে, পূর্ব্ব পুরুষ নরকে যাবে ইত্যাদি অনেক রকম ধর্মের বুলি আওড়িয়ে সন্ন্যাস নিতে চাইছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণও সেদিন স্পষ্ট ও সামগ্রিক যুক্তিবাদের দ্বারা অর্জুনের সামনে তুলে ধরেছিলেন ধর্মের আসল রূপ। স্থাপন করে ছিলেন প্রাণবাদ। অর্জুনকে উপলক্ষ করে সর্ব্বকালের সর্ব্ব স্তরের মানুষকে দেখালেন কেমন করে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে এবং জগতের প্রতিটী বস্তুর যথামূল্য দেবে।

একদল বলবেন মানুষকে মানুষের ভালবাসতেই হবে। তাঁরা যুক্তি দেখালেন একজন আর একজনকে না ভাল বাসলে, পরস্পর মিলে মিশে না থাকলে এই মারণাস্ত্রের যুগে মনুষ্য জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াবে। যেহেতু আমাকে আঘাত করলে আমি প্রতিঘাত হানব এবং এই ভাবে হানাহানি বেড়েই চলবে এবং দেখতেও পাচ্ছি এই ভাবে "বদলা" নেবার আদিম প্রবৃত্তি মানুষের ভেতরে কেমন করে ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে যার জন্য চিন্তাবিদগণ খুবই উদ্বিগ্ন এবং এর থেকে সমাজকে রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য নানা উপায় নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত। যেহেতু আঘাত করলে আঘাত আসবে অতএব মিলেমিশে থাকতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মনুষ্য জগতের মিলেমিশে থাকবার যে যুক্তি ঠিক করে গেছেন সে যুক্তি বা কৌশল অধিকতর ব্যাপক। আজ বিশ্ববাসীর অনুধাবন করবার ও অনুসন্ধান করবার দিন এসেছে শ্রীকৃষ্ণের এই মিলন-বারতা, তাঁর দেওয়া পথ চলার ছন্দ আজকের মানুষের জীবনে কতখানি অপরিহার্য্য।

প্রতি মানুষের ব্যক্তি-আমি যখন বিশ্ব-আমিতে একীভূত বলে মনে করবে, মানুষ যখন জানবে যে আমি অপরকে ছাড়া পূর্ণ হই না, ব্যক্তি-আমি, বিশ্ব-আমি এই মিলেই পূর্ণ আমি, তখনই হবে সত্যিকারের ভালবাসা—যাকে বলে প্রেম। Love is God. এই রকম ঘনীভূত প্রেমই ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্ব-আমিত্বের জীবন্ত মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্ব-আমিত্বের আদর্শ জীবনে বরণ না করে নিজেদের ক্লীব বানিয়ে বসে আছি। যার ফলে আমাদের পূজা আজ সৌখিনিকতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। অর্জুনকে তিনি ধমক দিয়ে তার পুরুষকারের শক্তিকে জাগ্রত করে বললেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"—ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হওয়া তোমার সাজে না। কৃষ্ণ-জীবনই পুরুষকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি কিভাবে জীবনযাপন করাটাকে শ্রেয় মনে করেন নি, আবার যে যুদ্ধ তিনি অর্জুনকে করতে বলেছিলেন, তা-ও আসক্তি-বিদ্বেষ-অহংকারের প্রকাশ নয়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে দেখেছি বেদনা-ক্লিষ্ট মানুষের জন্য কী বেদনার্ত্ত, মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য সারা জীবনে কী তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা, কী ত্যাগ। সে মানুষ সহস্রবার বলেছেন, আকাশের দেবদেবী আমার আরাধ্য নয়—মাটীর জগতের ক্লিষ্ট নরনারীই আমার আরাধ্য। আবার বলতে শুনেছি "তবে এ তৃষির মরু 'পড়িয়া' তুলিব তোমারই রসাল নন্দনে"—ছাড়িয়া যাইব নয়। তিনি এ জগৎটাকে গড়তেই চেয়েছিলেন। এ জগৎকে গড়তে চাওয়ার পথে যে ত্যাগ, তিতিক্ষা তাঁর জীবনে ছিল তা বিশেষ লক্ষণীয়। জগতের মানুষের মঙ্গল চিন্তা, মঙ্গল কর্ম ছাড়া পারলৌকিক কর্ম্মের আচরণ বা কারণ পুরুষোত্তমানন্দে কোন দিন দেখিনি। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমায় লিখেছেন, "আবার বলি শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই ভারতের জীবন। শ্রীকৃষ্ণই ভারতের রাষ্ট্র-পতি, ধর্ম্মপতি; তাঁহার দর্শন ও জীবনের ছাঁচেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বিশ্ব-ভারত, উজ্জ্বল ভারত"। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ একজন বাস্তববাদী হয়েও এত যে তাঁর গভীর কৃষ্ণ বিশ্বাস ইহা কি একেবারেই ভাবোন্মাদনা, ধর্ম্মান্ধতা? ভারতীয় সত্যিকার ধর্ম্ম মানুষকে ক্লীব করে না, স্বার্থপর করে না—করে প্রেমময়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য্য যেন আমরা জীবনে উপলব্ধি করি এবং তাঁরই ছাঁচে নিজ জীবন ও বিশ্ব-জীবন গড়বার সংকল্প গ্রহণ করি। তাহলে ধর্ম্মের এক নূতন রূপ আমরা দেখতে পাব যার সাথে বাস্তব জীবনের কোন বিরোধ তো নেইই, বরং বাস্তব জীবনকে তা মহীয়ান করে তোলে। "বিশ্ব-ধর্ম্ম বিশ্ব-প্রেম বিশ্ব-মানবতা, কে শিখাল জগতেরে?—ভারতের গীতা॥"

দেহস্থ আত্মার দেহ ত্যাগ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন না। যেরূপ আমি এক গৃহ পরিত্যাগে অন্য গৃহে গমন করিলে আমি যাহা তাহাই থাকি, তদ্রূপ আত্মা এক দেহ ত্যাগে অপর দেহাবলম্বী হইলেও তিনি যাহা, তাহাই থাকেন।

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

প্রাণের কথা

॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

ঊনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে অধর্মের গ্লানি দূর করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপাল দেব। তাঁহারা পরস্পরের পরিপূরক রূপেই আসিয়াছিলেন ইহা ঠাকুরের শ্রীনিত্যগোপাল দেবের ত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যগোপাল দেবকে বলিয়াছেন, "তুই আসিয়াছিস্ মিও আসিয়াছি"। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পরম হা ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীনিত্যগোপাল ের মধ্যে বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবারেই রামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপাল দেবকে দেখিয়া পরম প্রীতি করিয়াছেন এবং নিজের হাতে খাওয়াইয়াছেন, ার আসিবার জন্য বারবার বলিয়াছেন। সাধন র দুই জনেই উচ্চস্তরে ছিলেন। পরস্পরের প্রেমের ারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নলিখিত উক্তিতে, "নিত্যগোপালের মহাভাব হয়, তাহাতে তার কোমরের কাপড় খসে তোদের ছটাক নটাক কি একটু হয়েছে আর তোরা টো হয়ে নাচ সুরু করেছিস্। পর পালারা কাপড় । তিনি শ্রীনিত্যগোপাল দেব সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন, কে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই "।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি কবিরত্নের অধ্যাত্মবাদ এবং াদের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত করিয়াছিল। দুই মহান দিকপাল আসিয়াছিলেন পরস্পরের পরি- । গ্রহণ করিয়া যুগধর্ম প্রচার করিতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছেন সর্ব্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথমমন্ত্র এবং জীব া দীক্ষা। তিনি সমন্বয় আদর্শের প্রথম পর্য্যায় দিয়া ছেন আর শ্রীনিত্যগোপাল দেব দিয়াছেন সমন্বয়ের পরবর্ত্তী পর্য্যায়। কিন্তু এই দুই মহান যুগাবতারের তিরোভাবের পর তাঁহাদের পরবর্ত্তীরেরা এই ধর্ম-জগতের ভাবধারায় মিলিত না হইয়া স্বতন্ত্র ভাবেই চলিতেছে। এই দুই ধর্মাদর্শের সমন্বয় হইলেই বিশ্বের মঙ্গল সাধন হইত।

শ্রীনিত্যগোপাল দেব পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয় বিধান করিয়া দিয়াছেন তাঁহার প্রাণ-দর্শনে। এই প্রাণ-দর্শনের সূত্র রূপে রাখিয়া গিয়াছেন পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয়। পরস্পর বিরুদ্ধের পারস্পরিক শোষণের চাপ মুক্ত করিয়া পরস্পরকে কেবল করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে পোষণ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া গলিয়া গিয়া দ্বিত্ব হইয়া এক হইবার মহান মন্ত্রই এই সমন্বয়। এখানে সকল মিলনই অদ্বৈতের। কোন অভিসন্ধি বা কৌশল লইয়া অপরকে দিয়া নিজের কার্য্য সিদ্ধির অভিসন্ধি থাকিবে না। এই সমন্বয়ের মিলন-মকে কোন হাবড়া ভাব নাই। ইহা গীতার "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ"-এর শাস্ত্র। সম ও অনুপূর্বক সমগমন এবং অনুগমন করিয়া ই ধাতু সর্বত্র গতি সঞ্চার করিয়া সকল বিরুদ্ধের কঠোরতা গলাইয়া এক সমগ্ররূপে প্রতিষ্ঠার জন্যই এই সমন্বয় সূত্র। ইহা উত্তরপথপ্রধান ন্ধ সমাস। ইহা বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাস্তববাদ এবং অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়। এই মিলন ক স্থাপনে শ্রীনিত্যগোপাল দেব সূত্র দিলেন—"সমন্বয় —নিত্যানিত্য সমন্বয়। আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়"।

শ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'এই সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী

হ। বৈতাবৈত সমন্বয়ের জন্যই ইহার অবতারণা। ই সিদ্ধান্ত দর্শনে অনেক স্থলেই অদ্বৈত তত্ত্বের তিকূল বিচারসমূহ দূর হইবে। সে সকলের মূঢ় ৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন অন্য কিছু হে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা রিলে বৈতাবৈত সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। তিমতে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলিয়া সমন্বয় এবং অনন্যত্বকেও ব বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে বৈতত্বাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে র্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া অদ্বৈতবাদের উত্তরই ব বলিতে হয়'। ইহাতে শ্রীনিত্যগোপাল দেবের গভীর াপক সামগ্রিক চেতনাই উদ্ভাসিত হইয়াছে। এতদিনের নি এবং শাস্ত্র মনের স্তর হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। নের স্তরে পরস্পর বিরুদ্ধের যৌগপদ্য ধরা পড়ে না। ুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্"। যুগপৎ জ্ঞানের ৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ বা চিহ্ন। ব্রহ্মকে এতদিন গতের ওপারে রাখা হইয়াছিল। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ই মতবাদে এই জগৎ মিথ্যা, প্রকৃতি বিনাশশীল, ার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। প্রাকৃতিক মনবুদ্ধির পর চাপ দিয়াই মনস্তত্ত্বের অটিলতা কুটিলতাকে পরিহার রা হইয়াছে। ইহার পরিণতিতে মন একদেশদর্শী ইয়া সমগ্রতার সন্ধান দিতে পারে নাই। One sided ogmatism has the opposite dogmatism lent in itself—এই সত্য ধরা পড়ে নাই। মনের ারা নির্মধ্যম নীতির (Law of excluded iddle), Either or-এর ভাষা। এই ভাষায় কোন ছুরই সামগ্রিকতা ধরা পড়ে না। আমার মতবাদের পর অর্থ অপরের মতবাদ; তাহা না জানিলে সমগ্র তবাদ প্রতিষ্ঠা হইবে না। আজ সমগ্র বিশ্ব নিজের মগ্রতা হারাইয়া খুবুৎসুর মনোবৃত্তি লইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ। জ্ঞাবাদী সম্প্রদায়সমূহ বলিতেছেন "ন মদন্যৎ অস্তি"—ার কেহ নাই। এক মতবাদ অপর মতবাদকে নিঃশেষ) করিয়া যেন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন অন্যের নিঃশেষ নির্বাণ। এমন করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া পরস্পরের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা পুরুষোত্তম-বেদে নাই।

আজ সারা বিশ্বে প্রত্যেকেই চাহিতেছে পরস্পরকে দাবাইয়া রক্তারক্তির পথে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে। চোরের মত একে অপরকে শোষণ করিয়া নিজের ভোগ চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে। আদর্শ ও বাস্তব দুই পরস্পর বিরুদ্ধের প্রয়োজন জীবনে সমভাবে আছে, আদর্শ বাস্তব হইতে দূরে থাকিয়া বাস্তব ঘটনাবলীর কোন সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে না। পক্ষান্তরে বাস্তবকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। আদর্শ চাহিতেছে বাস্তবকে সংকুচিত করিতে অথবা নিরোধ করিতে। আজ পর্য্যন্ত বাস্তবকে ভিত্তি করিয়া কোন আদর্শ গড়িয়া ওঠে নাই। বাস্তব-ভিত্তিক আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিষ্ঠিত হইবে বাস্তব আদর্শ সমন্বয়। এই বাস্তব আদর্শের সংঘাতে আজ পাকিস্থান জাগিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পাক সামরিক সরকার চাহিতেছে ধর্ম্মের নামে, রাষ্ট্রীয় সংহতির নামে পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনগণকে ভেড়িতে কুটিয়া একটা পিণ্ডে পরিণত করিয়া যে সুযোগ সুবিধা তাহারা এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহা বায়েম করিতে এবং ক্ষমতা নিজের অধিকারে রাখিতে। রাষ্ট্রের একটা অংশকে পঙ্গু করিয়া শাসন এবং শোষণ পরিচালনা করিবার মত সুকৌশল অভিসন্ধি পাক সরকারের ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্র সংহতি রূপ উদ্দেশ্যের মধ্যে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব পাকিস্থানের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতেছে স্বাধিকার লাভের দাবী এবং পূর্ব্ব পাকিস্থানের গণ আন্দোলনের লক্ষ্য হইতেছে শোষক পাক সামরিক সরকারের শোষণ-মুক্ত হইয়া স্বাধীন শোষণরহিত সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা। পূর্ব্ববঙ্গের এই বাস্তব দাবী উপেক্ষা করিয়া পাক সামরিক সরকার নিরস্ত্র লোকদের উপর বিনা উত্তেজনায় কামান বন্দুক লইয়া ঝাপাইয়া পড়িয়া ১০ লক্ষ লোককে হত্যা, ৮০ লক্ষ লোককে বাস্তু ত্যাগ করিতে বাধ্য করা, লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ নারী ধর্ষণ প্রভৃতি পাশবিক ধ্বংস কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া এই গণ আন্দোলনকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে শুরু করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাংলা দেশের

মুক্তি সেনার কাছে আজ নাস্তানাবুদ হইতেছে।

এই পরিস্থিতিতে বাস্তব দাবী মানব অধিকার সংগ্রামের জন্য, এই গণআন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য এবং পাক সরকারকে এই পাশবিক হত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের শাস্তি প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে পাকিস্থানকে তাহার চোরের মত অভিসন্ধিমূলক শোষণ চালাইবার অভিসন্ধি বর্জন করিয়া বাস্তবের দাবী মানিয়া লইয়া পূর্ব্ববঙ্গকে স্বাধীনতা এবং স্বাধিকার প্রদানের গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বাংলাদেশকেও স্বাধীন এবং সংস্কারমুক্ত স্বাধীন জাতিরূপে শোষণবর্জিত সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

পাক সামরিক সরকার এই বাস্তবের দাবী না মানিয়া মনের স্তর হইতে স্থির করিল যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগে জনসাধারণকে ভীত এবং ত্রস্ত করিয়া সকল আন্দোলন ২২ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ করিবে এবং এইরূপ সমস্ত ঘোষণাও করিল। কিন্তু তাহাদের মনের স্তরের অভিসন্ধিমূলক এই সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। লক্ষ লোককে হত্যা করিয়া, ৮০ লক্ষ লোককে ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া, লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ, নারী-ধর্ষণ প্রভৃতি পৈশাচিক নির্যাতন চালাইয়া বাংলা দেশের জনসাধারণের আন্দোলনকে তাহারা বন্ধ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে নৈতিক বলে বলীয়ান নিরস্ত্র জনসাধারণ এক দুর্জয় স্বাধীনতা সৈনিকরূপে পাক সরকারের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রাণের স্তরে পাইয়া সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে উৎপীড়িত শোষিত লোকের হৃদয়কে জমাট করিয়া বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির সহিত তথা বিশ্বের সাথে যুক্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন, "আমার এই সংগ্রাম শুধু বিশ্বের শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম"। তিনি আরও ঘোষণা করিয়াছেন, "জেল জুলুম আমাকে দুর্বল করিতে পারে না। বাংলা দেশের লোকের ভালবাসাই আমার দুর্বলতা। আমি বাংলার রক্তের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে পারিব না"।

প্রধান মন্ত্রীত্বের প্রলোভন তাঁহাকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কি আদর্শ সুন্দর জাগ্রত এই জীবন। শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে। তিনি আজ জগৎ সভায় উন্নীত। আজ সারা বাংলা দেশ একসূত্রে বাঁধা প্রাণের স্তরে। তাহারা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার এবং সামাজিক অপরাপর কুসংস্কার। তাহারা আজ সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মানুষ। সেখানে আজ সকলে সমানে সমান। বড় সেখানে ছোটর তাবার কথা কয়, সকলে যে যার স্থানে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক। তাহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিয়াই মৃত্যুঞ্জয়ী, এখানে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর রূপ আজ অপরূপ ভাবে প্রকট। বদ্ধ জলাশয়ে পূতিগন্ধময় আবর্জনা জমিয়া ওঠে, কিন্তু প্রবহমান জলধারায় কোন জঞ্জাল দাঁড়াইতে পারে না। সংস্কারের পূতিগন্ধময় জঞ্জাল আজ প্রাণের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র এক-প্রাণতা। এমন সুন্দর বিশ্ব-প্রাণের জাগরণ আর কোথায় আছে? ধন্য বঙ্গবন্ধু মুজিবর, ধন্য সোনার বাংলা, ধন্য তোমার সোনার ছেলে মুজিবর, ধন্য তোমার সোনার মুক্তি সংগ্রামী সেনানীরা। তুমি আজ বিশ্বের পথপ্রদর্শক। শ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবন-স্বপ্ন আজ সার্থক রূপায়িত সোনার বাংলায়।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন, "আজ মনের ক্ষেত্র এবং মনের ভাষা বর্ত্তমান যুগের সমস্যা সমাধানে অচল হইয়া পড়িয়াছে, পচিয়া গিয়াছে। বীজ পচিলেই অঙ্কুর উদ্গম হয়; মনের ক্ষেত্র এবং মনের ভাষা আজ পচিয়া প্রাণের ক্ষেত্র এবং প্রাণের ভাষায় গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে"। আজ বাংলা দেশের ভাষা প্রাণের ভাষা এবং বাংলা দেশের ক্ষেত্র প্রাণের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া পুরুষোত্তম দর্শন সার্থক এবং বাস্তব হইয়াছে।

প্রাণ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়সহ মন কেমন করিয়া প্রাণকে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া প্রাণের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব যোগ্যতা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল এবং প্রাণ বনিয়া গিয়াছিল তাহার সন্তান উপনিষদ দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক

ইন্দ্রিয়ের এক একটী বিশেষ গুণ আছে। বাক্ বাগ্মিত্ব গুণসম্পন্ন হইয়া বসিষ্ঠ। চক্ষুর গুণ প্রতিষ্ঠা, ইনি ইহ লোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পৎ গুণে প্রসিদ্ধ। মন আয়তনের দ্যোতক। এতদা সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের ঝগড়া বাধিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিল। অবশেষে স্থির হইল, যে দেহ ত্যাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে এই দেহ অত্যন্ত পাপিষ্ঠের ন্যায় হইবে সেই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হইবে। অতঃপর প্রথমে বাক্য দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার অভাবে সমগ্র দেহের কিছুই হয় নাই বাক্যহীন হইয়া মানুষটা কিছু অসুবিধা ভোগ করিয়াছে মাত্র। অনুরূপভাবে চক্ষু শ্রবণেন্দ্রিয় এবং মন পরপর দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একইরূপ দেখিল। অতঃপর প্রাণ যখনই বহির্গত হইতে উদ্যত হইল তখন সকল ইন্দ্রিয় সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, কেননা প্রাণ বহির্গমনের সাথে সাথেই তো সকল ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের অবসান হইবে। তখন সকল ইন্দ্রিয় প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিল এবং প্রাণেই তাহাদের স্ব স্ব যোগ্যতা অর্পণ করিল। আবার এই প্রাণই দেহ যন্ত্রে মাতৃ জঠরে থাকাকালীন প্রথম আবির্ভূত হয়, তৎপরে অপরাপর ইন্দ্রিয় দেহ যন্ত্রে প্রকাশ পায়। অতএব প্রাণই জ্যেষ্ঠ। এই প্রাণকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলেই জীবন হয় সহজ।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন, "আধুনিক কালে ইহারই পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। বাক্‌সর্ব্বস্ব মানুষ মনে করে যে বাক্যধারাই, প্রোপাগাণ্ডাধারাই সে এই বিশ্ব জয় করিবে। প্রতি জাতি কথার মারপ্যাঁচে সত্য কথাকে গোপন করিয়া, পদস্খলিত করিয়া চলিয়াছে। এইভাবে বাক-ইন্দ্রিয় সমগ্রের সেবা না করিয়া সমগ্রকে বিকৃত করিতেছে। সর্ব্বোপরি আত্মিকার অন্তর্নিহিত সত্তা যদিও ব্যাকুল ভাবে সমগ্রকেই চায়, প্রাণের খোঁজে যদিও সে এদিকে ওদিকে ছুঁ দিয়া ফিরিতেছে, তথাপি তাহার বাহ্যিক কার্য্যকলাপ চলিতেছে মনের সাহায্যে। মন বলিতেছে আমিই শ্রেষ্ঠ। আমার কূটনীতিতে বিশ্বযন্ত্র ঘুরিতেছে। সমগ্র দৃষ্টিহীন মন জীবন-যন্ত্র পরিচালিত করিলে যাহা হইতে পারে আজও তাহাই হইতেছে। মন এক ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া অপর ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বিভেদের কাটনই বাড়াইয়া চলিয়াছে। আজিকার সংসার বিভেদের সংসার। মনের ব্যর্থতা তাই দিকে দিকে। মনের সামর্থ্য আর কতটুকু? সে তো আর জীবন হইতে বড় নয়? সমগ্র জীবনকে ধরিয়া রাখিবে সে কোন্ যোগ্যতায়? অথচ তাহারই প্রচেষ্টায় চলিতেছে, মন দিয়া সমগ্র জীবনকে রক্ষা করিবার, বশকে ধরিবার, বিশ্বসমস্যা সমাধান করিবার প্রচেষ্টা। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন তাহাদের নিজেদের ক্ষমতা নিজেরাই জানে না"।

প্রাণ এইভাবে বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় লইয়া সংসারী। কৌষীতকী উপনিষদ দেহ যন্ত্রের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়গণের সম এবং অনুগমন করিয়া সমন্বয় সাধনের একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

জীবের সমস্ত প্রাণ এক হইয়া বিশ্বের সকল বস্তুকে প্রকাশন করায়। যখন বাক্য কথা বলে তখন সকল প্রাণ সেই বাক্যের অনুগমন করে ও এক হইয়া কথা বলে। যখন চক্ষু দেখে তখন সকল প্রাণ চক্ষুর সাথে এক হইয়া দেখে। যখন কর্ণ শ্রবণ করে তখন সর্ব্ব ইন্দ্রিয় কর্ণের সহিত এক হইয়া শ্রবণ করে। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় এইভাবে সম এবং অনুগমন করিয়া দেহযন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতেছে। প্রাণ সকলের আশ্রয়। প্রাণের সকলই অন্ন। 'সর্ব্বরূপ সর্ব্বরস সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বশ্রদ্ধায় সর্ব্বমতবাদ সকলই প্রাণের অন্ন। সকল ইন্দ্রিয়ই পছন্দমত হয় এটা নয় ওটা বাছিয়া লয়। এই জন্যই ইহারা সংসারী এবং পাপবিদ্ধ প্রাণের কোন বাছাবাছি নাই বলিয়াই প্রাণ সকলই হজম করিতে পারে। প্রাণ কোন বিষয়ে আটকাইয়া যায় না বলিয়াই পুরুষোত্তম প্রাণস্বরূপ। আজ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়দ্বার পুরুষোত্তমকে ধরার উপায় শ্রীনিতাগোপাল দেব প্রতিষ্ঠিত প্রাণ-দর্শনে আমরা পাই। এতদিন ব্রহ্ম উপাসনার ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে। আজ ব্রহ্ম মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, চিত্ত, ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়া প্রকৃতি-নন্দনরূপে ধরার ধূলিতে জন্ম গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন।

গল্প শুধু নয়

।। শ্রীরুহিদাস সাহা ।।

সুপ্রিয়বাবু সেদিন এসেছিলেন। উঠে যেয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেছিলাম।

বসেছিলেন সুপ্রিয়বাবু।

এমনিভাবেই মাঝে মাঝে আসেন তিনি। প্রতিবারেই বসেন ঐ চেয়ারটিতে।

সবকিছুতেই গতানুগতিক ধারা।

কিন্তু নতুনত্ব ওর বক্তব্যে।

চেয়ারে বসেই বলেছিলেন—আজ একটি গল্প শোনাব আপনাকে।

গল্প! বিস্মিত হয়েছিলেন আমি। বলেছিলাম—গল্প তো আপনি বলেন না কোনদিন!

কিন্তু আজ বলব।

শুরু হয়েছিল তারপর।

নবীন নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁর গল্পের আরম্ভ। সুশান্ত নামে এক বন্ধু ছিল নবীনের। একদিন সুশান্ত গিয়েছিল তার বাড়ী। বহুদিন পরে দেখা, তাই আলোচনা হয়েছিল অনেক। প্রসঙ্গও নানাবিধ। প্রথমে পৃথিবীর রাজনীতি, তারপর ভারতের, সর্বশেষ প্রসঙ্গ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে।

প্রবীণের পর্যায়ে না পৌঁছলেও নবীনের নবীনত্ব কটেছে অনেক দিন আগেই। সংসারে নবীন আর ওর মা ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। মায়ের বয়স হয়েছে তবুও সংসারের কাজকর্ম তাঁকেই করতে হয়। ছেলের দেখাশুনার ভার মায়ের উপর। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তিগত আলোচনায় প্রথমেই স্থান পায় বিয়ে প্রসঙ্গ।

সুশান্ত প্রশ্ন করে—বিয়ের কি হল রে?

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে আবার বলে উঠে—আর দেরী করবি কত! এবার একটি দেখে নে!

তেমন মেয়ে পাচ্ছি কোথায়—নবীনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে উঠে।

তেমন বলতে কি বলতে চাস—শুধায় সুশান্ত।

উত্তর আসে—এই ধর দেখতে শুনতে মোটামুটি, গায়ের রং ফর্সা না হলেও চলবে। তবে বি. এ. পাশ হওয়া চাই।

কেন বি. পাশ চায় তারও ব্যাখ্যা করে নবীন। বলে—দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যা তাতে স্ত্রীর রোজগারেরও প্রয়োজন হতে পারে। কখন কোন্ অবস্থায় মানুষ পড়বে তা তো আগেই বলা সম্ভব নয়। তাই পূর্বেই চিন্তা করা দরকার।

খেমেছিল নবীন।

খেমে ছিলেন সুপ্রিয়বাবুও।

আমি বলেছিলাম—তারপর?

তারপর?

শুরু হয়েছিল আবার।

একটু ভেবে সুশান্ত বলে উঠে – আমার পরিচিত একটী মেয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বিবরণও দিতে শুরু করে—গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা, সুন্দরীও বলা যায়। বি. এ. পাশ, শিক্ষকতা করছে।

ঔৎসুক্য নিয়ে কাছে এগিয়ে আসে নবীন। আগ্রহাতিশয্যে অনুরোধ জানায়, দে না ভাই কাজটি করে।

সুশান্তও তেমনি আগ্রহ দেখায়, বলে—তুই সম্মতি দিলে কাল-পরশু দেখাশুনা করে এমাসেও বিয়ে হতে পারে।

এতটা নিশ্চয়তার কারণও জানায় সুশান্ত, বলে—আমার হাতেই সব ভার, আমার কথাতেই সব হবে।

নবীনের মুখখানা আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠে।

তবে—এতদিন পরে ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবারে।

আনন্দ মধুর নিস্তব্ধতা।

নবীনের কণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। শুধায়—মেয়ের

গোল্ড কি বলতে পারিস ?

সুপ্রান্ত উত্তর দেয়—তা বলতে পারবো না, তবে ব্রাহ্মণ যে নয় তা ভালভাবেই জানি।

ব্রাহ্মণ নয়!—একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। এতটা আশার আলোতে অন্ধকার নেমে আসে। সে অন্ধকার নবীনের মুখখানাকে প্রবীণ করে তোলে।

কণ্ঠস্বরও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বলে—তা হলে যে সম্ভব হবে না, সুপ্রান্ত !

সুপ্রান্ত বুঝাবার চেষ্টা করে বলে—ব্রাহ্মণ না হলেও মেয়েটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। ওদের বংশের যথেষ্ট নাম যশ রয়েছে।

নবীন সব শোনে—কিন্তু খুশী হয় না কিছুতে।

বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়বাবু।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম—তারপর ?

উত্তর এসেছিল—এখানেই শেষ।

বিস্মিত হয়েছিলাম আমি, বলেছিলাম—এই আপনার গল্প ! চমৎকার গল্প জানেন তো আপনি !

গল্পটা পছন্দ হলো না বুঝি ? তবে আর একটা বলি—বলেই গল্প শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সুপ্রিয়বাবু।

আমি থামাবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম—থাকুন আপনার গল্প। আপনার গল্প শোনার মন নেই—আমায় নেমে হতে হবে এখনই।

শোনেননি সুপ্রিয়বাবু। গল্প আমাকে শুনাবেনই তিনি। শুনিয়েও ছিলেন, আর আমিও শুনেছিলাম।

প্রতিদিনের মত সেদিনও ট্রেনে যাচ্ছিল প্রশান্ত। সঙ্গে প্রতিদিনের সহযাত্রী বন্ধু নরেশ।

ট্রেন চলতে চলতে অনেক গল্প হয়, বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনা হয়। স্থান ভেদে বিভিন্ন সুর—কোথাও উগ্র কোথাও নরম। কোথাও হয় ব্যক্তিগত আলোচনা, আবার কোথাও রাষ্ট্রকে নিয়ে।

এমনটি প্রতিদিনই হয়, সেদিনও হয়েছিল।

বলে চলেছিলেন সুপ্রিয়বাবু।

রাজ্যপাল ধর্মবীর কেমন করে যে-আইনী ভাবে ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে ছিলেন সে সম্পর্কে কত কথা।

কারও কণ্ঠে—যাই বলুন না মশাই, একথা স্বীকার করতেই হবে ধর্মবীর জিনিষ পত্রের দাম খানিকটা কমিয়ে আনতে পেরেছেন।

কেউ বলেছিল—কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট দুই-ই সমান।

অপর জনের কণ্ঠে—যুক্তফ্রন্টের বড় বড় বুলি যে ভাওতা একথা বুঝে নিয়েছে দেশবাসী।

একজন বলে উঠেছিল—বিশ বছরের কংগ্রেসী পাপ কি এত সহজেই যায় !

আমি বললাম—এসব কথা তো আমিও অনেক শুনেছি। এসব রেখে এখন আসল গল্প বলুন। আপনার গল্প সংক্ষেপে বলুন !

সংক্ষেপেই রেখেছিলেন সুপ্রিয়বাবু।

বলেছিলেন—ট্রেনের কামরার এক কোণে আলোচনা চলছিল আয়েষা সুলতানাকে নিয়ে।

একজন বলে উঠেছিল—ঠাকুর বংশের মেয়ে গেল কি না নবাবের কাছে। তাও আবার ধর্মান্তরিত হয়ে !

অপরের কণ্ঠে—এঁদের কাছে ধর্মের যেন কোন মূল্যই নেই !

কয়েকজন বলে উঠেছিল—এদের বিষয়ে আর বলবেন না ! একেবারে বিশ্রী জিনিষ।

তারপরই প্রশান্ত শুনতে পেল নরেশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। এক নাগাড়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে সে—

কি অন্যায় করেছেন শমিলা ? ধর্মান্তরিত হয়েছেন ? কি হয়েছে তাতে ? ধর্ম আবার কি ? ওটা মনের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। নবাবকে বিয়ে করেই বা তিনি কি অন্যায় করেছেন ? নবাবকে তাঁর ভাল লেগেছে, তাই বিয়ে করেছেন। ধর্মের প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

সর্বত্র নিস্তব্ধতা। সকলের দৃষ্টিই নরেশের দিকে। সকলের কানই নরেশের বাক-চাতুর্যে আকৃষ্ট।

উত্তেজিত না হতে প্রশান্ত অনুরোধ করেছিল, নরেশকে থামাতে সে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু থামেনি নরেশ। বলেছিল—আজকের দিনে চাই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্ত রকম কুসংস্কারকে আজ

ছুঁড়ে ফেলা দরকার। জগৎটাকে বদলা প্রয়োজন গতিশীল।

গতি থেমে গিয়েছিল ট্রেনের, ট্রেনখানি পৌঁছেছিল শিয়ালদহের পাঁচনম্বর প্ল্যাটফর্মে।

আমি বললাম—এত আপনার চমৎকার গল্প। আরও চমৎকার এই জন্যে যে, ট্রেনের গতি থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও শেষ!

সুপ্রিয়বাবু বললেন—আপনার ধারণা ভুল, গল্প শেষ হয়নি এখনও।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—সে কি?

সুপ্রিয়বাবু বললেন—হ্যাঁ, তাই। বললেন—নবীন আর নরেশ যদি এক ব্যক্তি হয় তবে কেমন হয় বলুন তো!

আমি আরও বিস্মিত হলাম। বললাম—তা কি করে হয়!

তাই হয়েছে এখানে—বললেন সুপ্রিয়বাবু। থামলেন না, বলে চললেন—নবীন আর নরেশ একই ব্যক্তি। ব্যবধান শুধু স্থান আর কালের। স্থানের ব্যবধান অনেকটা, কিন্তু কালের ব্যবধান দিন পনেরোর।

আরও বসে চললেন সুপ্রিয়বাবু—সুপান্থ আর প্রশান্তও আলাদা ব্যক্তি নয়। উভয়েই এক। তা আবার আপনার সম্মুখের লোকটি, অর্থাৎ গল্প বয়ে যে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

বাংলা সাহিত্যের নব দিগন্তে প্রথম সূর্যের ভাস্বর প্রভায় বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। শুধু উপন্যাস সাহিত্যের স্রষ্টার ভূমিকাতে নয়, সাহিত্য-জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রতীপ্ত পদচারণ। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র এবং সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন যেমন অনন্য ছিলেন, আজও তাই। তাঁর সাহিত্য-চিন্তায় ইউরোপীয় ভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনে তিনি সার্থক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

তবু—হয়ত সকল চলিষ্ণুতার শিল্পীর মতই—বঙ্কিমের মধ্যেও কিছু স্ববিরোধী ধারা ছিল। তাঁর মধ্যে একদিকে যুক্তিবাদী আধুনিক মনের প্রকাশ, অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের ধারক এক লেখার হৃদয়াবেগ। তাই অধিকাংশ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা যখন দেখি 'বিধবা বিবাহে'র উদ্যোক্তা ও সাগর বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরাগ তখন আমরা বিস্মিত হই সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার হানি ঘটে না।

'সমকালীন' প্রবন্ধ পত্রিকার ফাল্গুন (১৩৭৭) সংখ্যায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'বিদ্যাসাগর' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল ছিলেন বলে পরিচিত কিন্তু এ'মত প্রচলিত থাকার কারণ সেকালে পত্রীক্ষিত হ'য়েছে বলে মনে হয় না"।

ভবতোষবাবু নিজে যুক্তিবাদী বলেই এ'প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-মন-হিতবাদ বা utilitarianism-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোকে তিনি মনন শক্তিকে পরিশুদ্ধ করে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসেও ইউরোপীয় ধারা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে এক সময়ে তিনি এর জন্যে নিন্দিতও হয়েছিলেন। "He was put down as a denationalised writer, an imitator of European model." [R. C. Dutta. The heritage of Bengal]

কিন্তু এ' সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাঁর সমাজমন জেগে উঠেছিল। ইয়ংবেঙ্গলের ধ্বংসনীতি ও অন্ধভাবে খ্রীষ্টধর্মের যে হিন্দু জাতীয়তা ও ঐতিহ্যকে সগর্বে তিনিই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। শেষ জীবনের চিন্তাধারায় হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি বিশেষ-ভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন। অত্যন্ত সচেতন মন ছিল বলেই বঙ্কিমের চিন্তাধারায় স্ববিরোধী ভাবের ক্ষণগুলি স্পষ্ট হ'য়ে জেগে উঠেছে। "বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মধ্যে বিরোধ একটা লেগেই ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কার, ইংরেজীয়ানা ও স্বদেশীয়ানার অনুকূল-প্রতিকূল সংঘাতনা। একদিকে যুক্তিমার্গ, অন্যদিকে আবেগধর্মী শিল্পীর সংস্কার। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে মত পোষণে, বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিতে.....বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের পরিচয় দিয়েছেন।" —অলোক রায়—বন্ধুকার বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী সমাজমন।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন, একথা সত্য। কারণ তখনকার সমাজে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পুরোপুরি উপেক্ষিত হ'য়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যা' চেয়েছিলেন, তা হ'চ্ছে সমাজের ভীত কাঠামোর মধ্যেই নারীর আপেক্ষিক স্বীকৃতি। তিনি যে নারী-প্রগতি ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, তা তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। 'বিবিধ প্রবন্ধে' 'প্রাচীনা ও নবীনা' নিবন্ধে তিনি লিখলেন—"আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা নূতন পদ্ধতি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন"। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সমাজ-সংস্কারক বলতে বিদ্যাসাগরকেই লক্ষ্য করেছেন। তখন শিক্ষার প্রসারে, বাল্যবিবাহ নিবারণে, বিধবা বিবাহের চলনে এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করণে বিদ্যাসাগর মশাই একাই সহস্রভুজ হ'য়ে কাজ করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তবু মনে মনে শ্রদ্ধার ঈর্ষাও পোষণ করছেন। 'সীতার বনবাসে'র জনপ্রিয়তায় তিনি অসহিষ্ণু হ'য়ে বইটিকে 'কান্নার ফোয়ারা' বলে অভিহিত করেছেন। নারী-শিক্ষা ও নারীর অধিকার রক্ষার জন্যে বিদ্যাসাগর যেভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা' সহানুভূতির চোখে দেখতে পারেন নি। তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—"দিনকতক খুব পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবা বিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁড়ী রামী মাগীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল"।

বিধবা বিবাহের প্রচলন—বলাবাহুল্য সে যুগে পাঁচ বছর বয়সের বালিকাকেও বৈধব্য পালন করতে হ'ত—বঙ্কিম যে দৃষ্টিতে দেখেন নি তার উদাহরণ অজস্র। কিন্তু হিন্দু সমাজে নারী নির্যাতনের এবং বালবিধবার নির্মম যন্ত্রণাভোগের বিরুদ্ধে কোথাও তিনি কিছু বলেছেন কি? ভূতোবাবু বলেছেন—"বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে নায়িকার পরিণতি দেখিয়ে এ মত প্রতিষ্ঠিত করা হয়ত ভিন্ন সে বিষয়ে নিঃসংশয় হ'তে পারি না"।

সত্যি কথা। তবে দেখা যায় মাত্র এই দুটি উপন্যাসেই তিনি বিধবা বিবাহের ও বিধবা নারীর প্রেমের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং দুটিতেই অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়ে সে মিলনের চরম পরিণতি রোধ করেছেন। কুন্দ বা মোহিনীর মানবিক চেতনার ধারাকে তিনি স্তব্ধ হতে দেননি। তুলনায় বলা যায় শরৎচন্দ্রের 'অভয়া' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিনোদিনী'কে। পরবর্তী দুজনই অন্ততঃ দুরন্তের দিক থেকে নির্বীর্য হ'তে চান নি।

তারপরে 'বিষবৃক্ষে'র বিধবা বিবাহের পরিবেশকে বঙ্কিম আগে থেকেই সৃষ্টি করে চলেছেন। সমস্ত কাহিনীটি প্রথম থেকেই সুপরিকল্পিত। তাই তারাচরণের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যখন বললেন—"সমাজে তারাচরণ বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন—যে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!" তখন 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সূর্য্যমুখীর মুখে শুনতে পাই—"আর একটা হাসির কথা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের পুঁথি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মূর্খ মনে করতেন না। কিন্তু সূর্যমুখীর মুখের মন্তব্যকে নিছক কৌতুক বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কেন না উপন্যাসের প্রতিপাদ্যও ত' তাই।

এবার 'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে আসি। ভবতোষবাবু বলছেন —"১৮৮০ খৃষ্টাব্দেও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন।"। সত্যিকথা, সম্পাদক হিসেবে নাম পাওয়া যায় জীবচন্দ্রের। কিন্তু ১২৮৪ সালে বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবনের প্রকৃতিগত স্বরূপ বঙ্কিম বললেন—"বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না;....."। বস্তুতঃ কোন কারণে তিনি সম্পাদক হিসাবে আর নাম রাখতে চাননি। কিন্তু ১২৮০ সালেও তাঁর বিভিন্ন রচনা বঙ্গদর্শনে ছাপা হচ্ছে। কিছু উদাহরণ: যেমন "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত"। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি বরাবরই অস্বাক্ষরিত। ১২৮০ সালের জুন সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) "দ্বিতীয়বার বিবাহ" শীর্ষক যে অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটি ছাপা হয়, তার ভাষা যুক্তি ও চিন্তাধারার প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রেরই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। এই প্রবন্ধে বিধবা-বিবাহের তীব্র বিরোধিতা করে বলা হয়—"অনেকে বলেন বহুবিধবাগণ চিরদুঃখিনী। তাহাদের কোন কার্য্যেই সুখ নাই, কোন প্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্বদাই দুঃখিত। তাহাদিগকে কিরূপ এইরূপ করে রাখা অতিনৃশংসের কার্য্য। যাহার সুখ নাই যায়া নাই, যে স্নেহ মমতা কাহাকে বলে জানে না, পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদের দুঃখ যে সহ্য এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয়। অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের হিতবাদ দর্শনের চিন্তা শেষ পংক্তির মধ্যে পরিস্ফুট।

ওই প্রবন্ধেই বলা হ'য়েছে—..."যদি পাঁচজন বিধবার দুঃখমোচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, তবে বিধবা-বিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চতুরতা।".....

পুরো প্রবন্ধটিতেই এইভাবে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হ'য়েছে। লেখক ম্যালথাসের পপুলেশন থিওরির অবতারণা করেছেন এবং বলেছেন—"যদি আমরা সমাজ-সংস্কারচ্ছলে বিধবাবিবাহ দিয়া লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ করিয়া দিই তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ বৎসরান্তর না হইয়া মাসে মাসে হইবে"।

যদি ধরা যায় প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, তাহ'লে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় তাঁর নিজস্ব মতবাদের পরিচয় পাওয়ার দাবি পাঠকের নিশ্চয়ই ছিল। বিশেষতঃ যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, নীতিনিয়ন্তা এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোন প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেননি এবং কোন কথা বলেন নি।

ভবতোষ বাবুর আর একটি যুক্তি: "রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সামাজিক উপন্যাসে অসবর্ণ বিধবাবিবাহ ঘটিয়েছেন। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন"।

রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ছিলেন এ'কথা যেমন সত্য, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বে ও মহত্বে তিনি অভিভূত ছিলেন, এ'কথাও তেমনি সত্য। রমেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে নানাভাবে ঋণী। এই প্রসঙ্গে আমি রমেশচন্দ্রের উক্তিই উদ্ধৃত করছি—

"It was often my privilege to accompany Vidyasagar in his early morning walks, and sometimes I saw him in his house and was permitted to inspect the splendid collection of books.....when in 1886 I commenced my Bengali translation of Rigveda hymns,—amidst a perfect storm

of opposition from a section of my orthodox countrymen—the generous hearted Vidyasagar gave me his support and help." [Introduction to Iswar ch. Vidyasagar by Subal Ch. Mitra.]

সবশেষে, বঙ্কিমচন্দ্রের উদার দৃষ্টি ও বহৎ চেতনাকে সীমিত করার কোন উদ্দেশ্য আমার নেই, আমি শুধু বলতে চেয়েছি, বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারমুক্ত আধুনিক মন সে যুগে কারও ছিল না, এ যুগেও আছে কিনা সন্দেহ।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮৮)

নিজের কর্ম কর—আর এক হও—এই পথ।···There is one man whose name is All men, there is one woman whose name is All women···All women হল কালী, দুর্গা।...নদী যদি সাগর হয়ে না যায়, নদীতে পচন আসবে···,···সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না।—এই সমগ্রত্বকে মনে রাখাই বৈরাগ্য···। বিশ্ব-সত্তাকে কোথাও আটকে ফেলো না, আটকে রাখলেই মৃত্যু··। অহংকারের বাঁধ ভাঙলে তাপ কাটবে··। ভাগবত ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্র দিয়ে ভগবান তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন না—কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি দ্বারা তৎক্ষণাৎ।···

ভাগবত যে কতকগুলি শব্দের উপর জোর দেয় তার মধ্যে 'সদ্য' একটা শব্দ···সদ্য পুণাপ্তি···এই ভাগবত ধর্ম যদি কেউ শোনে, ধ্যান করে, অনুমোদন করে···সদ্য পুণাপ্তি—সদ্য পবিত্র হয়। দ্বৈপায়নদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি বলছেন—ভগবৎপ্রসঙ্গ যে তার একই সময় ভক্তি, পরেশের অনুভব, অন্য বস্তুতে বিরক্তি হয়, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসে গ্রাসে যেমন তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুৎ অপায় হয়। আজ খাব, কাল তুষ্টি হবে তা যেমন হয় না—ভগবানে যে প্রপন্ন হয় সেও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়···। কালের ব্যবধান থাকলে হয় না···। প্রপন্ন হলে তবে পবিত্রতা আসে ...। সাগরের সঙ্গে নদীর বাঁধ কেটে দিলে সাগরের জল তরতর করে এসে ঢোকে।···কাড়াকাড়ি করলে অন্ন বেশী আসে না। অহংকারীর কাছে নয়, শিবের কাছেই ভূতের ভিখারী।... পরিচ্ছিন্নের সঙ্গে সঙ্গে অপরিচ্ছিন্ন যেখানে—সেই অপরিচ্ছিন্নতাই অনির্বচনীয়...। তোমার স্ত্রীকে কেবল তোমারই স্ত্রী হিসাবে দেখিও না। তাহাকে রাধাভাবে কিংবা দুর্গাভাবে দেখ···তাহার ভিতরের অনন্তত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য কর।···সদ্য সদ্য তখন তখন—না পেলে ভাগবত হয় না।···ভগবানের কৃপা স্মরণ করলেই বুকটা তখন তখন জুড়িয়ে যায়।···এ যদি আমি জানি যে আমাকে আসবার জন্য He will knock, তাহলে মানুষ কত বড় নিশ্চিন্ত হয়ে গেল···। আমি সাত সমুদ্র পেরিয়ে যাব তাঁর কাছে কোথায় কোন্ দেশে···দুয়ার তিনি খুলবেন কিনা—এ সব ভাবনায় আমি কত অসহায়। ...আর আমার মত ছোট মানুষকে নিয়েও তাঁর কত প্রয়োজন···ভগবান আমায় সত্যি করে চান—একথা জানলে বুকটা জুড়িয়ে যায়···কোথায় তার বাড়ী কেউ জানে না, কোন্ পথে যেতে হবে তারও ঠিক নেই—কেউ বলে জ্ঞানে তাঁকে পাওয়া যায়, কেউ বলে কর্মে···। ভাগবত বলল কোথাও যেতে হবে না—এইখানে তাঁর প্রপন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে

কে—তিনিই আসনে তোমার কাছে।...পতি হওয়ার প্রয়োজনেই তিনি জগৎকে চান ...জগন্নাথ তিনি ...... নি এক, বহু হওয়ার জন্য আমাকে (প্রকৃতিকে) নিলেন ...জীবের প্রয়োজন এইখানে ....শুধু হও ...। আমার নি থাকছেন ..তার রাধে মানে তার বিজন, তার বিষ্ণু, তার ণা....। বাঁশী ডেকে ডেকে যাচ্ছে—তুমি অন্য কাজে ত থাক তাই শুনতে পাও না...। বিশ্বে ঘরে না নিলে বিশ্বনাথকে পাবে কি করে?...কান পেতে তাঁর ক শোন..... ...

১৩, ৪, ৫৭। বর্ষশেষ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ...অহং ইদং একাংশেন স্থিতো জগৎ—আমি আমার । অংশদ্বারা এই জগৎ আবৃত করে আছি—আমার কটা জগতের ওপারে।...পুরুষসূক্তেও আছে এ বিশ্ব পুরুষের এক পোয়া তিন পোয়া অমৃত তার বাইরে। ... বেদেও তাই ...চারভাগের এক ভাগ শক্তিতেই এই ার চালানো যাচ্ছে—বাকি তিনপোয়া দিয়েই এই ারের বাইরে তাঁর কাজ করা যায়।...কাদের হিসাবেও ান এক পোয়া—বাকি তিন পোয়া অতীত ভবিষ্যতে ত—সাধারণতঃ অতীত বর্তমানে মিল থাকে না ....। ী বৎসর চলে যাচ্ছে...পতিয়ান নিয়ে দেখ...গত য় জীবন নিয়ে আগামী বছরে যাবে কি করে? ানের কাছে পুরণো হয়ে যায় বিশ্ব...কিন্তু বালকের ে পুরণো হয় না... সংসারের মধ্যে একটা র্চনীয়তা আছে...রসের দৃষ্টিকোণে বস্তু কখনও পুরণো া—রসে নিত্য নূতন রূপে দেখা দেয়...তাই পুরণো া...মূলো প্রতি বছরই নিত্য নূতন স্বাদে আসে... াসা পুরণো হয় না...আস্বাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ব নূতন ই যায়... বুদ্ধি পুরণো হয়ে যায়...প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে রোজ সূর্য ওঠে।...আমার জীবনে যে যত তাক করুক, আমি র নূতন করে আরম্ভ করতে পারি....ঐ একাংশের দৃষ্টি অবাধ হয়ে গেলেই সব কিছু পুরণো হয়ে যায়। তিনপোয়াকে যদি সঙ্গে রাখতে পারি তবে পুরণো া...। আমি আমাকেই ষোল আনা করি বলে পুরণো । কিন্তু মনে রাখতেই যে এক পোয়া এখানে, বাকি তিন পোয়া ওখানে। পরমাগতি সাধনার এই চার পোয়ার কথা মনে রেখে চলা সত্য ...রবীন্দ্রনাথের ঐকি কবিতার ত ছোট জানিয়ও তোমে ভাল লাগে—সব কিছুই ভাল লাগে...। নিত্য নূতন দেখার স্বভাব ব্রহ্ম স্বভাব স্মৃতির দোষগুলি আমরা জ্ঞানযজ্ঞে ঠিক সেই রকম ভাবে produce করতে চাওয়া...। ইংরেজ আমলের গোলামী বুদ্ধির ন্যই আজও আমরা বেশন দেও দেও—সরকারের কাছ থেকে কেবল দেও দেও। অতীতের স্মৃতির চাপে আমরা মুহ্যমান...। কিন্তু আজ যে নূতন যুগ এসে পড়ল...। নিতাগোপাল নূতন যুগের কথা নিয়ে এসেছেন,...সেই নূতন যুগে সমস্ত বিধি নিষেধ তাঁর কিঙ্কর স্বরূপ...। ইংরেজ আমলের বিধি নিষেধ এখন নেই—থাকা উচিত নয়...বর্ণাশ্রমীর বিধি নিষেধ এখন চলে না—চলা উচিত নয়। অতীত যুগের যে বিধি ছিল তা আজকের যুগের দিকে চেয়ে বদলাতে হবে—এটা বর্তমান ভজন...। আমরা অতীত বর্তমানের ঝগড়ার মধ্যে পড়ে আছি।... নূতন বছরে আমরা নূতন করে জীবন চালাব...। নূতন যুগের দেবতা শ্রীনিতাগোপাল ধরার ধূলিকে ব্রহ্ম-ধূলি করতে এসেছেন...'

১৬. ৪. ৫৭ শ্রীনিতাগোপাল এই সংসার থেকে চলে যাওয়ার আগে বলেছিলেন, জানো জানো, এ সংসার অতি ভীষণ স্থান...এখানে স্ত্রীতে সুখ নেই, পুত্রে সুখ নেই...। স্ত্রী পুত্রে সুখ আনা যে যায় সেই কথাটা তিনি পরে বলেছেন—কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যায় স্ত্রীপুত্রে সুখ আনবার সাধনা আমরা আজও জানি না—সেইটাই আজকের দিনের সাধনা—শিখতে হবে নিতাগোপালের কাছে।...যারা এ সাধনা না শিখে সংসারকে অতি সহজ মনে করে স্ত্রীপুত্রধন নিয়ে চলতে চায়—তাদের প্রতি এ সাবধান-বাণী ....। মোটামুটি ভাবে বলা যায় আগের যুগে সংসার এত ভীষণ স্থান ছিল না, এত জটিলতা, এত উপদ্রব ছিল না। বর্তমানে অন্নবস্ত্র-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সব কিছুই অসম্ভব জটিল হয়ে উঠেছে...। এর মধ্যে পথ চলতে সাধনা দ্বিমুখী হওয়া দরকার—এক মুখ ভগবানের দিকে, আর এক মুখ সংসারের দিকে...' ছ'

রকমের জীবন—শরণাগতির জীবন, সখ্যগত জীবন ... ভগবানকে ষোল আনা আমি দিতে গেলে বিশ্বের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হবে—বিশ্ব বাদ দিয়ে যে ভগবান—সে ভগবান অসম্ভব।...গুরুকে পেতে গেলে সখ্যকে আপন করতে হবে...। যদি কেউ মনে করে থাকে সখ্য নিয়ে থাকবার কি, আমার আমি গুরুকেই দেব...না, তা হবে না—ভগবানের মাঝে বিশ্বের মাঝে, গুরুর মাঝে সখ্যের মাঝে আমি.... এটা মনোযোগ আশ্রম—মন ও মনোযুক্ত দুইই একসঙ্গে...নিত্যগোপালকে ভালবাসা, নিত্যগোপালাশ্রিত তাঁর বিশ্বকে ভালবাসা—মনের মানুষ ছাড়িয়ে যাবেই, একদেশদর্শী হয়ে পড়বে...বাস্তব বস্তুকে পাওয়া যাবে না...। তাই দ্বিমুখী সাধনা।...বাবা বলছেন, আমার প্রাণভরিকে যে ভালবাসে তার মত আর বান্ধব কই?...গুরুকে ভালবাসা অর্থ যখন গুরুভাই-ভগ্নীকেও ভালবাসা—তখনই গুরুকে ভালবাসা সত্য ও কল্যাণকারী। ভগবান একা সত্য নয়... তাই নিয়ম আছে নিত্যগোপালের মন্ত্রও দেয়, নিত্যভক্তেরও মন্ত্র দেয়। কৃষ্ণকে বিশ্বাস করা অর্থ যখন বিশ্বকেও বিশ্বাস করা, তখনই কৃষ্ণে বিশ্বাস সার্থক।...নারায়ণের কাছে ফাঁকি দেওয়া সহজ—নরকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়...। বেশে দেখো—ভগবানের কাছে ক্ষমা চাওয়া সহজ—কিন্তু যীশু মানুষের কাছে দোষ করলে ক্ষমা চাওয়া অনেক অনেক কঠিন।...গোবিন্দায় নমঃ বলে টাকা গোবিন্দকে দেওয়া সহজ, কিন্তু দেহধারী একজনে টাকা দেওয়া কঠিন।... শুধু নারায়ণেও ফাঁকি থাকে, শুধু নরেও ফাঁকি থাকে—তাই নরনারায়ণ।...সকলের সঙ্গে যেতে হবে, এমন জামাকাপড় পড়তে হবে যা আর একজনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হতে পারে না।...সংযমের পরীক্ষা, অহংকারের বিলুপ্তির পরীক্ষা দুই জায়গায়—গুরু আর সঙ্ঘ।...হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতেই হবে।...গোপীসঙ্ঘ রচনা না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণকে ধরা যাবে না।...সেইজন্য নিত্যগোপাল তাঁর শেষবাণীতে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে ভালবাসতে বলেছেন—আমায় ভালবেসো বলেন নি। জানেন ওটা তো জানা কথা—যুগ যুগ ধরে মানুষ মুখস্থ করেছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে জানা কথাটা মানুষ ভুলেছে এবং ধার্মিক হতে ইচ্ছুক যারা তারা যে কথাটা কোনদিন শোনে নি সেটা হল—তোমরা সবাই ভাই ভাই মিলে মিশে থেকো। আমি চলে যাব পরে, আর আমার পাশের লোক কি করছে, তার খোঁজ করব না—তা চলবে না।...একদিন কথা হচ্ছিল ১০০টা আশ্রমের মধ্যে ৯৯টার মধ্যেই মামলা... এইজন্যই তো আশ্রম করতে চেয়েছিলাম না। বৃন্দাবনে থাকতে সুনয়নের মা কত বলেছিলেন।...কিন্তু নিত্যগোপাল জীবন তাঁদেরগুলিকে এক জায়গায় রেখে যেতে হবে তাই করতে হল—কিন্তু এখানেও কি মামলা হবে? ...আমারই প্রতীক জ্ঞানে পরস্পরকে ভালবেসো।.... আমারই প্রতীক বেণু প্রতিভা যীশু বিজন বিষ্ণু কাশী...। আমি চলে গেলে তোমাদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে এ আমি ভাবতেও পারি না...তার চেয়ে আগেই চলে যাও...সমস্ত মঠ মন্দিরে ঝগড়া লাগে কেন না সবলে চায় কর্তৃত্ব করতে—সেবা করতে চায় কয়জন?...সেবকে সেবকে ঝগড়া হয় না তেমন।...একজনের অনুগামী হয়ে চললে...তার ভুলে খুব আসে যায় না। যে আশ্রমের ভার সব দিচ্ছে তার কথা যেন চলতেই হবে...। মিলে-মিশে কি করে থাকা যায় সেইটে শিখতে হবে...। নিত্যগোপালের শেষ উপদেশ, আমার শতবার অনুরোধ—শতবার পায়ে ধরা—পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবে।...দুই ভাবে নিজেকে দেখবে—গুরুর প্রতি শরণাগতি আসল কিনা, সঙ্ঘের প্রতি শরণাগতি আসল কি না...। লক্ষ লোকের প্রয়োজন নাই, যে কয়জন আছ সংহত হও—আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হও, সচেতন হও—জীবনের আচরণে তাকে রূপ দেও।...গুরু ভাইবোনদের ভিতর যদি ভালবাসা না পৌঁছায় তবে ভগবান ভালবাসা, গুরুকে ভালবাসা কাজ ....

১৫, ৪, ৫৭। ঈশোপনিষৎ বললেন—হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতম্ মুখং...অপাবৃণু—হে পোষণ, তুমি সেই পাত্রটী সরিয়ে ফেল, আমি সত্যধর্মী—আমার দৃষ্টির জন্য তুমি আবরণ উন্মোচন কর...। একটী হিরন্ময় চকচকে পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা।...মানুষ এমনি করে নিজে

মনবুদ্ধিদ্বারা ভগবানকে ঢেকে ফেলে। একটা গল্প ঈশোপনিষদে দিয়েছি...অমলা সাধু প্রকৃতির...সে স্বামী-পাগলা...। ধ্যানের সঙ্গে বস্তু-তান্ত্রিকতা নেই—বুদ্ধুর যখন কল্পনের শুকনো হাড় চিবোয়, তখন নিজের দাঁতের রক্তকেই মনে করে হাড়ের রস...' ধ্যানের বিপদ এইখানে···তাতে বাস্তবের স্পর্শ থাকে না··· ধ্যানের ভাব বাস্তবের বস্তুর সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়।···সেইজন্য ভাগবত বলেছেন—হেয়ন্ বাস্তবংবস্তু...' পৃথকবুদ্ধি থাকলে ধ্যানে সেই পৃথকবুদ্ধি বেড়েই চলে।··· বিদ্যাগোপাল এইজন্য ভক্তিযোগ গ্রন্থে লিখেছেন, গোড়ায় তাত্ত্বিকবুদ্ধি না থাকলে কোন সাধনাদ্বারাই পরা গতি লাভ হয় না···। একাত্মবুদ্ধি থাকলে কর্মই ব্রহ্ম হয়, ভক্তিই ব্রহ্ম হয়।···যাঁর চরণ তলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে মন করে সব সাধনাকে আমাদিগকে নিতে হবে।··· গোড়ার প্রেমে যদি এক না হয়ে যেই—তাহলে সব সাধনাই ব্যর্থ···। প্রেম কিন্তু সব সময় পাওয়ার কথা বলে না—প্রেম পাওয়া না-পাওয়ায় মিলে। ব্যবধানে এবং অব্যবধানে দুই রকমভাবে আপন জিনিষকে পেতে হয়।...ব্যবধানের সাধনা এবং অব্যবধানের সাধনা একসঙ্গে চালাতে হবে...। এতে সংসার কেউ নয়—প্রেম এটাও থাকে, আবার সংসার আমার সঙ্গে অন্বিত হয়েও থাকে।···এটাই ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অন্বয় ব্যতিরেক সাধনা।···সুধাকে লিখেছিলাম অনন্ত দূরে যেতে পারলেই অনন্ত নিকটে থাকা সার্থক ও সত্য —এতে উভয়ের মোহ থেকেই মুক্ত থাকা যায়।··· অন্তরে অন্তর্যামীকে চাই।···নারায়ণকে ভালবাসার কষ্টিপাথর নরকে ভালবাসা।···গুরুতে ভালবাসার পরীক্ষা সন্তানে ভালবাসা আসল কিনা, মানুষের প্রতি সেবাবুদ্ধি আসল কি না।··· অন্তরও মানুষকে শোষণ করে, বাইরেও মানুষকে শোষণ করে।···ধ্যানী বাস্তবকে এক রকম করে সরিয়ে রাখে, সংসারী আর এক রকম করে···।

১৮, ৪, ১৯৫৭। ভাগবত শাস্ত্রের মন্থন করলে রাস-পঞ্চাধ্যায়কে পাওয়া যায়—বৈষ্ণবগণ বলেছেন এটা মধ্যমণি। এতে আছে রসশাস্ত্র এবং রসের পরিপাক-শাস্ত্র। মানুষ রসের কাঙাল—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ এই পঞ্চরস।···রূপের আস্বাদনে ঝড়িং মরে,···স্পর্শ আস্বাদন করতে গিয়ে হাতী ধোবে, বাঁশীর সুর শুনে মৃগ ছুটে গিয়ে ব্যাধের কাছে ধরা পড়ে···। মানুষের মধ্যে ঐ পাঁচটা রসই প্রবল—তাই মানুষের অবস্থা খুব জটিল···। পাঁচ রস পাঁচ দিকে টানছে—মানুষ কি করে ঘরে ফিরে আসবে?··· এই ঘরকে বজায় রেখে কি করে বাইরে আসা যায় তারই শাস্ত্র ভাগবত আর রসময় অধ্যায়ের শেষ দুটি শ্লোক।···রস নিয়ে যতটা অধঃপতনে মানুষ যেতে পারে তারই চিত্র এঁকে তাকে পরিপাক করবার কথা বলেছেন ভাগবত।···রস দু রকম—আস্বাদক রস, পাচক রস। মানুষ লোভী—আস্বাদনের জন্য পাগল, কিন্তু পরিপাক করতে পারে না। টাকা চায় মানুষ—পরিপাক করতে পারে?···

ক্রমশঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট ত্রাণ

প্রাথমিক শিক্ষা

॥ মানববাদী স্বদেশরঞ্জন ॥

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে ঈপ্সিত লাভ যে ঘটছে না, অনেক দিন থেকেই যে তা গভীর সংকটের আবর্তের মধ্যে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সে কথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনেক কমিটি কমিশন বসানো হয়ে আসছে। তথাপি সংকট যে ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে তা গত কয়েক বছরের ইতিহাস থেকেই বোঝা যাচ্ছে। অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যেন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলে 'যুক্তফ্রন্ট' রচনা করেছে। অথচ এ ষড়যন্ত্র কারো সজ্ঞানে হচ্ছে না। তা যদি হ'ত তা হলে সেই সঙ্গে বিকল্প শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাও থাকত। সজ্ঞানে যে ঘটছে না তার প্রমাণ পাই যখন দেখি, বিদ্যালয়ে নিজেরাই অশান্তি ঘটিয়ে যখন সেখে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল তখন ছাত্ররাই 'হায়' 'হায়' করে; শিক্ষকরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহিত করে, তাবে এতে তাদের দাবীর জোর বাড়বে, কিন্তু যখন দেখে ছাত্ররাও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে শিক্ষকদের নির্দেশ মানছে না, শ্রদ্ধা করছে না, অপমান করছে, আঘাত করছে তখন তাঁরাই দুঃখিত হচ্ছেন; অভিভাবকগণ তাঁদের কর্মক্ষেত্রে যে পার্টির সামিল হয়ে তাকে শক্তিমান করে তুলছেন, সেই পার্টি যখন ছাত্রদের কাজে লাগিয়ে লেখা-পড়ার ক্ষতি সাধন করছে তখন তাঁরাই এটাকে নিন্দা করছেন। অর্থাৎ দেশ থেকে যুক্তিশীলতা যে নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে, সমাজের সকল অংশ ও বিভাগের সঙ্গে সকল অংশ ও বিভাগ যে জড়িত, সকল ব্যক্তির কাজ-কর্ম যে সকল ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে, এ শিক্ষা যে সবলে ভুলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এই যুক্তিশীলতা ও এই সমাজ-চেতনাই মানুষকে অপর জীব থেকে পৃথক করেছে, বন্য অবস্থা থেকে সভ্য পর্যায়ে উন্নত করেছে।

বিদ্যালয়ের মোটামুটি চারটি কাজ: একটি হল, প্রত্যেক ছাত্রকে একটা না একটা পেশা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দান করা; দ্বিতীয়টি হল, ছাত্রকে সঠিক চিন্তার পদ্ধতি শিখান, যাতে ছাত্র তার ভবিষ্যৎ জীবনে যখন নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন যেন সঠিক চিন্তার দ্বারা সেই সব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়; তৃতীয়টি হল, ছাত্রকে সমাজচেতন, নীতিপরায়ণ, মূল্যবোধিক করে গড়ে তোলা; আর চতুর্থটি হল, ছাত্রের চরিত্র গঠন—দেহ মন বুদ্ধি চিত্তবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য অনুশীলন—ভাবাবেগকে যুক্তির দ্বারা সংযত রাখার ক্ষমতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আত্মনির্ভর, ঠাণ্ডা স্বভাব, সত্য ও অহিংসার প্রতি আগ্রহ, সৌন্দর্যবোধ, সংযমের দৃঢ়তা, নির্লোভ আচরণ, সাফল্যমণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত উদ্যমের প্রতি লেগে থাকা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণাবলী আয়ত্ত করার অনুশীলন।

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনৈতিক আচরণের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শিক্ষক ও অভিভাবকরা তো কয়েক বছর পূর্বে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বেরিয়েছেন। তাঁরাও যুক্তিশীলতা ভুলে এমন অযুক্তিবাদী হচ্ছেন কেন? সমাজ বিরোধী আচরণ করছেন কেন, দুর্নীতিপরায়ণ হচ্ছেন কেন? চরিত্রের এমন দুর্বলতা দেখাচ্ছেন কেন?

এর একমাত্র উত্তর এই যে, অনেক দিন থেকেই

বিদ্যালয়গুলি থেকে ছাত্রদের সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শেখান বন্ধ হয়ে গেছে; সমাজশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার এবং চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা উঠে গিয়ে সমাজবিরোধী ও অনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। তারই ফলে আমরা আজ ভুগছি। শিক্ষাব্যবস্থার যে চারটি মূল উদ্দেশ্য, সেই চারটি বিষয় যাতে সুষ্ঠুভাবে শেখানো হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই শিক্ষা সমস্যার সমাধান হয়ে সংকট কেটে যাবে। কাজটি সহজ নয়। কিন্তু কাজটি কঠিন বা সহজ হোক, কাজটি যখন আজ করণীয় তখন কাজটি সুষ্ঠুভাবে করে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করতেই হবে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে দুই উপাদানের সংমিশ্রণে। এক জন্ম-সূত্রে প্রাপ্ত প্রকৃতি, ও অপরটি হল শিক্ষা। এই শিক্ষার সুরু মাতৃ ক্রোড়ে। শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীরা হ'ল শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিশুর এই গৃহ-শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যাক। এ সম্বন্ধে আলোচনা সমাজশিক্ষার সমস্যা ও সমাধান আলোচনার সময় করা যাবে। শিশুর পাঁচ বছর বয়স থেকে যে প্রাথমিক শিক্ষার সুরু তা থেকেই এখানে আলোচনা সুরু করা যাক।

শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল: শিশুর দেহ মন বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে তাকে এমন এক সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের অধিকারী করা যখন সে হবে যুক্তি ও নীতিপরায়ণ সৃজনশীল সুনাগরিক। মানুষ পরিবর্তনশীল। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, মানব শিশুর এই পরিবর্তনশীলতাকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা। এই পরিবর্তন যেন শিশুর দেহ মন বুদ্ধি চিত্তের সকল বৃত্তি ও শক্তিসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে সাধিত হয়।

মানুষের আবেগ ও যুক্তিবুদ্ধি মস্তিষ্কেরই দুই ক্রিয়া। এই দুই ক্রিয়া নিয়েই মানুষের মন। জীবজগতের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে ক্রমবিকশিত হয়েছে জীবের স্নায়ুমণ্ডলী। স্নায়ুমণ্ডলীর সর্বশেষ স্তরের বিকাশের ফলস্বরূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে মানুষের মস্তিষ্ক। মানুষ ছাড়া অন্যান্য উচ্চ-স্তরের জীবের মস্তিষ্ক চেতনা ও আবেগসর্বস্ব। এই চেতনা ও আবেগকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কেরই আছে। সুতরাং যুক্তির ক্ষমতাকে বাড়িয়ে মানুষের মনের আবেগসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শৈশব থেকে শিশুর এই যুক্তিশীলতাকে বাড়াবার চেষ্টা করতে হয়, তবেই শিশুর ব্যক্তিত্বের আশানুরূপ বিকাশ ঘটে, এবং শিশু উত্তর কালে যুক্তিশীল, বিবেকপরায়ণ সৃজনশীল সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। এটিই হল প্রাথমিক শিক্ষকের কাজ।

শিশুর আবেগ স্তরের প্রকাশ যেমন এক রকম হয় না, তেমনি যুক্তি-বুদ্ধিরও তারতম্য ঘটে। শিক্ষককে প্রতিটি ছাত্রের এই সব স্বাভাবিক বৃত্তি ও ক্ষমতার তারতম্য লক্ষ্য করে কোন্ বৃত্তিকে বাড়াতে হবে, কোন বৃত্তিকে কমাতে হবে তা ঠিক করে শিশুদের সেই মতো শিক্ষাদান করতে হয়, শিশুকে চিন্তাশীল ও যুক্তিপরায়ণ করে তার অবাঞ্ছিত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হয়, এই সব আবেগকে দমিত না করে, সৃজনশীল কাজকর্মের প্রতি সেই সব আবেগকে পরিচালিত করে তা সবকে প্রশমিত করতে হয়। অন্তর্নিহিত শুভ ও স্বাস্থ্যের বৃত্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য শিশুকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। শিশুর মনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গভীর ভাবে অনুভব করিয়ে দিতে হয় যে, সহজ আবেগজনিত ক্রিয়াকর্ম যদি যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা খুবই ক্ষতিকর হয়, তা উন্নতির পথে চালিত না করে ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়।

শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ যেন যুক্তিসিদ্ধ হয় তা প্রতি পদে পদে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হয়। যে বিষয়ে ছাত্রকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে সে বিষয়টি ছাত্র কতটুকু বুঝছে তা বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করে চলতে হয়, ছাত্রের পক্ষে বুঝতে কষ্ট হলে বা ছাত্র অপারগ হলে, পদ্ধতি তৎক্ষণাৎ বদলাতে হয়।

প্রথমেই ছাত্রের যুক্তিবুদ্ধিকে জাগিয়ে দিতে হয়, সে যেন নিজের বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারে বিষয়টির অর্থ ও তাৎপর্য্য। ছাত্রের যুক্তিবুদ্ধি জাগরিত হলেই ছাত্রের অন্যান্য শক্তি ও বৃত্তিগুলি সহজেই জাগান সম্ভব হয়, তখন বিষয়টি বোঝান এবং শেখান সহজ হয়ে আসে।

যুক্তিশীলতা সকল মানুষেরই অন্তর্নিহিত বৃত্তি বটে কিন্তু এই যুক্তিশীলতা সকলের জীবনে একভাবে বিকশিত হয় না, এবং ব্যক্তি বিশেষে এই বিকাশের এমনই তারতম্য ঘটে যে, প্রত্যেকটি মানুষই এক অনন্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠে। সেই জন্য যুক্তিসঙ্গত শিক্ষাদান পদ্ধতি বলতে এক রকম পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণভাবে সকল ছাত্রের যুক্তিবুদ্ধিকে জাগাবার চেষ্টা করলেই হয় না। অবশ্য বুঝে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও ছাত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়, তবেই এই যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়।

ব্যক্তিত্বের অনন্যতার অর্থ এই নয় যে, মানুষ অপরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না, সহযোগিতা করতে পারে না। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে ভাল-মন্দের চেতনা, প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতায় লাভ বেশী এই জ্ঞান, এই যুক্তিবুদ্ধিই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক করেছে। তার অনন্যতা সত্ত্বেও যে সে সমাজ গড়ে সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে চায় তার কারণ সে যুক্তিপরায়ণ। মানুষ তার অনন্য ব্যক্তিত্ব নিয়েও সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার জন্য নিজের অনন্য ব্যক্তিত্বের কোথায় কতটুকু খর্ব করতে হবে, কতটুকু সংযত করতে হবে তা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বোঝার ক্ষমতা রাখে। মানুষের এই যুক্তিপরায়ণতার জন্যে সে কলের পুতুলের মতো সকলের সঙ্গে একইভাবে চলা-বলা-চিন্তা করাকে খুবই অপছন্দ করে। সুতরাং এই অনন্যতাই যখন মানুষের স্বভাব তখন সকলকার জন্যেই এক প্রকার শিক্ষাদান পদ্ধতি হতে পারে না। শিশুর জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে; এবং এই বিভিন্ন স্তরের ও মেজাজের ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির আবিষ্কার শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি সূচিত করে। মানুষ সমাজ-চাকার অন্যতম শিকমাত্র নয়, কিংবা উচ্ছৃঙ্খল অসামাজিক, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকামী ব্যষ্টিও নয়। সুতরাং মানুষের অনন্যতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য পিপাসা থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন মেধা ও মেজাজের ছাত্রের জন্য কয়েক প্রকার শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকলেই সকল ছাত্রকেই সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী সৃজনশীল, সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, নীতিপরায়ণ সুনাগরিক করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থার চার আদর্শের মধ্যে কেবল পেশাদারী শিক্ষাটাই চলছে, তাও ভাল চলছে না, বাকি তিনটি আদর্শের অভাব ঘটেছে বলেই আজ এই সংকট দেখা দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না বলেই এই সংকট দেখা দিয়েছে। কথাটা ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন হল চরিত্র বলতে কি বুঝব। যুক্তিশীলতার শক্তিবৃদ্ধি, সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি শেখা, দেহমন চিত্তের সুসমঞ্জস অনুশীলনের দ্বারা বিকাশ সাধন, নীতিপরায়ণতা, সামাজিকতা, সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ, একাগ্রতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণের সম্মিলিত ফলের দ্বারাই চরিত্র গড়ে ওঠে বা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সত্যই এ দিকে নজর দেওয়া হয় না। সংকট দূর করতে হলে এদিকে নজর দিতে হবে।

এই সব চারিত্রিক গুণ সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। কেবল বই পড়িয়ে বা বক্তৃতা শুনিয়ে ছাত্রদের এ সব গুণে গুণান্বিত করা যায় না। এ সব গুণের প্রতি ছাত্রের আগ্রহ জাগাতে হলে এসব গুণের সকল দৃষ্টান্ত ছাত্রের চোখের সামনে রাখতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের এসব গুণে গুণান্বিত হতে হবে। চোখের সামনে যখন ছাত্ররা দেখবে এ সব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির সঙ্গে গুণহীন ব্যক্তির পার্থক্য, গুণহীন ব্যক্তির সর্ববিষয়ে হীনতা দীনতা, দুর্বলতা, দারিদ্র্য তখনই ছাত্র এসব গুণকে নিজ নিজ চরিত্রের মধ্যে গড়ে তুলতে আগ্রহান্বিত হবে, অনুশীলন সুরু করবে।

ছাত্রের দৈহিক শক্তির বিকাশ সাধনের জন্য নিয়মমত ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকবে। দেখতে হবে দেহচর্চার প্রতি অত্যধিক ঝোঁকের ফলে চিত্ত বৃত্তির বিকাশ যেন ব্যাহত না হয়। দেহচর্চার পদ্ধতির মধ্যে যেন একঘেয়েমি না থাকে, তা যেন আনন্দদায়ক হয় এবং সামরিক ড্রিল ও সকলের দেহ মনকে এক ছাঁচে ঢালাই করার উগ্র আগ্রহে

যেন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের প্রতিবন্ধক না হয়।

• ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য ও সঠিক চিন্তা করার পদ্ধতি শেখানর জন্য উপযুক্ত পাঠ্য বিষয়ের পঠন, রচনা ও তর্কবিতর্কের ব্যবস্থা থাকবে।

• চিত্ত বৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য নন্দনতত্ত্ব ও সৌন্দর্য-তত্ত্ব চর্চার ব্যবস্থা থাকবে।

• সামাজিক চেতনাবৃদ্ধি নৈতিক শিক্ষার ও চরিত্র গঠনের শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা দিতে হবে। নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয় যোগ ও সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

কায়িবিদ্যা চর্চার দ্বারা সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধ বিকশিত না হলে ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ ঘটবে না। সেই জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন, পুতুল গড়া, মূর্তি-গঠন, নানা খেলনা তৈরীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকা চাই। এ সব বিষয়ে যথাযথ কলমে শিক্ষার ও অনুশীলনের দ্বারা যেমন ছাত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও রসবোধ বৃত্তি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকবে, অন্যদিকে তেমনি সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষক ছাত্রকে কেবল অঙ্কন-কৌশল ও গঠন পদ্ধতিটিই দেখাবেন, কিন্তু অনুকরণ করতে শেখাবেন না। তাতে ছাত্রের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটবে না। কখনো অনুকরণের ফলে তার রসবোধের মৃত্যু ঘটবে, শিল্পের প্রতি আগ্রহই নষ্ট হয়ে যাবে।

আগেও বলেছি, এখনো বলছি যে, শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি ছাত্র অনন্য; কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য সকলের মধ্যেই আছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে নানারূপ পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। ছাত্র বিশেষে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেহ, বুদ্ধি ও চিত্তের অনুশীলন ছাড়া আছে চরিত্র গঠনের শিক্ষা। অপরের সঙ্গে নৈতিক ব্যবহারের শিক্ষা, সামাজিক ও নাগরিকত্বের শিক্ষা। শুধু বই পড়িয়ে বা বক্তৃতার সাহায্যে চরিত্র গঠনের শিক্ষা ও গুণগত শিক্ষা হবে না। শিক্ষকের নিজ ব্যবহারের সাহায্যে ও নিজ জীবনের সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা এ শিক্ষা দান করতে হবে; যথা: (১) সত্যবাদিতা;

(২) প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদা দান;

(৩) জাতিবর্ণবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বমানবসোষ্ঠির সঙ্গে একাত্ম বোধ;

(৪) সমাজে অপর মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্ব-বিরোধ না করে সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার করলেই যে সমাজ সুখকর হয়ে ওঠে, যুক্তির দ্বারা এই বোধ জাগিয়ে সকলের সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার করার প্রেরণা জাগানো; সেবা প্রতিষ্ঠান, সমবায় প্রতিষ্ঠান, গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা ও নানা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ শিক্ষা দিতে হবে।

(৫) দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা সামাজিক দায় দায়িত্ব বোধ জাগানো ও অপরের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদা দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো;

(৬) সকলের সঙ্গে মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্ব ও মমতা-বোধ জাগানো;

(৭) হিংসা, কুশ্রীতা, নীচতার প্রতি ঘৃণা ও সর্বজীবে দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা ও উদারতা জাগানো।

চরিত্র গঠনের শিক্ষা মাতৃক্রোড় থেকে সুরু করতে হয় শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। সুতরাং শিশুকে এ শিক্ষা পিতামাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও খেলার সাথীদের নিকট থেকেই পেতে হবে। এই একান্ত কাঁচা বয়সে লালন-পালনের দোষে শিশুর মনে এমন সব ধারণা দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় যে ভবিষ্যতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে এক বিকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়ে শিশু বড় হয়ে ওঠে।

শিশু মনস্তত্ত্ববিদদের মতে শিশু যেমন ভাবে লালিত পালিত হয় শিশু মন তেমন ভাবেই গড়ে ওঠে। যথা: সব সময় যদি শিশুর ব্যবহারের ত্রুটি বের করা হয় তবে সে বড় হয়ে গুণগ্রাহী হয় না, সেও সকলের দোষটাই

দেখে; বিরোধিতা পেলে দ্বন্দ্ব-বিরোধ করতে শেখে; ভয়ের সঙ্গে পালিত হলে রক্ষণশীল ও প্রচলিত ব্যবস্থার গুণগ্রাহী হয়; দয়া বা করুণার সঙ্গে পালিত হলে জীবন তার কাছে সন্তোষ্য হয়ে ওঠে না; উপহাস সহ্যে পালিত হলে অপরাধী মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে, পালকের আশা উৎসাহ, সাহস উত্তরকালে প্রতিপাল্যকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে; প্রতিপাল্যের আস্থার ও নৈরাশ্যের প্রতি পালকের সহিষ্ণুতা প্রতিপাল্যকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়; পালকের প্রশংসা গুণগ্রাহিতা শেখায়; শিশুর প্রতি আগ্রহ শিশুকে ভালবাসতে শেখায়; শিশুর কাজ-কর্মের প্রতি সমর্থন জীবনকে ভালবাসতে শেখায়; শিশুর অহং-এর স্বীকৃতি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে; অন্যান্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া পরা খেলা থাকার অভ্যাস শিশুকে উদার করে; সরল ও উদার ব্যবহার সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শিশুর আকর্ষণ বাড়ায়; নিরাপত্তা বোধ থেকে শিশুর আত্ম-বিশ্বাস জাগে ও অপরের প্রতি আস্থাবান করে তোলে; স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি শিশুকে জীবনমুখী ও সুখবাদী করে তোলে; শান্ত গম্ভীর পরিবেশ শান্তিপ্রিয় করে তোলে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদের মতেও শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। অতএব পিতামাতা আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদেরও বিজ্ঞানসম্মত শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

শিশুর মন এতই কোমল ও স্পর্শকাতর থাকে যে, পিতামাতা ও শিক্ষকদের খুব সতর্কতার সঙ্গেই শিশুদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। শিশুর চাহিদা, জিজ্ঞাসা, সুবিধা-অসুবিধা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে তা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে হয়তো একটি শিশুর ভবিষ্যৎ চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সদভ্যাস, শুভ্র ব্যবহার, অনুসন্ধিৎসা, জানার আগ্রহ প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন অতি শৈশব থেকেই সুরু করতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন বাঁধা-ধরা পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। খেলাধূলা, ছবি আঁকা, পুতুল গড়া, বাগান করা, ভ্রমণ, বনভোজন, এবং শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে ছোটো-খাটো বিষয় খোঁজ ও আবিষ্কার অভিযানের মধ্য দিয়েই শিশুশিক্ষা চালু হবে; কারণ এই শিক্ষাদানের পদ্ধতি শিশুশিক্ষাকে স্লান্তিকর এক-ঘেয়েমি থেকে মুক্ত রাখবে, শিক্ষাকে আর শিশু ভয় করবে না, আনন্দের মধ্য দিয়েই শিখবে।

শিশুশিক্ষা পদ্ধতি এমন করতে হবে যার ফলে প্রতি-ধাপে শিশু নতুন কিছু শেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পায়, মজা পায়। শিশুর পারিপার্শ্বিক থেকে উদ্ভূত যে সব পরিস্থিতি ও সমস্যা শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে, সে সবের ব্যাখ্যা ও শিশুকে দিয়েই সমাধান প্রচেষ্টার দ্বারাই শিশুকে জ্ঞান দিতে হবে, তার জ্ঞানলাভ স্পৃহাকে বাড়িয়ে চলতে হবে।

শৃঙ্খলা রক্ষার কোন প্রকার বিধি-নিষেধই জোর করে চাপানো চলবে না। শিশু যেন তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে যে, সে যা করতে চায় তা ভালভাবে করতে হলে, তার উদ্দিষ্ট বস্তুটি সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে, কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা তাকেও মানতে হবে, নতুবা সে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবে না, অপরে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং নিজের স্বাধীনতা, ইচ্ছা মতো চলা-বলা-কাজ করার অর্থ এই নয় যে, কেউ কোন নিয়মশৃঙ্খলা মানবে না, সবাই ইচ্ছামতো যা খুশী তাই করবে। ছাত্রের এই অভিজ্ঞতা যাতে হয় সে জন্য শিক্ষক ছাত্রের সকল অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করবেন, প্রয়োজন হলে নিত্য নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা ছাত্রের কাছে ব্যাখ্যা করবেন, তাৎপর্য বোঝাবেন।

প্রত্যেক দেশেরই পুরাণ, মহাকাব্য, রূপকথা আছে। আমাদের সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী আছে। ছাত্রদের এসব পড়াতে হবে এবং জাতির ঐতিহ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করতে হবে, তাতে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকবে। তখন তারা ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, গল্প-কবিতা লিখে, নৃত্যগীত অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের রূপ রস জ্ঞানের অনুশীলন করার চেষ্টা করতে থাকবে।

শিশুদের ঠিক মতো পরিচালনার জন্যে এবং এই সব

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষকদের দাদা দিদি বন্ধুদের মতো এসব কাজে শিশুদের সঙ্গ দিতে হবে।

পিতামাতা আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীকে যেমন বিজ্ঞান-সম্মত শিশু পালন পদ্ধতি শিখতে হবে তেমনি প্রাথমিক শিক্ষকদেরও বৈজ্ঞানিক শিশু শিক্ষা পদ্ধতি শিখতে হবে। অর্ধ শিক্ষিত, কুশিক্ষিত, অশিক্ষিত পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীকে দিয়ে যেমন বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শিশু পালন হবে না, তেমনি বর্তমানের মতো অত্যল্প বেতনের অল্পশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়েও শিশুর বিজ্ঞান-সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা চলবে না। প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকের চরিত্রের প্রভাব শিশুর উত্তর জীবনকে খুবই প্রভাবিত করে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন গড়ে তোলে। এই প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বাসন ঘটাতে হবে। অতএব প্রাথমিক শিক্ষকের যোগ্যতা বিচারের সময় অতিশয় যত্নের সঙ্গে তা করতে হবে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যেমন কম, সামাজিক মর্যাদাও তেমন বেশী নয়। কিন্তু উপযুক্ত বেতন উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা পেলে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শবাদী চরিত্রবান মানুষ এই পেশা গ্রহণ করবে।

ছাত্রদের মানসিক বিকাশের গতি পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হলে ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা কমাতে হবে। দেশের সব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে প্রচুর শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। উপযুক্ত বেতনে প্রচুর শিক্ষকের জন্য খরচও পড়বে কম নয়। জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন করে জাতীয় আয় বাড়িয়ে এই অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশু-শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষকদের শিখতে হবে। সেই জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থা চাই। শিক্ষা-ব্যবস্থার সংকট কাটবে না যদি শিক্ষক সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গির ও আদর্শের পরিবর্তন না ঘটে, এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান চার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা না হয়।

ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে তাদের সকল বৃত্তি ও শক্তির সুষম বিকাশের জন্য ও নীতিপরায়ণ সুনাগরিক হওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সহযোগিতা দান করবেন যাঁরা তাঁদের কাজ নিঃসন্দেহে মহান, একান্ত দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করে শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। অবশ্য পারিশ্রমিক ও সামাজিক মর্যাদা এই পদের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনুযায়ীই হবে। শিক্ষকতা কার্যের ভার গ্রহণের পূর্বে সকল শিক্ষককেই শিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই শিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে, ছাত্রদের অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও শক্তি-সমূহকে অনুশীলনের দ্বারা বিকশিত করে তোলার কৌশল ও পদ্ধতি শেখা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা অবশ্যই মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা থেকে পৃথক হবে। বস্তুতঃ প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপেক্ষা অনেক কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শিশু-শিক্ষকের মহান ব্রত যিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য যে সকল বিশেষ প্রতিষ্ঠান থাকবে সেখানে তাকে ভর্তি হতে হবে, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোর্সে ভর্তি হতে হবে। অবশ্য এ দুই স্থানেই পাঠক্রম ও শিক্ষণ ব্যবস্থা একই হবে, একই ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এই সব শিক্ষণ-ব্যবস্থায় কেবল শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধেই শেখান হবে না, কী ভাবে শিশুদের সে সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে তাও শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে।

এই শিক্ষণ-ব্যবস্থার শিক্ষা-কাল হবে তিন বৎসর। প্রথম বৎসরের পাঠ্য তালিকা হবে: (১) শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় ও শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি; (২) শিশু-শিক্ষাদানের কৌশল ও পদ্ধতি, (৩) শিশু-মনস্তত্ত্ব।

দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষার্থীকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে থেকে শিশুদের পড়াতে হবে।

তৃতীয় বৎসরে শিক্ষার্থীকে তার কলেজে ফিরে এসে

এক বছরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করতে হবে। সেই অভিজ্ঞতায় ভিত্তির ওপর ও যে সব সমস্যার সমাধান সে করতে পারেনি বা কঠিন বলে মনে হয়েছে বা পদ্ধতি প্রয়োগে অক্ষমতা দেখা গেছে সে সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে হবে ও পুনরায় সর্বিস্তার সময়য় সাধন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

এই তৃতীয় বৎসরের পাঠক্রম শেষ করে শেষ পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীরাই শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষার জন্যে পিতামাতা আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশীকে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে এবং শিক্ষকদের জন্য এই নিয়মে শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার, রাষ্ট্র ও অর্থ নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে তখনই যখন রাষ্ট্রের ও আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন হয়, তা হলে রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থার ওপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই। তা যদি না থাকে, রাষ্ট্রের ওপর যদি অপরের নিয়ন্ত্রণ থাকে তবে তার চেষ্টা হবে, সাধারণ মানুষকে তার শাসনের বশম্বদ সমর্থক রূপে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সে উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা। বর্তমানে এইটাই হচ্ছে। কিন্তু এ যুগে সাধারণ মানুষ সেটা আর সইতে চাইছে না, সে জন্যেই সংঘাত বেধেছে। কিন্তু সে সংঘাত সজ্ঞানে চলছে না বলে তা অন্ধ সংঘাতে পরিণত হয়ে কোন সুফল প্রসব করতে পারছে না; কারণ এই সংঘাতের সামনে কোন বিকল্প পরিকল্পনা নেই। এটাই বর্তমান সংকট রূপে দেখা দিয়েছে। এই অন্ধ সংঘাতের সামনে এই বিকল্প পরিকল্পনা তুলে ধরে বর্তমান সংকটের নিরাকরণ করতে হবে।

বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যক্তির কোন অধিকার ও ক্ষমতা যে নেই তা আমরা জানি। কোন না কোন পার্টি সরকার দখল করে রাষ্ট্র পরিচালিত করে চলেছে। ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের রচিত আইন কানুন হুকুম মেনে চলতে হচ্ছে। অসন্তুষ্ট হলে অবশ্যই দাবী পেশ করার অধিকার আছে। এবং এটা একই সঙ্গে হাস্যকরও বটে দুঃখজনকও বটে যে, যে পার্টিকে জনগণ সংখ্যাধিক্যে নির্বাচন করেছিল তাদের কাছেই ভিক্ষুকের মতো দাবী আদায়ের জন্য দরখাস্ত নিয়ে হাজির হতে হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে এও সকলে দেখছে যে শাসক পার্টির ক্ষতি হবে, এমন কোন দাবীই পূরণ হচ্ছে না। তথাপি সব দেখেও সেই পথেই দিনের পর দিন জনসাধারণ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলছে, 'আমাদের দাবী মানতে হবে—নইলে গদি ছাড়তে হবে'। এবার কিন্তু বোঝার সময় হয়েছে যে, গদীতে যেই বসুক জনসাধারণের দাবী শাসক পার্টি কোন দিনই মানতে পারে না, কেবল ভোটের আগে অঙ্গীকার করে ভোটারদের ধাপ্পা দিতে পারে, কারণ দাবী মানলে তাদের আর ক্ষমতায় থাকা চলে না, ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্তিরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সংবিধান অনুসারে সার্বভৌম ক্ষমতা যখন জনগণের হাতে এসেছে এবং পাঁচ বছর অন্তর সার্বজনীন ভোটের দ্বারা সরকার গড়ার ব্যবস্থা হয়েছে, তখন সার্বভৌম ক্ষমতা পার্টিদের হাতে ব্যালট বাক্সে হস্তান্তর করে দিয়ে ভোটারদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা বন্ধ করতে পারলেই বর্তমান সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

ভোটারগণ গ্রামে গ্রামে সহরের পাড়ায় পাড়ায় ভোটার পঞ্চায়েত গড়ে নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্য থেকে এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করে যার আনুগত্য ভোটার পঞ্চায়েতের নিকট থাকবে, পার্টিদের নিকট থাকবে না তা হলেই ভোটারগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রের আইন বিভাগ ও শাসন পরিচালন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন রচনার দ্বারা সমাজের বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ব্যবস্থাকেও পরিবর্তন করে নূতন সহযোগিতামূলক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে শিক্ষা

ব্যক্তিরও ব্যক্তির বিকাশের উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভাবে
নর্গঠিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়
তাকেই প্রতিযোগিতা করে চার-ভিতের মধ্যে বেঁচে
করতে হয়। তার ফলে সকলকে একটা দ্বন্দ্ব-বিরোধ
পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে হয়। সেই জন্য অন্ন
স্থানের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা সকলের থাকে না, যাদের
ক তাদেরও কখন সেটা যায় সেই ভয়ে সদাই সতর্ক
তে হয়। ফলে সমাজের সকলকার মনেই ভয়,
দ্বন্দ্ব, দুর্ভাবনা লেগে থাকে। সকলে সকলকে সন্দেহ
করতে থাকে—কে কখন ঠকাবে, কে কখন তাকে
য়ে তার স্থান দখল করে লাভবান হবে। এই অবস্থায়
প্রেমী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একটা মৌখিক ভদ্রতা
লেও আন্তরিক প্রেম প্রীতি সৌহার্দ্য সহযোগিতা
াচ্ছার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। শিশুরাও এই আব-
হায় পালিত হয়ে স্বাভাবিক মন নিয়ে গড়ে উঠতে
না—ছল চাতুরি, মুখে মধু অন্তরে গরল, হিংসাদ্বেষ,
নেষাত্মক মনোভাব নিয়েই সকল শিশু বড় হয়ে উঠতে
। দারিদ্র্যের জ্বালা ও প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক
া পিতামাতাকে সর্বদা এমনই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত
রাখে যে সন্তানদের প্রতি দুটো মেহে দেওয়া ছাড়া
কোন দিকে নজর দিতে পারে না।

পিতামাতার দারিদ্র্য দূর করে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে
সত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করার জন্যে এবং শিক্ষকদের
ক সাচ্ছন্দ্য বিধান করার জন্যে ও সমাজ থেকে
জগতের দ্বন্দ্ব-বিরোধ, খাওয়া-খাওয়ি, কামড়া-কামড়ি
রে প্রেম প্রীতি সহযোগিতার আবহাওয়ার প্রবর্তন
জন্যে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বর্তমানের
যোগিতামূলক অর্থনীতির পরিবর্তে সহযোগিতামূলক
াতির প্রবর্তন করতে হবে। সমাজের সকল
ধনের উপায়—জমি, কলকারখানা প্রভৃতির
সমাজের সকলকার অধিকার দিতে হবে। তখন
কে নিজ নিজ অমশক্তির সাহায্যে যেটুকু উৎপন্ন
করবে সে তার মালিক হবে। তখন দেখবে অপরের
সঙ্গে সহযোগিতা না করলে উৎপাদন হয় না, উৎপাদন
বাড়ে না, লাভবান হওয়া যায় না; তখন বর্তমানের
মতো প্রতিযোগিতা না করে সকলের সঙ্গে সকলে সহ-
যোগিতা করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

প্রতিযোগিতায় জিততে হলে প্রতিযোগীকে ফাঁকতা
দিতে হয়, ভুল বোঝাতে হয়, নিজের আক্রমণাত্মক হিংসা
বৃত্তিকে অন্যের রং মাখিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়—
কামুফ্লেজ করতে হয়। কিন্তু জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে
প্রতিযোগিতা যখন থাকবে না, যখন মানুষ তাকে ঠকাবে
না বরং সহযোগিতার দ্বারা সকলে তাকে লাভবান করবে,
তখন সবলের নিকট নিজেকে আকর্ষণীয় সহযোগী করে
তোলার জন্য সত্যবাদী হতে চাইবে, হিংসা করার মতো
কেউ আর থাকবে না। আর্থিক ব্যবস্থা থেকে প্রতিযোগিতা
উঠে গেলে তখন মানুষের ঠকবার ভয় না থাকাতে, খেয়ে
যাবার ভয় না থাকাতে, জীবিকা হারাবার ভয় না থাকাতে
মানুষের মনে ভয় ভাবনা সন্দেহ আর থাকবে না,
তখন আর প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য মুখে মধু অন্তরে
গরল পোষার প্রয়োজন হবে না। বড়দের এই রূপ প্রেম-
প্রীতি ভালবাসাপূর্ণ সহযোগিতার নীতি-ভিত্তিক আচার
ব্যবহার দেখে ছোটরাও তা শিখবে। স্থানীয় পঞ্চায়েতে
বসে বড়রা যখন দেশের সকল মানুষের অন্নসমস্যার নিশ্চয়তা
ও নিরাপত্তা বিধান করতে থাকবে, তখন সমস্ত সমাজই
একান্নবর্তী হতে থাকবে। তখন সব বাড়ীর ছেলেমেয়েই
সকলকার ছেলে মেয়ের মতই সকলের নিকট থেকে ব্যবহার
পাবে। তখনই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুর লালন-পালন
করা সম্ভব হবে।

উৎপাদকগণের পরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থায় সকলকার
উৎপাদন ক্ষমতাই বেড়ে যাবে। তখন দেশের অর্থনৈতিক
অবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে জাতীয় সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি
পাবে। তখন আমাদের ঈপ্সিত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে
অর্থাভাব ঘটবে না।

সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রতিযোগিতামূলক

হওয়ায় সমাজে গুরু জগতের আচার-ব্যবহার করতে সকলে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষক সম্প্রদায়ও সে আবহাওয়া থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাঁরাও তাঁদের নিয়োগ-কর্তা অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকদের ঠকাতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরাও ছাত্রদের যথার্থ শিক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার না করেই নিজেদের পাওনা গণ্ডা পেতে চাইছেন। শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য সেটাই শিক্ষক সম্প্রদায় ভুলে গেছেন। অতএব সমাজের যে মূল সংকট সেই মূল সংকটের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে শিক্ষার সংকট। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাও সংকট-মুক্ত হবে। নতুবা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সংকট-মুক্ত করতে বাজেটে শিক্ষা খাতে টাকার অংক বাড়ালেই হবে না, শিক্ষা-কালের কমবেশী করলে বা পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির হের ফের ঘটালেও হবে না। সমাজ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে শিক্ষা-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করতে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হল: তার প্রত্যেকটি একক যে ব্যক্তি তার উন্নতি বিধান করা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্বাধিক ও সর্বোত্তম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। সমাজের সকল অংশ ও বিভাগের সঙ্গে—রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার নীতির—পারস্পরিক বিরোধিতা নেই। পরিবর্তে আছে একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একই লক্ষ্যের প্রতি চলা। তা যদি না চলে, সমাজের সকল অংশের কাজ-কর্ম যদি ব্যক্তির উন্নতি বিধানে সমর্পিত না হয়, তবে যে সকল ব্যক্তির সমবায়ে সমাজ গঠিত, সে সকল মানুষের সুখ শান্তি প্রগতি ঘটে না এবং সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। সুতরাং সমাজের রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতিকে শিক্ষানীতির সঙ্গে ঐক্যতানতার সঙ্গেই চলতে হবে। শিক্ষানীতিকেও রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে একই সুরে ও তালেই বাজতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সংকট ত্রাণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও শিক্ষার সংকট দূর করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ও ছাত্র যুবকগণের জীবনবাদের সংকট মুক্তির ব্যবস্থাও করতে হবে।

আজ বিপ্লবের প্রথম কর্মসূচী হোক: খণ্ডবিখণ্ড জোতে মাঠময় ছড়ানো ব্যবস্থা ভেঙে কৃষকের সকল জমি একত্রিত করে তার জোতকে চকবন্দি করে দেওয়া (Consolidation of holding)...। জাপানের কৃষককে ম্যাক আর্থার এই পদ্ধতিতেই প্রচুর উৎপাদনক্ষম করতে পেরেছিলেন। তিনি পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থাকে ভেঙে বা একরের প্লটে জমিকে ভাগ করে কৃষকের জমি চকবন্দি করে দিয়েছিলেন। এই জন্যই জাপান, ফরমোসা ও ফিলিপিনের একর প্রতি ফলন যান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়াই পৃথিবীর সব জায়গা অপেক্ষা বেশী।...

বিপ্লবের দ্বিতীয় কর্মসূচী হোক: শিল্পবাণিজ্যের যান্ত্রীকরণের পরিবর্তে শ্রমিকীকরণ।...অটোমেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে—বলা হচ্ছে এতে মালিকের লাভ শ্রমিকের ছাঁটাই, অতএব বরবাদ। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির মালিক যদি সকল শ্রমিকরাই হতেন, তাহলে কি আপত্তি করতেন?...শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতো এই যে অটোমেশনের বোতামগুলো টিপতে সকল শ্রমিকের ভাগে এক ঘণ্টাও পড়ছে না।...তখন শ্রমিকরা বলতে পারতেন যে তাঁরা ঐ সময়টা বিনা পারিশ্রমিকে খেটে দেবেন, প্রতিদানে উৎপন্ন দ্রব্যটা বিনামূল্যে সকলকে দিতে হবে।...মজুরিই যদি না থাকে তবে বাড়তি মূল্য অপহরণও নেই, শ্রমিকরাই যদি মালিক হয়, তবে কে কাকে শোষণ করে,... সুতরাং কে কার বিরুদ্ধে বিপ্লব করে?

বিপ্লবের তৃতীয় কর্মসূচী হোক: সকল মানুষের বর্তমান সার্বভৌম অধিকারটি কেড়ে নিয়ে কোনো পার্টির একাধিপত্য স্থাপন না করে ঐ অধিকারটিকে বাস্তব করে তোলা।...বর্তমানে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার আছে বটে, কিন্তু তার কোন ক্ষমতা নেই। সাধারণ মানুষ তার এই সার্বভৌম অধিকার ব্যবহার করতে পারে না। নির্বাচনের সময় ব্যালট বাক্সে প্রতিনিধির হাতে সেই ক্ষমতাটা হস্তান্তর করে দিতে হয়।...বর্তমান বৈপ্লবিক কর্মসূচী হবে...যদি বর্তমানের পঞ্চায়েত আইনটিকে এই উদ্দেশ্যে সংশোধন করে গ্রামসভার হাতে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং এই সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনটি সহরাঞ্চলেও সম্প্রসারিত করা হয়।...

—মানববাদী অন্বেষকগণ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৪০)

নবদ্বীপ-যাত্রা

নবদ্বীপ, শ্রীগৌরজন্মলীলাপূত, শ্রীনিত্যগোপাল-বিরাজিত বদ্বীপ, আমার দীক্ষাস্থলী, আমার বিবাহকালে আমায় শীর্বাদ কর, শক্তি দেও। ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ াকায় দিন। 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন বন-ডোরে'। বাঙ্গলাদেশে কত নগর, কত পথ ণ করিয়াছি। সহস্র সহস্র বক্তৃতা দিয়াছি। কিন্তু ামার সেবকরূপে, চিরদিন দাসরূপে তাহা যেই নাই। াজ তোমার মহানির্বাণ মঠ, তোমার নবদ্বীপ, তোমার িহাটি হইতে বঙ্গবিজয়-অভিযান, ভারত-বিজয় অভিযান রম্ভ করিবার শক্তি দেও। প্রেমের প্লাবন নামিয়া সুক। ১১টার সময় ট্যাক্সীযোগে হাওড়া রওয়ানা হই। াত্রিদেবী কুহুম ও মিঠু বাসে যায়।···অবধূত আশ্রমে সি। ক্ষিতীশবাবু ও সেবানন্দ দিয়াড়াপাড়া মঠে যায়। ময়া মায়ের ঘরে থাকি। এই ঘরেই তো ১৩১২ সনের ই অগ্রহায়ণ দীক্ষার সময় ছিলাম। আবার সেই স্থানে সিয়াছি। নূতন করিয়া বিশ্বময় প্রচারের উপযোগী ন লাভের জন্য। ঠাকুর, কৃপা কর। এই ঘরে সকলেই ্-পাতরা দিয়া শোয়। কোন কষ্ট হয় নাই।···৩ দিনে জন সভাপতি। ১ম দিন-গোপেন্দুভূষণ, ২য় দিনে বাগচি, ৩য় দিনে নিত্যপ্রকাশানন্দ।···বন্ধের ও কাংশ স্থলে সভার চিঠি দেওয়া হইয়াছে।

১৯শে নভেম্বর

নিত্যগোপাল, 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমারে নবীন নডোরে'। নবীন জীবনের ডোরে আমাকে বাঁধিয়া ও, আমি তোমায় বনিয়া যাই, তুমি বনিয়া যাই। গড়িয়া তোল, সারাজীবনের সঙ্গী আমায়। এই তো আমার দীক্ষাস্থল, আবার আজ আসিয়াছি তোমাকে নবীন করিয়া পাইবার জন্য, তোমার বিশ্বের বুকে নবীন রূপ প্রতিষ্ঠার উপযোগী জীবন পাইবার প্রার্থনা লইয়া। ওগো, ঝড়ের বুক চিরিয়া এই বিশ্বের বুকে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শক্তি দাও। আমার ইহা হইতে আর কিছু প্রার্থনা নাই। প্রতিভা, কুসুম, বেণু, গোপা গঙ্গাস্নানে যায়। সকালে ধীরেন সিংহ ও সুরেন বিশ্বাস আসেন, বৈকালেও আসেন। তাহারা চিঠি পত্র বিলি করিতেছে। রাঘব দাদা আসেন।··· এখানের কেহ 'অবধূত আশ্রমের' কথা জানেনা। কি দুঃখ! যাহার সব চেয়ে বেশী পরিচিত হইবার কথা ছিল, তিনিই সব চেয়ে বেশী অপরিচিত। রামপদ ডাক্তার তারিণীবাবুকে বলিয়াছেন, 'গোপেন্দুভূষণ কায়স্থের কাছ হইতে মন্ত্র লইয়াছে, কেন আপনারা তাহাকে সভাপতি করিলেন? আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল।···বিনয়বাবু নিত্যপদানন্দকে বলিতেছে, 'পুরুষোত্তমানন্দ স্ত্রী লইয়া আসিয়াছে। গার্হস্থ্য সন্ন্যাস সমন্বয় বলে ইত্যাদি'···। গোপেন্দু আজ মা ঠাকুরাণীর উৎসবেও ৪টায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ভাষণ দিবে। অথচ সে আজ এখানেও সভাপতি ৩টায়। সে চলিয়া গেলে কে পরে সভাপতি হইবে, ইহা নিয়া তারিণীবাবু বিব্রত। তারিণীবাবুর দুর্বল নীতির ফলে প্রতিক্রিয়াশীল দল সুযোগ পাইতেছে। আমাকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। ক্ষিতীশবাবু দিয়াড়াপাড়ার 'শান্তি'-তে আছে। এখানে আর সে আসিতে চায় না। হায় শান্তি!···

১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ তোমার শ্রীচরণতলে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। তাহার পর জীবনে কত তত্ত্ব, শাস্ত্রের কত নূতন ব্যাখ্যা, সারা বাঙ্গালায় ভ্রমণ, হাজার হাজার বক্তৃতা—কত কিছু করিয়াছি···তোমাকে জীবনে বহন করিব···আমি ভুক্তি চাই না, মুক্তি চাই না। চাই তোমাকে, তোমাকেই শুধু। আমার কেহ নাই। বড় ব্যথা, ঠাকুর, তোমার সম্প্রদায়ের লোক হইতে পাইতেছি। বুকের রক্ত দিয়া কাজ করিতেছি, তাহারা বাহির হইতে বাধা দিতেছে। কোলে করিয়া রাখ। সকালে গোবিন্দ গোস্বামী ও গোপেন্দু আসেন। গোপেন্দু বলেন, 'Life Divine যাহারা না পড়িয়াছেন, তাঁহারা 'শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' বুঝিতে পারিবেন না। Social training Centre এ শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শন আলোচনার জন্য গোবিন্দ অনুরোধ জানায়। উহারা ভারতের অতীত হইতে বর্ত্তমান যুগের শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত বলেন। শ্রীনিত্যগোপালের দর্শন পূর্ব্বে জানিলে দিতে পারিত বলিল। নীলরতনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসেন ১২টার পর। পার্ব্বতীবাবু আসেন। বৈকাল ৩।০ টায় সভা আরম্ভ হয়। গোপেন্দু সভার উদ্বোধন করেন, বেশ বলেন। বর্ত্তমান যুগের সমস্যা কি, শ্রীনিত্যগোপালে তাহার সমাধান কিরূপ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য নবদ্বীপবাসীদের পক্ষ হইতে অনুরোধ জানান। আমি একদিন ব্রিটিশের সিংহাসন টলাইয়াছি, এইবার বৈকুণ্ঠের সিংহাসন টলাইতে চাই—এই সব বলেন। আমার পূর্ব্ব জীবনের কথা অনেক বলেন। রেণু প্রবন্ধ পড়ে। রামপদ ভাক্তার বক্তৃতা দেন। পরে আমি। 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' শ্রীগৌরাঙ্গ আজ শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনিত্যগোপাল। সভার শেষে পার্ব্বতীবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হয়।···আমি বলি—আমার উপর সম্পূর্ণ প্রচারের ভার ছাড়িয়া দিলে ৫ বৎসরের মধ্যে শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে পারিতাম যদি ইহারা আমার সঙ্গে বুকে বুক মিলাইয়া থাকিতেন। আজ সভায় নিত্যপ্রকাশানন্দ, নিত্যপদানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি আসেন।

২১শে নভেম্বর

নিত্যগোপাল, তোমার প্রেম-প্লাবনকে বহিয়া সমাজের বুকে ছড়াইয়া দিবার মত বীর্য তুমি প্রদান কর।···'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি'—আমাকে নিরঞ্জন করিয়া দেও। অবধূত করিয়া দেও। আসন করি···। ৬টায় গোড়ামাতলা যাই। ৬।০ টায় সভা আরম্ভ হয়। পূর্ণচন্দ্র বাগচি সভাপতি হন। কোলাকুলি করি। তাহার পিতাঠাকুর স্নেহ করিতেন, মাতা ঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া খাইয়াছি। কোনও সঙ্গীত হয় নাই। প্রথমে বিজ্ঞানানন্দ ৬মন্মথনাথ রায়ের (?) বক্তৃতার বলে। পরে আমি বলি। প্রাণদর্শন—দেবতাদের উর্দ্ধশীর্ষ গান, প্রাণের আঘাতে অসুরদের চূর্ণ হওয়া, বিশ্ব মনের স্তর হইতে প্রাণের স্তরের জন্য পাড়ি জমাইয়াছে, আজ বিশ্ব প্রলয়সমুদ্রে জলে নিমগ্ন, নিত্যগোপাল মীনরূপে নূতন দেহ ধারণ করিলেন, জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। মনে যুগপজ্জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয়। প্রাণেই সমন্বয় সম্ভব। নিত্যগোপাল প্রাণের ঠাকুর···। নিত্যগোপাল নূতন অদ্বৈত নূতন দ্বৈত প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। তিনিই নবীন শঙ্কর, নবীন বুদ্ধ, নবীন কপিল, নবীন গৌতম, নবীন কণাদ, নবীন চার্ব্বাক। আজ সকলকে এক পাতে খাওয়াইবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা মনের স্তরের, নিত্যগোপাল প্রাণের স্তর হইতে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপালই 'মধ্যম প্রাণ'। 'একূলে ও কূলে' ইত্যাদি গান। আজিকার বক্তৃতা আমারই খুব ভাল লাগিয়াছে। বাস্তবিকই সুন্দর হইয়াছে। ২।৩ হাজার লোক জমিয়াছিল। একটা সাড়া পড়িয়াছে। এখানে আসিবার পর পার্ব্বতীবাবু, তারিণীবাবু, নীলরতনবাবু প্রভৃতির সামনে আমার জীবনের অনেক কথা, নগেন্দ্রনারায়ণবাবুর স্বপ্ন, ঠাকুরের কৃষ্ণরূপে দর্শন দান, আমার বৃন্দাবন-যাত্রা প্রভৃতি বলি।

২২শে নভেম্বর

...১১টার পর দিয়াড়াপাড়ার মঠে আমরা যাই। সেখানে প্রসাদ পাই ও বিশ্রাম করি। ৩টায় সভা আরম্ভ হয়। নিত্যপ্রকাশানন্দ সভাপতি হন। মেয়েরা··গান গায়। প্রতিভা প্রথমে প্রবন্ধ পাঠ করে। সভাপতি সংক্ষেপ করিতে বলে। একটী মেয়ে বলিতেছে—এই

র সময়ের জন্য বাধা দেওয়া অশোভন। নিত্যধর্মানন্দ, স্বপক্ষ তাকায়, বিজ্ঞানানন্দ বক্তৃতা দেয়। তাহাদিগকেও বা দেয়। তাহার পর আমি বলি। ভগবান শব্দের ধ্যা—ভগ+মতুপ্… ভগবান। শ্রীনিত্যগোপাল-বন বিস্তীর্ণতম গভীরতম—তিনি cosmopoli-n, তাই বিশ্বরূপ। তিনি প্রতি অণুর, প্রতি রমাণুর, প্রতি ধর্মের স্বয়ংমূল্য স্বীকার ও আস্বাদন করেন তাই তিনি বিস্তৃততম, গভীরতম। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনিত্য-পাল। প্রেমে hierarchy নাই। প্রতিটি রস পূর্ণ। প্রতি সাধ্যের সাধনার সম্বন্ধ নিত্যগোপাল য়াছেন। সংসারী সন্ন্যাসীর মধ্যেকার স্পৃশ্যস্পৃশ্য র এখানে অচল। ইতিহাস শুধু ঘটনার বিবরণ নয়, ভূমিকায় ছবি না থাকিলে উহা জীবনী হয় না। াপদ, গোলাপ গয়লানী, বলাই পাল, বিষ্ণুকণ বলি। ানন্দপ্রকাশানন্দ বন্ধ করিতে বলে, অবশ্য হাত জোড় য়া। জীবনে কোনদিন বাধা পায় নাই। সে ার বক্তৃতার সমালোচনা করে। প্রাণতোষের লোচনা করিয়া আমার ভুল দেখাইতে চেষ্টা করে। ধ চলিয়া আসি। যখন বাধা দিয়াছিল তখনই বন্ধ ব ভাবিয়াছিলাম।...একটু আসিয়া বসিলাম। শেষে তারাই উহাকে বসাইয়া দিয়াছে। হাঁটিয়া চলিয়া ম। রাধিকা গোস্বামী নামে এক ভদ্রলোক এই া-লঙ্ঘন সহ্য করিতে না থাকিয়া ছুটিয়া এখানে ন। আমার বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে কেউ সাহস নাই।

২৩শে নভেম্বর

নিত্যগোপাল, তুমি গৌরসুন্দর রূপে 'রাধা' বলিয়া াছিলে। 'মায়া'-স্পর্শ পাইবার জন্য 'দেখা দেও' 'দেখা বলিয়া কাঁদিয়াছিলে, জড়ের মান ভাঙিবার জন্য ধূলিতে লুটাইয়াছিলে, তুমি অধর হইয়া রহিলে, াকে না পাইয়া আছাড় খাইয়া মাটিতে মুখ ঘসিলে, । তো জড়ের মান ভাঙিল না। আজ তুমি আবার গোপাল রূপে আসিলে জড় অজড় সমন্বয় করিতে। ায়াকে না এড়াইয়া, জটিলতাকে বাঁধ না দিয়া, বরং তাহাকে পরিপাক করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদনের রূপ হইতেছে 'রাসলীলা' ....২। টার পূর্বেই বঙ্গবাণীতে রিকসায় যাই। আলোচনা করি। মায়াকে বেদব্যাস দেখিয়া-ছিলেন। মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলেন শ্রীনিত্যগোপাল। মায়া অর্থ কুটিলতা। মায়াই মেয়ে—স্ত্রী অর্থই সংসার, জটিলতা। সহজ সরল জীবনকামীরা তাই মায়াকে অস্বীকার করিয়াছেন। জটিল-কুটিল জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান চাহিলে মায়াকে মানিতে হয়; নর-নারীর সম্পর্ক পরকীয়। স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমই পরকীয়। 'গোপীনাং নয়নোৎপলাঙ্কিততনুঃ' ব্যাখ্যা করি। ...অতিমানস আজ মানসস্তরে অবতীর্ণ। অতিমানসকে মনের স্তরে খুঁজিতে হইবে। তাহার জন্য চাই পরকীয় সম্বন্ধে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করা।...সকালে নিত্যপ্রকাশানন্দ আসিয়া ক্ষমা চায়। কত বড় ভুল সে করিয়াছে তাহা বলি। একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গুরু-প্রশিষ্য মত নিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ আলোচনা করে—ইহা বড়ই অশোভন। আমার সঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা উচিত ছিল। বিপিন পালও বরিশাল কনফারেন্সে আমার অত বড় দীর্ঘ বক্তৃতায় আমাকে বাধা দিতে সাহস পান নাই। যে অপমান আজ নিত্যপ্রকাশানন্দ করিল তাহা জীবনে আমার হয় নাই। তাহাকেও ওখানের লোকেরা বলাইয়া দিয়াছে।...

২৪শে নভেম্বর

নিত্যগোপাল, বন্ধু আমার, প্রতি অণু, প্রতি ব্যক্তি, প্রতি সমাজ, প্রতি জাতির মধ্যে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া 'একবিশ্ব' রচনা কর। আমি তো এই একবিশ্ব রচনার স্বপ্ন লইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। ইহার উপযোগী দর্শন সাহিত্য সবই পাইয়াছি। তোমার কৃপায় স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। নবদ্বীপের মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা আসিয়াছে। ঠাকুর, তুমি উন্মাদ কর। আমাকে উন্মাদ করিবার মত শক্তি দাও, মানুষ যেন উন্মাদ হইয়া তোমার তত্ত্বে আশ্রয় নেয়। গোবিন্দ আসিয়া বলিল, আজ সভা হইবে ৩৷৷ টায় পোড়ামাতলায়। দিন রাত্রি লোক যাতায়াত করিতেছে। সকালেও ৩৷৷ ঘণ্টা আলোচনা হয়।...আমিই সভাপতি, আমিই বক্তা। বিষয়

—নিত্যগোপাল-জীবনালোকে সমাজ-সংগঠন। প্রথম দার্শনিক স্তর মায়ার স্বীকৃতি। কেন না মায়া বহু প্রসবিনী, মায়াই জটিলতা। এ দেশ জটিলতা ছাড়িয়া সরল পথে, বহুকে ছাড়িয়া একের পথের খোঁজ করিয়াছে। সমাজ তাই গড়ে নাই। ইহারা ব্যক্তিগতভাবে একত্র হইয়াছে। সামাজিকভাবে হয় নাই। 'ধ্যানে করবে মনে, বনে, কোণে'। অথচ প্রহ্লাদ বলিতেছেন, 'নৈতান্ কৃপনান্ বিহায়' ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তর—ভাগবত-সমাজে ছোট বড় বিভাগ, hirecrchy থাকিতে পারে না। কোনও বর্ণ-কৌলীন্য, বৃত্তিকৌলীন্য, কর্মকৌলীন্য নাই। ব্রহ্মজীবনের সঙ্গে প্রত্যেকের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তৃতীয় স্তর—যেহি মে পাদপল্লবম্ উদারম্, রন্তিদেবের উপাখ্যান, সুদামার উপাখ্যান। প্রথমেই আরম্ভ কবি গিরিধারীর উপাখ্যানের ভিতর দিয়া। ৯। ঘণ্টার উপর বক্তৃতা দেই। বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিল। আমার নিজেরও খুব ভাল লাগিয়াছে। ইহার পর অমরেশবাবু, লক্ষ্মীবাবু, ধীরেনবাবু, সুরেনবাবু প্রভৃতি অনেকে আসেন। ১টা পর্যন্ত আলোচনা হয়। নবদ্বীপের এই কাটা দিন নূতন অভিযানের সূচনা হউক। বিমলা, সুধাননী গোস্বামী ও নীহারিকা আজ অবধূত আশ্রমে প্রসাদ পায়।···

২৪শে নভেম্বর

নবদ্বীপ হইতে বিদায়

ঠাকুর, এতদিন তোমার কথাই বলিয়াছি, কিন্তু তোমার স্থান হইতে তোমার নামে বলা হয় নাই। তাই কি দানা বাঁধে নাই? তুমি স্বপ্নে বলিয়াছিলে, 'শরৎ মনোহরপুরে এসে থাকুক'। কি ইহার অর্থ? তোমার সৃষ্টি রক্ষা করিবার, তোমার সমাধিস্থলের মর্যাদা রক্ষার ভার কি আমাকে দিতে চাহিয়াছ? আমাকে যোগ্য কর। 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমারে নবীন জীবন-ডোরে'। এই নবদ্বীপেই মাথা তোমার পায়ে রাখিয়াছিলাম।···১১-৪৭ এর গাড়ীতে কলিকাতা যাওয়া স্থির হয়। উহারাই (ধীরেন বাবু, সুরেনবাবু, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতিরাই) গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। অনেকদিন কেহ তুলিয়া দিতে আসেন নাই। কংগ্রেস-জীবনে শতশত মানুষ receive করিত। আজ চোখে জল আসিল। আবার কি সেই প্রাবন আসিবে নিত্যগোপালের নামে? তাহাই হউক। ধীরেন বাবুদের বলিলাম, 'ওরা ঠাকুরের বড় অযত্ন করে···অবধূত আশ্রম ও আপনারা রহিলেন, দেখিবেন'। ধীরেনবাবুর চোখে জল পড়িল, চোখ মুছিলেন। উহারা প্রণাম করিলেন। গাড়ী ছাড়িল। প্রাণটা বেদনাতুর হইল, ছাড়িবার ব্যথা। এক সপ্তাহ নবদ্বীপে চাঁদেরহাটে বসিয়াছিল। সকালে বিকালে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অজস্র লোক। আজ সকালে হরপ্রসাদ, রাধিকা, প্রকাশানন্দ, লক্ষ্মী কত মানুষ আসিয়াছে। ৩-৩৫ এ গাড়ী পৌঁছায়।...তারাপদ বসুমদার ও সুরেনবাবু উজ্জয়ন্তীর টাকা দেয়।···

২৬শে নভেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে নিয়া ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝগড়ি, ঠেলাঠেলি করিয়া কত অনাদর কত অযত্ন করে। আমার তো সাধ হয় তোমাকে আদর করিতে···কি করিব আমি? আমার তো কোন সুযোগ নাই, ধন নাই জন নাই। তোমাকে সিদ্ধ পোড়া খাইতে হয়, পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাইতে হয়? কেহ নাই কম্পান্বিত দু'মুঠো অন্ন দিবার জন্য? যশোদা কি এই জন্যই নিজের হাতে গরুর দুধ দোহাইয়া, নিজ হাতে জাল দিয়া পান করাইতেন? নিজের হাতে সেবা করা ইহারা ভুলিয়া গেল? আপন জনের হাতে খাওয়ার কপাল করিয়া কি তুমি আস নাই? হায় ঠাকুর! উহারা অনেকেই তোমার সন্তান···।... বৈকালে ৪।০ টার পর মঠে যাই। যগেনবাবু, রমাপতিবাবু, নীলরতনবাবু ও ক্ষিতীশবাবুর কাছে নবদ্বীপের সংবাদ আনুপূর্বিক বলি। শেষ দুই দিনের মাইক দিয়া সভার বিজ্ঞাপন প্রচার, মাইক সাহায্যে বক্তৃতা, সতরঞ্চি প্রভৃতির খরচ গোবিন্দ, ধীরেনবাবুরাই বহন করিলেন। উহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তারিণীবাবু কাজ করিলে সব দিক দিয়া সুবিধা হইত।...বন্ধুবাবুকে সরানো যে একেবারে অসম্ভব তাহা আলোচনা হয়।—দ্বিতীয় দিনে পোড়ামাতলার সভায় দিয়াড়াপাড়ার কেহ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে নাই, আমি যখন (?) দিয়াড়াপাড়ার সভা হইতে বেদনা পাইয়া চলিয়া আসি কেহ তো সেখানের—

হারিশবাবু পর্যন্ত—আমার খোঁজ নয় নাই। একটা প্রকাণ্ড ক্লান্ত আমাকে জব্দ করিবার জন্য pre arranged চল। যদুবাবু, ধীরেনবাবু, তারাপদবাবু প্রভৃতি যে শেষের ন পোড়ামাতলায় সভা করিলেন, তাহা হইতেছে য়াড়াপাড়ার মঠে আমার লাঞ্ছনার প্রতিবাদ। ৮ টায় র মঠ হইতে ফিরি। বাহিরের জল মহানির্বাণ মঠে বেশ না করিলে এখানের বিষাক্ত জল বাহির হইবে না। গেনবাবু আজ সকালে মেডিকেল হাসপাতালে যান। লিনা শুক্লিপাড়া মঠে আমার যাইতে ভয় হয়। প্রকাশ ভৃতি আমাকে শাস্তি দিবে, অপমান করিবে।

২৭শে নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার সকল সমস্যার সমাধান হইয়াও জ তুমিই আমার একমাত্র সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছ। মাকে লইয়া আমি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এই দেখ , আমি এখানে নাই—দুই রবিবার কোনও আলোচনা ই হইল না। এখানে থাকিলে বাহিরে হয় না, বাহিরে লে এখানে হয় না। কোথায় তোমার শতবার্ষিকীর ায়নচিত্র? তুমি গণপতি; জনগণ আমার সঙ্গে বলে তোমার মঠ আপনাআপনি ঠিক হইবে। মার সেবাপূজা নিয়াও কিনা এখানে বিশৃঙ্খলা? রা না আছে আচরণে, না আছে প্রচারে। আমার দেও, বুদ্ধি দেও। আমি শরণাগত হইব। আসন ।....জ্ঞানবাবু উকিল আসেন। কালনা মঠের ানন্দ আসে। সে ৩০শে অগ্রহায়ণ নিত্যগৌর-নের জন্ম-উৎসবে ও সেই সময়ে শতবার্ষিকীর উৎসবে াকে যাইতে বলে। আনুপূর্বিক অবস্থা বলিয়া যাইতে মতা জ্ঞাপন করি। 'আমি জীত' বলিয়া হেই।... ার অবস্থা বুঝিতে তাহার কোনও কষ্ট হয় নাই। ঠিক মাসের 'বসুমতী' পত্রিকায় ঠাকুর সম্বন্ধে অচিন্ত্য-র সেনগুপ্ত 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে 'সাধু ধান' ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, বয়স হয়েছে বলেই মনে করো না যে তোমার আর ন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সাধু সাবধান।

নিত্যগোপাল অবধূত হয়েছে। জ্ঞানানন্দ অবধূত। চিত্তাকর্ষ উজ্জ্বল দ্বিতীয় মহেশ। পরণে রক্তবাস, হাতে ত্রিশূল, গলায় নাগযজ্ঞ, করে পানপাত্র, মুখে (?), বনে গৃহে সমানানুরাগ সন্ন্যাসী"। আবার লিখিয়াছেন, "এত উচ্চভূমিতে আছে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা হচ্ছে ঠাকুরের। তুই এসেছিস? অমনি আবার উত্তর দেন নিগূঢ় স্বরে 'আমিও এসেছি' "। দুইয়ের এই 'আসা'র মধ্যে শতদের আসবার কি কোনও অবকাশ রহিয়াছে। যিনি আজ প্রকট নাই, তাঁহাকে লইয়া এই টানাটানির মধ্যে কি কোনও রুচির পরিচয় আছে? ইহা একটা challenge। ইহাকে accept করিতে হইবে। জ্ঞানবাবুসহ মঠ হইতে আসি। মোড় হইতে ১ বসি ১৷৷০ দিয়া কিনি। রেণু পাঠ করে। বড় বেদনা পাইতেছি। ঠাকুর, শক্তি দাও গর্জন করিবার মত।...

২৮শে নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি 'মমাত্মা সর্বভূতাত্মা'—তুমি আমার আত্মা, সর্বভূতের আত্মা। তোমাকে জগন্নাথরূপেই আমি পাইয়াছি। 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ'। তুমি কোন বিশেষ দল গড়িতে আস নাই। সকল দল লইয়াই তোমার এক অখণ্ড দল। বিশ্বময় হইয়া, বিশ্বের সকল দলের সঙ্গে একদেহ, একপ্রাণ একমন হইয়া তোমাকে পাইব। তুমি ব্যষ্টিজীবনে আমার নাথ, পরিবার জীবনে তুমি আমার নাথ, সমাজ জীবনে আমার নাথ, জাতীয় জীবনে আমার নাথ, বিশ্ব জীবনে তুমি আমার নাথ। তুমি সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তোমাকে সেইরূপেই তো পাইয়াছি। তোমার জয় হউক। আসন করি। রেণু সকালে বাহির হইয়া পোস্টাফিসে যায়, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া আনে। আমার বাহির হয় ২৷৷০টার পূর্বে: পথে কুমারের সঙ্গে দেখা। কুমারকে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। তাহার পর আমি নীচে নামি। রেণু সেফ ডিপোজিট, বালন্তী কটন, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক, মেট্রোপলিটান ইনসুরেন্স, পরে যুগান্তর অমৃতবাজার, আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড ও বসুমতীতে নবদ্বীপের সভার বিবরণ দিয়া ৭টায় ফেরে। কুমারের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়। সে আর্থিক অবস্থায় বিব্রত। এখানে আসার

কথা বলে। পীযূষ তার শ্বশুরের বাসায় রাখিলে সে আমার এখানে খাওয়া পাইবে ও মাসিক ৫০ টাকা দিব—ইহা বলিয়া দিলাম। আমার এখানে না থাকিলে তাহার শান্তি আসিবে না। সে এই দুই বৎসর পর্যন্ত একখানি চিঠিও দেয় নাই। আর্থিক অবস্থায় বিব্রত। যুক্ত থাকিলে কিছু কিছু দিতেও তো পারিতাম। নীলুর মেয়ের বিবাহে, তাহার অসুখের সময় যাহা পারিয়াছি দিয়াছি। প্রিয়নাথ মৈত্র (কুমারের পিতা) দেহত্যাগ করিয়াছেন ৬ মাসের উপর। তাহাও তো আমাকে জানায় নাই। মঠে যাই, কার্তিক মাসের মাসিক বসুমতী লইয়া, পাঠ হয়। খগেনবাবু বলেন—উহার মধ্যে তেমন কি আছে? কুমিল্লার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন আমাকে রক্ষা করিলেন। রমাপতিবাবু নীরদতনয়বাবুও পড়েন। যে আক্রমণ কিছুদিন পরে আসিবে ভাবিয়াছিলাম, তাহা অনেক আগে আসিয়াছে। 'যুদ্ধমারম্ অনাবৃতম্'। এইবার নিত্যগোপাল প্রচারিত হইবেন। কুমার কাল আবার আসিবে। অতুল বৈকালে আসিয়াছিল। সকলকেই তো কাছে রাখিতে ইচ্ছা হয়।

২৯শে নভেম্বর

ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তোমাকে, তোমার অবধূত সম্প্রদায়কে সিধাসিধি আক্রমণ করিয়াছেন। এই challege accept করিতেই হইবে। আমি আজ সংগ্রামের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। তুমি আমার সারথি, আমার 'বুদ্ধি'। বলিয়া দিয়াছ, 'তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, ভগবান অন্তর্যামীরূপে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন'। যে যে অস্ত্র উহারা নিক্ষেপ করিবে তাহা ঠেকাইবার মত, তাহা পরিপাক করিবার মত শক্তি-বল-বীর্য তুমি আমাকে দেও। আমি যেন শ্রদ্ধা না হারাই, যাহা ভারতীয় সভ্যতার অবদান। অচিন্ত্যকুমার তোমার উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকেই আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার বুকে শেল বিদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন অন্তিম কলেবর। সেই তোমাকে অচিন্ত্য সেন আঘাত করিয়াছেন ....কুমার ঠাকুরের প্রসাদ পায়। ইহাতে নিশ্চয়ই তাহার মঙ্গল-বায়ের উপবাস ভাঙ্গা যায় নাই ....তারিণীবাবু আসে নাই। এত বাহিরের কাজ নিয়া থাকিলে কি করিয়া ঠাকুরের কাজ হইবে? একটা সভার আয়োজন করিতে যদি এত সময় লাগে, তবে কয়টা সভা করা সম্ভব হইবে? .. এখানের ইহারা কেবল ঘুমাইতেছে। গৌরাঙ্গ কেমন করিয়া নিত্যগোপাল হইলেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত ঘাটিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি। উজ্জয়ন্তারতের বিজ্ঞাপনের বাকী ১৮০০৲ টাকার উপর। কুমারকে তাহার মন নির্মল করিয়া আসিতে বলি। ষোল আনা প্রাণ লইয়া খাটিলে তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব নয়। উজ্জয়ন্তারতের ক্ষেত্র প্রসারিত। যত ইচ্ছা 'অর্থ' কুড়াইয়া লইলেই হয়। উজ্জয়ন্তারতের possibility অনন্ত। শত শত কর্মী হৃদয়বান অসাম্প্রদায়িক মানুষকে provide করা যায়। নীলুর পোষ্ট কার্ড আসে।

৩০শে নভেম্বর

নিত্যগোপাল, আজ যখন ঝড়ের মাঝখানে, যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তোমার সারথিত্বের, তোমার সঙ্গিত্বের প্রয়োজন অধিকতর অনুভূত হইতেছে। চিরদিন তুমি আমার রক্ষা করিয়াছ, আজও করিবে। তবুও ভয় হয়, আমি দুর্বল কি না। তুমিই আমার বল-বুদ্ধি। আমার বুদ্ধি নাই। আমার চতুর্দিকে কি ষড়যন্ত্র চলে তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি ফাঁস করিয়া দিয়াছ। কত জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া তুমি আমাকে কোলে করিয়া আগাইয়া আনিয়াছ, তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। কুমার এখানে আসিতে চায়। ব্রজগোপীগণ 'আজগ্মুঃ'। আনা ভাল নয়, 'আসা'ই তো স্বাধীনভাবে আসা। রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নের কথা—মা বলিলেন, এসেছো'? আমি তো চাই, আসিলেই তো আমার সার্থকতা।

ক্রমশঃ

'জাতীয় সংহতি'

॥ শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ॥

ঐতিহাসিক পটভূমিকা :—

ভারতবর্ষ সম্পর্কিত ধারণার ক্রম বিকাশের ধারা এই ঐতিহাসিক বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীন-কালের ঋষিগণ বিভিন্ন দেশকে বর্ষ আখ্যা দিয়েছিলেন, যথা, ভারতবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ ইত্যাদি। এই সব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল মধ্যস্থিত ভূভাগ। এই সব দেশের আয়তন ও চতুঃসীমা যতখানি কল্পনা-নির্ভর ছিল, ততখানি স্পষ্ট ছিল না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এবং এর আয়তন ও রূপ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রথম একটা চিত্র পাওয়া গেল, রামায়ণের সীতা অন্বেষণের ব্যাপারে। বানর সেনারা পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, বহুদূর পরিভ্রমণ করেছিল এবং মোটামুটি একটা ভৌগলিক সীমানার কথা বলেছিল যাতে দেখা যাবে উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম তিনদিকে পর্বত-মালা ও দক্ষিণে সমুদ্রসীমা। এতকাল পার হয়ে গেছে, ভারতবর্ষ সম্পর্কিত আমাদের ইঙ্গিত সেই প্রাচীনকালের রূপই এখনও রয়ে গেছে।

পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে একটি সর্ব-ভারতীয় রূপ প্রকট হল মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। এই সময়েই, সিন্ধুদেশ থেকে আরম্ভ করে পূর্বদেশের মণিপুর পর্যন্ত রাষ্ট্র, রাজা, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল।

তারপর যতই দিন গেছে সর্বভারতীয় চেতনা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং অনেক রাজা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করে একরাট্ হবার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে একরাট্ হওয়া ছিল প্রাথমিক বিস্তার মাত্র। অধীনতা স্বীকার মাত্রেই তা শেষ হ'ত। শাসন ক্ষমতার বিস্তার ঘটত না। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে কোনো কোনো রাজা চক্রবর্তী হয়েছেন, দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছেন কেউ কেউ, যা উত্তর ভারতে প্রাথমিক বিস্তার করবার স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কখনও।

মুঘল আমলেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত হ'ল একটা বিরাট অংশে এবং একই সম্রাটের অধীনে শাসন ব্যবস্থা চালু হল। কাজেই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে ভারতবর্ষ, তার সূচনা হয়েছে মুঘল আমলেই। হিন্দুরাজারা অল্পস্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। মোঘল রাজত্বের পর ইংরাজ আমলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় ভারতবর্ষের রূপ আরও স্পষ্ট হল, বিস্তৃত এলাকা এক শাসনাধীনে এল,—একই রকম রীতিনীতি, আইনের আওতায় এক সুবিপুল জনগোষ্ঠী একই ধরণের মানসিক পরিমণ্ডলে বাস করতে শুরু করল যা এতকাল কোনো উপায়ে সম্ভব হয়নি।

জাতীয় সংহতি বিধানকারী অন্যান্য শক্তিসমূহ : রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় চেতনা সৃষ্টি হ'তে বহুকাল দেরী হ'লেও অন্যান্য উপায়ে সর্বভারতীয় চেতনা গড়ে উঠেছিল যার অবদান কোনো অংশেই কম নয়। সংক্ষেপে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। ধর্ম ও তীর্থস্থান :—ধর্মীয় কারণে বহুযুগ থেকে বহু সংখ্যক মানুষ তীর্থযাত্রায় বের হ'য়ে সারা ভারত পরি-ভ্রমণ করত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শংকরাচার্যের মত মনীষীরা ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে মন্দির স্থাপন করে গেছেন। এইভাবে সারা ভারতের তীর্থস্থান ভ্রমণকারী নরনারী সর্বভারতীয় একটি অবয়বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করত।

কেদার, বদ্রীনাথ, দ্বারকা, কন্যাকুমারী, পুরী, কামরূপ, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী একই প্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন অংশ হতে সমবেত হয়েছেন যুগ যুগ ধরে। তাদের ভাষা ও জীবনযাপন রীতি পৃথক

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

পৃথক হ'লেও তারা তীর্থক্ষেত্রে একই ধরণের ভাবের প্রেরণায় সমাগত হয়েছেন, ভারত সম্বন্ধে একই ধরণের image গড়ে তুলতে পরস্পরকে সাহায্য করেছেন। রাষ্ট্রশক্তি এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি করে নি।

ধর্মপ্রচারকরাও এই ভাবসংহতি স্থাপনে সাহায্য করেছেন। বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্ম ভারতের মানুষকে একতায় বদ্ধ করেছে—সে একতা রাষ্ট্র-নৈতিক সম্পর্ক-নিরপেক্ষ।

২। লোক-কথা কাহিনী জাতীয় বীরত্ব গাথা :—ধর্ম ও তীর্থস্থান যেমন ভারতের মানুষকে এক ভাবসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছে তেমনি জাতীয় বীরত্ব গাথা ও কাহিনীও বহু মানবের মাঝে অখণ্ড ভাবসংযোগ রচনা করেছে। রামায়ণের কাহিনী একজন বাঙালীর কাছে যে আবেদন এনেছে একজন মারাঠার কাছেও তাই।

অর্জুন, রামের মত জাতীয় বীরের কল্পনা, মনসার কাহিনীর মত লৌকিক দেবীর কাহিনী সারা ভারতবর্ষে সামান্য পার্থক্য ছাড়া মোটামুটি একইভাবে প্রচারিত ঘুরঘুর করে। ফলে ভারতের মানুষ শাসনে এক না হয়েও, রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে একরাজ্য না হয়েও মনের দিক থেকে এক-ভারতীয় হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছে।

(৩) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য :—ভারতবর্ষ সম্পর্কিত যে ভাবরূপ প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিরাজমান, তা হ'ল উত্তর সীমান্ত হিমালয় বেষ্টিত, দক্ষিণ সমুদ্র-বিধৌত মধ্যস্থিত শ্যামলভূমি। এই সুবিশাল দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষীর, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বাস করে, যাদের মধ্যে কোনো বিষয়েই মিল নেই। কিন্তু এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে সর্ব সময় একটি সর্বভারতীয় চেতনা জাগরূক হয়ে আছে—তা হ'ল, আমরা ভারতবাসী, আমাদের ভারতের সীমানা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র, আমাদের জাতীয় বীর রামচন্দ্র, অর্জুন, আমাদের গৃহদেবতা কৃষ্ণ। এইভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবসংগতি ভারতের ঐক্যকে বজায় রাখতে পেরেছে। এই অন্তঃসলিলা শক্তিকে Unity in Diversity বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(৪) ইতিহাস :—ইতিহাসের কাহিনী ও তৎসম্বন্ধে এক ধরণের চেতনা সারা ভারতকে একই অনুপ্রেরণা দিয়েছে। রাজপুতানার রাণা প্রতাপের বীরত্ব গাথা, শিবাজীর কাহিনী ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মানুষের মনে একই ধরণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অথচ ভারত কখনও এক রাজ্যশাসনে ছিল না।

(৫) পরবর্তীকালে ইংরাজ আমলে সর্বত্র একই আইন ও একই শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সর্বভারতীয় চেতনাসম্পন্নকারী রাজনৈতিক মনোভঙ্গী গড়ে উঠতে থাকে এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় তা জোরদার হয়। স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত এই মনোভঙ্গী ভারতকে রাষ্ট্রনৈতিক একতায় বিধৃত রাখতে থাকে। ভারত স্বাধীন হয়, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক একতা সম্ভব হয় না।

জাতীয় সংহতি ও বর্তমান সমস্যা :—বলাই বাহুল্য, এতকাল ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক-নিরপেক্ষভাবে এক ধরণের জাতীয় ভাবসংগতি রক্ষা করে এসেছিল। কিন্তু জাতি হিসাবে ভারতবাসীরা এক হয়ে উঠতে পারেনি—তার দরকারও ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর রাষ্ট্র হিসাবে এবং জাতি হিসাবে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে দাঁড়াতে হচ্ছে তখন সমগ্র ভারত এবং ভারতবাসী এই পরিচয়টাই প্রথম দিতে হচ্ছে। কাজেই আগের তুলনায় জাতীয় সংহতি এখন আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংহতিবিধানকারী শক্তিগুলির উপর এতকাল বিশ্বাস করে থাকা যেত, কিন্তু এখন ভারতের জাতীয় অস্তিত্ব অনেক বেশী পরিমাণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তারপর আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের নূতন করে ভাবতে হচ্ছে জাতীয় সংহতি কি ভাবে আরও দৃঢ় করা যায়। এর জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনার অন্ত নাই। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তার আলোচনা করা হল।

১। ভাষা ও ত্রি-ভাষাসূত্রঃ—ভাষা হিসাবে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠী, দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী ও উপজাতীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠী। ভাষা সংযোগ সাধনের অন্যতম বাহন আবার এত বিচিত্র যে বিভিন্ন ভাষাই ঐক্য বিধানের প্রধান অন্তরায়। তাই এমন একটি নীতি রূপায়ণের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল যার দ্বারা বহুলপরিমাণ ভাষাভাষী ভারতীয়দের মধ্যে একটা সাধারণ সংযোগ মাধ্যম গড়ে উঠতে পারে এবং জাতীয় চেতনা ও রাষ্ট্রনৈতিক একতা রক্ষার পরিপোষক হয়। কিন্তু নানাবিধ কূ মতলবের ফলে তা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি এবং পরিশেষে ত্রি-ভাষা সূত্র অনুমোদিত হয়। এটিও সার্থকরী হয়নি এখনও। বরং বলা যেতে পারে ত্রি-ভাষা সূত্রকে অবলম্বন করে ভারতের প্রাদেশিক সংকীর্ণ মনোভাব আরও প্রকট হয়েছে এবং একতার বদলে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব ক্রমশঃ দৃঢ় হয়েছে।

২। ভারতীয় সংবিধান :—যতখানি ভারত রাষ্ট্রের লাভ তার মধ্যে একই সংবিধান ও সংবিধান অনুমোদিত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে একসূত্রে ভারতকে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে নানাবিধ অসুবিধা শাসকবৃন্দের অক্ষমতার জন্য সর্বত্র তা দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে নি।

৩। শিক্ষা :—ইংরাজ আমলে সারা ভারতে একই ধরণের শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। ফলে সর্বভারতীয় মনসিকতা গঠনে তা অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল। স্বাধীন হবার পর শিক্ষা প্রাদেশিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেও মোটামুটি পূর্বধারা অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা সংস্কারের নামে যেসব নূতন নীতি প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। অনেক সময় জাতীয় পটভূমিকায় সেই সব বিষয় চিন্তাও করা হয় না। ফলে প্রদেশে প্রদেশে অসমতা ও মানের তারতম্য চরমে প্রকট হয়ে উঠবে। একদিকে ভারতের শিক্ষিত গোষ্ঠী একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ও মেজাজ গঠন করতে পেরেছিলেন—তা আর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে কিনা কে জানে।

ভারত সরকার জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগোষ্ঠীর কার্যকলাপে আশংকিত হয়েছেন। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাতীয় সংহতি কিভাবে রক্ষা করা যায় তার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে এবং সরকার কতকগুলি কমিশন নিয়োগ করেন। এই সকল কমিশন নানা অবস্থার পর্যালোচনা করে নানা রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যাতে জাতীয় ভাবসংহতি রক্ষা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে সকলের মধ্যেই একটি মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সকলেই ভেবেছিলেন দেশের শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকবে যার দ্বারা ভাবগত ঐক্য ও ভারতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা রক্ষিত হতে পারে। মুদালিয়র কমিশনে (মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে) বলা হয়েছিল, "Educational System must make its contribution to the development of habit attitudes and qualities of character which will enable its citizen to bear worthily the responsibilities of democratic citizenship and to counteract all those fissiparous tendencies which hinder the emergence of a broad national secular outlook."

কোঠারী কমিশন জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বিধায়ক কতকগুলি পন্থার কথা বলেছেন। সেগুলি নিম্নে দেওয়া হল :—

(ক) কমিশন দেখেছেন বর্তমান ভারতে শিক্ষার সমান সুযোগ নেই। বড়লোকদের ছেলেরা বেশী অর্থের বিনিময়ে ভাল শিক্ষা পায় ও সাধারণ শিশুরা যথার্থ শিক্ষা পায় না। তাতে অনৈক্য ক্রমশঃ বেড়ে এমন দুটি জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যারা পরস্পর নৈকট্য অনুভব করে না। একজন উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশু দেহে মনে যতখানি ভারতীয় তার থেকে বেশী ইউরোপীয়। একজন

নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু দেহে মনে যতখানি ভারতীয় তার থেকে বেশী প্রাদেশিক। শিক্ষা-ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার ছাড়া এই পার্থক্য ঘোচানো অসম্ভব।

(খ) শিক্ষার সর্বস্তরে জাতির সেবামূলক কাজ থাকা দরকার। না হলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠি জাতির সাথে একাত্ম অনুভব করেন না। এর জন্য বহু পন্থার কথা চিন্তা করা হয়েছে এবং সামুদায়িক জীবন যাপন ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভাগে অংশ গ্রহণ করানো যেতে পারে তারও চিন্তা চলেছে। সি. ডি. দেশমুখ কমিটি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট দান করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা এখনও কার্যকরী হয় নাই।

(গ) ভাষার উন্নয়ন :—ভারতের সকল ভাষা সমান উন্নত নয়। ফলে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে আধুনিক শিক্ষা সকল প্রদেশে সমতালে চালানো কঠিন। কমিশন মনে করেছেন, শিক্ষার মান দ্রুত উন্নত করতে হ'লে সর্বাগ্রে সকল ভাষার উন্নতি বিধান দরকার। ভাষা দ্রুত উন্নত হয় পুস্তক প্রকাশের দ্বারা। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নানা ভাষার পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থাও এর জন্য করা হচ্ছে।

(ঘ) জাতীয় চেতনার উদ্বোধন :—এর জন্য কমিশন উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন—

(১) প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন—কমিশন ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক আলোচনা, এক ভাষার সম্পদ অন্য ভাষার সঞ্চারিত করা, এ ছাড়া ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, স্থাপত্য, কলা, সংগীত, নৃত্যনাট্য এগুলির উজ্জীবন, প্রসার ও পুনর্গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাছাড়া শিক্ষক আদান প্রদান, ভ্রমণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের আদান প্রদানের ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন।

(২) ভবিষ্যতে ভারতের প্রতি গৌরবজনক মনোভাব গঠনও এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হবে। ভারতের মহান সংবিধান, ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা মোচনের উদ্যম, যাতে তরুণ মনে আদর্শের ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হবে।

শ্রেণী সংঘর্ষ মানিয়া লইলে অন্যকে হটাইয়া দিয়া গদী দখল করাও সঙ্গে সঙ্গেই মানিয়া লইতে হইবে। অথচ কাহারও যে এই পুরুষোত্তম-বিশ্বে মরণ নাই, প্রত্যেকের বাঁচিয়া থাকাটাই যে বিশ্বের একটা বিরাট সত্য কথা, তাহা শ্রেণীসংঘর্ষবাদী মানিতে পারে নাই। নইলে কি ট্রট্স্কি নির্বাসিত হন? যাহারা ব্যক্তিস্বাধীনতার গর্ব ও দাবী করেন, তাঁহারা দশটি বৎসরও মানুষকে অবাধ চলিবার সুযোগ দিয়া রাজত্ব স্থাপন করিতে পারিলেন না? এ কোন্ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা? ··'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' —As the means, so the end—যাহা সাধন তাহাই পাকিলে সিদ্ধি।···শাসনযন্ত্র 'জীবনবাদে'ই যদি স্থাপিত হইয়া থাকিত, তবে কাহাকেও এমন করিয়া দাবাইয়া শাসন প্রবর্তিত করিবার প্রয়োজনই হইত না।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)

সামাজিক ক্রমবিবর্ত্তন—সমবায়ী গণতন্ত্রের পথে

॥ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ॥

প্রকৃতির নিয়ম।

প্রকৃতি নিয়মের বশে চলে। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য। প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মে কোনো ঘটনা ঘটে না। ই জীব জগতেও যা কিছু ঘটে, সবই কোনো না কোনো য়মের বশে ঘটে। মানুষ এবং মানুষের সমাজও জীব-তেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই বন্য-সমাজেও যা ঘটে, কৃতির নিয়ম অনুসারেই ঘটে।

সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা প্রকৃতির নিয়ম।

প্রত্যেকটি জীব তার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির কাছ কে দুটো বৃত্তি লাভ করেছে—সহযোগিতা ও প্রতি-াগিতা। জীব জগৎ এই দুই সহজাত বৃত্তির বশে পরি-লিত হয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের জীবন-যাত্রা াহ করে।

প্রত্যেক জীবের বেঁচে বর্ত্তে থাকার জন্যে প্রথম দরকার স আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা। দ্বিতীয় দরকার খাদ্য গ্রহ। এই দুই ব্যাপারেই মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব ানতঃ প্রতিযোগিতার পথই প্রশস্ত বলে গ্রহণ করে। ই মহামতি ডারুইন বলেছেন যে জীব-জগতের ক্রম-র্ত্তনে প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হয়েছে। । যে কোনো জীব শুধু আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহ-ই করে তার আর একটা জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে সন্তান উৎপাদন ং সেজন্যে তার সহযোগিতার পথ গ্রহণ না করে উপায় ই। কেন না, সন্তান উৎপাদনের জন্যে প্রকৃতির নিয়মে পুরুষের মিলনের প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে জীব ভাবী রূপে সহযোগিতার পথই গ্রহণ করে। এ ছাড়া া জীবের ভিতরে নানা বিষয়ে কিছু কিছু সহযোগিতার । চলার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন—পিপিলিকারা এক সঙ্গে া বেঁধে থাকে এবং নানা প্রয়োজনে এক সঙ্গে সারিবদ্ধ য় চলে, মৌমাছিরা দলে মিলে এক সঙ্গে বাসা তৈরের করে, তাতে খাদ্য সংগ্রহ করে এনে রাখে, হাতীরা যূথবদ্ধ হয়ে চলে, পাখিরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে উড়ে যায় ও উড়ে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব সহজাত প্রেরণা বশেই সহযোগিতা কিংবা প্রতি-যোগিতার পথ গ্রহণ করে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি নেই বলে গতানুগতিক ভাবেই তারা এ পথে চলে—কোনো রকম-ফের বা অদল-বদল ইচ্ছা মতো করতে পারে না। তাই তারা মানুষের মতো উন্নত ধরণের সমাজ গড়তে পারেনি। কেন না, সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে পরস্পরের ভিতরে সহযোগিতা—নানা বিষয়ের ও অসংখ্য প্রকারের। মানুষের মতো তারা প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতার রকম ফের করতে পারেনি বলে তাদের সমাজেরও উন্নতি অবনতি কিছুই হয়নি। তাদের মধ্যেও এক একটা সমাজ আছে বটে। কিন্তু তা নামে মাত্র সমাজ—সে সমাজ তার আদি রূপ ছাড়িয়ে এক পা-ও অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনার সাহায্যে প্রয়োজন মতো সহযোগিতা কিংবা প্রতিযোগিতার পথ গ্রহণ করে তার সমাজের ক্রমোন্নতি সাধন করে চলেছে। মানুষের সমাজের সেই ক্রমোন্নতির পথে বা বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে চলা আজো অব্যাহতই আছে।

প্রকৃতির সৃষ্টিতে একটা ক্রম বিবর্ত্তনের ধারা বয়ে চলেছে সুদূর অতীত থেকে। জীব-সৃষ্টির পূর্বে এই পৃথিবী ও তার পরিবেশ কোটি কোটি বছরের ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে প্রাণ-সৃষ্টির উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। তারপরে আরো কোটি কোটি বছরের ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে জীব সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। তারপরেও আরো কোটি কোটি বছরের ক্রম-বিবর্ত্তনের পরে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছে। একমাত্র মানুষের বেলায়ই ক্রম-বিবর্ত্তনের

ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ অতিশয় দুর্বল জীব। তার আকৃতিটাও অতিশয় ক্ষুদ্র! তা ছাড়া, আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্যে প্রকৃতি তাকে তার প্রয়োজনীয় কোনো হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র দেয়নি, যা সে অন্যান্য জীবকে দিয়েছে। হাতিয়ারের বদলে প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে বুদ্ধি যা সে অন্যান্য জীবকে দেয়নি। এই বুদ্ধি দিয়েই তাকে আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের উপায় নিজেকে উদ্ভাবন করে নিতে হয়েছে। মানুষ সহজেই তার বুদ্ধি দিয়ে এ কথা বুঝেছে যে একা একা আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহ করার চেয়ে পাঁচ জনে মিলে তা করা অনেক সহজ। তাই সে সব সময়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে এই কাজটা করতো। তাছাড়া বেঁচে বর্তে থাকার জন্যে যে হাতিয়ার দরকার, নিজের বুদ্ধি বলে প্রকৃতির কাছ থেকে মাল মসলা সংগ্রহ করে সে নিজেই তা সৃষ্টি করে নিয়েছে।

মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে যে সমাজ সৃষ্টি করেছে, তার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে স্ত্রী, পুরুষ ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে পরিবার গড়ে উঠেছে সেই পরিবার। এই পরিবারের সৃষ্টি থেকেই মানুষের সমাজের আরম্ভ। পরিবারের সকলে এক সঙ্গে থাকে বলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ভিতরে একটা আপন বোধ গড়ে ওঠে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে সকলে মিলে আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। মানুষের কোনো স্বাভাবিক হাতিয়ার ছিল না বলে সে প্রথম থেকেই বুদ্ধির কৌশলে ও পাঁচ জনের সহযোগিতায় আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভবপর করে তুলেছে।

আপন বোধের গণ্ডি—সমাজ

মানুষ ক্রমে দেখলো যে আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্যে একটা পরিবারের লোক-জনের সহায়তায় যে ফল লাভ হয়, দুইটা, তিনটা, পাঁচটা পরিবারের লোকজনের সহায়তায় তার চাইতে অনেক গুণ বেশী ফল লাভ হয় এবং সহজলভ্যও হয়। তখন মানুষ একাধিক পরিবার মিলে এক একটা গোত্র, এক একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে [illegible] সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। তাদের ভিতরে একটা আপন বোধের গণ্ডি স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে। সমাজ মানেই হয়ে দাঁড়ালো এই আপন বোধের গণ্ডি। সমাজে পরিবারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, এই গণ্ডির পরিসরও ততই বেড়ে চলে। ক্রমে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়ে এক একটা জাতি গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেক জাতির জনসংখ্যার ভিতরে পরস্পরের সম্বন্ধে একটা আপন-বোধও সৃষ্টি হয়।

আপন বোধের গণ্ডির ভিতরে সমাজ-বদ্ধ মানুষের পরস্পরের ভিতরে কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। নইলে সমাজবদ্ধতা থাকে না—সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে পরিমিত পরিমাণে প্রতিযোগিতাও সমাজের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন—খেলায় প্রতিযোগিতার ফলে এক একজন ভাল খেলোয়াড় হয়ে ওঠে—লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতার ফলে কোন কোন বিদ্যার্থী প্রভূত উন্নতি লাভ করে। মনুষ্য সভ্যতার বহু বিষয়ের উৎকর্ষ প্রতিযোগিতার ফলেই অধিগত হয়েছে। তাই সমাজের স্থিতি ও প্রগতির পক্ষে প্রতিযোগিতারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা যতক্ষণ একটা বিধিবদ্ধ বা উভয় পক্ষের স্বীকৃত একটা গণ্ডির সীমানা মেনে চলে, ততক্ষণই তা সুফল প্রদান করে। সীমা ছাড়িয়ে গেলেই প্রতিযোগিতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোনো সমাজেই অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান নেই। অবাধ প্রতিযোগিতার ফল সংঘর্ষ, সংগ্রাম, মারামারি কাটাকাটি, হিংসা। তাই প্রত্যেক সমাজেই প্রতিযোগিতাকে নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়।

সমাজের শাসন শক্তি

সমাজে সহযোগিতা সম্বন্ধে যে নির্দেশ থাকে এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে, তা সকলে সব সময়ে মানতে চায় না। বহু লোকে যদি মানতে না চায়, তবে সমাজে অরাজকতা দেখা দেয়। তার ফলে সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ে। তাই সমাজের স্থিতির জন্যই—তাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই সমাজে এমন

একটা শক্তির কেন্দ্র আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে যায় কিংবা সৃষ্টি করা হয়, যে শক্তির প্রয়োগে অরাজকতা সৃষ্টি-কারীকে—নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্যকারীকে শাসন করা ও নিয়ম মানতে বাধ্য করা সম্ভবপর হয়। পরিবারে সেই শক্তির কেন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে দাঁড়ায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটি। গোষ্ঠীতে তা হচ্ছে গোষ্ঠী পতি। এই শক্তি-কেন্দ্রই কালক্রমে রাষ্ট্রশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা

আপন-বোধের গণ্ডির ভিতরে সহযোগিতার প্রাধান্যই স্বাভাবিক এবং তা-ই হয়ে থাকে। কিন্তু আপন-বোধের গণ্ডির বাইরে অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র অপরিসীম এবং সর্ব-ব্যাপ্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ই এগিয়ে গিয়ে বহু সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ বহু প্রকারের পশু-পক্ষীকে কৌশলে ধরে বা আটকে রেখে গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীতে পরিণত করেছে। তখন নানা প্রকারের এই সব পশু-পক্ষী মানুষের সহযোগিতার সম্পর্কে আসতে অভ্যস্ত হয়েছে। সেই রূপে মানুষের এক গোষ্ঠির সঙ্গে আর এক গোষ্ঠির দেখা সাক্ষাৎ হলেই লড়াই বেঁধেছে। সে লড়াইতে এক পক্ষ জয়ী ও অপর পক্ষ বিজিত হয়েছে। তার পরে যারা বিজিত হয়েছে, তারা অপর পক্ষের ক্রীতদাস হয়ে গেল। তারপর এই ক্রীতদাসেরা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বজায় রেখেই ক্রমে ক্রমে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। এভাবে যারা ছিল সমাজের বাইরে অর্থাৎ অন্য এক পৃথক গণ্ডির লোক—যাদের সঙ্গে ছিল পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়েই এগিয়ে গিয়ে তারা হয়ে উঠলো বিজয়ীদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সঙ্গে গড়ে উঠলো পরিপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক। তার ফলে মানুষের গণ্ডির পরিসর গেল বেড়ে। এই হচ্ছে মানুষের সমাজ ক্রম-বিস্তারের ইতিহাস।

এই ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই ভাবে কিংবা অন্য যে কোন ভাবেই হোক না কেন, বিভিন্ন সামাজিক গণ্ডির ভিতর মানুষ প্রতিযোগিতার পথে চলে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছে এবং এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

সমাজে অসমানতা ও বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ

এই ভাবে সমাজের সংগঠনের ফলে সমাজে নানা শ্রেণীভেদ, অসমানতা ও অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। সমাজে সকল মানুষের মর্যাদা সমান ছিল না, সামাজিক কর্তব্য ও কর্তৃত্বও সমান ছিল না এবং আর্থিক আয়ও সমান ছিল না। তখন মানুষের বৃত্তি অনুসারে জাতি ভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। আর্য সমাজে বৃত্তির ভিত্তির উপরে চতুর্বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। তার পরে, আর্যরা অনার্যদের সংস্রবে আসার পরে আর্য-অনার্যের মিলিত সমাজের বৃত্তি অনুসারে বহু বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন—কামার, কুমার, ধোপা, তাঁতি, গোপ, নাপিত, ছুঁইমালী, বাহার এবং আরো কত কি? প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত লোকের রুজি রোজগারের পথ আলাদা আলাদা এবং এই পথের নামানুসারেই প্রত্যেক বর্ণের নামকরণ। বৃত্তির বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত মানুষের আর্থিক আয়ও বিভিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসের উদ্ভব

মানুষের সমাজের আর এক দিকের ইতিহাসও আছে। তা হচ্ছে ভাবাবেগ ও বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত মানুষের কার্য-কলাপের ইতিহাস। নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মানুষ মোহিত হয়েছে। নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—এ সব কি? বিরাট ঝড় উঠলো। সে ঝড়ে গাছ-পালা ভেঙে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে সব থেমে গেলো। মানুষ ভাবলো—ব্যাপারটা কি হলো। মরুক লাগলো—অল্প সময়ের মধ্যে বহু লোক মারা গেলো। প্লাবন এলো—সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। মানুষ ভাবলো—এ সব কি? এবং কেন এ সব হয়? মানুষের বুদ্ধি ও বিচারের শক্তি আছে বলেই তার মনে এ সব প্রশ্ন জাগে এবং মনে প্রশ্ন জাগলে, সে প্রশ্নের জবাব তার চাই-ই চাই। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সে সোয়াস্তি বোধ করে না। তাই আবশ্যক হলে অনুমানের বলেই সে একটা সম্ভাব্য জবাব খাড়া করবেই। প্রথম যেটা কেবল মাত্র অনুমান, কালে কালে

সেইটেই হয়তো প্রমাণিত সত্য হয়ে দাঁড়ায়, অথবা সেটা ছেড়ে মানুষ অধিকতর যুক্তিসহ আর একটা অনুমান উদ্ভাবন করে।

ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়লো। মানুষ ভাবলো—"আমি আমার নিজের শক্তিতে ছোট্ট একটা গাছের ডাল ভাঙতে পারি। কিন্তু এত বড় গাছটা তো ভাঙতে পারিনে। যে ভাঙলো, তার শক্তি আমার শক্তির চেয়ে কত বড়। এই শক্তিমান ব্যক্তিটি যে কে, তাও সে জানে না। প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে তার মনে হলো—এ সব এক একটা বিরাট বিপুল অজানা শক্তির খেলা।

বহু দেবতার উদ্ভব ও পূজা-অর্চনা

তার পরে তার মনে আবার চিন্তা এলো—এই সব শক্তি কি শুধু তার ক্ষতি সাধনের জন্যেই ওত পেতে থাকে, না ইচ্ছা করলে, তার মঙ্গল সাধনও করতে পারে? সে মনে মনে বিচার করে বুঝলো—একজন শক্তিমান মানুষকে তো খোসামোদ করে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করা যায়। তবে এই শক্তি নিচয়কেই বা পারা যাবে না কেন? নিশ্চয়ই পারা যাবে। এই ভাবনা থেকে স্তব-স্তুতির প্রথা সুরু হয়ে গেল। ক্রমে বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন স্তব-স্তুতির সৃষ্টি হ'তে লাগলো। লোকের মনের ভাবটা দাঁড়ালো এই যে, এই শক্তিগুলি স্তব-স্তুতিতে খুসি হলে স্তুতি-কারকের মঙ্গল বিধান করবে। কিন্তু খুসি করতে চেষ্টা না করলে, কিংবা খুসি করতে না পারলে তারা অনিষ্ট সাধন করবে। তার মানে—এরা এক একটি দেবতা বলে গৃহীত হ'লো। তা থেকে ক্রমে নানা রকমের পূজা, অর্চনা, মন্ত্র, তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, দেব-স্থান, দেব-মন্দির এবং আনুসঙ্গিক আরো কত আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হলো।

ঈশ্বর-বিশ্বাস

এই ভাবে ক্রমে অসংখ্য দেবতা এসে ভিড় করে দাঁড়ালো মানুষের পূজা-অর্চনা পাওয়ার জন্যে। তখন মানুষের এ-ও একটা সমস্যা যে এত দেবতাকে খুসি করে বা খুসি রেখে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা কি সম্ভবপর? কোনো একটি দেবতা যদি কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হন্, তবে তিনিই তো আমার সর্বনাশ সাধন করবেন। এই সমস্যার প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে কোনো এক মনীষীর মনে এই প্রতীতি জন্মালো যে এই সব দেবতা আসলে এক দেবতারই অংশ বিশেষ এবং তার শক্তিতেই শক্তিমান। সে দেবতার নাম দেওয়া হলো—ঈশ্বর। তার মনে যে দেবতাকেই পূজা করি না কেন, তাতে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। এই ভাবে মানুষ তার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলো। এই ভাবনার তার মনে দোসরাতি এলো যে, ঈশ্বরের পূজা মানেই যে কোনো দেবতার পূজা এবং যে কোনো দেবতার পূজা মানেই ঈশ্বরের পূজা।

সোঽহম্ অস্মি

তখনো কিন্তু এ বিষয়ে মানুষের সব প্রশ্নের মীমাংসা হলো না। আবার তার মনে নূতন প্রশ্ন জাগলো—"আমিই বা কে, আর ঈশ্বরই বা কে? ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই বা কি? এই প্রশ্নের জবাব ভাবতে ভাবতে কোনো এক মহাপুরুষ বললেন—"আমি আর সে ভিন্ন নয়—আমিই সে।" বহু দেবতা-বাদ থেকে আরম্ভ করে "সোঽহম্-বাদ" বা ব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসের প্রথম পর্য্যায় হিসেবে গণ্য করা যায়। তখন মানুষ এক বা একাধিক অজানা অচেনা অতি বিপুল অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস ও সে বিশ্বাসের আনুসঙ্গিক ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈনন্দিন কাজকর্মের ভিতর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে।

ধর্মমতের উদ্ভব

এই অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানা দেশে নানা যুগে নানা ধর্ম-মত গড়ে উঠেছে এবং অবিচলিত চিত্তে মানুষ এই ধর্মের নির্দেশ মেনে চলেছে। যে কোনো ধর্মের যে কোনো নির্দেশ প্রধানতঃ সমাজ-স্থিতির সহায়ক হয়েছে এবং মানুষকে সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বোধ

মানুষের ঈশ্বর-ভাবনা থেকে বহু নূতন নূতন চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছে। মানুষ ভাবলো—প্রকৃতির সব শক্তির পিছনে যদি এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে তো এ-ও স্বীকার করতে হয় যে—সমগ্র সৃষ্টির মূলেই

ঈশ্বর—তিনিই তো সৃষ্টি-কর্তা—আমাদের সবাইকে তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তার মানে—মানুষ আমরা সবাই তো ভাই ভাই—এক ঈশ্বরের সন্তান। এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বোধ মানুষ পেয়েছে সমাজ-সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই। কিন্তু আজো এই বোধটা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। আপন বোধের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব-বোধের উন্মেষ খানিকটা হ'য়ে থাকলেও, বিশ্ব-মানবের ক্ষেত্রে এই ভাবের প্রতিফলন কিছুমাত্র হয়েছে বলেও মনে করা যায় না। আমরা এই লেখায় এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাই যে মনুষ্য-সমাজের ক্রম বিবর্তন মানুষের মধ্যে এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-বোধটাকেই কার্যকরীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে এগিয়ে চলেছে।

ক্রম-বিবর্তনে সমাজের ক্রম-প্রসার

সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ নিজেই তার সমাজ গড়ে তোলে। সমাজ টিকে থাকা ও তার শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে তিন রকমের তিন শক্তি কার্যকর বলা যায়। তার প্রাথমিক বাঁধন রজ্জু বা শক্তি হলো—সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত জন-গণের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে আপন-বোধ। দ্বিতীয় রজ্জু বা শক্তি হ'লো—সমাজের মুষ্টিমেয়ের শাসন বা রাষ্ট্রের শাসন। এই শক্তির কাজ হচ্ছে—যে-মানুষ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে না কিংবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার নিয়ম মানে না, তাকে সায়েস্তা করা। তৃতীয় শক্তি হলো—অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধর্মের শাসন। এই শক্তি পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে তার সমাজের অন্যান্য লোক-জনের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলতে বাধ্য করে। এই শক্তি রাজ-স্থিতির পক্ষে যতটা সহায়ক হয়েছে, ততটা আর কোনোটাই নয়। কেন না, বিশ্বাস যুক্তির ধার ধারে না। কোনো কারণে যদি একটা বিশ্বাস মনে স্থান পায়, তবে মানুষ নির্বিচারে অন্ধের মতো সেই বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করে চলে। ধর্ম-বিশ্বাস মানুষকে তার সহজাত পাশবিক বৃত্তিগুলোকে সংযমের নিগড়ে শক্ত করে বেঁধে অপর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে বাধ্য করেছে।

গোত্র, গোষ্ঠী, জাতির উদ্ভব

মানুষে মানুষে আপন-বোধ, সমাজের শাসন এবং ধর্মের শাসন—এই ত্রিবিধ শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মানুষ যে-সমাজ গড়ে তুলেছে, সেই সমাজ এক পরিবার থেকে আরম্ভ করে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক পরিবারের যোগ হতে হতে ক্রম-বিবর্তনের পথ ধরে একে একে গোত্র, গোষ্ঠী ও জাতিতে (নেশন) পরিণত হয়েছে। তার মানে আপন বোধের গণ্ডি যে সমাজ, সে সমাজের পরিসর আকারে ক্রমে বেড়েই চলেছে। বর্তমানকালে এক নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার অন্তর্গত খণ্ডে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে এক একটা জাতি বা নেশন গড়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীতে ছোট বড় এরূপ বহু নেশন আছে। চীন ষাট কোটি লোকের নেশন। ভারতও ৫০ কোটি লোকের নেশন। এত বেশী লোকের নেশনেও লোকজনের ভিতরে একাত্ম-বোধ বা আপনবোধ আছে, বহু বিষয়ে পরস্পরের ভিতরে সহযোগিতা আছে—প্রতিযোগিতা যে ক্ষেত্রে একান্তই অনিবার্য অথবা প্রয়োজনে অভিপ্রেত, সেখানেও একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধন সবাইকেই মেনে চলতে হচ্ছে। এই বন্ধন যারা মানতে চায় না কিংবা অন্য প্রকারে অসামাজিক কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সে প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করে ঠিক পথে চালাবার জন্যে রাষ্ট্রের শাসন, কোথাও বা ধর্মের শাসন কাজ করে চলেছে।

ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব

ইউরোপে অদ্যদিন ধর্মের শাসন ও রাষ্ট্রের শাসন একই হাতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-যাজক মহামান্য পোপের হাতে সংরক্ষিত ও কেন্দ্রীকৃত ছিল। নানা দিক দিয়ে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের প্রত্যেক দেশ এক এক করে পোপের শাসন অস্বীকার করে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং সে সব দেশের অধিবাসীবৃন্দ এক-জাতীয়তা বোধের ভিত্তিতে নিজদিগকে এক জাতি বা নেশন হিসেবে ঘোষণা করেছে। এইভাবে ইউরোপেই প্রথম নেশন বোধ বা জাতীয়তা বোধের উদ্ভব হয়েছে। এর পূর্বে জাতীয়তা বোধ বলে বস্তু কোথাও ছিল না। তার পর ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এশিয়া, আফ্রিকা,

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশগুলিতেও এরূপ নেশনের সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা

এরূপে জাতীয় রাষ্ট্র বা নেশন-রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই চলছে নেশনে নেশনে প্রতিযোগিতা। তার ফলে যুদ্ধ বেধে যায় এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক রাষ্ট্রের। যুদ্ধ চিরকাল চলে না। এক পক্ষ জয়লাভ করে, অপর পক্ষ পরাজিত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি হয় এবং সন্ধির সর্ত অনুসারে উভয়ের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন অন্ততঃ বজায় থাকে। তার মানে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়েই নেশনে নেশনে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো নেশনে নেশনে বোঝা-পড়া হয়—সমঝোতা হয়। তার মানে নেশনে নেশনে যে একটা স্বাভাবিক অবাধ প্রতিযোগিতার সম্পর্ক আছে, সেটাকে বোঝা-পড়ার মাধ্যমে একটা নিয়মের শৃঙ্খলায় বেঁধে দেবার চেষ্টা হয়। সব নেশন সমান নয় এবং যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্যও সকলের সমান নয়। বড় বড় নেশনগুলির শক্তি-সামর্থ্য বেশী এবং তাদের ভিতরে প্রতিযোগিতাও তীব্রতর। প্রতিযোগিতার ফলে দুটো বড় নেশনের ভিতরে যখন যুদ্ধ বাঁধে, তখন সে সব যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণটাও বিপুল আকৃতি ধারণ করে। এরূপ যুদ্ধ কেবল এক নেশনের সঙ্গে আর এক নেশনের হয় না, উভয় পক্ষেই একাধিক নেশন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার ফলে হয়তো একটা বিশ্ব-যুদ্ধই বেধে যায়। ইতিমধ্যে দুই দুইটা বিশ্ব-যুদ্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধের যেমন আরম্ভ আছে, তেমন তার শেষও আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ী বিজিত নেশনগুলি এক যোগে মিলে "লীগ অব্ নেশনস্" (আন্তর্জাতিক সংঘ) গড়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল—এই লীগ্ বা সংঘ বিভিন্ন নেশনের ভিতরে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে এনে, তাদের ভিতরে যুদ্ধবিগ্রহ যাতে আর না হয়, তার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু এই লীগকে দিয়ে সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি বলে দ্বিতীয় বার বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। এই যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী প্রায় সব দেশেরই বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। এই যুদ্ধের পরে আবার একটা সম্মিলিত আন্তর্জাতিক সংস্থা (U.N.O.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববর্তী লিগ বা সংঘের মতো এই সংস্থারও উদ্দেশ্য একই—নেশনে নেশনে বোঝা-পড়ার মাধ্যমে পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বিগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি যাতে আর না হয়, তার ব্যবস্থা করা। বর্তমানে এই সংস্থা বেশ কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে, বলা যায়। যেখানেই যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেখানেই এই সংস্থা তৎপর হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছে। এই সংস্থা শুধু যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে তা-ই নয়—নেশনে নেশনে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও বিষয় যাতে ক্রমেই বিস্তার লাভ করে, তার জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা করে চলেছে (unesco) এবং ক্রমেই অধিকতর সফলতা লাভ করছে। এই ভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে এই সম্মিলিত আন্তর্জাতিক সংস্থা একদিন হয়তো বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত হবে। তার মানে সমস্ত বিশ্বের মানব সমষ্টিকে নিয়েই একটা আপন বোধের সমাজ গড়ে উঠবে। তাদের মধ্যে সর্ব ব্যাপারেই সহযোগিতা সম্পর্ক বিস্তার লাভ করবে এবং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। প্রতিযোগিতা যে সব ব্যাপারে অপরিহার্য, সেখানেও নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়েই সে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে। সমস্ত বিশ্বমানবকে নিয়ে যদি এই ভাবে সহযোগিতা বা সমবায়ের ভিত্তিতে এক সমাজ গড়ে ওঠে, তবে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হবে। তখনই সমস্ত বিশ্বে বিশ্বে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে। সমাজ-সৃষ্টির সূচনা কালেই ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মনোভাব মানুষের মনে উদয় হয়েছিল, তখনই মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় তারই পূর্ণ প্রতিফলন সংসাধিত হবে। এই অবস্থা কবে হবে, তা বলা সম্ভপর নয়। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের ক্রম-বিবর্তনের গতি যে এই পরিণতির অভিমুখে, তাতে কোনো সংশয়ের হেতু নেই।

এতক্ষণ যা বলেছি, তার মোট কথাটা এই:—

মানুষ তার প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করেছে। আপন

বোধের গণ্ডীই হচ্ছে সমাজ। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই গণ্ডী ক্রমে বিস্তৃততর হতে হতে চলেছে। পরিবারের গণ্ডী ক্রমে গোত্র, গোষ্ঠীর ভিতর দিয়ে নেশনের গণ্ডীতে গিয়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংঘের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত নেশনগুলিকে এক গণ্ডীর ভিতরে সংঘবদ্ধ করে এক সমাজ গড়ে তুলবার চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা সফল হলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ লোপ পাবে—পূর্ণ অহিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সমাজের ক্রম-বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই ক্রম-বিবর্তনের গতি কোন্ পথে—কোন্ পরিণতির অভিমুখে, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমাজের ক্রম-বিবর্তনের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝবার চেষ্টা করলে বর্তমানে ক্রম-বিবর্তন কোথায় এসে পৌঁছেছে।

মানুষের সমাজে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন চলেছে, সে পরিবর্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে আমরা বুঝতে পারি য, এই পরিবর্তন এলোমেলো ভাবে হয় না—একটা ধারায় চা হয়ে থাকে। সে ধারাটা হচ্ছে—ডায়েলেক্‌টিক্‌স্-এর ারা—থিসিস্ এণ্টিথেসিস্ ও সিনথেসিস্-এর ধারা ('হাঁ' 'না', । সমন্বয়ের ধারা)। ইতিহাসের দিক থেকে বিবর্তনের তনটি পর্য্যায় বা যুগ-ও বলা যায়। মানুষের সমাজ-সৃষ্টির াল থেকে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত বিবর্তনশীল মানব সমাজের যে ইতিহাস, তার তনাবলী আমরা একটা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে রতে পারি। এই পর্য্যায়ের যে সমাজ সে সমাজকে আমরা রতে পারি—এক বা একাধিক অজানা, অপার্থিব অতীন্দ্রিয় শক্তির উপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত মাজ। ভূত প্রেত বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে বহু দেবতায় শ্বাস, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং 'লোহহম্' তত্ত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত ই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বৈষয়িক দিক থেকে এই র্য্যায়কে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের পর্য্যায় বলা যায় Feudal Age)। এই পর্য্যায়ে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী ভৃতি নামধেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ পরস্পরের ভিতরে প্রতি-াগিতার পথে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ক্রমেই অধিক সংখ্যক মানুষের সমাজ গড়ে তুলেছে এবং এই সমাজ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ নিয়ে এক একটা জাতি (Nation) হয়ে উঠেছে। এই ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিতর দিয়ে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর সমাজ গড়ে ওঠার ফলে এক একটা সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজে এই শ্রেণীগুলি মর্য্যাদায় এক নয়, এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেও এক নয়। তার ফলে সমাজে নানা রকমের অসমতা ও অসামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই অসমতা ও অসামঞ্জস্য নিয়েই সমাজ ক্রম-বিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়েছে এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সমাজে পরিণতি লাভ করেছে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আরম্ভ। এই পর্য্যায়ের সমাজকে বলা যায় বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি-বিচারের উপরে নির্ভরশীল সমাজ অথবা বৈজ্ঞানিক মনো-ভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজ। এই পর্য্যায়ে সমাজে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক এবং জাতীয়তা-বাদী গণ-তান্ত্রিক রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে।

এই দুই পর্য্যায়ের সমাজ প্রকৃত পক্ষে, দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজ—একটা আর একটার বিপরীতধর্মী বলা চলে। প্রথমটাকে যদি বলি—ধর্ম বিশ্বাসের যুগ, তবে দ্বিতীয়টাকে বলবো—ধর্ম-বিশ্বাস উড়িয়ে দেওয়ার যুগ। প্রথমটাকে যদি বলি—হস্ত শিল্প ও স্বল্প পরিমাণ বস্তু উৎপাদনের যুগ, তবে দ্বিতীয়টাকে বলবো—কল-কারখানার সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের যুগ। প্রথমটাকে যদি বলি—সামন্ত-তান্ত্রিক যুগ, তবে দ্বিতীয়টাকে বলবো—গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও ধন-তান্ত্রিক অর্থনীতির যুগ। প্রথমটাকে যদি বলি—ডায়েলেকটিক্‌স-এর ভাষায় থিসিস্ (Thesis—'হাঁ-এর পর্য্যায়), তবে দ্বিতীয়টাকে বলবো—এন্টিথিসিস্ (Anti Thesis—'না' এর পর্য্যায়)।

আমাদের আলোচনায় এই কথাটাই আমরা পরিস্ফুট করে তুলতে চাই যে সামাজিক ক্রম-বিবর্তন ঘটে দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ধারা অনুসারে। প্রথমে থিসিস্, তারপরে এণ্টি-থিসিস্ এবং তার পরে সিন্-থিসিস্ এবং এই তিনের পর্য্যায় বার বার ঘুরে ঘুরে আসে—এই হলো দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ধারা।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে ফরাসী বিপ্লবের সময় সমাজের প্রথম পর্য্যায়—যাকে বলা হয়েছে থিসিসের পর্য্যায়, তার শেষে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আরম্ভ এন্টি-থিসিস্ হিসেবে। এই পর্য্যায়টাই এখনো চলছে। তবে এ পর্য্যায়টাও প্রায় তার শেষ পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। এই ধারার যে বৈশিষ্ট্য ধন-তন্ত্রের অর্থনীতি এবং জাতীয়তাবাদের রাজনীতি—এই দুই বৈশিষ্ট্যই প্রায় অবলুপ্তির পথে। ধন-তন্ত্রের নৈতিক সমর্থক আজ আর দুনিয়ায় একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা—এক-গোঁয়া জাতীয়তাবাদের সমর্থক কেউ আর কোথাও নেই।

তাই একথা বলা যায় যে দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের নিয়মানুসারে এর পরে আসছে সিন্-থেসিস্ বা সমন্বয়ের পর্য্যায়। পরে ইতিহাসের আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো যে বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এই সমন্বয়ের পর্য্যায়টা রূপায়িত হয়ে উঠবার আয়োজন চলছে—আয়োজন চলছে ধন-তন্ত্রের জায়গায় সমবায়ের অর্থনীতি, জাতীয়তাবাদের জায়গায় সমবায়ী রাজনীতি ও সমবায় দর্শন (মানবতাবাদ)—এই অর্থনীতি রাজনীতি ও দর্শনের সমন্বয় গড়ে তুলবার।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে যে সামাজিক ক্রম বিবর্ত্তনেও এই ডায়েলেক্‌টিক্‌স্-এর ধারা অবলম্বনের হেতু কি? তার জবাব হচ্ছে—মানুষের সমাজ মানুষ নিয়েই সৃষ্টি করে। তার মনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে করতে সে সমাজের রূপান্তর সাধনও সম্ভবপর করে তোলে। মানুষের যে মন এই কাজটা করে সেই মনটাই ডায়েলেক্‌টিক্‌স্-এর ধারা অনুসরণ করে চলে। মনের বৃত্তি ত্রিবিধ—ভাব বা অনুভূতি (feeling), যুক্তি বিচার (thinking) এবং কর্ম প্রবৃত্তি (willing)। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফতে মানুষের মনে অনুভূতির উদয় হয়। অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের ভেতরে কর্ম-প্রবৃত্তি হয় না। মানুষের মনে অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উদয় হয় এবং বিচার বিবেচনার পরে কর্ম-প্রবৃত্তি জাগে। তার মানে মানুষের মনের অনুভূতি হচ্ছে থিসিস্, তারপরে মানুষের মনে চিন্তাটা আসে এন্টি থিসিস্ হিসেবে এবং তারপরে এই দুইয়ের সমন্বয় [illegible]

কোনো পশু খাবার দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে—অন্য কেউ লাঠির ভয় দেখিয়ে বাধা না দিলে সে খাবে না। কিন্তু মানুষ রসগোল্লা দেখে লোভের বশবর্ত্তী হলেও তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াবে না। সে ভাববে—পকেটে পয়সা আছে কি না, এখন খাওয়া উচিত কি না, কেউ দেখছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ চিন্তা-বিচার করে তবে স্থির করবে—সে খাবে কি না। মানুষের মনটা ডায়েলেক্‌টিক্‌স্-এর ধারায় চলে বলে প্রকৃতির নিয়মেই সমগ্র মানব সমাজের মোট প্রচেষ্টার ফল এই ডায়েলেক্‌টিক্‌স্-এর ধারায় রূপ পরিগ্রহ করে।

সামাজিক ক্রম-বিবর্ত্তনে সমগ্র মানব জাতির মন কি ভাবে এক সঙ্গে কাজ করে—এ প্রশ্নও স্বাভাবিক এবং তার জবাব দেওয়াও প্রয়োজন। মানুষ তার জীবন-যাত্রার প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বাস করে এবং সর্ব্বদা ছোট বড় নানা ব্যাপারে নানা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে এগিয়ে চলে। কোনো মহাপুরুষ বা কোনো মনীষী ব্যক্তি হয়তো কোনো একটা প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হন। তাঁর মনে চিন্তা আসে—সে সমস্যার সমাধান কি? এই চিন্তা থেকে তাঁর মনে সমাধানের এক পরিকল্পনার উদয় হয়। সে তখন সেই পরিকল্পনা প্রকাশ্যে প্রচার করে। কিছু লোক তাঁর পরিকল্পনার যুক্তিযুক্ততা বা সমীচীনতা স্বীকার করে তদনুসারে কাজে প্রবৃত্ত হয়। কিছু লোক আবার নানা কারণে বিরুদ্ধবাদী হয়ে দাঁড়ায়। তারা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে হয়তো বলে যে এরূপ ক্ষেত্রে এই মত খাটেনা। তখন যারা পরিকল্পনার পক্ষপাতী, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলে যে, পরিকল্পনার এই অংশের অর্থ যদি এইরূপ মনে করা যায়, তাহলে আর সে আপত্তির কারণ থাকে না। এই ভাবে সে পরিকল্পনায় কিছু নূতন অর্থ জুড়ে দেওয়া হয়। তার মানে বিরুদ্ধতার ফলে পরিকল্পনার সম্প্রসারণ হয় এবং তাতে করে পরিকল্পনা সমস্যা সমাধানের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়। পরিকল্পনা যত বেশী সমস্যা সমাধানের উপযোগী হয়ে ওঠে, ততই বেশী সংখ্যক লোক তার পক্ষপাতী হয়ে কাজে [illegible]

তাড়াতাড়ি সে পরিবর্তনে সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়। তাই বলা যায় যে সমাজের প্রত্যেকটি লোক পরিবর্তনের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে থেকে (positively or negatively) সামাজিক ক্রম-বিবর্তনের ধারায় অংশ গ্রহণ করে। এই ভাবে সামাজিক ক্রম-বিবর্তনে সব মানুষের মন এক যোগে কাজ করে।

এখন আমরা আবার ইতিহাসের আলোচনায় ফিরে যেতে চাই। ইতিপূর্বে মনুষ্য-সমাজের ক্রম-বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে আমরা বলেছি যে ক্রম-বিবর্তনের প্রথম ধাপ বা প্রথম যুগ হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এবং ফরাসী বিপ্লবের সূচনা থেকে সে যুগের শেষ এবং দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভ। এই দ্বিতীয় যুগটা হচ্ছে—ব্যক্তি স্বাধীনতা-বাদী ধনতন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগ।

এই যুগে সমাজের ক্রম-বিবর্তনের দিক পরিবর্তনের কথা দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে অসমতা ও অসামঞ্জস্য নিয়েই সমাজ গতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের থেকে এই অসমতা ও অসামঞ্জস্য দূর করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে সমতা প্রতিষ্ঠার দিকেই মানুষের প্রকারের প্রচেষ্টা প্রবহমান দেখা যায় এবং তার ফলে সমাজের ক্রম-বিবর্তনও সেই পথেই এগিয়ে যাবে বোঝা যায়। রুশো ও ভলটেয়ারের ব্যাপক প্রচার ও তুমুল আন্দোলনের ফলে মানুষের মনে যে স্বাধীন চিন্তা ও সব মানুষের সম-মর্যাদার ভাবনা উদ্ভূত হয়েছে, তা থেকেই প্রেরণা লাভ করে ফরাসী বিপ্লবের জন্ম হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের ফলেই প্রথম মানুষের মনে গণ-তন্ত্রের আদর্শ স্থান লাভ করেছে। গণতন্ত্র মানে সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্র-ক্ষমতা রাজা-মহারাজাদের করায়ত্ত ছিল, তা জনগণের করায়ত্ত হওয়া। অর্থাৎ জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন।

এই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হলো—জনগণের গভর্নমেন্ট, জনগণের দ্বারা পরিচালিত গভর্নমেন্ট এবং জনগণের জন্য পরিচালিত গভর্নমেন্ট (Goverment of the people, for the people and by the people)।

বহু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্রের রূপায়ন এখনো কোথাও হয়নি। গণতন্ত্র এ পর্যন্ত সত্যিকার যে রূপ নিয়েছে, তা হচ্ছে—জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রতিনিধিগণের দ্বারা পরিচালিত গভর্নমেন্ট। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিগণ যাতে এক যোগে কাজ করতে পারে, সেজন্যে দল গঠনের প্রয়োজন হয়। সে দল নির্বাচনের সুবিধার জন্যে নির্বাচনের পূর্বেই গঠিত হয় এবং বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। ক্রমে অসংখ্য দল-উপদল গজিয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় কখনো একাধিক দল মিলে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এই একাধিক দলই সকলে মিলে সরকার গঠন করে। ক্রমে দলই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। দল মানে উপরি স্তরের কয়েকটি নেতা। এই নেতারাই যা খুশি তা-ই করে চলে। দলের সাধারণ মেম্বারদের বিশেষ কোনো ক্ষমতাই থাকে না। ভোটারদের হাতে ক্ষমতা আসা তো দূরের কথা—ভোটের পরে তাদের আর কেউ ডেকেও জিজ্ঞেস করে না। দেশের কোনো সমস্যা নিয়েই ভোটারদের মাথা খাটাবার বা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাই কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক মত দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

তা ছাড়া, আর দিনের মধ্যেই দেখা গেল—ভোটের ব্যাপারটা প্রকৃত পক্ষে টাকার খেলা হয়ে দাঁড়ায়। ভোট যুদ্ধে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আসে কোথা থেকে? যাদের টাকা আছে, তাদের কাছ থেকেই আসে। অর্থাৎ ধনিকদের কাছ থেকে। যারা টাকা দেয় রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যায়। তার মানে ধনিক শ্রেণী সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে ওঠে। জনগণ যে তিমিরে, সে তিমিরেই থেকে যায়।

এই সমস্যা সমাধানের কথা ভেবে মনীষীগণ এই সিদ্ধান্তে এলেন যে প্রথমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে না এলে, রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে না। তার মানে—আর্থিক

দিক থেকে জনগণ সমাজের অন্যান্য সকলের সমকক্ষ হয়ে না উঠলে, জনগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই যে, জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে কেমন করে?

কেউ কেউ বললেন—সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, অর্থাৎ সমাজই যদি সে-গুলির মালিক হয়ে দাঁড়ায়, তবেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তখন সমগ্র জাতীয় আয়টাই রাষ্ট্রের হাতে আসবে—কোনো ব্যক্তি-বিশেষ কিংবা কোনো শ্রেণী-বিশেষের ভাণ্ডারে জমা হবে না। তারা এই ব্যবস্থার নাম দিলেন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।

কার্ল মার্কস বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা দরকার। বর্তমানে রাষ্ট্রের সর্ববিধ কর্তৃত্ব ধনিকদের করায়ত্ত। তারা এমন কাজ করতে রাজি হবে কেন, যাতে তাদের হাতে কোনো কর্তৃত্বই থাকবে না? সহজেই বোঝা যায় যে তারা রাজি হবে না। ক্ষমতা তাদের হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। তা পারে একমাত্র শ্রমিকরা। শ্রমিকরা কাজ করে বলেই তো ধনিকদের মনোৎপাদন সম্ভবপর। তারা কাজ বন্ধ করলেই ধনিকদের মনোৎপাদনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করলে তাদের রুজি রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে তাদেরও উপোষ করে মরতে হবে। কাজেই শ্রমিকরা খেতে পারবে না। সে পথের পরিবর্তে কার্ল মার্কস্ যে পথের কথা বললেন, তা এই :—

প্রথমে এই ধ্বনি বা স্লোগান তুলতে হবে যে বর্তমানে সমাজে যে ধনিক-রাজ চলছে, তার জায়গায় আমরা মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠিত করবো। কেমন করে তা করা যাবে? সব দেশের সব মজদুর মিলে মিশে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেই তা হতে পারে। শ্রমিকদের মিলিত সমর্থনের উপরে ভরসা করে প্রত্যেক দেশে একটা করে শ্রমিকদের রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হবে। তার নাম হবে কমিউনিষ্ট পার্টি। এই দল এক এক দেশে সুযোগ বুঝে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়ে তুলে সে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করবে। তারপর সেই সিদ্ধ সিদ্ধ উহার ক্ষমতাই দলের হাতে রেখে দিতে হবে, যে পর্যন্ত ধনতন্ত্র সমূলে উৎপাটিত না হয়। এই ব্যাপারটাকে বলা হবে শ্রমিকের এক-নায়ক-তন্ত্র (Dictatorship of the Proletariate)।

কার্ল মার্কস বলেছেন যে, তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে সত্যিকার সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যে সমাজ-তন্ত্রে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের রাজনৈতিক সাম্য ও অর্থ নৈতিক সমতা রূপায়িত হয়েছে। কার্ল মার্কস্ এমন নিপুণতার সঙ্গে এবং অপূর্ব যুক্তি-বিচার সহ তাঁর মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন যে, বিশ্বের জ্ঞানী গুণী ও বিদ্বজ্জন সমাজ সবাই মুগ্ধ হয়ে কার্ল মার্কস্-এর মতবাদ গ্রহণ করেছেন। এমন কি কার্ল মার্কস্-এর যুক্তি বিচারের ত্রুটিগুলিও অগ্রাহ্য করেছেন। কার্ল মার্কস্‌কে এমন ভাবে মেনে নেবার আরো একটা কারণ এই যে, যুগের দাবী যে ব্যক্তিমানবের পূর্ণ স্বাধীনতা, একমাত্র কার্ল মার্কস্-ই তার পথ দেখিয়েছেন—আর কেউ দেখাতে পারেন নি—দেখাতে পারেন বলে দাবীও করেন নি।

কিন্তু কার্ল মার্কস্ তাঁর পরিকল্পনা কার্য ক্ষেত্রে রূপায়িত করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর ৩৩ বছর পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেনিন রুশ দেশে কার্ল মার্কস্ এর পরিকল্পনা রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে রুশ দেশে কেরেনেস্কি গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হলো। এটা হলো কার্ল মার্কস্-এর ভাষায় বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব। লেনিন বললেন—রুশ দেশে এখনই পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক গণ বিপ্লব হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত। তিনি ট্রট্স্কির সহায়তায় রাষ্ট্র ক্ষমতা কেরেনেস্কির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাবার সমাজ-তান্ত্রিক গণ বিপ্লব ঘোষণা করলেন। তার ফলে সম্পত্তির ব্যাপারে ব্যক্তিগত মালিকানা সত্বের বিলোপ সাধন করা হলো। রুশিয়ায় শ্রমজীবীদের রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান যে কমিউনিষ্ট পার্টি, সেই পার্টি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক যাবতীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করলো। তার পরে শ্রমজীবীর এক-নায়কত্বও রুশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো। তার ফলে রুশ দেশে [illegible]

মার্কস্-এর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবেই রূপায়িত হলো। কাজেই এ কথা বলা যায় যে ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরাও কার্ল মার্কস্-এর প্রদর্শিত প্রগতির পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কার্ল মার্কস্-এর পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশগুলি রূপায়িত হলেও, যে মানবতার আদর্শ সম্মুখে রেখে পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, সে আদর্শ তো রুশিয়া বা অন্য কোনো দেশেই এখনো প্রতিফলিত হল না। কার্ল মার্কস্ চেয়েছিলেন, এবং মনে করেছিলেন যে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত হলে—সব মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হবে, মানুষে মানুষে অসাম্য থাকবে না, ব্যক্তি মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে, অথচ সবাই মিলে মিশে এক যোগে সুখে শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে। কিন্তু তা হলো কই? রুশীয় বিপ্লবের পরে অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেলেও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা তো কার্ল মার্কস্-এর আদর্শ প্রতিফলিত করে তুলবার পথে আর এক পা-ও অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না! লেনিন ও তাঁর পরে তাঁদের কার্য্য-কলাপে মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, তাঁরা প্রায় প্রতি পদ ক্ষেপেই মানবতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণই করে করে চলছেন—বিরুদ্ধবাদীগণকে হত্যা করা তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্ল মার্কস্-এর পরিকল্পনায় শ্রমজীবীর এক-নায়কত্বে পৌঁছানো পর্য্যন্ত পথের নির্দ্দেশ আছে। তার পরে কি, কার্ল মার্কস্ নিজেও কিছু বলে যাননি। তাই রুশ ও চীনের মতো বিপুল শক্তিসম্পন্ন দেশও পথ খুঁজে না পেয়ে পরস্পর পরস্পরের দোষারোপ করছে—পরস্পরে যুক্তি করছে। চীন বলছে—রুশিয়া আর কমিউনিষ্ট নয়—সংশোধনবাদী। রুশিয়া বলছে—চীন কমিউনিষ্ট নয়—জাতীয়তা-বাদী। এরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করে এটাই প্রমাণিত করছে যে, প্রগতি কোন্ পথে, তা এদের মধ্যে কেউ-ই জানে না। কথায় আছে—'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত'। এদেরও সেই অবস্থা হয়েছে। কার্ল মার্কস্ যতটা পথ বাতলে দিয়ে গিয়েছেন, ততটা পথে এসে আর তারা এগোবার পথ পাচ্ছে না। এখন শুধু চলছে—পুরোনো কথার রূপচানি এবং শ্রমজীবীর এক-নায়কত্বের ব্যাপারটা নিয়ে কচ্ কচি বা কল-তলানি।

যে সব দেশ এখনো শ্রমজীবীর এক-নায়কত্বে পৌঁছাতে পারেনি, সে সব দেশের সাম্যবাদীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে এক-নায়কত্বে পৌঁছাবার জন্যে। কিন্তু তারাও তাদের মসজিদে পৌঁছে গিয়ে—যদি পৌঁছাতে পারে—স্থাণু হয়েই বসে থাকবে।

কিন্তু কার্ল মার্কস্-এর পরিকল্পনা পুরাপুরি রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আদর্শে পৌঁছানো গেল না কেন? এ জন্যে দায়ী বিপ্লবের সময়কার রুশিয়ার পরিস্থিতি এবং সে পরিস্থিতিতে অবলম্বিত লেনিনের কর্ম্ম পন্থা। বিপ্লবের পরে ক্ষমতা হাতে পেয়েই লেনিন সমাজ-তান্ত্রিক গণ-বিপ্লবের ঘোষণা প্রচার করে বললেন—বিত্ত-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্বের বিলোপ করে দেওয়া গেল। তার ফলে দেশ-বিদেশের সব লোকই লেনিন ও তাঁর মতাবলম্বীদের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। বাইরের শত্রুরা (ইংলণ্ড ও আমেরিকা) তো রুশিয়া আক্রমণই করে বসেছিল। বহু চেষ্টা করে লেনিনকে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছিল। কিন্তু দেশের ভিতরেও তো সবাই শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেনিন ভাবলেন—বাইরে শত্রু, ভিতরে শত্রু—এত শত্রুর চাপে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকলে তো এ অভিনব বিপ্লব বাঁচিয়ে রাখা যাবে না দু দিনও। তাই তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে, ভিতরের শত্রুর মূলোৎপাটন করতেই হবে। তিনি শ্রমিকের এক-নায়কত্ব ঘোষণা করলেন। শ্রমিকের এক-নায়কত্ব মানে শ্রমিক দলের অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির এক-নায়কত্ব। আর পার্টির এক-নায়কত্ব মানেই দলপতি বা নেতার এক-নায়কত্ব। এ ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা হিসেবে লেনিনের এক-নায়কত্ব। রুশিয়ায় শ্রমিকের এক-নায়কত্ব ঘোষণার অর্থ হলো—লেনিনের মত অনুসারেই সবাইকে চলতে হবে, তার বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করারও কারো অধিকার নেই। যে ব্যক্তি লেনিনের মত মানবে না, তার এ রাষ্ট্রে থাকারও অধিকার নেই। তাই দেশে যারা লেনিনের মতাবলম্বী

য়, লোকে জানলো, তাদের সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আসলে সাইবেরিয়ায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের খতম করে দেওয়ারই ব্যবস্থা হলো। এই ভাবে হাজার হাজার, কারো কারো মতে লক্ষাধিক লোককে লেনিনের জীবিত কালেই খতম করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের জীবন নিয়ে এরূপ ছিনিমিনি খেলার দরুণ লেনিনের মতাবলম্বী কারো কাছেই মানুষের জীবনের মূল্যবোধ আর রইলো না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যার সঙ্গে স্ট্যালিনের মতের সামান্যতম অমিল হয়েছে, তাকে স্ট্যালিন নির্মমভাবে পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চ থেকে অপসারিত করেছে লেনিন ও তাঁর মতাবলম্বীরা এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে মানবতাবোধটাকে ক্ষুণ্ন করে করে এগিয়ে যাওয়ার ফলে কার্ল মার্কস্-এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারলো না। কেউ কেউ বলেন—লেনিন যে পথ নিয়েছিলেন, সে পথ না নিলে তিনি বিপ্লবটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন না। কাজেই তাঁর পক্ষে সে পথ নেওয়া অনিবার্য্য ছিল। তা হতে পারে। কিন্তু সে পথ নিলে, তার ফলে, যে তাদের কাজ-কর্মে মানবতার আদর্শ ক্ষুণ্ন হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই পথে মানবতার আদর্শে পৌঁছানো কখনই সম্ভবপর হবে না, তাও যে অনিবার্য্য, তা আমরা সর্ব্বত্র চোখেই দেখতে পাচ্ছি। যে সব দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সব দেশের একই ইতিহাস—কমিউনিষ্টরা রুশিয়ার সাহায্যে ক্ষমতা হাতে পেয়ে হাজার হাজার কোথাও বা লক্ষ লক্ষ লোকের অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছে বিপ্লব টিকিয়ে রাখার অজুহাতে। চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে এক চৈনিক লেখক তাঁর বইতে লিখেছেন—কমিউনিষ্টরা নিজেরাই স্বীকার করে যে তারা ৫ লক্ষ লোককে খুন করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সংখ্যা ৫০ লক্ষের কম হবে না।

খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কার্ল মার্কস্ 'ডিক্টেটর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি যদি বলতেন—বিপ্লবের পরে বেশ কিছু দিন দেশের শাসন-কর্তৃত্ব পার্টির হাতে রেখে দিতে হবে, যে পর্য্যন্ত জনতন্ত্র সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে না যায়, তাহলে হয়তো দলে দলে মানুষ খুন করার ব্যাপারটা এমন বেপরোয়া ভাবে চালু হতো না। কোনো দেশের ডিক্টেটর হওয়া মানেই সে দেশের সকলকে বিনা প্রতিবাদে সেই ডিক্টেটরের হুকুম মেনে চলতে হবে। যে মানবে না, তাকেই সরিয়ে দিতে হবে। নইলে ডিক্টেটরত্ব থাকে না। এই ভাবেই কমিউনিষ্ট মহলে খুনোখুনির ব্যাপারটা এসে পড়েছে।

এই খুনোখুনির পথটা হচ্ছে—পরমত অসহিষ্ণুতার পথ, জোর যার মুলুক তার—এই মতাবলম্বীদের পথ—মধ্য যুগে চেঙ্গিস্ খানের অবলম্বিত পথ। যারা বিরুদ্ধে, তাদের একধার থেকে কেটে কেটে এগিয়ে চলা। ফরাসী বিপ্লবের পরে যে গণতন্ত্রের যুগ আরম্ভ হয়েছে, এই যুগের প্রধান শিক্ষাই হচ্ছে—পরমত সহিষ্ণুতা এবং নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও সংখ্যা-গরিষ্ঠের মত মেনে চলা। মানুষ যদি এই পথে চলে, তবে যুক্তি-বিচারের বলেই বোঝা যায় যে একদিন হয়তো পৃথিবীতে ব্যক্তি-মানবের সর্ব্বাত্মক স্বাধীনতার আদর্শ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। অন্ততঃ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উক্ত আদর্শ সার্থক হয়ে উঠতে হলে মানুষের মনোভাব উপরোক্ত পথে চলবার উপযোগী হয়ে উঠতেই হবে।

কিন্তু লেনিন যে পথ দেখালেন, সে পথ এ পথের উল্টো পথ। আমার মতের সঙ্গে যদি কেউ একমত না হয়, তবেই তাকে খুন করতে পারি—এ মত তো বর্ব্বর যুগের মত। মানুষ সবাই কোন বিষয়ে একমত হতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিও সকলের এক নয়। তাই মতও সকলের এক হতে পারে না। দুটো মানুষের চেহারাও সর্ব্বাংশে এক হয় না। সর্ব্ব বিষয়ে বৈচিত্র্যই হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম। এরূপ অবস্থায় মানুষে মানুষে মিলন যদি কাম্য হয়, তবে পর-মত সহিষ্ণু হতেই হবে।

১৯১৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত রুশিয়া, চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভাকিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, পূর্ব্বজার্মানী, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েটনাম প্রভৃতি দেশে কমিউনিষ্টদের শাসন চলছে। এ সব দেশগুলিতে শ্রমিকের এক-নায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তার মানে এক মতের শাসন—

ক্ত কোনো মতের স্থান সেখানে থাকতে পারে না। এরূপ
অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোথায়? অতএব যে সব দেশে
নিউনিষ্ট পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত, তার কোনো দেশেই
ক্তির স্বাধীনতা নেই। কিন্তু তবে সে সব দেশে
ক-নায়কতন্ত্রের অবসান হবে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা
তিষ্ঠিত হবে, তা কেউ জানে না। সুদূর ভবিষ্যতেও
ব কিনা, তাও কেউ বলতে পারে না। কেন না,
ক-নায়কতন্ত্র শাসন তুলে দিয়ে, তার কোন্ রূপের
সন কায়েম করবে, তা তারা জানে না—সে সম্বন্ধে
রা চিন্তাও করে না। এই সব দেশ প্রগতি কোন্
থ তা জানে না বলে তারা প্রগতির পথের বাধা হয়েই
ছে। পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল থেকে এই অবস্থা
ছে।

কিন্তু বাধা চিরকাল বাধা হয়ে থাকতে পারে না।
-পরিস্থিতি কতকাল আর অচল হয়ে থাকবে?
র বাধার অপসারণ অবশ্যম্ভাবী। নূতন প্রগতির
র বার্তা দেবার লোকও এসে হাজির হয়েছেন।
র্ল মার্কস্-এর মতোই তাঁরাও তাঁদের বার্তা দিয়ে
ছেন এবং তাঁর মতোই বার্তা রূপায়নের পূর্বেই
াও পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চ থেকে সরে পড়েছেন। তাঁদের
ন হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং অপর জন
ন্ধী গান্ধী।

প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর কথাই বলি। তিনি বিলেত
র ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসে এক মোকদ্দমা উপলক্ষে
ণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গভর্ণমেণ্টের
ক্ষে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সে
ন্দোলনে জয় লাভ করেন। তারপরে ভারতবর্ষে ফিরে

এখানেও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের
ন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অহিংস অসহ-
ও সত্যাগ্রহের পথে লড়াই করে উদ্দেশ্য সাধনে সফল-
ন। এ সব আন্দোলন গান্ধীজীর পক্ষে বড় কথা

আসল কথা হলো—অহিংসার পথে লড়াই
ালনা সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তিনি বলেন যে
। যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে পথই গ্রহণ
করুক না কেন, সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে হলে তাকে
পথের প্রতি পদক্ষেপে মানবতার আদর্শ রক্ষা করে চলতে
হবে। তার মানে—কোনো অবস্থাতেই মানুষের মানুষকে
খুন করা চলবে না। হিংসার পথে চলে কোনো দিনই
উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সফলতা অর্জিত হয়নি। আংশিক সফলতা
সত্ত্বেও পর হলেও, নূতন নূতন আরো অনেক সমস্যার
সৃষ্টি হয় বলে অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে।
রুশীয় বিপ্লবের পরে বিপ্লবের নেতারা ক্ষমতায় লড়াইয়ে
মেতে খুনোখুনি আরম্ভ করে দিলেন। তার ফলে এমন
সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হলো যে নেতারা আর সামাল
দিতে পারলেন না। যে গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিপ্লবের
সৃষ্টি, সে উদ্দেশ্যই গেল কেন্তে। নেপোলিয়ান এসে
সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করলেন এবং
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিজে সম্রাট হয়ে বসলেন।

কার্ল মার্কস্-এর পরে লেনিন এসে মার্কস্-এর পরি-
কল্পনা রূপায়নের বাস্তব পন্থা বা কার্যকর উপায় উদ্ভাবন
করেছেন। মহাত্মা গান্ধী লেনিনের পরে এসে, লেনিনের
প্রদর্শিত কর্ম-পন্থার ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন।
লেনিনের মতো মহাত্মা গান্ধীও ধন-তন্ত্রের ও একচক্ষুদা
জাতীয়তাবাদের বিরোধী। গান্ধীজীর মতে, ধনতন্ত্র
বর্তমান যুগে জগতের পক্ষে অবলুপ্তিকর। তাই ধন-
তন্ত্রের বিলোপ সাধন গান্ধীজীরও কাম্য। কিন্তু তাড়া-
হুড়া করে তা করতে গিয়ে লেনিন যে খুনোখুনির পথ
নিয়েছেন, গান্ধীজীর মতে, সেই খানেই তিনি মস্ত বড় ভুল
করেছেন এবং সেই জন্যেই তিনি মার্কস্-এর পরিকল্পনা
রূপায়নে সফলকাম হয়েও তাঁর আদর্শ সফল করে
তুলতে পারেন নি। এই ভাবে লেনিনের কর্মপন্থার
ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে গান্ধীজী যে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের
কথা বলেছেন তাতে মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে যুগের
প্রয়োজনটাই ব্যক্ত হয়েছে। যুগের প্রয়োজন মেটাতে
মহাত্মা গান্ধীর এই যে অবদান, সেটা বুঝার জন
ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া এখনো বিশ্বের জন-মানসে এই ভাবে
স্পষ্ট প্রতিভাত হয়নি। কিন্তু গান্ধীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী
উৎসব উপলক্ষে সমস্ত বিশ্বে যে তুমুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল

-টে ধুম-পাহাড়া হয়েছিল, তার একমাত্র কারণ
ত পারে যে বিশ্বের জন-সাধারণ যেমন করেই
. করাটা বুঝেছে—কমিনটার্ন অন্ততঃ
যে জগতের মানুষের মনে যেন কিছু উপাদেয়
ন করেছেন, যা তেমন করে আর কেউ করেনি—
যে অবদান এ যুগের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান।
ই পথ যুক্তি-বিচারের পথ তো বটেই। কিন্তু
গের পথও বটে। তিনি ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে
র মতোই বলেছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য,
উপরে নাই"। অতএব কোনো অবস্থাতেই মানুষ
চলবে না। এই যে "মানুষ খুন-না করার নীতি",
রিস্থিতি যে পথে এগিয়ে গেলে এই অবস্থায় সৃষ্টি
যুগের পক্ষে সেই পথটাই হচ্ছে প্রগতির পথ।

ঃ মানবেন্দ্রনাথের মতবাদটা যে কি তাই নিয়ে
না করা যাক। মানবেন্দ্রনাথের মতে—কার্ল মার্কস্-
ল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন একটা সমাজ গঠন করা,
ব্যক্তি-মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকবে এবং
টি মানুষ আর্থিক অনটনের উর্দ্ধে থেকে সুখে
। জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে। কার্ল মার্কস্-
কল্পনায় বিপ্লবের পরে এক-নায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার
াছে। এক-নায়ক তন্ত্রে ব্যক্তি মানবের স্বাধীনতা
া অবশ্যম্ভাবী। এক-নায়ক-তন্ত্র যদি কোন দেশে
দিন প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এক-নায়কতন্ত্র তুলে
ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা
ম্ভব। এ কথাটা যে কতখানি সত্য, তা আমরা
র অভিজ্ঞতায়ই আজ বুঝতে পারছি। ১৯১৭ সালে
পরে রুশিয়ায় যে এক-নায়ক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো,
া বিপ্লবের ৩০ বছর পরেও অব্যাহত আছে।
এই এক-নায়ক-তন্ত্রের অবসান হবে, তা কেউ
। মানবেন্দ্রনাথের মতে, আবার একটা বিপ্লব
র্ত্তমানের কর্তৃকর্তাদের তাড়িয়ে না দিলে, এ
কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে প্রতিনিধিরাই সর্বেস
হয়ে উঠলো—ভোটারদের আর সে সম্বন্ধে কিছু করার
রার একিয়ার রইলো না। তাই এ অবস্থায় জনগ
হাতে সত্যিকার ক্ষমতা এলোনা—তারা যে তিমিরে
তিমিরেই রয়ে গেল। এই অবস্থার প্রতিকার করে স
তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনা করা হয়েছিল।
করা হয়েছিল—অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সব রাষ্ট্র
হলেই, তা হয়ে যাবে। কার্ল মার্কস্ বললেন—শা
বস্থায় থাকলে, তা হতে পারে না। আগে ধন-ত
বিলোপ সাধন চাই। কার্ল মার্কস্ পালটা পরিক
উপস্থিত করে বললেন—এই পরিকল্পনা রূপায়িত ক
পারলে প্রকৃত সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যে সমাজ-
জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা অধিগত করা সম্ভবপর হবে।

কার্ল মার্কস্-এর পরিকল্পনার বিপ্লবের পরে জাতী
বাদের রাজনীতির জায়গায় আন্তর্জাতীয়তা-বাদের
নীতি কায়েম হবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির জা
কি প্রকারের অর্থনীতি কায়েম হবে কিংবা চেষ্টা
গড়ে তুলতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশ।
কিন্তু কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নির্দ্দেশেই তো
নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুনিয়ায় চালু হয়ে উঠতে
না। নানা যোগাযোগের ফলে তা হয়ে থাকে। এ
আকাশ থেকেও তা পড়তে পারে না। ক্রম-বিব
ফলে একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকে। কার্ল
বেঁচে থাকতে, ধনতন্ত্রের পালটা কোনো অর্থনীতি
উঠবার কোনো লক্ষণ তিনি দেখতে পাননি।
আজ আমরা দেখি যে, প্রায় এক শতাব্দী ধরে
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অতি ক্ষুদ্র প্রারম্ভ থেকে একটু
গড়ে উঠছে এবং ক্রমেই তা সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ ক
সেটা হচ্ছে সমবায় অর্থনীতি। এই অর্থনীতি
ভাবে গণতান্ত্রিক অর্থনীতিও বটে এবং যে দেশে
অর্থনীতি ধনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রধান অর্থনীতি হয়ে

ক্রমে ক্রমে এই অর্থনীতিই ধনতন্ত্রের পালটা অর্থনীতি হয়ে দাঁড়াবে এবং দুনিয়ায় সেই ভাবেই গৃহীত হবে। আর এই অর্থনীতি সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শেষও যে যথোপযুক্ত অর্থনীতি হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সমবায় অর্থনীতি সমবায় সমিতির মারফতে গড়ে উঠে ও বিস্তার লাভ করে। সমবায় সমিতি হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তি-বিশেষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছার গড়ে তোলা এমন একটা অর্থনৈতিক সংস্থা যার সভ্য হিসেবে তারা নিজেদের চেষ্টায় ও পরস্পরের সাহায্যে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করবে। (A Co-operative Society is a voluntary association of members for their own economic improvement through self-help and mutual aid)। প্রথম কথা হচ্ছে সমবায় সমিতির প্রত্যেকটি সভ্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সমিতির সভ্য-তালিকাভুক্ত হবে—বাধ্যবাধকতার কোনো স্থান নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—সমবায় সমিতির সভ্যদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতার ভাব থাকা চাই। যে সমিতির সভ্যদের সহযোগিতা নেই, মিল নেই—বরং ঝগড়া-ঝাটি আছে, সে সমিতিকে সত্য সমবায় সমিতি বলাই চলে না। সমবায় সমিতি হচ্ছে সমবায় মনোভাবের ভিত্তির উপরে গঠিত সমিতি। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে এরূপ মনোভাব ছাড়া সমিতি সাফল্য লাভ করতে পারে না এবং তার দ্বারা কোনো কাজের কাজও হয় না। সমবায় সমিতির পক্ষে সমবায়-মনোভাবটাই হচ্ছে আসল কথা।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনী পরে;
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥"

কামিনী রায় মহাশয়ার কবিতার এই লাইন কয়টিতে সমবায় মনোভাবটা সম্যক প্রকাশ লাভ করেছে। ইংরেজীতে বলা হয়—"Each for all and all for each"। প্রত্যেকে আমরা সকলের তরে এবং সকলে আমরা প্রত্যেকের তরে। এই সমবায় মনোভাবের উপরে ভিত্তি করে যদি কোনো দেশের সম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে, তবে সে দেশটাকে বলা যেতে পারে সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র বা সমবায়ী গণতন্ত্র (Co-operative commonwealth) এবং এই সমবায়ী গণ-তন্ত্রই হচ্ছে সম্পূর্ণ সমাজ-তন্ত্র।

মানবেন্দ্রনাথের মতে, সমবায়ী গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সত্যিকার সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই মত নিজে কোথাও প্রচারিত করে যেতে পারেননি। কেননা, এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কখনো তাঁর হাতে আসেনি। সে ক্ষমতা ছিল জওহরলালের হাতে। তাই তিনি জওহরলালকে দিয়ে ভারতবর্ষে সমবায়ী গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা জানি যে জওহরলাল চিরদিনই সমাজ-তন্ত্র-বাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অপরিহার্য। গান্ধীজীর তাকে জন-সাধারণ যে ভাবে সাড়া দেয়, তার তুলনা নেই এবং সেরূপ সাড়া জাগানো আর কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তাই গান্ধীজীর বেঁচে থাকা পর্যন্ত জওহরলাল সমাজ-তন্ত্রের কথা কখনো কখনো বক্তৃতায় বলেছেন বটে, কিন্তু সমাজ-তন্ত্র গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করেন নি। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে জওহরলালই হয়ে গেলেন এ দেশের অবিসংবাদী নেতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তাঁর হস্তগত। তিনিই তখন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী।

জওহরলাল এই সময় থেকে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে একটু একটু করে সমাজ-তন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। 'সমবায়মূলক সাধারণ তন্ত্র' মানেই সত্যিকার সমাজ-তন্ত্র—এই সূত্রটি মানবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়ে জওহরলাল প্রথমে কংগ্রেসের শপথ বাক্যের ভিতরে এই কথাটা ঢুকিয়ে দিলেন যে সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আমাদের আদর্শ। তার পরে তিনি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—What we want, is a socialistic pattern of society to be established in India"। অর্থাৎ এ দেশে সমাজ-তান্ত্রিক

ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এ কথার মানে কি? জওহরলাল সমাজ-তন্ত্র না বলে সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ কেন বললেন? এর অর্থ হলো—ইউরোপে যে সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে, তা নয়, কিন্তু সেই ধরণের একটা কিছু, যা প্রকৃত পক্ষে সমাজ-তন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেটা যে কি, তা ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—বলা হয়েছে, "What we want is Democratic Socialism"। অর্থাৎ আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র চাই। তার মানে গণতান্ত্রিক পথে সমাজ-তন্ত্র গড়ে তোলার কথা।

ইউরোপের বহু মনীষী মনে করেন যে এক-নায়ক-তন্ত্রের পথে ছাড়া অন্য কোনো পথে সমাজ-তন্ত্রে পৌঁছানো যাবে না। মানবেন্দ্রনাথ বলেন—ইউরোপের বহু দেশে তো সে পথ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। যারা সে পথ নিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কি সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে? না—হয়নি। কেননা, এখনো সে সব দেশে এক-নায়ক-তন্ত্রই চলছে এবং এক-নায়কতন্ত্র এবং সমাজ-তন্ত্র তো এক কথা নয়। আসল কথা—সে সব দেশে এক-নায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে কর্মকর্তারা নিজেদের ফাঁদেই নিজেরা আটকে পড়েছেন—আর বেরিয়ে আসতে পারছেন না। ভবিষ্যতে কখনো পারবেন বলেও মনে হয় না। অথচ এক-নায়ক-তন্ত্রের আওতার বাইরে না আসতে পারলে সমাজ-তন্ত্রও হবে না। মানবেন্দ্রনাথের মতে এখন সমাজ-তন্ত্র গড়ে তুলতে হলে এক-নায়কতন্ত্রের পথ ছেড়ে দিয়ে গণ-তান্ত্রিক পথে চলতে হবে। সে গণ-তান্ত্রিক পথটা যে কি, তাও তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন—সে পথটা হচ্ছে সমবায়-মূলক সাধারণ-তন্ত্র গড়ে তোলার পথ।

মানবেন্দ্রনাথের পরামর্শে জওহরলাল ভারতবর্ষে সমবায়-মূলক সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এগিয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি ভারতীয় অর্থনীতিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করলেন—(১) ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় পরিচালিত অর্থনৈতিক বিভাগ (Private sector)। (২) রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক বিভাগ (Public sector)। (৩) সমবায়ী অর্থনৈতিক বিভাগ (Co-operative sector)। জওহরলালের এই পরিকল্পনা ছিল যে প্রথমে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বিভাগ ক্রমে ক্রমে উঠে যাবে। তার পরে রাষ্ট্রায়ত্ত বিভাগও যখন উঠে যাবে, তখন একমাত্র সমবায় বিভাগই থেকে যাবে। তখন এ দেশের সম্পূর্ণ অর্থনীতিটাই সমবায়মূলক অর্থনীতি হয়ে উঠবে। তার মানে তখন এদেশে সমবায়মূলক সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

যে দেশে সমবায়মূলক সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বুঝতে হবে সে দেশের অধিবাসীরা সমবায়ী মনোভাব-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে—বুঝতে হবে মানুষ সেখানে মতের জন্যে মিলন খুয়া যেতে দেয় না—মতের চেয়ে মিলনের মূল্য অনেক বেশী তাদের কাছে—মানুষ সেখানে অধিকাংশের মত মেনে চলে বাধ্য হয়ে নয়—সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে। ক্রমে সেখানে মানুষের মত দিকে যত রকমের সমস্যার সম্ভাবনা আছে তার অনুরূপ এক একটা সমবায় সমিতি গড়ে উঠবে এবং সেই সব সমবায় সমিতির মাধ্যমেই তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সে সমাধান তার উপরে জোর করে চাপানো হবে না। সে সমাধানে আসতে যে বিচার-বিবেচনা করা হবে, তার মধ্যে সে নিজেও অংশ গ্রহণ করবে। এই ভাবে গৃহীত সমাধান মেনে নিতে তার স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনেরই প্রয়োজন থাকবে না। তখনও রাষ্ট্র যদি থাকে, তবে তা বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিতরে একটা যোগরক্ষা করার সংস্থা হয়ে থাকবে। (State will remain, if at all, as a co-ordinating body)। তার মানে কার্ল মার্কস্ যে অবস্থা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সেই অবস্থাই হবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষে সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যে ভারতের বৈদেশিক নীতি হিসেবে পঞ্চশীল গ্রহণ করেছিলেন, তার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দেশে বা জাতির ভিতরে সমবায়মূলক রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে

তোলা। আমরা জানি যে সমবায় অর্থনীতি ও সমবায় রাষ্ট্রনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে মানবতা-বাদ (Humanism)। তাই মানবতা-বাদই হচ্ছে সমবায় দর্শন। আমরা মনে করি, জওহরলাল যদি আরো কিছু দিন দেহে মনে সুস্থ সবল থেকে বেঁচে থাকতেন, তবে ভারতবর্ষে সমবায় রাজনীতি ও সমবায় দর্শনের পূর্ণ সম্ভব রূপায়িত হয়ে উঠতো।

তখন বলা যেতে পারতো যে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কার্ল মার্কস, মানবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ পুরোপুরি রূপায়িত হইয়েছে। সাধারণ সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি ও দর্শনের সমন্বয় হওয়ার ফলে এদেশে ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই, জন-সাধারণের আর্থিক অনটনে পড়বার আর সম্ভাবনা নেই। এরূপ একটা আদর্শ রাষ্ট্র হলে, ভারতের আদর্শে ও দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ভারতের সাহায্য প্রচেষ্টায়ও বটে, অন্যান্য দেশেও ক্রমেক্রমে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকবে। এ ব্যাপারে সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংঘের অবদানও সুপ্রচুর হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে শ্রীঅরবিন্দের সর্ব মানবের পূর্ণ ঐক্যের আদর্শও রূপায়িত হবে।

পণ্ডিত জওহরলালের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে ওঠার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় ক্রম-বিবর্তনে বিশ্ব-পরিস্থিতি যে রূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা হয়েছিল, তা আর হতে পারলো না—অন্ততঃ জওহরলালের চেষ্টায় হতে পারলো না। এইটেই স্বাভাবিক। বিশ্ব-পরিস্থিতির বিবর্তন এভাবেই হয়ে থাকে। কোনো এক মহাপুরুষ প্রকৃতির মঞ্চে কিছু দিনের অভিনেতা হয়ে আসেন এবং অভিনয়ে তাঁর অংশ শেষ হলে যবনিকার অন্তরালে সরে পড়েন। তখন আর একজন তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনিও আবার যবনিকার অন্তরালে আশ্রয় নেন। এই ভাবেই ক্রম-বিবর্তন এগিয়ে চলে।

রুশো-ভলটেয়ারের পরে মার্কস্ এঙ্গেল্স্, তারপর লেনিন ষ্ট্যালিন, তারপরে মহাত্মা গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ, সর্বশেষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু—এরা সকলেই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে নিজ নিজ অভিনয়ের পালা শেষ করে সরে পড়েছেন। এ অভিনয়ের তো শেষ নেই। যারা চলে গিয়েছেন, বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন লোক এসে এবং নূতন নূতন সংস্থা গড়ে উঠে তাঁদের স্থান পূরণ করবে এবং তাঁদের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

ক্রম-বিবর্তনের পথে সময় সময় এমন একটা সংকট উপস্থিত হয় যে তার ফলে এক একটা প্রগতি-বিরোধী প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভূত হয়। সে শক্তি অনেক অঘটন-ঘটন করে পৃথিবীর পরিস্থিতিটাকে ওলট-পালট করে দিয়ে প্রগতিকে উলটো পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়ে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে শক্তি নিজেকে উজাড় করে দিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লবের পরে নেপোলিয়ান, রুশীয় বিপ্লবের পরে হিটলার এবং এবারকার আটমীক যুগে মাওসেতুঙ্—এরা সকলেই এক একটি প্রগতি-বিরোধী শক্তি। প্রথম দুটির যে অবস্থা হয়েছে তৃতীয়টিরও সেই অবস্থা হওয়াই অনিবার্য।

সমবায়ী পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র সংগঠন সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, তার কাজ হচ্ছে—মানবেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে জওহরলাল যেখানে শেষ করে গিয়েছেন, সেখান থেকে আবার নূতন করে সুরু করা। কিন্তু জওহরলাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে ভাবে উপর থেকে সমবায়মূলক সাধারণ-তন্ত্রের কাঠামো জনগণের পক্ষে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, ক্ষমতা হাতে নেই বলে এই সংস্থা সে ভাবে কাজে এগিয়ে যেতে পারবে না। জনগণ যাতে নিজেদের চেষ্টায় দেশে সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে, এই সংস্থা সেই কাজে তাদের সাহায্যের জন্যে চেষ্টা করতে পারে। জওহরলাল চেষ্টা করেছিলেন উপর থেকে জনগণের উপরে চাপাতে। এই সংস্থা চেষ্টা করতে পারে জনগণকে নিয়ে নিচে থেকে গড়ে তুলতে। একমাত্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইচ্ছা করলে জওহরলালের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এ দেশে বিদেশে বহু দেশে এরূপ নূতন নূতন আরো অনেক সংস্থা সৃষ্টি হবে এবং সে সব সংস্থা তাদের মতন করে নানা দিক থেকে সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এগিয়ে আসবে এবং বহু ব্যক্তি-বিশেষও হয়তো সেই একই উদ্দেশ্যে কাজে লেগে যাবে। এই ভাবে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের কাজ এগিয়েই যাবে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২.০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮.০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭.০০
২।	ঈশোপনিষৎ	২.০০
৩।	কেনোপনিষৎ	১.০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৩.০০
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	১.০০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ পাণ্ডুক্যোপনিষৎ	১.৭৫
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২.৭৫
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ মুণ্ডকোপনিষৎ	৩.০০
৯।	শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩.০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	০.৫০
১১।	গীতাজয়ন্তী	০.০৬
১২।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	০.৫০
১৩।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩.০০
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২.০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির অন্তকথা	১.২৫
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিল্পী সুধার কথা	০.৩১
৩।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫.০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়ন্ত্রষ্টা শ্রীনিত্যগোপাল	০.৬২
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২.০০
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫.০০
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৫.০০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪.০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

Central Regd. No. B. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

11 NOV 197

গুণেও অতুলনীয় ও খরচও কম

"লক্ষ্মী মার্কা" সুষমদানা সার

প্রত্যেক চাষীভাইয়ের কাছে
এক অতিপরিচিত নাম।

সারা বাংলাদেশের চাষী ভাইয়ের মুখে কেবল একই কথা লক্ষ্মী মার্কা সার—কিন্তু কেন? কারণ, লক্ষ্মী মার্কা সার মানেই সুষমদানা সার। তা "জ্যোতি" (৮:১:৮) হোক বা "সর্ব্বপ্রিয়" (১১:১১:১১) হোক। কম খরচে ফসলে পর্যাপ্ত ফলন দিতে এর জুড়ি মেলা ভার।

সার কেনার সময় চাষী ভাই ভেজালের ভয় করছেন? দানা আকারে বলে লক্ষ্মীমার্কা সারে ভেজালের কোন ভয় নেই। যে ভয়টা হয় বাজারে বিক্রিত গুড়ো মিশ্র সার কেনার সময়। খরচের সাশ্রয় হয় অনেকাংশে। ৫০ কেজি "সর্ব্বপ্রিয়" গুণের দিক থেকে ৭৫ কেজি "জ্যোতির" সমান। অথচ ৫০ কেজি সর্ব্বপ্রিয়"-র দাম ৯০ টাকা এবং ৭৫ কেজি "জ্যোতি"-র দাম ৪৫ টাকা। তাই সমপরিমাণ উপাদান দিয়েও "সর্ব্বপ্রিয়" থেকে বস্তা প্রতি ৫ টাকা সাশ্রয় করতে পারেন।

[illegible] কিনুন, ভেজালের হাত থেকে রেহাই পেতে লক্ষ্মীমার্কা সুষমদানা [illegible] নির্ভর করুন।

বিঃ দ্রঃ—স্বাষ্য মূল্যে ইউরিয়া, পটাশ ও সুপার ফসফেট পাওয়া যায়।

দি ফস্‌ফেট কোম্পানী লিমিটেড

১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১।

ফোন : ২২-৬৮৬১ ও ২২-০৭৭১।৩

প্রতি সংখ্যা ৮০ পয়সা, শারদীয়া ১·২৫ বার্ষিক পাঁচ টাকা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ-আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
ভঙ্গ-অভঙ্গ সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহাদ

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৮, ১৯৭১ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র চতুর্বিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভূমাতে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। ভূমাকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১।	ব্রহ্মসূত্র (অনূদিত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০
২।	ঈশোপনিষৎ	২·০০
৩।	কেনোপনিষৎ	১·০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৩·০০
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	১·৭৫
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২·৭৫
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ মুণ্ডকোপনিষৎ	৩·০০
৯।	শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩·০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	০·৫০
১১।	গীতাতত্ত্বরত্নী	০·০৬
১২।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	০·৫০
১৩।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩·০০
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি

৺প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির জন্মকথা	১·২৫
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিতাগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা	০·৩১
৩।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	০·৬৭
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩·০০
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৪·০০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

উদ্ধারত

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭১ চতুর্বিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

উননব্বইতম জন্মক্ষণে

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

ওঁ নমো ভগবতে নিতাগোপালায়

ওঁ নমো পুরুষোত্তমানন্দায়।

আজকের এই দিন-টীতে যাঁকে স্মরণ করতে এবং আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধা জানাতে মিলিত হয়েছি, তিনি হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী বিশ্বদরদী স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। বাংলা দেশের বরিশাল জেলার একটী পল্লী গ্রামে শরৎকুমার নামে তাঁর প্রথম পরিচয়।

আজ তাঁকে স্মরণ করবার কালে আর একজন দরদী মানুষের কথা মনে হয়ে চোখে জল আসছে—যে মানুষটী বিশ্বকে ভালবাসবার জন্য প্রাণের প্রেরণায় পুরুষোত্তমানন্দের ছায়া-তলে এসে পুরুষোত্তমানন্দের কাছ থেকে মানুষকে ভালবাসার নতুন মন্ত্র পেয়ে জীবন-পথে মন প্রাণ ঢেলে এগোচ্ছিলেন সেই আমার সহোদর ভাই, আমার পরমার্থ ভাই আর সকলের চিনুদা। আজ বার বার মনে পড়ছে সেই চেহারা। মনে হচ্ছে তিনি যেন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-চেতনার কথা তাঁর সহজ ভাষায় আপনাদের কাছে নিবেদন করছেন। কিন্তু জানিনা কেন তাঁর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল—আমাদের কাছ থেকে তাঁকে চিরতরে সরিয়ে নেওয়া হল। কালের বিধান আমরা নত মস্তকে বরণ করে নেব, তাঁর আনন্দলোকে আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধা জানাব। এই সঙ্গে স্মরণ করি, শ্রদ্ধাপ্রীতি জানাই এই আশ্রমের সেই সেবিকা দুজনকে—শ্রদ্ধেয় প্রতিভাদি ও প্রীতিভাজন মীনুকে—যারা কয়েক বৎসর আগেই আনন্দ-লোকে প্রয়াণ করেছিলেন।

এখন কথা হচ্ছে, এই যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জন্ম-তিথি পালন করছি, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই উৎসব উপলক্ষে—কেন এই আয়োজন? আজ বাংলার মানুষ আমরা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করে চলেছি—স্বাধীনোত্তর বাংলাবাসী, ভারতবাসীর মনে একদিনের জন্যও সোয়াস্তি আছে? আছে কোন নিরাপত্তা? মনুষ্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্র আজ বিষিয়ে, বিষণ্ণ-মূল। এ হেন অবস্থায় একজন সন্ন্যাসীর জীবন-কথা শুনলে আমাদের সাধারণ মানুষের কতটুকু লাভই বা হবে? মঠ, মন্দির, আশ্রম বাংলার মানুষ, ভারতের মানুষ যুগ যুগ ধরে অনেক দেখেছেন—এর দ্বারা মনুষ্যজীবনের শাশ্বত পথের কোন কল্যাণ, কোন ত্রাণ, কোন সততা এনে দিয়ে মানুষকে সুস্থ করতে পারেনি। অজড়বাদী ভারত পরাধীনতা বরণ করেছিল। মাটীর মর্যাদা দেবার কথা সেদিনের ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছিল। তার যা কিছু করণীয় ছিল তার মূলে ছিল পারলৌকিক বন্দোবস্ত। সোনোক টৈকুণ্ঠের পথ-যাত্রার নিশানাই ছিল বাস্তব জীবনের চলার লক্ষ্য—তাই গান ছিল মরণের দিন করয়ে স্মরণ ইত্যাদি—যার ফলে মুসলমানের অত্যাচার এসেছিল, ইংরেজের অত্যাচার এসেছিল—।

এমনই এক কালের মধ্য দিয়ে আর একজন মানুষ এই বাংলায় এসেছিলেন যাঁর নাম জানে এমন লোক হয়ত সংখ্যায় হাতে গোণা যায়, যাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "তুই এসেছিস, আমিও এসেছি"—আর বলেছেন 'টাকে টাকা' যাঁর সমাধি একমাত্র নিতাগোপালেই সম্ভব"।

এই শ্রীনিত্যগোপালরূপী মানুষটী আজ থেকে প্রায় ১২০ বৎসর আগে অজড়বাদী ভারতের মাটীকে, জড়কে মূল্য দিলেন, বললেন—এই বিশ্বই আমার বন্ধুমঠ, আমি বিশ্ব-নাগরিক। এবং এই গোটা দুনিয়াকেই কোন্ দৃষ্টিতে দেখলে, কোন্ কৌশলে চললে এটা শান্তি-ক্ষেত্র মঠরূপে উদ্ভাসিত হয় সে দর্শনও তিনি তাঁর বহু লেখনীতে এবং জীবনের চলার ছন্দে রেখে গেছেন আমাদের সকলের কাছে। ভারতবর্ষের একজন সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দৈনিকে আটকে যাননি। সেদিন মিউনিসিপ্যালিটীর ভোট দিতে তিনি সাদা ধুতি চাদর পরে নাগরিকের কর্ত্তব্য পালন করেছেন, আবার সেই মানুষটীই একবস্ত্রে সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে এক নাগাড়ে ছয় বৎসর ভ্রমণ করেছেন। তাঁর জীবনে তিনি কত সহস্রবার সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন তার সংখ্যা কথা যায় না। আবার সেই মানুষটীই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোথায় কতটুকু কার প্রয়োজন তা মায়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখে তা পূরণ করেছেন। সেই সমাধিস্থ মানুষটীর শেষ উপদেশে আপনারা দেখবেন বাস্তব জগতে, সামাজিক বন্ধনেও মানুষ কী ভাবে চলবে সেই কথা সকলকে বলে গেলেন—বলে গেলেন "পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবে ও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে" ইত্যাদি। আমার লেখনী বা আমার ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তি ও ভাব দিয়ে আপনাদের কাছে তাঁর কথা প্রকাশ করতে পারছি না—আমার প্রাণের আহ্বান জানাই আপনারা আসুন, তাঁর কথা পড়ুন। এইটুকু শুধু বলতে পারি বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের পথ ও কৌশল আপনারা অবশ্যই পাবেন।

বরিশালের কিশোর শরৎকুমারের কৈশোর বয়সের যতটুকু তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তাতে দেখি শিশু-কাল থেকেই শরৎকুমারের প্রাণ কেমন একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে বড় হচ্ছিল। শিশু শরৎকুমারের প্রাণ, কিশোর শরৎকুমারের প্রাণ যেন কি চায়—প্রাণহীন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান কিশোর শরৎকুমারকে পীড়া দেয়—তিনি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কিশোর শরৎকুমার একদিন নতুন কাপড়ের মধ্যে একটা ছবি দেখলেন পৃথিবীকে একটা মানুষ সামনের দিকে ঠেলছে—শরৎকুমার ঐটুকু বয়সেই পুলকিত হলেন, ভাবলেন তিনি কবে এই রকম করে জগতটাকে সামনের দিকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ....এই ভাবে বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে তিনি বাড়তে লাগলেন—দেশে ইংরেজের শোষণ তাঁকে ব্যথিত করে তুলল—দেশের সেবায় শোষণের প্রতিবাদে নিজেকে গড়ে তুললেন। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে জড়াজড় তথা সর্ব্বসময়ের দার্শনিক, বিশ্ব-নাগরিক শ্রীনিত্যগোপালের চরণ তলে এসে দাঁড়াবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। বিশ্বগুরু শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর সর্ব্বসময়ের ব্যাকুলতা ও ছন্দ উপযুক্ত পাত্র শরৎকুমারের কাছে সঞ্চিত রেখে গুরু শিষ্য ধন্য হলেন, গুরু শিষ্য সহবীর্য লাভ করলেন। পরবর্ত্তী জীবনে শরৎকুমার পুরুষোত্তমানন্দরূপে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ফেরি করে বেড়ালেন নতুন মানুষ গড়বার জন্য। আজ আমরা তাঁর জন্ম-বাসরে শ্রীনিত্য-গোপাল-পুরুষোত্তমানন্দকে আমাদের সকল বৃত্তি দিয়ে প্রণাম করি, তাঁদের কথায় ও চলার কৌশলে আমরা নিজেদের জীবনকে এবং বিশ্ব-জীবনকে সুন্দরতর করব এই সংকল্প গ্রহণ করি। সত্যিই শ্রীনিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ মানুষ-সমাজের জন্য এমন ধন রেখে গেছেন যা নাকি বিশেষ করে আজকের মানুষের জীবনে একান্ত অপরিহার্য্য। আমাদের পরম দুঃখ আমরা সেই দুর্ব্বোধ্য অথচ সব চেয়ে সহজ কথাটী সকলের কাছে তুলে ধরতে পারছিনা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের—ব্রহ্মসূত্র, এগারখানি উপনিষদ ও গীতার—অবধূত ভাষ্যের ভেতরে দর্শনের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবঘন নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় রেখে গেছেন। সেদিক থেকে তিনি একজন বিপ্লবী দার্শনিক। আজ দার্শনিক কথাটী শুনলেই আমরা ভারতীয় জন সাধারণ এই কথাটাই মনে করি যে দার্শনিক হওয়া মানেই জগৎটাকে মায়া মরীচিকারূপে দেখতে পাবার মত যোগ্যতা লাভ করা। কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দের দর্শন প্রত্যক্ষকে ডিঙিয়ে নয়, মৃতের বা পরলোকের দর্শন নয়। তিনি ছিলেন তেমনই একজন দার্শনিক যিনি প্রত্যক্ষ

এই জগতের, প্রত্যক্ষ এই জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কোন্ ছন্দে মধুর ও আনন্দের হয় সেই প্রাণ-দর্শনের দার্শনিক। প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ কর্মকে আমরা "ভূতের বেগার খাটা" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছি, যে ভারতবাসীর প্রার্থনা ছিল—গোবিন্দ এ কর্মভোগ কবে কাটবে ইত্যাদি সেই ভারতেরই একজন মানুষ পুরুষোত্তমানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনিতাই-গোপালের জীবন মন্থন করে দেখালেন কর্মই মানুষের জীবনে কেমন করে দুর্ভোগ না হয়ে মোহন ভোগ হতে পারে। ভারতবাসী আমরা এই সব মহাজনদের কথা গ্রহণ করতে পারি নি, তাই কর্মকে ফাঁকি দিয়েও আমাদের দৈনন্দিন জলপান আটকায় না, এবং কর্মকে ফাঁকি দিয়েও নিজেকে খাঁটী মানুষ বলে সমাজে পরিচিত করাতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করিনা।

গীতায় শ্রীভগবান বললেন "ইহৈব ব্রহ্ম সমশ্নুতে"। এই খানেই, এই প্রত্যক্ষ জগতেই ব্রহ্মকে আস্বাদন করতে হবে। প্রতিটি কর্মের ভেতরে, প্রতিটী সম্পর্কের ভেতরে মানুষকে, ব্রহ্মকেই সেবা করতে হবে—আস্বাদন করতে হবে। তাতেই হবে মানুষের সত্যিকার প্রতিষ্ঠা। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর সমস্ত জীবনখানি দিয়ে সামগ্রিক ভাবে এই আস্বাদনেরই ছন্দ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্ত প্রাণপণ করে গেছেন। তাই দেখেছি যিনি বেদান্ত-শাস্ত্রের নতুন ভাষ্য রচনায় একনিষ্ঠ ধ্যানী আবার সেই ধ্যানী মানুষটীর চোখে কোন রুগী অপথ্য করবার আগে একটু জল আগে না খেলে যদি গলায় ঠেকে যায় তার জন্ত তাকে "একটু জল খেয়ে নাও নইলে ভাত গলায় ঠেকে যেতে পারে" একথা বলতে তাঁর ধ্যানের ছন্দ-পতন হয় না, কোন্ খাবার কার দুপুরে যাওয়া হবেনি তার জন্ত তুলে রাখার নির্দেশ দিতে ভুল হয় না। আবার দেখি ব্রিটিশ-শাসনে রাজবন্দীদের বাসস্থানের অব্যবস্থার জন্ত কারা-বাসকালে অনশন করতে ও তাঁর কারাবাসকালে বেদান্তের ভাষ্য লিখতে লেখনী কখনও থেমে যায় নি।

পুরুষোত্তমানন্দের সমস্ত ব্যাখ্যাই বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখা বলেই জীবনের কোন একটা অংশেই তা আটকে যায়নি। নিত্য লৌলার লোকে প্রেমনৃত্যও করেন আবার মহাধ্যানীও হতে পারেন—এই দুটোই যে মানুষের জীবনে কেমন করে সম্ভব সেই ছন্দের খবরই আমরা শ্রীনিতাগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ জীবনে দেখতে পাই।

ভারতবর্ষের একজন সন্ন্যাসী হয়েও পুরুষোত্তমানন্দ সংসারকে সত্য বললেন, আবার একমাত্র সংসারী হওয়াই সবখানি সত্য নয় তাও বললেন, বিশেষ করে যদি তার মধ্যে বিবেকনীলতা না থাকে। তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে আশ্রমবাসী সংসার করলেন আবার আশ্রমের আটকে থাকলেন না—রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—সারা বাংলাদেশে আন্দোলন গড়ে তুললেন; সহস্র সহস্র বক্তৃতায় মানুষের অন্তরকে শোষণের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলবার জন্ত প্রাণপণ করলেন। কিন্তু তাঁর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কোন কিছুর ওপর বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। সামনের দিকে একটা মহত্তর অবস্থানে জাগাই তাঁর বক্তব্য ছিল। যেখানে শোষণ সেইখানেই প্রতিবাদ তাঁর সমস্ত ভাষণগুলির মধ্যে আমরা পাই। ধর্মের নামে ভারতের মানুষ যেভাবে শোষিত হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ তিনি রেখে গেছেন তাঁর লেখনীতে দার্শনিক ভাষায়। সব রকম কৌলীন্যের মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন তিনি। শ্রীনিতা-গোপালের ভিতর দিয়ে ভারতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণজীবন ছিল তাঁর জীবনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীনিতাগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন ভারতের নতুন রূপের দর্শন। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা প্রচারের অত্যাচারে ভারতের বুকে কম্যুনিজম্ এসেছে। এই কম্যুনিজম্দ্বারা আমরা ভারতবাসী মুক্ত হই নাই—মুক্তির হই নাই বরং চারদিকে দেখতে পাই বীভৎসতার নগ্ন রূপ। তবে কোথায় সমাধান, কার দ্বারা সমাধান, কেমন করে সমাধান এই ভাবনা প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষকে পেয়ে বসেছে। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে মানুষের জীবনের সামগ্রিক সকল রকম সমস্যার সমাধানের কথা রেখে গেছেন। নরনারায়ণ আশ্রম তার ধারক ও বাহক

আমরা শুধু প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছি। কিসের আশায়? শুধু মানুষের আশায়, সর্বহারা মানুষের আশায়; তবে মানুষ আসবে তাদের কিসিদ তারা নেবে শুধু এই আশায়। অনেকে হয়ত শুনলে মনে করবেন আশ্রম, মঠ মন্দিরবাসী কিসের আশায় মঠ মন্দির আশ্রমে বসে? সে ত ভগবান লাভের আশায়। পুরুষোত্তমানন্দ-প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম মানুষের আশায় আজও বসে আছে, অনন্তকাল ধরে বসে থাকবে যেমন করে ছেয়ে থাকতেন পুরুষোত্তমানন্দ। তিনি বলতেন, "আকাশের দেবতারী আমার ইষ্ট নয়। ধরার ছিন্ন নরনারীই আমার ইষ্ট" সংসারী যেমন করে সংসার করেও সংসারাতীত জীবনে যাপন করতে পারে, সন্ন্যাসী যেমন করে সন্ন্যাসাতীত অবস্থায় চলতে পারে, রাজনীতি করেও যেমন করে রাজনীতি পরাস্ত করা যায়—রাজনীতি দিয়েও রাজনীতি বন্ধ করা যায় এর সুন্দর ছন্দ আমরা পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনে দেখেছি তিনি মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের সুন্দর সমাধান রেখে গেছেন যার দ্বারা বর্তমান পরিবার জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্র জীবন, বিশ্ব জীবন সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে। তিনি ১৩৩৭ সালে উদ্বোধন কার্যালয়ে লিখছেন, "মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাওয়া পরার সমস্যা ও আজই তাহার একটা সমাধানের জন্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যাকুল; দার্শনিকের দৃষ্টি কিন্তু রহিয়াছে বড়র দিকে, চিরন্তনের দিকে, আত্মার দিকে। অনিত্য খাওয়া পরার প্রশ্ন তাহাদের কাছে একটা প্রশ্নই নয়। রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক দুই-ই এইভাবে গোটা সমগ্র জীবন্ত মানুষকে post-mortem করিয়া চিত্তর বাহির, আত্মা দেহ, universal, particular ভেদে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। সমগ্র মানুষই আজ মৃত। জীবন্ত মানুষ আজ মরিয়া রাজনীতিজ্ঞ প্রেত ও দার্শনিক প্রেতে পরিণত হইয়াছে। প্রেতের নৃত্য জগতের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছে"। আমরাও বর্তমান জগতে সকল দিকে এই প্রেতেরই নৃত্য দেখতে পাচ্ছি। পুরুষোত্তমানন্দ লিখলেন, "রাজনীতিজ্ঞের সৎ অসৎ এবং দার্শনিকের সৎ অসৎ একই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন আস্বাদন হওয়ার ফলে আজ ওগুলিকে এমনই গুছাইয়া লইতে হইবে যাহাতে উহারা গোটা জীবনের মধ্যে থাকিয়া পরস্পরকে অস্বীকার না করিয়া চলিয়া পরস্পরেরই পরিপূরক হইতে পারে। খাওয়া পরাও যেমন জীবনের একদিক (apparent), খাওয়া পরার অতীত বলিয়া যাহা কিছু আছে তাহাও জীবনের অপর দিক (ideal)। সমগ্র মানুষের কোনও একটীতেই বাস্তব জীবন চলে না, চলা উচিতও নয়। চাই আজ এমন একটী বৈপ্লবিক জীবন যেখানে আদর্শ ও বিষয় হাত ধরাধরি করিয়া একই সমগ্র সত্তাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিবে"। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ গীতা উপনিষদ্ মন্থন করে কার্যাত্মকরূপে এই বৈপ্লবিক দর্শনেরই আস্বাদন ও প্রচারের প্রয়াস পেয়েছেন। এই ছিল তাঁর সারা জীবনের ব্রত। ব্রহ্ম-জ্ঞানী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন অনুধাবন করলে দেখা যায় তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান তাঁকে জগত-বিমুখ করেনি, বরং অধিকতর জগতমুখী করেছে সুন্দর ছন্দে। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র মন্থন করে তিনি বৈপ্লবিক ভাষায় সে দর্শনের আসল রূপ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। দ্বিধাগ্রস্ত ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের জগতের অবমাননা করেছে, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনিক-শ্রমিক, পণ্ডিত-মূর্খ, নারী-পুরুষ ইত্যাদির কৌলীন্যের শোষণে যে বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে তারই সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে মানুষ-সমাজকে একটানে দিয়ে সত্য মানুষের স্তরে উন্নীত করবার জন্যই বুঝি সুন্দর দেহ সুন্দর মন সুন্দর প্রাণ নিয়ে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। আজকের দিনে সত্যই মনে হয় এমন জীবনবাণীর উৎসবের আয়োজন বছরে মাত্র একবার কেন বার বার তাঁর জীবন-আলোচনা উৎসব ঘটান উচিত। কেননা আমরা সকলে মিলে বার বার তাঁর জীবন-কথা শুনলে এবং সমাজের মধ্যে রূপ দিতে পারলে সমাজের এই চরম গ্লানি দূর করতে পারব। পুরুষোত্তমানন্দ সার্থক হবেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অর্পিত ভাবনে পাওয়া যাবে জড় জগতের বুকেই অজড় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। ভাবনে লিখেছেন, "এই ধরার উপর চলিয়াছে যেমন বৈত্য সমূল রাজাদের শোষণ, তেমনি দর্শন-ক্ষেত্র হইতে, ধর্ম-ক্ষেত্র হইতে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা হইতে শোষণই চলিতেছে প্রচুর।

জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাবে ছাঁচ বসানো হইয়াছিল একটী সিঁড়িতত্ত্ব, একটী উচ্চ-নীচ বিভাগ। এই উচ্চ নীচ বিভাগ কনষ্ট্রীটিউশান দ্বারা কায়েম হইবার ফলেই আকাশ কৌলীন্য লাভ করিয়াছে; আকাশের পূজা, অজড়ের পূজা, চৈতন্যের পূজা প্রবর্তিত হইয়াছে। বিকারগ্রস্থ মাটী হইয়াছে সর্ব্ব নিম্নস্তর; আকাশের পূজা, ভূমার পূজা অপরিচ্ছিন্নের পূজা যাহারা করে তাহারাই শীর্ষস্থানীয় আর যাহারা মাটীর পূজা করে তাহারা ইতর, সমাজে তাহারা ছোট লোক, চাষা। এই দর্শনে মাটীর উপর পড়িল সর্ব্বক্ষেত্রের কুলীনদের চাপ। মাটীর দর্শন জড়বাদ হইল নিন্দিত"। পুরুষোত্তমানন্দ সমস্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব অবলম্বনে দেখালেন যে জৈব রূপ হইতেও নররূপের উৎকর্ষ এই চলার দেশে। "এখানে মাটীর দেশের পশুপাখী তরুগুল্মলতা সকল রক্ত-সম্বন্ধের ব্রহ্মরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে চলিতে চলিতে পৌঁছাইতে হয়, এখানে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে চলিতে হয়। বিশ্বের ব্রহ্মময় রূপের আবিষ্কার করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, "আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি। অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই বিশ্বকে কল্পিত বা মিথ্যা বলিব? এই বিশ্ব দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ দ্বারা অবধারিত হইতেছে"। সেদিনকার ভারতবাসী যদি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের মত শ্রীনিত্যগোপালের এই অজড়সমন্বিত জড়বাদকে জীবনে বরণ করতে পারত তা হলে বুঝি বা পাশ্চাত্যের পরিচ্ছিন্ন নিছক জড়বাদের ভূত এমন করে ভারতবর্ষকে বিকারগ্রস্ত করতে সক্ষম হত না। ভারতের বুকেই যে মানুষের মত বাঁচবার মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল উপনিষদের ভাষায় যা প্রাণদর্শন বলে অভিহিত, যে প্রাণদর্শন "ওঁকার স্থানবে—ওক ওক মুস্তরিবে মন্ত্রা প্রমর ওস্তরিবে" এত খানি শক্তি ধরে। এই মহাপ্রাণ বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে বিধৃত রয়েছে, তারই জীবন্ত ধারক এই শ্রীনিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ।

বিশ্বকবি যে কথা তাঁর সাহিত্যের ভাষায় দিয়ে গেছেন পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর দর্শনের ভাষায় সে কথা মানুষের জীবনের সামাজিক কল্যাণের পথের খবরে রেখে গেলেন সমস্ত মানুষের জন্য. তিনি বলতেন, যে দার্শনিক চিন্তাধারা মানুষের জীবনকে বিকৃত করে ফেলেছে, মানুষের অস্থি মজ্জায় মিশে আছে, তার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ছাড়া বাইরের কোন বিধি বা আইনের দ্বারা তা পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। তাই দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর এই বিপ্লব অভিযান: রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে। সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, ব্রত ব্রত করেছে; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হবে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু স্বর্গ ত কোথাও নেই। তিনি ত স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন—তোমাকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ মূঢ়তার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই ঘুরে ঘুরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘরকন্না শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু আত্মীয় প্রতিবেশী এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি এমনি হবে? না—তিনি বলেছেন 'তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব। আর সব আমি একলা করেছি কিন্তু তোমার জন্যই আমার স্বর্গ-সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্ম নিবেদনের অপেক্ষায় এত বড় একটা চরম সৃষ্টি হতে পারেনি'। সর্ব শক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সন্তান তার সব উপকরণ নিয়ে আসবে ততক্ষণ স্বর্গ-রচনাই অসম্পূর্ণ রইল। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যই এত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি? পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরী হয়েছে—স্বর্গ এখনও বাকি। স্বর্গ লোক বাষ্পাকারে আমাদের হৃদয়ের ভেতরে রয়েছে তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনা-কার্য্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল খাব পরব, সঞ্চয় করব এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এই ভুল ত ভাঙবে। আজ বলবার দিন—তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়ে

ছিলে কিন্তু আমি ভুলে ছিলুম আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম। তোমার সঙ্গে সেই এ গৌরব ভুলে গেলুম"।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই কথাই দর্শনের ভাষায় বলে গেলেন—কবে এ ভূমিত মন্ত্র পড়িয়া তুলিব তোমারেই রসাল নন্দনে। ব্রহ্মের রসাল নন্দন যে এই পৃথিবীর ধূলি কণাতেই তা পুরুষোত্তমানন্দের চোখে ধরা পড়েছিল। সৃষ্টির এক অর্ধ নারায়ণ, অপরার্ধ নর। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নামকরণ করলেন নরনারায়ণ আশ্রম। নর এবং নারায়ণ দুইয়ে মিলেই জগত সৃষ্টি সার্থক হবে। একান্ত নর বা একান্ত নারায়ণ কিছুতেই জগত সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি—অনন্ত কালেও পারবেনা। শঙ্করের একান্ত ব্রহ্ম-দর্শন বাস্তব জগতের মানুষের অন্তরের কান্না থামাতে পারেনি, আজ নিখিলের কান্নায় ব্রহ্ম বুঝি বা অন্তর্হিত। আবার তাই ক্রম বিস্তৃতের ধারা বেয়ে মনীষী কার্ল মার্কসের একান্ত জড় দর্শনের প্লাবনেও মানুষ সুস্থ হতে পারল না—অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এল।

এই অন্ধকারের পথ চিরে চিরে নতুন সকল নিয়ে আজকের এই তিথিতে বাংলার বুকে এসেছিলেন পুরুষোত্তমানন্দ। তিনি লিখছেন, "পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের যত রকমের সমস্যা আজ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার মূল কারণ রহিয়াছে জড়ের উপর, বিত্তির উপর অতিমাত্রায় মূল্য আরোপ করার মধ্যে। এমনিই হয়। মানুষ যখন নিজের সমগ্রত্ব হারাইয়া ও প্রাণের মধ্যে শক্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া প্রজ্ঞাবৈকল্যিক হইয়া বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল তখন মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের মূল্য বাড়িয়া গেল, মাটীর পূজার চেয়ে আকাশের পূজা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল, আদর্শের কাছে বাস্তবের বলি দেওয়া হইল, পতিই নারীর একমাত্র গুরু হইল এবং প্রাগ-দর্শনে নারীও যে পতির গুরু তাহা ভুলিয়া গেল, অন্নবস্ত্রের মর্যাদা স্বর্গ কাড়িয়া লইল, অন্নমানের স্থলে স্বর্গমান প্রতিষ্ঠিত হইল, নিম্নবর্ণ শুদ্র, বর্বর ব্রাহ্মণের কাছে অস্পৃশ্য হইল। এই ভাবে একদিন ঈশ্বর-শাসন কোন রকমে বেশ চলিয়া ছিল। কিন্তু মানুষের সংশয় ও অবিশ্বাস আসিয়া বিশ্ব সমস্যার বাস্তব বীভৎসরূপ মানুষের সামনে ধরিয়া দিল, মানুষ মহাসংশয়ে পড়িল—ঈশ্বর আছেন কি নাই! ঈশ্বর কি দয়াময়? শিব, সুন্দর? যদি তিনি শিব ও সুন্দর তবে এত অশিবত্ব, অসুন্দরত্ব কেন? তবে কি তিনি মায়ার অধীন যে মায়াকে সামলাইতে পারিতেছেন না? জড়ের দাবী এতোই তাবে জড়ের দাবীর কাছে বলি দেওয়া চলে? যাহারা বলি দিবার জন্য প্রাণপণ করিলেন, তাঁহারাই কি শেষ পর্যন্ত সেই জড়ের হাতেই নাকেহাল হন নাই? এই সব সমস্যায় প্রপীড়িত সামাজিক মানুষ তাই ঘরের আর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ডায়লেকটিকের ধারা বহিয়া চিন্তা ধারা চলিল।

কেহ বলিলেন—ঈশ্বর নাই, কেহ বলিলেন ঈশ্বর আছেন কি নাই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। মানুষ আছে, মানুষের শান্তি চাই। মানুষ কৃপার দিকে না চাহিয়া কর্মের ভিতর দিয়াই শক্তি লাভ করিতে পারে। অদৃষ্ট এমন শক্তিশালী নয় যে কর্ম তার গতি রোধ করিতে পারে। কেহ বলিলেন বাস্তবই সত্য, আদর্শ বাস্তবেরই সৃষ্টি। আদর্শ যদি বাস্তবের অনুসরণ না করিয়া চলে, সে আদর্শ আমরা চলিবে না। Beware of those whose God is in the skies. আকাশের আদর্শ লইয়া আমরা মাটির বুকে হোঁচট খাইতে প্রস্তুত নহি। জড়ই একমাত্র Reality, অজড় জড়েরই সৃষ্টি। অপর একদল ঈশ্বরের আসনে মানুষকে বসাইলেন। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য বসিয়া গেলেন। নারীর স্বাতন্ত্র্য বিশ্বময় ঘোষিত হইল। কাস্তে কোদালের সভ্যতা স্বর্ণ সভ্যতাকে পদদলিত করিবার জন্য গর্জন করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাকে উৎখাত করিয়া 'Ye the workers of the world, unite' ধ্বনি দেশে দেশে ধ্বনিত হইল। ধনিকের গদি শ্রমিক কাড়িয়া লইল। বুদ্ধির আসনে শ্রম বসিল। শ্রমিকের চরণতলে ধনিককে টানিয়া নামানো হইল। দ্বিতিধর্মী সমাজ বলিল—ঘোর কলিকাল"। এই বিশ্লেষণে পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, "অন্বয়ের এক প্রান্ত ঈশ্বর, অপর প্রান্ত নিরীশ্বর, মানুষ, জীব জগত; অন্বয়ের এক প্রান্ত অজড়, অপর প্রান্ত

অন্ত; এক প্রান্তে নিত্য, অপর প্রান্তে অনিত্য, এক প্রান্তে স্থিতি, অপর প্রান্তে গতি; এক প্রান্তে একতা, অপর প্রান্তে বহু; এক প্রান্তে বৃদ্ধি, অপর প্রান্তে প্রেম; এক প্রান্তে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা, অপর প্রান্তে ফ্লেচ্ছ-কিরাত সভ্যতা; এক প্রান্তে নর অপর প্রান্তে নারী। বিশ্বের কোন এক প্রান্তকে একান্ত করিয়া তুলিলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অপর প্রান্ত নূতন বলে বলীয়ান হইবে। এই ভাবে প্রান্তে প্রান্তে যখন সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, বিশ্বের organic সত্তা সামাজিক সত্তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তখন এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়া জন্ম গ্রহণ করে সমন্বয়। সমন্বয় হইবে তখনই যখন অক্ষর ব্রহ্মকে উন্নততম এক স্তরে মানুষের সঙ্গে, জীব জগতের সঙ্গে সমন্বিত করা যাইবে। এই সমন্বয় সঠিক হইলে ব্যবহারিক পারমার্থিকের ভেদ কাটিয়া যায়, সংসার সংসার থাকিয়াই সন্ন্যাসের সঙ্গে হাত মেলায়, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হইয়াই সংসারী বনিয়া যান, গার্হস্থ্য ও সংসার গলিয়া একাকার হয়। তখন যিনি mystic, তিনি বৈজ্ঞানিক হন। যুগ সংস্কারক শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়ের এই দুরূহ কার্য্য দার্শনিক ভাবে সমাধান করিয়া লিখিলেন "মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বলিয়া বোধ হয়"।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর আড়াই বৎসর কাল বৃন্দাবনে মাধুকরী করে দিন কাটালেন, আর ওই সব অকলে মানুষের কাছে জীবনবোধের এই তত্ত্ব পৌঁছে দেবার জন্ত ৩ মাসে হিন্দি ভাষা শিখে তাদের ভাষায় এই দুরূহ তত্ত্ব বক্তৃতা করে বোঝাতে লাগলেন। সেখানে দেখলেন উচ্চবর্ণীয়ের কুয়োর জল ধোপারা ছুঁতে পারে না, ভিস্তার জল পায় না। আর বৃন্দাবন প্রভৃতি অকলে জল-কষ্ট সর্ব্বজন বিদিত। তিনি বৃন্দাবন থাকা-কালীন এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান করে এবং তাঁর তাত্ত্বিক ভাষায় বর্ণাশ্রমীয় বর্ণ কৌলীন্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে সফলকাম হলেন। ধোপারা পানীয় জল পাওয়ার অধিকার পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। পুরুষোত্তমানন্দ 'এক-জাতীয়তা' প্রবন্ধে লিখলেন, "যে সমাজে মুসলমানের কুয়োর জল হিন্দুর মুখে পড়িলে তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা হয় শুধু সে সমাজে কি জীবনের মূল্য এতটুকু আছে? এই নিষ্ঠুর সমাজে আচারের সাধনে মানুষ বলি হইয়া গিয়াছে। এই সমাজে যে হিন্দু জাতিও আছে ইহাই আশ্চর্য্য। উচ্চ বর্ণীয়দের মধ্যে একদল যাহারা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন অথচ ইস্পাত-কাঠামো এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে বাহির হইলেন, মুসলমান হইলেন, বা খ্রীষ্টান হইলেন। আর নিম্ন বর্ণীয়দের কথা! তাহারা ত সর্ব্ব সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন। যাহারা সনাতন ধর্মের নেশায় জোর করিয়াই এবম্বিধ সমাজের নিম্নস্তরে পদদলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন তাহারা সিডিউল্ড কাষ্ট বলিয়া ইংরেজ বিধানে উচ্চ বর্ণীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন, উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি বিদ্বিষ্ট। তাহারা হিন্দু সমাজ ছাড়িবার জন্ত এক পা বাড়াইয়াই রহিয়াছেন। যতদিন না হিন্দু সমাজের মূল কাঠামোর মধ্যে হৃদয়কে সঞ্চারিত করা যায়, বুদ্ধিপ্রধান বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণ-সাধনার প্রবর্তন করা যায় ততদিন কিছুতেই আদিবাসীদিগকে, যবন ফ্লেচ্ছ প্রভৃতিকে আপন ঘরে সসম্মানে স্বীকার করা সম্ভব হইবে না। আজ প্রজ্ঞাপ্রধান উচ্চবর্ণ এবং প্রাণপ্রধান নিম্নবর্ণ একই হৃদয়ের সাধনায় ভারতে এক জাতিরূপে গড়িয়া উঠিবে। তাহারই সূচনা দিকে দিকে।" এইভাবে সামগ্রিক জীবন-বোধের একখানি জীবন্ত জীবনের মানুষ ছিলেন শ্রীমৎ-পুরুষোত্তমানন্দ।

আজ তাই তাঁর জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে আপনাদের সকলকে নরনারায়ণ আশ্রম আহ্বান জানাতে প্রয়াসী হয়েছে। এমন একখানি জীবনের ও জীবন-কথার আলোচনার প্রয়োজন বোধে নরনারায়ণ আশ্রম প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে বসে আছে বাংলার মানুষ আসবে, ভারতের মানুষ আসবে, বিশ্বের মানুষ আসবে এই আশ্রমকে সার্থক করতে এই আশায়। আমি ক্ষুদ্র এবং অযোগ্য হয়েও আমার সহস্র নমস্কার জানিয়ে আপনাদের কাছে আমার প্রাণের আহ্বান জানাই নরনারায়ণ আশ্রম যে বস্তু নিয়ে বসে আছে আপনারা তাকে আসুন, তার হাত আপনারা গ্রহণ করুন। পরিশেষে আমি নরনারায়ণ আশ্রমের হীনতম সেবিকা আপনাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত প্রণাম জানিয়ে আমার লেখনী শেষ করছি।

স্মরণে

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

প্রচলিত চিন্তাধারা যখন কুসংস্কারচ্ছন্ন হ'য়ে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে, সমাজ-চেতনা যখন সংকীর্ণ হ'য়ে মানবচেতনার পথ অবরোধ করে, তখন প্রয়োজন হয় এক শক্তিশালী মানুষের—যিনি আপন ব্যক্তিত্বের জোরে সংস্কার ও জড়তার চর কেটে চেতনার নদীতে স্রোত আনতে পারেন। যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই এমন বলিষ্ঠ মানবতার আবির্ভাব ঘটে সাময়িক বিরতিতে। একদা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের আবির্ভাবেও এই ভাবেই ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই জাতির মানসিকতাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। চিন্তার জড়তা মানুষকে শুধু আচ্ছন্ন করেই রাখেনা, তাকে আবিলতায় পঙ্কিল করে তোলে। এই সংকীর্ণ জড় মানসিকতার মরুভূমি থেকে প্রাণের মরুদ্যান আবিষ্কার করার চেষ্টাতেই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবনও অতিবাহিত হয়েছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে (১২৯০ সনের ৪ঠা অগ্রহায়ণ) স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অথবা শরৎকুমার ঘোষের জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ভারতবর্ষের জীবনে এক নতুন স্পন্দনের সাড়া এনে দিয়েছিল। তখন সবে মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস প্রকাশিত হ'য়েছে। সুরেন্দ্রনাথ 'ভারত সভার' সূচনা করেছেন। ইংরাজ শাসনের প্রতি একটি প্রতিকূল মনোভাব জাতীয় মানসিকতায় এক নবচেতনার সাড়া এনে দিয়েছে। ঋষি রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর চিন্তাধারায় ভারতীয়তার নতুন উদ্বোধন। ১৮৬৭ সালের অনুষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা' সমস্ত বাঙালী জীবনে এই স্বাদেশিকতা বোধের ধারাকে অনুস্যূত করেছে।

শরৎকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বরিশাল জেলায়। তাঁর বাল্যজীবনে তিনি অনুভব করেছেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সান্নিধ্য। বিখ্যাত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছেন। একদিকে তাঁর বাল্যজীবনের বরিশাল অশ্বিনীকুমারের চরিত্র-গৌরবে, ত্যাগে ও স্বাদেশিকতায় উজ্জ্বল; অন্যদিকে সুরু হ'য়েছে ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। শরৎকুমার তখন শিক্ষক জগদীশবাবুর কাছে গীতার পাঠ নিচ্ছেন,—কর্ম সন্ন্যাসে যোগে দীক্ষা।

তাই শরৎকুমারের মানসিকতায় একত্রে সমাবেশ ঘটে ছিল স্বাদেশিকতা, হিন্দুত্বের চেতনা এবং বৈরাগ্য ভাবের। ছাত্র শরৎকুমার সত্যে প্রতিষ্ঠিত, চিন্তায় সুদৃঢ়, এবং কর্মে আসক্তি হীন হ'তে পেরেছিলেন। বালক শরৎকুমারের সত্য-বোধ এমন সুদৃঢ় ছিল বলেই একদা পিতার আদর্শকে অবহেলা করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন।

অথচ তাঁর বাল্য আবহাওয়াতে দেশ জুড়ে ধর্মবোধের আর একটি গভীর অনুকরণ। স্বামী বিবেকানন্দ—এক তরুণ সন্ন্যাসী—আমেরিকায় গিয়ে যে ভাবে হিন্দুধর্মের বিজয় গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন, তাতে প্রত্যেকটি হিন্দু যুবকই তখন অভিভূত। শরৎকুমারও তাতে আবিষ্ট করেছেন—"এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। নাম রূপাত্মিকা মায়া প্রভাবেই মানুষ গরু নরেন্দ্র দেবেন্দ্র ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে। নাম এবং রূপ ত্যাগ হইলেই সমস্তই ভগবান বলিয়া বোধ হইবে। তখন রাম কৃষ্ণ আদি এবং আপনি সকলই সেই একের বিকাশ মাত্র।"

বালক বয়সেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। বাউল যাত্রা দিয়ে গান গেয়ে যায়—

"অসার সংসারের মায়া ছাড় রে এবার"

শরৎকুমার ভাবেন—সংসার মিথ্যা, পৃথিবীও মিথ্যা। শরৎকুমার মা-মা করে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন শুধু। কিন্তু এই উদ্দাম অস্থিরতা এই নিরন্তর ব্যাকুলতা শান্ত হ'য়ে এল এক দিন যেদিন মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রভাবেই জীবনের পূর্ণতার রূপ, পুরুষোত্তম রূপকে উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি। তাই ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক রূপে—সমাজ সেবক রূপে—রাজনৈতিক নেতা রূপে—কোন সময়েই তিনি বিশেষ কোন জীবন-ধারার সঙ্কীর্ণ আবর্তে বাঁধা পড়েন নি। যে নিরাসক্তি থাকলে মানুষ তার ব্যক্তি সত্তার ঊর্দ্ধে সর্ব-মানবের চেতনার উপলব্ধিতে মগ্ন হ'তে পারে, সেই নিরা-সক্তিই তাঁর ছিল। কিন্তু এক পরম অস্তিত্বের প্রেমতন্ময়তা শরৎকুমারকে তাঁর ক্ষুদ্র গৃহবাস থেকে পৃথিবীর মাঝখানে টেনে নিয়েছিল।

১৯২০ সালের ভারতবর্ষ স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রবাহে উত্তাল। ইংরাজ সরকারের প্রচণ্ড নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২১ সালে তিনি সমস্ত দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। মানুষের মুক্তি সাধনায় প্রাণের যোগ অনুভব করেছিলেন শরৎকুমার। মুক্তির আলোকে ছাড়া জীবনের সাধনা যে অসম্ভব—এ বোধ তাঁর ছিল বলেই বিনাদ্বিধায় সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীর আদর্শই তাঁর আদর্শ। সত্যের অনুসরণ ও অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ—এই মূলনীতিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ছিলেন বলেই ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক নীতিকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে অবিনিশ্বাস সম্পর্ক ছেদ করতেও তিনি দ্বিধান্বিত হন নি। কারণ কংগ্রেস নয়, বা আন্দোলনের নেতৃত্ব নয়, তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য ছিল সত্যানুধ্যান।

বরিশালের সমস্ত লোক সেদিনের ত্যাগী কর্মী শরৎ-কুমারকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিল। তাঁর নিঃস্বার্থ মানব-সেবা যেমন সকলকে অভিভূত করেছিল, তেমনই মুগ্ধ করে ছিল তাঁর আত্মনিপীড়নের ক্ষমতা। বক্তা শরৎকুমার শুধু রাজনীতি করতেন না, তাঁর কথায় সমগ্র মানুষের জীবনের নীতিই স্থান পেতো। পূর্ণ জীবনবাদের সাধক ছিলেন বলেই একদিন রাজনীতি সমাজনীতি সংসারকে নব নূতন রূপে পাওয়ার জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ রূপে তিনি দেখা দিলেন।

পুরুষোত্তমানন্দের চেতনায় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ: যিনি সমস্ত জগৎ এবং জড় জীবনের অতীত হয়েও তন্ময়, যিনি মানুষের কর্ম ও চেতনার আশ্রয় হয়ে থেকেও সমস্ত মানব সত্তার অতীতে প্রবহমান পরম সত্তা রূপে অধিষ্ঠিত।

সন্ন্যাসী এবং সর্বত্যাগী হয়েও স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাই মানুষের ও সমাজের চিন্তায় জড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখে ফুটে উঠলো এক 'উজ্জ্বল ভারতে'র স্বপ্ন। স্বামীজী দেখলেন যে হিন্দুমানসিকতার যে মায়াবাদের প্রচ্ছন্ন জড়তা, তাকে ভেঙে দিয়ে অস্তিবাদের ধর্মে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তিনি বুঝলেন, দেশ যেমন মাটি নয়, তেমনই স্বপ্নও নয়। সমাজ শুধু নীতি-বন্ধন নয়, আবার শুধু উচ্ছৃঙ্খলতাও নয়। ভারতের মানসিকতায় যে নৈর্ব্যক্তিক আধ্যাত্মিকতা, তার সঙ্গে মিলন ঘটানো চাই পাশ্চিম কর্মানুশীলনের।

পশ্চিমের মানুষ, বিজ্ঞানের মানুষ তার সমস্ত চিন্তার অন্তে যে কম্যুনিজমের প্রেরণা পেয়েছে, তার মধ্যে মানুষ তার পরিবেশ থেকে এবং অন্তর্চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জীবন নিছক একটা স্রোতের প্রবাহ মাত্র নয়, এবং বহির্মুখী চেতনাও নয়। জীবন অন্তর্মুখী অনুভবও। শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় রূপের সঙ্গে সময়ের পরিবর্তিত ও প্রয়োজনীয় চিন্তার সমন্বয়ই জীবন। এক অবিচ্ছেদ্য গতিপ্রবাহের মধ্যে মুহূর্তের স্বতন্ত্র ও খণ্ড খণ্ড রূপের উপলব্ধিতেই জীবনবোধের সার্থকতা।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ৮৮তম জন্মবর্ষের পূর্তিতে আমরা স্মরণ করি তাঁর জীবনদর্শনকে। যে জীবনদর্শনের আলোকে তিনি এক 'উজ্জ্বল ভারত'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে চোখের সামনে রেখেই আমরা যেন জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে পারি।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসত্যব্রত ঘোষ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অথ+অতঃ—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অথ শব্দ অনন্তরার্থে ও অতঃ শব্দ হেত্বর্থে প্রযুক্ত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ যোগেশ্বর এবং ধনুর্দ্ধর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সংবাদ - তাহার জিজ্ঞাসা ; যোগেশ্বর এবং ধনুর্দ্ধর কেমন করিয়া হওয়া যায় তাহা জানিবার ইচ্ছা।

পূর্ব সূত্রের অর্থ হইল—'অথ' কোন কিছুর অনন্তর—অর্থাৎ যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধর কাহারো টানে পড়িয়া যদি কেহ যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহা হইলে সে একজন ক্ষেত্রজ্ঞে পরিণত হয়। কোন একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে মানুষের অহংকার বাড়িয়া যায় এবং তাহাদের মনে করা সম্ভব যে যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধরকে বাদ দিয়াই তাহারা সব কিছু করিতে পারে এবং এই প্রকার মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বহু সময় সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধরকে পর্যন্ত অস্বীকার করে এবং নিজে প্রধান হইতে চায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করিয়া দেখে যে তাহার সামর্থ্য সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞের তুল্য নহে; এই প্রকার অবস্থায়—অতঃ হেতুবশতঃ—সর্ব ক্ষেত্রের যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধর কি বস্তু তাহা জানিবার আগ্রহ হয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। ফলে মানুষ জানিতে পারে যে সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়াটাই মানুষের কাম্য বস্তু।

সূত্রে যে অথ শব্দ আছে তাহার কথা বলিতে যাইয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক—(নিত্য কি অনিত্য কি তাহা অবধারণে কথা)—বৈরাগ্য—(ঐহিক বিষয় ভোগ হইতে বিরত থাকা) শম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম)—দম - (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, উপরত বিষয়ানুভব হইতে বিরত থাকা)—তিতিক্ষা (শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা) সমাধান আত্মতত্ত্বে মনোসংযোগ—শ্রদ্ধা (গুরু বাক্য এবং বেদ বাক্যে বিশ্বাস) মুমুক্ষুত্ব—মুক্তি পাইবার ইচ্ছা)। এইসব সাধন যাহার রহিয়াছে—কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী—অন্য নহে।

আচার্য্য শঙ্কর যে সাধন থাকিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধরের টানে পড়িয়া যাহারা যোগেশ্বর অথবা ধনুর্দ্ধরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়—ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক উপরি উক্ত সাধনসমূহের অধিকারী তাহাদের হইতে হয়।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী যাহারা তাহাদের কথা বলিতে যাইয়া বেদান্ত দর্শনের অবধৃত ভাষ্যে ভাষ্যকারের পুরুষোত্তমের টানে পড়িবার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়—এই কথা বলার ভিতর দিয়া আচার্য্য শঙ্কর নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন থাকিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার হয় বলিয়া যে কথা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

এই প্রকার অবস্থায় ব্রহ্মসূত্রের অবধৃত ভাষ্যের ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর-কথিত নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক প্রভৃতি সাধনের উল্লেখ না করিয়া পুরুষোত্তমের টানে পড়িলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় বলিয়া যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

সূত্রোক্ত 'অথ' শব্দের ব্যাপারে ব্রহ্মসূত্রের অবধৃত ভাষ্যের ভাষ্যকার এবং আচার্য্য শঙ্করের মোটামুটি মিল থাকিলেও সূত্রোক্ত অতঃ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতের মিল নাই।

সূত্রে অথ শব্দের পর অতঃ শব্দ আছে—এই অতঃ শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—যেহেতু অর্থাৎ কর্ম ফলের স্বর্গাদির অনিত্যত্ব হেতু এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পরম পুরুষার্থ হেতু। এবং যেহেতু স্বয়ং বেদই

যুক্তি সহকারে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম ফলের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই হেতুতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

আচার্য্য শঙ্করের এই কথার অর্থ হইল এই যে যাহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার হইয়াছে তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া অগ্নি হোত্রাদি যজ্ঞ করা প্রয়োজন—অন্য কোন কর্ম করিলে অন্ততঃ শুর অতিক্রম করা চলিবে না—ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্যকার তাহা মানেন না।

আচার্য্য শঙ্কর যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে কুমারিল ভট্ট মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি তপস্বী ব্যক্তিরা বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন—ফলে ভারতবর্ষে বুদ্ধবাদের স্থলে বৈদিক যাগ যজ্ঞের কিছু পরিমাণে প্রচলন হইয়াছিল। এই সময়তে যাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্লানি হইতে হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্য বৈদিক যাগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে আচার্য্য শংকরের দুটী অভিযোগ—প্রথমটী হইল—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনে সিদ্ধ না হইয়া—এক কথায় ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারী না হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া,—দ্বিতীয় অভিযোগ হইল নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনসিদ্ধ হইবার পরও কেবলমাত্র বৈদিক যাগযজ্ঞ লইয়াই লিপ্ত থাকিবার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া।

আচার্য্য শঙ্করের কথা ধরা যাক—আচার্য্য শঙ্কর মাত্র সাত বছর বয়সে বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া চৌল খুলিয়া বসিয়া ছিলেন—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া মায়ের অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসী হইলেন এই গেল—অধ ভরের সাধনা।

ইহার পর তিনি মহাযোগী গোবিন্দপাদের কাছে আসিয়া যোগসিদ্ধ হইলেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞে পরিণত হইলেন, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইলেন। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান পাইলে জগৎ সংসারের মহৎ উপকার করা সম্ভবপর নহে—যদি কাহাকেও জগৎ সংসারের মহা উপকার করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে কেবল মাত্র একটী ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে চলে না। পূর্ব্বোক্ত—অতঃ শব্দ দ্বারা এই অর্থের কথা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে গ্লানিযুক্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অপসারিত করিয়া তাহাকে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইহার পর আচার্য্য শঙ্করকে উপনিষদ বেদান্ত দর্শন গীতা এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লেখার মত কাজ করিতে হইয়াছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে হইয়াছে। মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে পরাজিত করিয়া তাহাকে শমতে আনিবার জন্য মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর কামশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ আচার্য্য শঙ্করকে কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবার জন্য মৃত এক রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইয়াছিল।

এরপরে বহু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর যখন মহাযোগী গোবিন্দপাদের নিকট যোগদীক্ষা নিয়াছিলেন সেই সময় আরও কয়েকজন তপস্বী ও মহাযোগীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তাঁহারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকারী ছিলেন না সেই হেতু তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

আচার্য্য শঙ্কর যোগসিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং যোগ এই দুই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞে পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন। অন্যান্যরা কেবল মাত্র যোগের ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কালে আমরা অনেক সাধু ব্যক্তিদের দেখিতে পাই যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া কোন আশ্রমভুক্ত হইয়া নাম জপ ও বিগ্রহের পূজা অর্চ্চণা লইয়া দিন কাটাইতেছেন—কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চা যোগের চর্চ্চা অথবা সাধুসঙ্গের মত কাজ করেন না এবং এই কারণে তাঁহারা সমাজে সাধু বলিয়া সম্মানটুকুই পাইতেছেন তাহাদের পক্ষে কোন একটী বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই ত গেল যোগেশ্বরের ক্ষেত্রের কথা।

এইবার বহুর্দ্ধরের ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি।—বহুর্দ্ধরের

টানে পড়িয়া বর্তমান কালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-সংসার ঘরবাড়ি-ধন সুখ সুবিধা—সব কিছু ত্যাগ করিয়া বহু লোক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। এই সব কর্মীদের কিছু অংশকে বহুবার জেলে গিয়াছে এবং অনেকে আরও বহু প্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়াছে—কিন্তু এই সব রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের চর্চা—ভক্তির চর্চা—অথবা যোগের চর্চা করে নাই—ফলে তাহাদের সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর সমান পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। উচ্চতর কর্মীদের পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব হয় নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর যে সব কর্মী রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ভক্তি যোগ এবং বহু প্রকার কর্মে পারদর্শী হইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞে পরিণত হইতে পারিয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর যাহারা চেষ্টাদ্বারা কোন একটী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারিয়াছে তাহাদের ভিতর কেহ কেহ দেহক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ নেতাকে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া নিজেদের মতবাদ অনুসারে ভিন্ন ভাবে দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু যেহেতু তাহাদের পক্ষে আরও কতকগুলি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেই হেতু তাহাদের ব্যর্থ হইতে হইয়াছে।

কোন একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে মানুষের চরিত্রে অহংকারের সৃষ্টি হয় এবং এই অহংকারের বশবর্তী হইয়া বহু সময় বহু ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞকে অস্বীকার করে এবং নিজে কার্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু একটী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞের পক্ষে কার্যোদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ার কারণে তাহার মনে কেন সফলকাম হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। এই অবস্থাটীর কথা অন্তঃ শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে।

নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধনসিদ্ধ হইবার পর কেহ যদি বৈদিক যাগযজ্ঞকে প্রধান করিয়া তাহার সহযোগী হিসাবে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগকে লাগাইতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে একটী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব।

অনুরূপভাবে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনে সিদ্ধ হইবার পর কেহ যদি নাম রূপ বিগ্রহ সেবাকে প্রধান করিয়া জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং রাজযোগকে লাগাইতে পারে তাহা হইলে তাহারও পক্ষে একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব।

যোগেশ্বরের ক্ষেত্রে—বৈদিক যাগযজ্ঞ নামরূপ ও বিগ্রহের সেবাপূজা রাজযোগ জ্ঞানযোগ এবং ষড়ৈশ্বর্যের ক্ষেত্র কর্মযোগ রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেষ্টা সব ক্ষেত্রেই একটি পদ্ধতিকে প্রধান করিয়া অন্যান্যের সহযোগী করিয়া তপস্যা করিলে কোন একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়াটাই শেষ নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গুরুদেব মহাত্মা তোতাপুরী ছিলেন এমন একজন যোগসিদ্ধ পুরুষ—একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি। মহাত্মা তোতাপুরী যোগ সমাধির কাতর হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইয়া পুরুষোত্তম বস্তুর দর্শন পাইয়া ছিলেন। কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞানে কুলায় নাই।

সর্ব দেবতাদের তেজ হইতে চণ্ডীর দেবী দুর্গার উৎপত্তি এবং ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্র লইয়া যাহারা চর্চা করেন তাঁহারা সকলেই জানেন।

যোগপ্রধান সর্বক্ষেত্রের যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি যোগেশ্বর এবং কর্মপ্রধান সর্ব ক্ষেত্রের যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি ষড়ৈশ্বর্য এবং এই দুই জনই ব্রহ্মবস্তু। কোন একটি বিশেষ পথের ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মবস্তু নহে। এই কথা পরিষ্কার ভাবে বলিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্যকার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী কে তাহা বলিবার জন্য নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়া পুরুষোত্তমের টানে পড়ার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কথা বলিয়াছিলেন।

এই সূত্রে যে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহার অর্থ ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্যকার কেন পুরুষোত্তম করিলেন এবং উহাকে আর একটু পরিবর্তন করিয়া যোগেশ্বর এবং ষড়ৈশ্বর্য কেন করা হইল এইবার আমরা তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত, ভাগবত

প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণের লেখক। আর্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেদ এবং উপনিষদের পরে যে বেদান্ত দর্শনের স্থান তাহারও লেখক বেদব্যাস। এই বেদব্যাসই চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ গ্রন্থ গীতারও সংকলয়িতা।

বেদব্যাস কর্তৃক সংকলয়িতা শেষ গ্রন্থখানি গীতার শেষ শ্লোকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়াছেন যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর অর্জুন সেইখানে ধ্রুব শ্রী, সেইখানে ধ্রুব বিজয়, সেইখানেই সকল ধ্রুব হওয়ার চরম পরিণতি ধ্রুব নীতি—ইহাই তাঁহার মত।

উপরি উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী যে ব্যক্তি তিনি ব্রহ্ম অর্থ যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধরের মিলিত অবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অবধূত ভাষ্যের গ্রন্থকার এই অবস্থাটীকে এক কথায় বলিবার জন্য সূত্রোক্ত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া পুরুষোত্তম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সূত্রোক্ত ব্রহ্ম শব্দের অর্থে পুরুষোত্তম বলিলেও কিছু অস্পষ্টতা উপস্থিত হইতে পারে সেই অস্পষ্টতা দূর করিবার জন্য আমি ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধর করা সমীচীন মনে করিয়া ব্রহ্ম শব্দের অর্থে যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধর এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে।

এই কথার পর স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বেদব্যাস যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধরের মিলিত অবস্থা এক কথায় পুরুষোত্তম চরিত্রকেই বুঝাইবার জন্য যদি এই সূত্র লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনিই কেন সূত্রে ব্রহ্ম শব্দের বদলে পুরুষোত্তম অথবা যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধর এরূপ লিখিলেন না ?

তাহার উত্তর হইল—সমাজে যখন যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধর এই উভয় ক্ষেত্রে বিরাটের সৃষ্টি হয় তখন যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধর এই দুই দল লোকের উপস্থিতির দরকার হয়। কিন্তু সর্ব সময়ের জন্য যোগেশ্বর এবং ধনুর্ধরের মিলিত ভাবে উপস্থিত থাকার দরকার হয় না। সমাজের কোন কোন অবস্থায় কেবল মাত্র যোগেশ্বর, অন্য কোন সময় কেবল মাত্র ধনুর্ধর, অন্য কোন সময় দুইজনের উপস্থিতি থাকিলেও সমাজ চলে।

যেহেতু বেদান্ত দর্শন সর্ব অবস্থার শাস্ত্র সেইহেতু এই গ্রন্থে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাকে বিভিন্ন রকমে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা চলে এবং এই প্রকার শব্দ হইতেছে ব্রহ্ম শব্দ। এইজন্য বেদব্যাস এই সূত্রে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

বন্ধুগণ,

আজ আমরা সবাই সমবেত হয়েছি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ৮৯-তম জন্মকে স্মরণ করে। এই কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীর দিনটীতে আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আজ আমরা তাঁকে জানাই আমাদের প্রাণের প্রণতি। আর সেই সঙ্গে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকেও আমাদের সকল প্রাণের প্রণাম নিবেদন করি। আপনারা এসেছেন—এতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কত খুশী হয়েছেন, তা যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা উপলব্ধি করছেন। আশ্রমের পক্ষ থেকে আপনাদের আমি সাদর সম্ভাষণ জানাই, আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের আনন্দ জানাই। এই সঙ্গে একটী বেদনার কথাও স্মরণ করি। গত বৎসর এই দিনে আমাদের যে বন্ধুরা আপনাদের সঙ্গে বসে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনকথা আলোচনা করেছিলেন, সেই পার্বতীনাথ বিশ্বাস—আমাদের চিনুদা—আজ উপস্থিত নাই। আপনারা অনেকেই জানেন বড় আকস্মিক ও

বেদনাপূর্ণহৃদয়ে তাঁকে শ্রীভগবান এ সংসার থেকে নিয়ে গেছেন গত বছর মে তারিখে। আপনাদের সকলের সঙ্গে আমাদের সেই চিরস্মরণীয়ার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করছি। চলে যাওয়া চিরদাকে স্মরণ করার সঙ্গে মনে পড়ল আশ্রমের আর দুইজন সেবিকা যারা কয়েক বৎসর আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমাদের সেই প্রতিষ্ঠাত্রী ও নায়িকাকেও আজ স্মরণ করছি। তাঁদেরকে জানাচ্ছি আমাদের প্রীতি।

আজ এই শুভ ক্ষণটিতে বসে আমরা আমাদের আত্মার আত্মীয় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে ও দর্শনে আজকের দিনের জন্য নূতন কোনো সমাধান আছে কিনা তারই খোঁজ করব। পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে আর তাঁর পথ-প্রদর্শক শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে সত্যিই একটা নূতন জীবন-চেতনার খোঁজ পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্য, অন্তর্মুখীন বহির্মুখীন, কোগবাদ ও ভোগবাদ প্রভৃতি এক একটী ঐকান্তিক একপেশে চিন্তাধারা যে মানুষের সত্যিকারের সমাধান নয়—সেটা অনেকেরই বোধের মধ্যে এসেছে। চারদিকে আজ এই যে এত দ্বন্দ্ব—এ তো কেবল আমাদের বুদ্ধি দোষে। কোন কিছুকে একান্তভাবে অস্বীকার করে অপর কোন কিছুকে একান্তভাবে স্বীকার করলে দ্বন্দ্বের সমাধান কিছুতেই হবে না। ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বত্র এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতির সামঞ্জস্যহীনতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সব সমস্যা। ঘরে বাইরের এই পরিবেশে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কি হতে হবে, কি হলে তার নিজের ও তার চারপাশের সমস্যাগুলি সমাধানের পথে যায়, মানুষের ভিতরে বাইরে দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ জীবনের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও তা সামঞ্জস্যের সুষমায় মণ্ডিত হতে পারে কি করে—তার পথরেখা পাব পুরুষোত্তমানন্দের চিন্তাধারায়, দৃষ্টান্ত পাব পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে।

এক সময়ে মানুষ ভেবেছে কোন কিছুকে একান্তভাবে পরিত্যাগ করা বা কোন কিছুকে একান্তভাবে গ্রহণ করাই জীবনের চলার পথ। সেই ত্যাগ ও গ্রহণে আসল জীবনের যাই হোক না কেন। কিন্তু এটা মনুষ্যত্ব নয়—মানুষ যা কিছু দিয়ে তৈরী তা এই বলে যে, সেই সব কিছুকে, হোক তারা পরস্পরবিরুদ্ধ, বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব—এই বিকাশে বিকশিত করে তুলতে কোথাও কিছু ত্যাগ করতে হয়, কোথাও কিছু গ্রহণও করতে হয় বটে কিন্তু মূল জীবনী শক্তির বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রেখে কোন একদিককে একান্তভাবে বাড়িয়ে তুলে আর একদিককে একান্তভাবে দাবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে কোথাও অনেক থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে সত্য নেই, মানুষের জীবনের সত্য নেই। এই নূতন জীবন-সত্যের দৃষ্টান্ত রেখেছেন পুরুষোত্তমানন্দ।

পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের যে সন্ন্যাসীত্বের কাছে 'রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্ম লাভ করেন'—যে কথায় স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঐ ভাষায় তাঁর 'নটীর পূজা' নাটকে—পুরুষোত্তমানন্দ সেরকম সন্ন্যাসী ছিলেন না। রক্তের দাবীকে অস্বীকার করে তিনি আত্মার দাবিকে উচ্চ মূল্য দেন নি—তাঁর কাছে সমগ্র জীবনে উভয়েরই তুল্য মূল্য—এই সমান মূল্য, সম মানের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিতেও হবে। এই সম মানের ভিত্তিতে পরস্পরবিপরীত-ধর্মীর মধ্যে সামঞ্জস্যের কথা জানতো না বা মানতো না বলে মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে এত দ্বন্দ্ব দৈন্য নাইনা। সম মানের ভিত্তিতে এই সামঞ্জস্য আনতে হবে নর নারীতে, ধনিকে শ্রমিকে, শাসক শাসিতে, উচ্চ নীচে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে। সামঞ্জস্য আনার সূত্রটা হবে মনুষ্যত্ব—মানুষ বা মনুষ্যত্ব বাদ দিয়ে কোন একপেশে মতবাদেরই কোন মূল্য নেই—থাকা উচিত নয়। পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য বা অসন্ন্যাসের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে সামঞ্জস্য আনবার চিন্তাধারা ও জীবন রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের পুরন্দর সন্ন্যাসীর বক্তব্যের দৃষ্টান্ত পুরুষোত্তমানন্দে পাওয়া যাবে। তিনি কেমন সন্ন্যাসী এ প্রশ্নের উত্তরে পুরন্দর বলেছিলেন, 'ঠিক যেমনটী হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই

নেই তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, অম্বর বিশ্বাম্বর হয়ে'। এই বিশ্বাম্বরত্বই পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনদেবতা শ্রীমিত্রানন্দনাথের cosmopolitan হওয়া। পুরুষোত্তমানন্দ সেই সন্ন্যাসী তিনি বলতে পারেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ'—কেননা তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল, রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ছিল, সমাজ জীবন ছিল—কিন্তু এ সবই তাঁর কাছে ছিল 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'—বন্ধন পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে গ্রন্থি সৃষ্টি করতে পারে নি। 'পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া'—এ যেমন তাঁর জগৎকে পাওয়ায়, তেমনি জগৎ-অতীত সত্তাকে পাওয়ায়। পেয়ে পেয়েই চলেছেন তিনি না পাওয়ার মধ্যে। প্রেম তাঁর কাছে 'মুক্তির্ন্তুতা সনাতনী'। প্রেম—ভগবৎ-প্রেম, মানুষ-প্রেম, দেশ-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম—কি করে মানুষকে মুক্ত করে দেয়—পুরুষোত্তমানন্দ তারই দৃষ্টান্ত। কি ভগবানকে, কি মানুষকে, কি দেশকে জীবনের চলার পথে কাউকে তিনি বাদ দেননি—সব কিছুকে তিনি সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। এই সবকেই তিনি ভালবেসেছিলেন কোন প্রয়োজনে নয়—ভাল না বেসে পারেন না, ভাল না বাসলে ভাল লাগে না—তাই ভালবেসেছিলেন। ভগবানকে ভালবাসতেও তাঁর ভাল লাগে, মানুষকে ভালবাসতেও তেমনি ভাল লাগে, দেশকে বিশ্বকে ভালবাসতেও তাঁর ততখানিই ভাল লাগে। দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শিক্ষা-অর্থ-নরনারী নির্বিশেষে প্রতি মানুষের জন্যে যেমন ছিল তাঁর অন্তরতম প্রদেশে একটা সহজ স্বাভাবিক গভীর আকর্ষণ, তেমনি মানুষের ভিতরে বাইরে মানুষ রূপে যা অরূপে রয়েছেন যে ভগবান, তাঁরও জন্যে ছিল তাঁর প্রাণের একটা গভীর ক্রন্দন—সে ক্রন্দন প্রেমের একান্তভায়—তা শূন্যতার হাহুতাশ নয়। তাঁর জীবন-দর্শন বলছে শুধু ভগবানকে উপলব্ধি করলেই জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন হয় না, মানুষকে দিয়েও নিজেকে ভরিয়ে নিতে হবে, নইলে মানুষ আমার পূর্ণতা আনবে না। তাঁর মতে আপনাকে আমি স্বীকার করব, ভালবাসব এই জন্য নয় যে তা না হলে আপনি আমায় আঘাত হানতে পারেন, আমার ক্ষতি করতে পারেন, আপনাকে স্বীকার না করলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। আপনাকে ভালবাসব এই জন্য যে আপনাকে ভাল না বাসলে, আপনাকে মর্যাদা না দিলে আমার প্রাণ তৃপ্ত হয় না, আমার প্রাণে বেদনার সৃষ্টি হয়, আমার জীবনের পূর্ণতা আসে না। ভগবান যেমন বুদ্ধিগুলি দিয়ে এই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তার সেই মানুষের ভুল হয় না যার আপনাকে আমি ভাল না বাসি

এই মনোবৃত্তি নিয়ে ভগবানকে, মানুষকে, দেশকে আপনাকে কি সংসারের চেহারাটা নূতন রকম হয়ে যায় না? নিশ্চয়ই হয়। এইটেই আজ দরকার—এইটেই আজ নূতন কথা, নূতন জীবন-চেতনা।

তাই যদি পুরুষোত্তমানন্দ সংসারকে বন্ধন মনে করে বা সংসার ভাল লাগে না বলে সন্ন্যাসী হন নি, তিনি তাঁর সংসারকে সঙ্গে নেওয়াই তাঁর ব্যক্তি-সংসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-সংসারকেও আত্মার সুষমায় মণ্ডিত করতে আর জীবনের যাবতীয় গভীরতার সৌন্দর্যে প্রাণপূর্ণ করে তুলবার প্রেরণায় সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন। যে ভারতবর্ষে সন্ন্যাস মানে জীবন-বিমুখতা এবং কতকগুলি বিধি নিষেধের বেড়াজালে ছোঁয়াছুঁয়ি হাঁড়িকুঁড়িকির নির্দেশে চালিত একটা বানিয়ে তোলা অসহজ জীবন, সেই ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী হয়েও তিনি বাস্তব জীবনটাকেই যোগের আলোকময়ক এবং ত্যাগের শ্রীমণ্ডিত করবার প্রচেষ্টাই করে গেছেন। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী কর্মকে বন্ধন বলে জানেন পুরুষোত্তমানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-কথিত কর্মের সুকৌশলী বিশ্ব-সেবাবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্মকেই জীবনের ভিত্তি বলে জানেন। আত্ম অহং-প্রধান অহং-কেন্দ্রিক কর্ম আবর্তই সৃষ্টি করে বটে। তেমন কর্মও পুরুষোত্তমানন্দ করতে বলেন নি তিনি জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্ত লোকহিত কর্ম বিশ্ব-সেবাবুদ্ধিতে প্রতি মানুষকে আবশ্যিকভাবে করতে বলেছেন। মানুষ যদি এইরকম কর্ম অনাসক্ত ভাবে করে চলে তাহলে সংসারটা ঘৃণা বিদ্বেষ আসক্তির নরকভূমি হয় না। আমরা নিজেদের বদলে নিতে চাই না—কোন্ ভাবে চললে

আমাদের সংস্কারগুলি আরও জটিলতর না হয়ে সরলতর হয় সে পথের খোঁজ করতে চাই না, আমরা আমাদের চারপাশকে সঙ্ঘের বিরক্তি বিদ্বেষ ঘৃণার চোখে দেখি, এ কথা ভাবতে শিখি নি যে আমার পরিবেশকে নিয়েই আমি আমি—তাকে আমি নিজ বলে দেখতে না পারলে সে আমাকে বেড়ই কাটবেই। আমি আর আমার পরিবেশ মিলিয়েই আমার সত্তা রূপ, এ কথা যেদিন আমরা নিত্য কাল থেকে নিখর, সেদিন কাউকে বাদ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মোহ আমাদের দূর হবে। সেদিন আমরা মানুষ বলে অভিহিত হবার যোগ্যতা লাভ করব। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তা বলতে আমরা নি সেটা তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীগোপালের নীচের কথাগুলি থেকে স্পষ্ট হবে—'সম্প্রদায়-গঠন আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহা হইলে আমি নিশ্চয় সিদ্ধ করিতে পারিতাম।...আমি দল গড়িতে আসি নাই। সাম্প্রদায়িক ভাব খুবই খারাপ—ইহাতে কোন না কোন ধর্মমতের বা সম্প্রদায়ের বা মহাপুরুষের নিন্দা করিতেই হয়।...আমি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট যেমন বহুরূপী, আমি সেইরূপ বহু সম্প্রদায়ী। আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন শৈব, তিনি যখন বিষ্ণু হন আমি তখন বৈষ্ণব, তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই।...আমি হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান।...I am a cosmopolitan। প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়।' এমনই এক মানুষ-ব্রহ্ম বর্তমান যুগের মানুষের দাবী। আকাশের দেবতা কাল্পনিক—কল্পনার সাধ্য কি মানুষের সকল দিক পূর্ণ করে? মানুষের দরকার মানুষের প্রয়োজন। কেমন মানুষের? যে কোন রকম মানুষই তো মানুষকে আনন্দ দিতে পারে না। উদার বিরাট ব্যাপক মানুষের সঙ্গ এবং সঙ্গে থাকলে মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে—কোন ক্ষুদ্র একদেশী জীবন-চিন্তা আজকের মানুষের প্রয়োজন নেই।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই তথ্য মায়াবাদ অনুযায়ী এই দেশে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জগৎকে ব্রহ্মের সমমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে লিখেছেন সঙ্ঘের স্থাপনার আগে তাঁর 'উদ্বোধনে'—"...শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন প্রেমধর্মে, চণ্ডীদাস-রে, তুমি মধুরভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে। তাই তিনি ধূলায় লোটান, মাটির কান্নায় প্রেম-কান্নায় গড়িয়া তুলা অশ্রুর নয়নে কাঁদেন। (শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায়) শুষ্ক সাম্যবাদীকে প্রেমান্বিত করিয়া ধরা নিজ ব্রহ্মরূপ আস্বাদিল; দিকে দিকে সিঁড়িঘরের সাধনার উচ্চ সব 'ফোঁপর' ধরা আকাশ চুম্বন চুম্বিত হইয়া ব্রহ্মরূপে উদ্ভাসিত হইল। চক্ষুর প্রকৃতি অন্ধকারে অমৃত দেখে মন্ত হইল, শেষে প্রাণ তাঁকে তাঁকে ডাকতে ডাকতে পাগলপারা আকুল হইয়া উঠিলে যেমন প্রতি দুইটী ব্রজগোপীর মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলো এই চলার দর্শন কোন প্রভাবে বেশীদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই স্তব্ধ হইল। কেন না সিঁড়িঘরের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করিলেও, সব ছোটদের তিনি শ্রীগোপালীয়দের সঙ্গে কোলাকুলি করাইলেও দার্শনিক-ভাবে সিঁড়িঘর কাঠামো না বদলাইবার ফলে তাহা সমাজে বন্ধমূল হইবার সুযোগ পায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আরব্ধ কার্যকে পরিসমাপ্তির দিকে আগাইয়া দিবার ব্রত লইয়া এক শত বৎসর পূর্বে শ্রীনিত্যগোপাল বাঙলার বুকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দার্শনিকভাবে স্থাপিত করিলেন মায়ার পারমার্থিক মূল্য, পরিণামের পারমার্থিক মূল্য, 'অন্নের পারমার্থিক মূল্য' 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাক্যের যথাযথ মর্মও তিনি দিলেন। এ বিশ্বের সব কিছুর ভিতরে যে অনন্ত ব্রহ্ম-সম্ভাবনা ঘুমাইয়া আছে, সচ্চিদানন্দ-সত্তাই যে সব কিছু পরিচ্ছিন্নের অন্তরে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন রূপে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন—ইহা দার্শনিকভাবে তিনি প্রস্থাপিত করিলেন। এই বিশ্বে অস্তি 'অন্য' 'এক ও অদ্বিতীয়'। প্রতিটী বস্তু এখানে স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য, কেবল। এই বিশ্ব অনন্ত অদ্বিতের মেলা, অদ্বয়ীন কেবলের মেলা। সিঁড়িঘর আজ এ বিশ্বে অচল।...চকলতার স্পর্শ-রহিত 'অচল-ব্রহ্ম' আজ অচল। শ্রীনিত্যগোপাল এই 'প্রত্যক্ষ' পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সিঁড়ির নিম্ন ধাপ ও ব্রহ্মাকাশকে

তাহার উচ্চতর দাম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মাটির স্পর্শহীন আকাশ মানুষকে পদে পদে বিপদেই ফেলিতেছে; আকাশের দিকে চাহিয়া পথ চলিলে 'প্রত্যক্ষ' জগতের সঙ্গে পদে পদে ঠোকর খাইয়া মরিতে হয়—ইহার দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ষে।...এই "বিশ্বকৃতানি" ব্রহ্ম-সত্তার এতখানি—ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। মন্দিরের চূড়া যত উচ্চ হইবে, মন্দিরের ভিত্তি তত গভীর হইতে হইবে। ব্রহ্মের যত উচ্চতম আধ্যাত্মিক ব্রহ্মধামে এঁরা বাস করিয়াছেন, এই বিশ্বের তত গভীরতম বিশ্লেষণের পরিচয় তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল ভক্তের পূর্ণ স্থাপন করিয়া চরম বিশ্লেষণ-প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছেন। সাক্ষাৎকার যে কোন অংশে বাস করিলেই সাক্ষাৎকার বলা হয়, গঙ্গার যে কোন অংশে স্নান করিলেই গঙ্গাস্নানের ফল হয়। অংশে পূর্ণ হইলেই প্রকৃতি পূর্ণপ্রকৃতিনী হইতে পারেন। ব্রহ্মধামের মাটি ব্রহ্মময় বলিয়াই ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপূর্ণ আস্বাদন সেখানে সম্ভব হইয়াছিল। বিশ্বজননী এই ভূমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তুকে বুকে স্থান দিতে সক্ষম। প্রত্যক্ষ এই বিশ্বের পারমার্থিক ভিত্তি অস্বীকৃত হইলে ব্রহ্মবস্তুই 'আকাশবৎ নিরালম্বঃ বায়ুবৎ নিরাশ্রয়ঃ' হন। এই বিশ্ব ব্রহ্মের আধার বলিয়াই নিত্য"।

এই নিত্য ও সত্য বিশ্বে কি করে দেহে মনে আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে—মানুষের সেইটাই সমস্যা। সেটার সমাধান করতে হলে মানুষে মানুষে বা মানুষে বস্তুতে সম্বন্ধটা স্থাপিত হবে কোন্ মনোভাব দিয়ে—তাই আগে স্থির করা দরকার। আজকের দিনে পারস্পরিক সম্বন্ধটা হবে স্বাধীনে স্বাধীনে—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অপেক্ষমানও বটে। একজনে কেউ কারো অধীন নয়, আবার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধীন। কেন না আমি স্বাধীন স্বতন্ত্র জনন্ত সত্তা—এমনি প্রত্যেকে, আবার যেহেতু আমরা সমাজ গড়ে বাস করবই সেহেতু অপরের অপেক্ষা প্রতি পদে আমাদের করতেই হবে। রাষ্ট্র ক্ষেত্রেও সেই কথা—এ বলে প্রত্যেকটী রাষ্ট্র স্বাধীন থাকবে, অথচ প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায়ে বিশ্বে একটী মাত্রই রাষ্ট্র হবে। স্বাধীন স্বাধীনে কোলাকুলি করে, প্রত্যেকে অপরের মান মর্যাদা স্বীকৃতি দিয়ে অথচ নিজের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে আত্মআস্বাদনের পথে এগিয়ে যাবে।—এইটেই এ যুগের দিনে পারস্পরিক সম্বন্ধের সূত্র যেমন হবে তেমনি মানুষের চলার পথের নিশানা হবে।

স্বাধীন হতে গেলে বা থাকতে গেলে স্বভাবতঃই যোগ্য হতে হবে। সেটা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেমন, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি। যতক্ষণ অপরের অধীন তখন তার দায় দায়িত্ব অপরের—আমি যাই করি ঐ পরস্থই। কোন অধিকারও নাই, যোগ্যতারও তেমন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখনই স্বাধীন হওয়া গেল, আমার অধিকার তখনই আসতে বসিল, আমার সব কর্তৃত্বও তখন আসবে, দায় দায়িত্বও আমার। তখন যোগ্য আমাকে হতেই হবে। আমি যখন কি সামাজিক সম্বন্ধে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরের দাসত্ব না করে আমার কর্তৃত্ব আমারই থাকবে বলে মানি, তখন আমার দায়-দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। তাই যোগ্যতা অর্জন আজকের দিনে বিশেষ কথা। ঘরে বাইরে যত বেশী যোগ্য হতে পারব, কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে প্রেমে যত বেশী নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারব—জীবনের দায়দায়িত্ব বহন করে নিজের স্বাধীন সত্তা রক্ষা করার ক্ষমতা ততই আমি অর্জন করব। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজকের দিনের মানুষকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ঐ ভাবেই স্বাধীন হওয়ার মন তৈরী করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে যোগ্যতা অর্জন করতে বলেছেন। তাঁকে তিনি অপরের অধীন হয়ে অপরের দাসত্ব করে জীবন কাটাতেও যেমন বলেন না, তেমনি আবার কেউ অপরের এতটুকু অমর্যাদা অসম্মান করে তাও তিনি সহ্য করতেন না, এবং এখনও তিনি বলেন নি যে স্বাধীন হলেও অপরকে বাদ দিয়েই একজনের চলতে পারে। সকলের সঙ্গে জ্ঞানে কর্মে সকল বিষয়ে যোগ্য হয়ে ওঠা যেমন তিনি মুখ্যতাত্ত্বিক বলতেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে

সংযম, শৃঙ্খলা, সুষ্ঠু আচার আচরণ, নিজে শ্রদ্ধা, পরস্পর পরস্পরের হৃদয়কে জানা ও মর্যাদা দেওয়া এসব দিকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন—এসব আচার ব্যবহারের সুষ্ঠুতা ও শৃঙ্খলা যার নিজে নিজেকে ব্যক্তিজীবনেই সর্বতোভাবে পরিপুষ্ট করে তোলার যে প্রচেষ্টা তাকে তিনি কখনই সমর্থন করেন নি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এইভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা পরিপূর্ণ দর্শন, সামগ্রিক দর্শন রেখে গেছেন যেটা প্রতি ক্ষেত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে পরিণামে করে এগিয়ে যেতে আমাদের পথ দেখায়।

সিঁড়িতত্ত্ব দার্শনিক ব্যবস্থার কথা আগে উল্লেখ করেছি। আমাদের সর্বশাস্ত্রীয় চিন্তাধারা এই সিঁড়িতত্ত্বের মেনে আসছে। এটা হচ্ছে কোন একটা গুণ বা অবস্থা উঁচু-কুলীন—আর একটা নীচু, অতএব, অপর একটা তার চেয়েও নীচু—এই রকম। গুণের ক্ষেত্রে এই উঁচু নীচু কুলীন অকুলীন করা হয়েছে বলেই মানুষের ক্ষেত্রে ও বস্তুর ক্ষেত্রে সেটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেছে। সাত্ত্বিক গুণকে সিঁড়ির উপরের ধাপ, অতএব কুলীন শ্রেষ্ঠ, তারপর রজোগুণ, তারপর তমোগুণ—এই ধারে সাত্ত্বিকে সাত্ত্বা রজো তমোগুণের মধ্যে উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতার ব্যবস্থা হয়েছে। তার তদনুসারে এই বেদব্যাস দর্শন তথা সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও টেনে আনা হয়েছে—তাই সাত্ত্বিকতাপ্রধান ব্যক্তিরা কুলীন, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিরা তার নীচের ধাপে, তমোগুণীদের একেবারে তলায় রাখা হয়েছে। এই সিঁড়িতত্ত্ব আবার জন্মগত বলেও ধরা হয়েছে। এই দুই ব্যবস্থার সমাজের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধিটা এত পক্ষ শেকড় গেড়ে বসেছে যে বাইরের জগতে যত জনকেই আমরা যেনে নেই না কেন আমরা সাত্ত্বিকতা যে কুলীন, ব্রাহ্মণত্ব যদি সত্যিকারের হয় তাহলে সেটা যে সর্বোচ্চে—একথা বেশ জোরালো ভাবেই বহু মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে। অবশ্য বিপাকে সবই মেনে নিতে হচ্ছে তাই অনেকেই অনেক কিছু মানে। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব যাতে তমোগুণপ্রধান শূদ্রত্ব জীবনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য যে রজোগুণ—অতএব মনের প্রত্যেকেরই যার যথাস্থানে দম মান ও মূল্য, এ কথা আজও মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়নি বলা যেতে পারে। মানুষে মানুষে সমতা আনতে হলে গুণের ক্ষেত্রে চিন্তা বৃত্তির ক্ষেত্রে সমতা, অপরিহার্যতা, উচ্চ নীচহীনতা মানতেই হবে—এই মূলের পরিবর্তন শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ রেখেছেন। ঠাকুর পূজা করা কিংবা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা যত কাজ—আর ঘর ঝাড় দেওয়া কিংবা পায়খানা সাফ করা কিংবা যে কোন কর্ম করা ছোটকাজ, ছোটলোকের কাজ—এই যে ভেদবাদের বুদ্ধি ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে—সেই ভেদবাদের সামনে যে কোন কর্ম, যে কোন গুণ বা যে কোন বৃত্তি ব্রহ্মকর্ম, ব্রহ্মগুণ বা ব্রহ্মবৃত্তি এবং প্রত্যেকটাই জীবনকে পরিপুষ্ট করছে বা বাঁচিয়ে রাখছে—একথা বোঝান এক প্রকাণ্ড কাজ এবং সেইটে দার্শনিকভাবে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রস্থাপন করে গেছেন। বর্তমান যুগের ঘটনাবলীকে সামনে রেখে জীবনের সর্বস্তরে সাম্যবাদ স্থাপন করতে হলে গোড়ায় এই গুণসাম্য স্থাপন করা ভিন্ন পথ নাই। এই দৈপ্রবিক কাজটীর গোড়া পত্তন করে গেছেন পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সূত্রানুযায়ী।

এইভাবে বিপ্লবী দার্শনিক অথচ একান্ত সহজ মানুষ, আপন হইতেও আপন পুরুষোত্তমানন্দ একটী জীবনদর্শনের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ছিল একটি ঝরঝরে মুক্ত স্বচ্ছ আনন্দিত জীবন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে বা তাঁর কথা শুনলে যেমন ভাল লাগে, তেমনি তা বুদ্ধির সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণকে তৃপ্ত করে, তেমনি তা শ্রদ্ধা নিয়ে ভক্তি প্রেমে আপ্লুত, আর তা সেই সঙ্গেই মানুষকে সংগঠনাত্মক কর্মে আহ্বান করে। তাঁর নিজের জীবনখানা যেমন ছিল সামগ্রিক তেমনি তাঁর আলোচনা একটী সামগ্রিক জীবন-চেতনাকে তুলে ধরত। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ অন্তর্কেন্দ্রিক ও একদেশে বা একদেশদর্শী হয়, তাই তাঁর আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করলেও তা তারা গ্রহণ করে উঠতে পারে না। তাই আজও এ চিন্তা মানুষের কাছে নূতনই। আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের এই ৮৯-তম জন্মক্ষণে বসে এই নূতন কথাগুলি স্মরণ করি, আপনাদের কাছে উপস্থিত করি। যদি নূতন সমাজ-গঠনে এদের প্রয়োজন আপনাদের কাছে ফুটে ওঠে সেই বাসনাতেই এই প্রয়াস। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মানেই এই তত্ত্ব—তাঁকে স্মরণ করা মানে যে কথা ও আচরণ তাঁর জীবন দিয়ে তিনি রেখে গেছেন তাই স্মরণ করা। তাই সে কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম। জয় হোক নূতন জীবনের, জয় হোক শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের যারা সেটার একটা দার্শনিক রূপ দিয়ে গেলেন।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

৮৯

…গীতায় ভগবান বললেন, আমি বৈশ্বানর অগ্নি …। বিশ্বরূপ যে নয় সে যেন হলের বাড়ীর ধার দিয়েও না যায়। … পরিপাক করতে পারবে যতটা ততটাই আস্বাদন করতে যেয়ো…মুদির দোকানে মৌমাছি গুড়ের রস খেতে গিয়ে আর নড়তে পারে না—তাতে আটকে মরে। যারা রসের সাগরে ডুবারার আগে চিনাদ করতে পারে না তারা এমনি মরে।…কৃষ্ণ মূর্তিমান রসশক্তি—দীপ্তাগ্নির ঘন বিগ্রহ… কৃষ্ণের কথা হচ্ছে বিষয়ে বিচরণ করব অথচ dispeptic হব না…। সব মানুষই তো এই রস নিয়ে বিপন্ন।…তাই কৃষ্ণের প্রয়োজন আছে জার্মানীরও। তাদেরও রসের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।…আজকের সংসার একান্তভাবে বহির্মুখীন হয়ে পড়ে' এর মীমাংসা করতে পারছে না।…

গুরুদেব পরীক্ষিতের ৯টা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন…

প্রথম—ঈশ্বর যারা তাদের সাহস আছে, ক্ষমতা আছে —তাই তিনি নিষেধ তাদের বিষয়…জোরের নাও তর দিয়া চলে…। কিন্তু দেখাদেখি সখা নাচে করলে তো চলবে না…। শিব বিষ খেয়েছেন—পার তুমি? নিত্যগোপালকে বিষ খাওয়ালে তিনি তা হজম করে ফেলতে পারেন, তুমি পার? তাহলে তিনি যা করেছেন, তুমি তাই করতে যাবে কোন্ বুদ্ধিতে?…এ যোগ্যতার প্রশ্ন—বস্তুকে হজম করে তার থেকে বলাধি শক্তির স্ফুরণ করতে হবে যা জীবজগৎকে ধারণ করবে।…তোমার কতখানি যোগ্যতা আছে? ক্লেশ অর্থ যোগ্যতার অভাব…কতখানি ভোগ পরিপাক করতে পারবে তুমি?…সাধারণ জীবনে যেমন শিশু দুধ খায় তার দাঁত নেই—ক্রমে ক্রমে সে কঠিন ও দুষ্পাচ্য খাবার ধরে, প্রথমে পিতামাতার সঙ্গে চলে, পরে স্ত্রী নিয়ে থাকে।…সাধনার জগতেও তেমনি।…তুমি যদি পরিপাক হত জমিদারের তাহলে জমিদারী যেতো না…। যো মাং ভজতি সংগ্রামে, এ কথাই কৃষ্ণেরও। তিনি বিষয়কে পরিপাক করবার challenge দিয়ে ছিলেন।…রস পরিপাকের practical class বৃন্দাবন…সব কিছুই পরিপাকের প্রশ্ন।…যে মাংস চিবিয়ে খেয়ে হজম করতে তার পক্ষে মাংস বিষ নয়।…হজম করতে পারলে মানুষ অত দূর যেতে পারে যেখানে ঈশ্বরও গেছেন।… —ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যম্ নৈষাচরিতং ক্বচিৎ—ঈশ্বরদের বচন তোমার পক্ষে সত্য…তাঁদের আচরণ তোমার পক্ষে সত্য নয়।…তোমার বালি পথ্য, কিন্তু যেহেতু আপনে রসগোল্লা খায়, সেই হেতু তুমিও রসগোল্লা খাবে?… আমার কথা পরিপাক করতে চলে, সেই অনুযায়ী চলতে হবে।…এসান্স হওয়া হচ্ছে পাচক রস।…বিশ্বরূপ হওয়া, অপরকে বিশ্বরূপ করে দেওয়া…কেউ কারো কর্তব্য অবহেলা করে না যারা জীবনে অগ্রগতি চায়।… ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের কাছে গেলেও তাদের স্বামী পুত্রেরা দেখলেন তাদের স্ত্রীরা ঘরেই আছে…কেননা ব্রজগোপীরা তো বিশ্বরূপ।…তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাকে তোমারই ষোল আনা করে রাখাটা কাম…প্রেম আস্বাদন করতে হলে স্ত্রীপুত্রকন্যাকে বিশ্ব-সম্পদ করে দিতে হবে…। কেবল টাকা অর্থাৎ অর্থই বিশ্ব-সম্পদ নয়—প্রত্যেক মানুষই যখন নিজেকে বিশ্বসম্পদ বলে মনে করতে পারবে তখনই ঘটে মানুষের মুক্তি…যদি কেউ আমার কথা শুনে জীবনে চলতে চাও তাহলে এসো…। এই পথে সদ্য মুক্তি হবে। …অনন্ত বাসস্থানে যে থাকতে পারে সে অনন্ত অব্যবধানে থাকতে পারে …কেবল কেবলা ছাড়া রস আস্বাদন হয় না…। যেখানে অহংতা, মমতা সেইখানে কাম…অহং-

বৈজ্ঞানিক এই আসক্তির ফলেই বিশোষিত জীবনের কায়।... নৌকাবিলাসের ভোরাভুবি কেউ পারল না ...যতবারই আমরা স্ত্রীপুরুষের সংযোগের নিয়ে বাড়াবাড়ি করি, ততই আমরা কল আমাদের পর হারিয়ে ফেলছি হলের সত্তা তখন সেইখানে যেখানে নর মুক্ত নারীর মুক্ত - নর ও নারী উভয়েই যেখানে মুক্ত সেখানেই হল আমাদের ...আমার কোষ্ঠীর দোষ থেকে মুক্তি দেবে—স্বামীর এইজন্য প্রণাম করে নিতে হয় ...কিন্তু তাঁর দোষের... আমার বললেন, তুমি অহংকারী, তুমি কিছু দোষ করো না ...কিন্তু অহংকারীরই দোষে অধিকার নাই, যিনি সকলের সঙ্গে অদ্বৈতভাবনা করছেন, তাঁর বিষয়দোষে অধিকার আছে।.....অদ্বৈত সিদ্ধি চাই—জ্ঞানাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত, দ্রব্যাদ্বৈত ...যে দিন তোমারে দিব সেই দিন তুমি... '... পরিপাক করার এই কৌশল পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যা কৃষ্ণ রেখে গিয়েছিলেন তা আজকের জগতে আবার নিয়ে এলেন শ্রীনিত্যগোপাল।...বলতে এইভাবে নিতে পারলেই হবে ধরার ধূলি স্বর্গরজ, ধরার মানুষ স্বর্গ-মানুষ। গীতায় দুই রকম অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি, ভক্তি-অগ্নি। জ্ঞানাগ্নি বাইরের আগুন—শুতে পুড়ে ছাই হয়। ভক্তাগ্নি যেমন ভুক্ত অন্নকে জারিত করে, রসরক্তের সৃষ্টি করে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে, ভক্তি-অগ্নি তেমনই সমস্ত কিছুকে পরিপাক করবার শক্তি দেয়—সেই পরিপাকের পথেই মানুষ পুরুষোত্তমত্ব প্রাপ্ত হতে পারে...সমস্ত দেহ তখন সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়।...

১৯.৪.৫৭—ওঁ...ওঁ। আমি বহুবার বহু রকম করে বলেছি যে এই সংসারটাকে পরিপাক করতে হবে। যোগ এদেশের ঋষিরা ভালবাসতেন...। যোগ নানারকমের ছিল...। যোগের এক অর্থ আত্মা ও পরমাত্মার মিলন। ...সংসারে তিন রকমের পদার্থ—মৌলিক মিশ্র যৌগিক। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোহা এগুলি মৌলিক পদার্থ। ...মিশ্র হচ্ছে লোহা—গন্ধকের গুড়ো, কাঠ—বালি—এগুলি মিশ্র, যৌগিক নয়।...যৌগিক হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সিজেনকে এমনভাবে মিশিয়ে দিলাম যে জল হয়ে গেল,...এমনভাবে যুক্ত হয় যে পরস্পরের ধর্ম বদলে গিয়ে জল একটা তৃতীয় বস্তু হয়ে গেল। H^2Oর বিশ্লেষে যদি কোন কৌশলপূর্বক বিদ্যুৎ (তাপ) চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই জল হল। রাধা আর কৃষ্ণ যোগিনী যুক্ত হয়ে এমনভাবে মিলনে যে গৌর হল, নিতাই—এটা একটা রাসায়নিক যোগ .....গৌরকে বিশ্লেষণ করলে রাধাকৃষ্ণ হয় ...এই যোগ মানুষকে লাভ করতে হবে... তাঁকে দিয়ে তো মিশ্রণ হয়, যোগ হয় না। লোহার গুড়ো গন্ধকের গুড়ো মিশালে সেটা মিশ্রণ হয়। চুম্বক দিয়ে লোহার গুড়ো আলাদা করে নেওয়া যায় .....বালির সাথে চিনির রসগত মিল হয় নি...। সাধারণ লোকের জীবনে মিলন মিশ্রণ হয়, যোগ হয় না। যোগ হলে হবে—তাতে দুজনেই বদলে যায়—বদলে গৌর হয়ে যায়। কিন্তু সংসারে সাধারণত এমন রাসায়নিক যোগ দেখা যায় না। পুরুষ যৌগিক, প্রকৃতি যৌগিক দুই-এর মিশ্রণে নিত্য যৌগিক মিলনে সচ্চিদানন্দ আস্বাদন।...গায়ে গায়ে তো মেশে বলে মনে হয়—কিন্তু বালি বালিই থেকে যায়, চিনি চিনিই থেকে যায়...। সংসারে পুরুষ প্রকৃতি মেশে, কিন্তু গলে না তো, বদলায় না তো—তাই সেখানে তাপ সৃষ্টি হয় না...তাই বস্তু পরিবর্তিত হয় না, নূতন কিছু গড়ে ওঠে না।...নিতাগোপালের জীবনে দেখে দেখে আমার কাছে এই সকল তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে...। জানি দিয়ে কিছু পাই নি—রাসায়নিক মিলনের মধ্য দিয়ে পেয়েছি ...ছিল শক্তি মন্ত্র—কালাচাঁদের সঙ্গে জীবনের প্রথমে নিবিড় আত্মীয়তা ছিল না—কেবল বকুল ফুলের মালা দেওয়া পর্যন্ত।...এক বছর পরে বদলে দেব বললেন...এই বছরখানেকের মধ্যেই কৃষ্ণ আমার জীবনে আসতে থাকলেন।...নিতাগোপাল রাম হলেন, কৃষ্ণ হলেন, গৌর হলেন...। আমাকে আকর্ষণ করলেন একদিন স্বপ্নে—টানের চোটে ঘুম ভেঙে গেল। ...তাই আমি যখন কৃষ্ণ বলি, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একমুখী হয়েই কৃষ্ণ বলি ...। সেদিনকার স্বপ্ন শুনে ঠাকুর বলেছিলেন...আশীর্বাদ তোমার উপরে আছে, তাই মায়ের পূজার স্বামী পেলে। ছোটবেলা বাবামা-ই প্রতিপালন করেন, যুবতী হলে বাবামা-ই স্বামী এনে

দেন ...দুর্গাপূজা করে স্বামী কৃষ্ণকে পেলে ..কিন্তু মনে হয় কখনও ছোট হোস না তুমি ...তাদের সম্বন্ধে আমি নূতন কথা কই। পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সব আন্দোলনেই আমি শোষণের বিরুদ্ধে বলি—অর্থাৎ রাধার জীবন-কথা বলি।.....রাধা আজি সব গৌরবশালী রূপ ... প্রাচীন বৈষ্ণবেরাও আমার কাছ থেকে নূতন করে রাধাতত্ত্ব শুনতেন .....ছোটবেলা থেকে মা মা বলেই তো জানতাম—রাধাকৃষ্ণকে তো জানি নি? তাঁরা এলেন কেন আমার জীবনে?...দুর্গাকেই ভালবেসেছিলাম ...। সে পরিবর্তন যে এমন আকস্মিক পথে হবে তা কি জানি জানি?...রাধাকৃষ্ণ যার জীবনে এসেছে অন্য মানুষকে তা দিয়ে যেতে পারলাম না—এ কি কম লাঞ্ছনা?...কিছুদিন এমন চলেছিল যে রাধা এলে কৃষ্ণ পালান, আবার কৃষ্ণ এলে রাধা পালান.. দুজনকে একসঙ্গে বুঝতে পারছি না।.. তারপর দুইজনের রাসায়নিক যোগ হল.....। তোমরা যদি রাসায়নিক যোগের জীবন যাপন করতে চাও তো এসো আমার সঙ্গে। আর যদি জীবনটা মিশ্র যোগ দিয়েই কাটাতে চাও তো থাক।...মিশ্রণের ভিতর মাত্রাযোগের প্রয়োজন নেই—সেখানে যে কোন মাত্রার সঙ্গে যে কোন মাত্রা রাখা যায়...। কিন্তু রাসায়নিক যোগে মাত্রারই ব্যাপার। ঠিক মাত্রা থেকে একটু এদিক ওদিক হলে আর জল হবে না ...কোন্ মাত্রায় যোগ চাও?...মাত্রার সামান্যতম বেশকমেও বস্তুর আলাদা রূপ হয়ে যাবে।...কত মাত্রায় লোহার সঙ্গে কত মাত্রায় গন্ধক মেলালে তুঁতে হবে তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে... মাত্রার তফাৎ হয়ে গেলেই আর তা তুঁতে হবে না...স্মৃতির দুই রূপ—জীবন্ত ও যান্ত্রিক...। মহাপ্রভুর জীবনের ইতিহাসে পাশে জীবনে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে ...জীবনে বিয়োগেরও একটা যোগ হিসেবে জানতে হবে।..... নরনারায়ণ আশ্রমে থাকতে হলে জীবনের সব ক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে...ইন্দ্রিয়কে জয় করতে হলেও যোগ দরকার ...এই যোগ দেখাতেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ. পুরুষোত্তম গৌর, পুরুষোত্তম নিতাগোপাল এলেন.....জীবন মিশ্র পদার্থ নয়—জীবন একটা যৌগিক পদার্থ।

...ভগবানের দেওয়া এই সুন্দর জীবনখানা নিয়ে ছেলে খেলা করো না...। নিতাগোপাল শক্তি-শক্তিমান যোগের কথা লিখে গেছেন ...তাঁর লেখা পড়ার জন্য তো তোমাদের কোন আকুলিবিকুলি দেখি না।...নিত্য নূতন করে কত কথা পাই,...কত কথা হারিয়ে গেছে।...কে ধরে রাখছে?...দুজন সরোবরের দিনে শুয়ে থাকতাম—বৃষ্টির মত তত্ত্ববৃষ্টি হত। বলতাম হরিচরণ বাবাজীর কাছে। ...নগেন্দ্রনাথ রায় গুরুভ্রাতা আমাকে প্রেমিকদাদা বলে ডাকতেন। সেই গেছে...। পুরনো সম্পর্ক এইভাবে রেখে দিয়ে নূতন জীবন যাপন করা চলবে না—আগের গাঁথুনিতেই কি নূতন বাড়ী উঠতে পারে? Moleculeগুলির যে বিন্যাসের ফলে চুম্বক হবে তা তো নূতন—লোহা থেকে তা আলাদা—readjustment জীবনে করে নিতেই হবে যদি নূতন জীবন চাও।... জীবনের যে চলা ব্যর্থতা এনে দিয়েছে, আজ তো তাই রেখে নূতন জীবন পাওয়া যাবে না ...অতীত জীবনের সম্পর্কের ফলে জীবন তো বেঁকে চুরমার হয়ে গেল—এখন তাকে যদি নূতন করে না নেই তাহলে নূতন জীবনকে পাবে কি করে? তাল সৃষ্টি হওয়া দরকার নূতন জীবন চালাতে হলে।...

"...সর্বপথসমন্বয় ও গন্তব্যস্থল একই পর সত্যের দুইটি সম আস্বাদন। অনন্ত পথে যুগপৎ বিচরণ করিয়া অনন্ত পথিকের সঙ্গে অনন্ত গলা ধরাধরি করিয়া অনন্ত কাল চলার মধ্যে রহিয়াছে 'পথের শেষ'। এক পথে 'পথ শেষ' হয় না; অনন্ত পথই পথের শেষ।"

- শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

সাময়িকী

নূতন দেশ, নূতন মানুষ, নূতন জীবন—পঁচিশ বৎসরের যাতনার অবসান হইল, নিশার আবেশ কাটিয়া গেল, ঘৃণাবিদ্বেষজাত কোন বস্তু যে আদলে সত্য নাম লইয়া দীর্ঘকাল টিকিতে পারে না, মানুষের মানুষত্বের অপমান যে একটানা দীর্ঘকাল চলিতে পারেনা, তাহাই আর একবার প্রমাণিত হইল। পূর্ব বাঙলায় এক নূতন দেশ, নূতন মানুষ, নূতন জীবনের অভ্যুদয় হইল। সেখানে অনাত্মীয়ের উৎপীড়নের অবসান ঘটিল। ধর্ম এক হইলেই কি আত্মীয়তা হয়? স্বাভাবিক সহজাত দরদের সৃষ্টি হয়? ভৌগোলিক তথা দীর্ঘকালীন একই অর্থ-নীতির মধ্যে বসবাস যে সহজাত পারস্পরিকতার সৃষ্টি করে তাহা কি হাজার মাইল ব্যবধানের মানুষের সঙ্গে সম্ভব? ধর্ম যদি কাহারও নিকট জীবন্ত সত্য ধর্মরূপে থাকিত তাহা হইলে তো তাহারা এবে অপরের প্রতি কোন অত্যাচার অপমানই করিতে পারিত না। সত্য ধর্ম যদি কোন এক পক্ষেরও থাকিত তাহা হইলে যেমন পাকিস্থান সৃষ্টিই হইত না, তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেও এত অত্যাচার অপমান নিপীড়ণ সম্ভব হইত না। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ ধর্মের মুখোষ দাঁড় করাইয়া ক্ষমতার লড়াই জিতিবার পথ সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সঙ্গে ছিল সেদিন ব্রিটীশ কূটনৈতিকতার সংমিশ্রণ। ধর্মের গোঁড়ামির দোহাই দিয়া আজিকার যুক্তি ও বিজ্ঞানের জগতে মানুষকে বাঁধিয়া রাখা আর কি সম্ভব? আজ সেই গোঁড়ামির অবসান হইল। যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছিল সেদিন ধর্মের দোহাই দিয়াই তাহা সৃষ্ট হইয়া ছিল বটে কিন্তু যেহেতু তাহার পিছনে ছিল শুধু হিংসা আর বিদ্বেষ—সেহেতু উহা সত্য ধর্ম ছিল না। যে ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করিতে, বিদ্বেষ করিতে, নস্যাৎ করিতে শেখায় সে কি একটা ধর্ম—নাম তাহার যাহাই হউক না কেন? ইসলামধর্মী জনসাধারণও একদিন যাহাদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া ইসলামধর্মীয় রাষ্ট্রই সকল সমস্যার সমাধান বলিয়া পাকিস্তান চাহিয়া ছিলেন, সেই অপর ধর্মীগণও সত্যধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহারা যদি ধর্মের সত্য রূপের সন্ধান জানিতেন তাহা হইলে অপর ধর্মীয়গণকে ঘৃণা করিতে, ছোট মনে করিতে, অপমান করিতে পারিতেন না। উভয় পক্ষই ধর্মীয় গোঁড়ামি দ্বারা বশীভূত ছিলেন বলিয়াই কখনও এ পক্ষের, কখনও ওপক্ষের দোষের আধিক্য হেতু গত বহুক শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে নানা দুর্দশা চলিয়াছিল। পাকিস্তান হওয়ার জন্য ভারতবর্ষীগণ যদিও নেতা বিশেষকেই দায়ী করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দায়ী করার বুদ্ধিটা নিতান্তই অদূরদর্শিতার ফল। দীর্ঘকালের নিজেদের কর্মদোষ বুদ্ধিদোষেরই যে স্বাভাবিক পরিণতি এই পাকিস্তান, তাহা কি কেহ তলাইয়া দেখিল? অপর ধর্মকে, ইসলাম-ধর্মকে তথা সেই সেই ধর্মীয়গণকে ছোট মনে করার, ঘৃণা করারই যে ইহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহা কেহ বুঝিতে চাহিল কি? ভারতবর্ষে একদিকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকে আত্মবৎ দেখিতে বলিয়াছে। অপর দিকে সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামধর্মীয় স্পর্শে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া রাখে। মিলিল কোথায়? ব্রহ্ম-বোধকে, আত্মবৎ দেখার ঔদার্যকে যদি সমাজের ক্ষেত্রেই আনিতে না পারা যায় তাহা হইলে সে তত্ত্ব কোন্ কল্যাণ করিবে? এইভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে ভারতবর্ষীয়ের চিন্তা ও আচরণে যেমন ত্রুটি ছিল, তেমনি ইসলামধর্মীয়গণও বুঝিতে পারেন নাই যে সর্বসাধারণের জীবনে ধর্ম আজিকার দিনে এমন জীবন্ত ও শক্তিশালী নয় যে উহা মানুষের আর সব বিবেচনাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে, বিশেষতঃ যখন সে ধর্ম ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়া সকলেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া অনেক হইল।

এখন অনেক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়া আমরা সকলেই চিন্তা ও আচরণের ভুল বুঝিয়া নূতন এক সংস্কৃতির অধিকারী হই নাই কি? ধর্মের বহিরঙ্গের রূপ যাহাই হউক না কেন তাহা যদি মানুষের জীবনের সমগ্রতা নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাকে আংশে আংশে ভাগ করিয়া ফেলে—যদি তাহার ধর্মবোধ তাহার জীবধর্মবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে না পারে, যদি তাহা মানুষকে ভালবাসিতে আপন করিতেই না শিখায়, তাহা হইলে যেমন কোন কল্যাণ নাই তেমনি একের উপরে অপরের আধিপত্য, তাহার প্রতিক্রিয়ায় আবার যে শোষিত হইতেছিল তাহার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া শোষককে শোষণ করা—অনন্তকাল এইভাবেই চলিয়া আসিতে থাকিবে। কিন্তু এইরূপ একের অস্তিত্ব করিয়া অপরের প্রতিষ্ঠা—এই চিন্তাধারা আজ ভুলিতে হইবে। আজ বুঝিতে হইবে, মানিতে হইবে যে কাহাকেও পরাভূত করিয়া অপর কাহারও অস্তিত্ব যেমন সম্ভব নয়, তেমনি কাহাকেও বাদ দিয়াও অপর কেহ রক্ষা পাইবে তাহাও ভুল। সত্যিকারের ধর্ম বাদ দিয়া রাজনীতি যে অসুর-বৃত্তিতে পরিণত হয়, তাহা কি বিশ্বের দিকে চাহিয়া আজও বুঝিব না? আমরা ধর্ম কথাটার অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ করিয়া ফেলিয়াছি। কতকগুলি আচার আচরণ শেষ পর্যন্ত ধাপ্পাবাজী পর্যন্ত আজ ধর্মের নামে চলিতেছে। ধর্ম সমগ্র জীবন হইতে আলাদা কিছু নয়। তাহাকে সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়া ও সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র অর্থনীতি চালাইতে চাহিলে কোন সুদূরপ্রসারী কল্যাণ আমরা লাভ করিতে পারিব না। কেন না ধর্ম বলিয়া কিছু একটা মানুষের সমস্ত জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া আছে। যদি সত্য ধর্ম থাকিত, যদি ধর্ম বলিতে চিত্তের প্রেম ও উদারতা—জীবনের ব্যাপকতা গভীরতার বিস্তৃতি—আনিয়া দিত তাহা হইলে এরূপ কোন বিপদই ঘটিত না। ধর্ম মানে প্রেম, ধর্ম মানে কল্যাণ-বুদ্ধি—এবং তাহা সমাজের জীবধর্মের ক্ষেত্রে—সমাজ-সম্বন্ধের বাইরেই শুধু নয়। সত্য ধর্ম ছাড়া ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তিদ্বারা বিশ্বের কি হিত হয় তাহা কি আমরা দেখিতেছি না? সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সখা হাড়িয়াই দিলাম, গণতন্ত্রের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ধারক বাহক চীন (পশ্চিমবাঙ্গলার বুদ্ধিপ্রধান যুবসম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন যে বিভ্রান্ত করিতেছিল) আজ নরঘাতক ইয়াহিয়ার প্রকাশ্য সমর্থক হইয়া দাঁড়াইতে যে পারে তাহা সম্ভব হয় কোন্ ছিদ্রপথের জন্য? শোষিত মানবাত্মার হিত করার নামে যে এতকাল চীৎকার করিয়াছে সে আজ নরঘাতকের সাথিন হইল কেন? যেহেতু তাহার কোন ধর্মবুদ্ধি কল্যাণবুদ্ধি ছিল না। জীবনকে ভাগ করিয়া ফেলিয়াই এই ঘটনা ঘটিতেছে। ধর্ম মানে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান নয়—ধর্ম মানে জীবনের সামগ্রিকতা বোধ যাহা সব বিরোধ হিংসা আসক্তিকে হজম করাইয়া তাহার ঊর্ধ্বে যাইবার শক্তি দেয়। ধর্মের এই বোধ লইয়া আজ আমাদিগকে রাজনীতি করিতে হইবে। পাকিস্তানের সৃষ্টি ও তাহার বর্তমান ক্রমবিলয়মানতা, স্বাধীন বাংলাদেশের জন অভ্যুত্থানের ভাবাভিত্তিক প্রথমারম্ভ চেতনার অনুখাবন একদিকে, আর এক দিকে আমাদের নিজেদের অতীতের ধর্মনামধেয় পাষণ্ডতার পরিণামে এতদিনের শাস্তি—এ সব কি আমাদিগকে জীবনের ও জগতের নূতন মূলবোধ শিখাইবে না? এতদিনে কি একটুও শিখায় নাই? কিন্তু নিশ্চয়ই শিখাইয়াছে—নূতন দেশ নূতন মানুষ নূতন জীবনের যখন সৃষ্টি হইল তখন বিশ্বাস করিব নিশ্চয়ই আমরা ঠিক আগের মানুষই নাই। সেই কথাই বিশ্বাস করিব—আমরা নূতন মানুষ। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিব—আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ—সেইজন্যই আমরা পরস্পরকে ভালবাসিব। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক বলিয়াই যে শুধু ভালবাসিব তাহা নয়। আমরা মানুষ—মানুষের মত প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সকলকেই ভালবাসিয়া বাঁচিতে চাই—সেইজন্যও ভালবাসিব। একই ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষকে ভালবাসা সহজ—রুচি পছন্দ এক বলিয়া। কিন্তু অপর মানুষের রুচি যদি মানুষকে হত্যা করা, মানুষকে অপমান করা, অত্যাচার করার রুচি না হয় তবে সে আমার ভাষাভাষী বা একই সংস্কৃতিবান না হইলেও তাহাকে ভালবাসিব। আমাদের দৃষ্টি এতটা সুদূরপ্রসারী না হইলে আমরা কিসের মানুষ? আমরা অনেক

শান্তি পাইয়াছি—আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আমরা ভালবাসিব, আমরা মিলিয়া মিশিয়া অগ্রসর হইব, আমরা হিংসা করিব না, ঘৃণা করিব না, অবিশ্বাস করিব না। নূতন দেশ, নূতন মানুষ, নূতন জীবন যাহাদের তাহাদেরও ঐ কথা—আমাদেরও ঐ কথা। আমরাও নূতন হইয়া ঐ সংকল্পই লইলাম। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও মিলিয়া মিশিয়া এক-রাষ্ট্র এক-বিশ্ব স্থাপনা করা যায় এই কথা ভবিষ্যৎ দিনগুলিতে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে। স্বতন্ত্র হইবার আহ্বান যেমন ব্যক্তির জীবনে, তেমনি সমষ্টিগত জীবনেও রাষ্ট্রেও। কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়াছি বলিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিব না, অপরের উপর চড়াও হইব—তাহা যে আজ চলিবে না—আমরা সেই দৃষ্টান্ত রাখিব।

আমাদের সকলেরই এই নূতন দিনে আজ স্মরণ করি সেই তাঁহাদের জানা না-জানা যাঁহারা সেই ভাষা আন্দোলনের সুরু হইতে আজ পর্যন্ত ওপারে এবং এপারে যে অগণনরা এই নূতন দিন আনিতে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। আজ তাঁহারা নাই—কিন্তু তাঁহাদেরই আত্মদানে আমাদের আজ আনন্দের দিন। তাঁহাদের আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই আর সংকল্প গ্রহণ করি তাঁহাদের মত আমরা যেন প্রয়োজনে মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন দিবার মত বীর্য লাভ করি। আমরা যদি মিলিয়া মিশিয়া উন্নততর জীবনে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি তাহা হইলেই শুধু তাঁহাদের প্রতি আমাদের ঋণ শোধ হয়—আর কিছুতে নয়। তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে একথা যেন ভুলিয়া না যাই।

গান

॥ শংখচিল ॥

সুর (গজল)

ছন্দিতা ইসলাম.....
তার নাম।
'দিল খুসাতে' দিল্‌সারেরে
স্বপ্নে হেরিলাম।
ইসলামেরই ছন্দ সে যে
মুন্নাজিনের দিল্‌কালাম্‌।.....
তার নামেতে কাব্য লিখি,
তার সে নয়ন স্বপ্নে দেখি,
ও নয়নে নিশা কাঁদে
কাঁদায়ে সারা জাহান.....
তার আলোতে সূর্য উঠে,
তার হাসিতে চন্দ্র ফুটে,
তার ইশারায় তারা জুটে
গায় মিলাদুন্‌ নবী নাম.....
তার গানেতে বহে নদী,
করুনা কাঁদে নিরবধি
তার নামেতে গাছে পাখি
পাহাড়ে জমিন সালাম.....

---

২৪ পরগণা জেলার বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি তুলা ও চীনা বাদাম চাষের বিশেষ উপযোগী।

আমন ধান কাটার পর জমি পতিত না রেখে ঐ জমিতে তুলা ও চীনা বাদামের চাষ করুন।

পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য আপনার এলাকার গ্রামসেবক ও ব্লকে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত॥

ধান কাটার মরশুম এসে গিয়েছে !!!

* আপনার ও সকলের স্বার্থে ফসল কাটার সময় শান্তি বজায় রাখুন।
* বর্গাদারকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না।
* ফসল বণ্টনে বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় ভাগ চাষ অফিসার অথবা জে. এল. আর. ও'র মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন।
* মনে রাখবেন—দেশের কৃষি উন্নয়ন বর্গাদার ও জমির মালিকের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। নিজেদের দায়িত্ব পালন করে দেশের কৃষি অগ্রগতির অংশীদার হোন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-2.J14

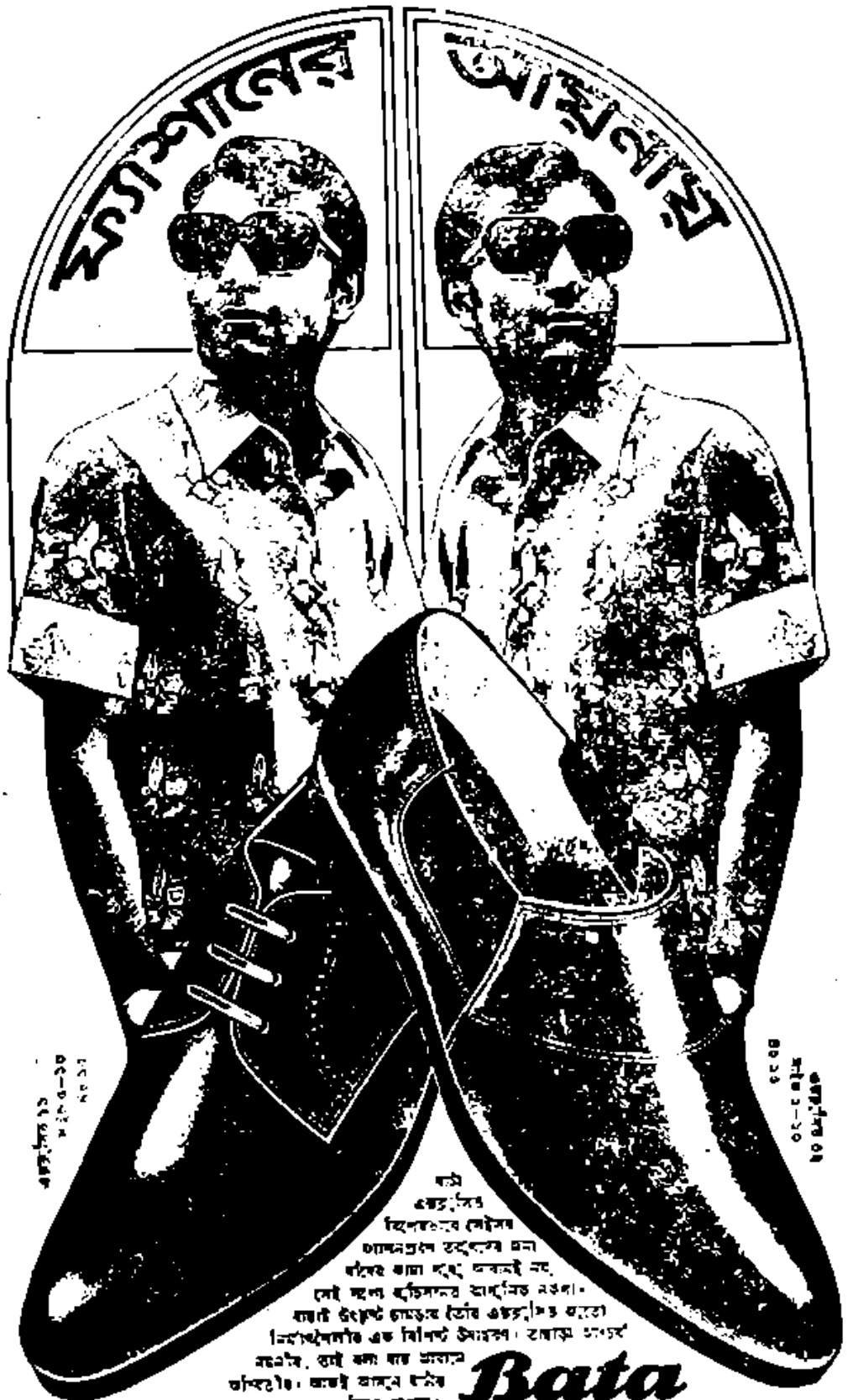
ফ্যাশনের
আধুনিক
Bata

যুদ্ধকালীন অবস্থায় আপনার কর্তব্য !!

★ দেশের সংকট আপনারই সংকট, সতর্ক থাকুন, ঐক্যবদ্ধ হোন।

★ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র মজুত করবেন না। দ্রব্যমূল্য বাড়তে দেবেন না।

★ শান্ত থাকুন, শান্তি রক্ষায় সদা সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

★ গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না।

★ অফিস আদালতে, কলকারখানায়, ক্ষেত-খামারে কাজের গতি অব্যাহত রাখুন।

★ মনে রাখবেন—লড়াই শুধু রণাঙ্গনে নয়—গৃহাঙ্গনেও। জয়ের জন্য উৎপাদন বাড়িয়ে যান।

★ ভুলবেন না—বিশৃঙ্খলা শত্রুকে সাহায্য করে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখুন।

★ অসামরিক প্রতিরক্ষার বিধি নিষেধ মেনে চলুন।

॥ ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কর্তৃক প্রচারিত ॥

॥ অসামরিক প্রতিরক্ষা আপনার দায়িত্ব ॥

★ অসামরিক প্রতিরক্ষা—আপনার দ্বারাই আপনাদের প্রতিরক্ষা। অসামরিক প্রতিরক্ষার যোগ দিন।

★ আপনার ওয়ার্ডেনের সঙ্গে পরিচিত হোন। প্রয়োজনের সময় তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ নিন।

★ বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনি শোনামাত্র নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবেন।

★ মনে রাখবেন—প্রকৃত বিপদের চেয়ে বিপদের আতঙ্ক অনেক বেশী ক্ষতিকর। গুজব ছড়াবেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না।

★ আপনার বাড়ী নিষ্প্রদীপ করার সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখুন।

২৪ পরগণা জেলা অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার পক্ষে জেলা তথ্য ও
জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ	
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০	ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০	বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
কর্মবাণী	১·২৫	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	বাংলার ঋষি	৩·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০	বাংলার বিদুষী	৩·০০
Soul of India Speaks	৬·০০	বাংলার মনীষী	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	জীবন গড়া	·৭৫
পকেট গীতা	৩·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	২·৫০
		আচার্য জগদীশ	২·৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি		আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫	রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

ral Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

1 FEB 1972

সূচীপত্র

উজ্জ্বলভারত, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৮

১। উনবিংশতম জন্মক্ষণে ১-১
শ্রীসুনীতি দেবশর্মা
২। স্মরণে ২-৮
শ্রীশচীন্দ্রকুমার অধিকারী
৩। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় পুরুষোত্তমানন্দ ৯-১০
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ
৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১১
শ্রীরেণু মিত্র
৫। সাময়িকী ১২
নূতন বেশ, নূতন মানুষ, নূতন জীবন
৬। গান ১২
শ্রীশংখচিল

বিজ্ঞপ্তি

ই মাসে 'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার ২৪ বৎসর শেষ হইল। আগামী ১৯৭২-এ মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৮ হার ২৫-শ বর্ষ আরম্ভ। বহু দুর্যোগ সত্ত্বেও এখনও ইহা [illegible] করিবার সংকল্প লইয়া চলিলাম। র প্রতি নিবেদন তাঁহারা যেন দেয় চাঁদা শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। দাতাদের প্রতি নিবেদন আমরা যেন তাঁহাদের সহযোগিতা আরও বেশী পাই। যে কেহ ারতে'র চিন্তাধারাকে বাঁচাইয়া রাখা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের ও সহযোগিতা এই নূতন বৎসরের যাত্রারম্ভ ক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি।

কার্যাধ্যক্ষ
উজ্জ্বলভারত

ণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত